[*Written in accordance with the Syllabus of Higher Secondary and Multipurpose Schools.*]

জীববিজ্ঞান-প্রবেশ

তৃতীয় ভাগ

[একাদশ শ্রেণীর জন্য]

[প্রদর্শন, পরীক্ষা এবং ব্যবচ্ছেদ প্রণালীসহ তুইশত চিত্রপূর্ণ]

ডক্টর হরিদাস গুপ্ত, এম. এস-সি., ডি. ফিল.

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটী : জীববিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, মণিমালা গার্লস্ কলেজ, আসানসোল।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

নিবেদন

জীববিজ্ঞান-প্রবেশ তৃতীয় খণ্ডে সমাপ্ত হইল। তৃতীয় খণ্ডটিও অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় পাঠ্যসূচীর নির্দেশ অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে। একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আছে; যেমন—পুষ্পের বিবিধ পুষ্পবিন্যাসের মধ্যে কতকগুলি কেবল পাঠ্যসূচীতে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট বাদ দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রেও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ফলের প্রকার বাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্বের পাঠ্যসূচীতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ব্যাঙের জননতন্ত্র পাঠ্যসূচীতে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু উহার রেচনতন্ত্রের উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু ব্যাঙের জননতন্ত্রের সহিত উহার রেচনতন্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং রেচনতন্ত্র পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত হইলেও এই পুস্তকে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার পাঠ্যসূচীতে জোঁকের বিবিধ তন্ত্রগুলিকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া ছাত্রদিগকে দেখাইতে বলা হইয়াছে; কিন্তু জোঁকের অন্তর্গঠনের যন্ত্রগুলির সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকিলে ছাত্রগণ কি করিয়া ব্যবচ্ছেদ হৃদয়ঙ্গম করিবে? সুতরাং জোঁকের বিবিধ তন্ত্রগুলি পুস্তকে চিত্রসহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। চিত্রগুলিতে ১, ২, ৩ ইত্যাদি ইঙ্গিতের দ্বারা বিবিধ যন্ত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। চিত্রের নিম্নে চিত্র পরিচিতিতে উহাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রদিগকে চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইহাই আধুনিকতম পন্থা। পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পুস্তকের পরিচ্ছেদ ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদের নিম্নে তাহার পাঠ্যসূচী অংশও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার দ্বারা পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত অংশগুলি সহজেই জানা যাইবে। ছাত্র-ছাত্রীদিগের কতখানি অধ্যয়ন করিতে হইবে তাহা জানা প্রয়োজন। উপরোক্ত ব্যবস্থায় তাহাও প্রতীয়মান হইবে। পুস্তকের অর্ধেকের চেয়েও বেশী চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

গৌরী সেনের মত যিনি এই পুস্তকের জন্য অর্থ খরচ করিয়াছেন এবং পুস্তকটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে যাঁর সবচেয়ে আগ্রহ, তিনি হইলেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর মাননীয় ডিরেক্টর, শ্রদ্ধেয় শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বন্ধুবর শিল্পী নির্মলাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় চিত্রগুলি সযত্নে অঙ্কন করিয়াছেন। সুতরাং এই পুস্তক প্রকাশের কৃতিত্ব অর্ধেক তাঁহার। বাকী অর্ধেক কৃতিত্ব এই

পাবলিশিং কোম্পানীর শ্রীপবিত্রকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের। এই পুস্তকের গঠনকাজে তাঁহার অমানুষিক পরিশ্রম ও একাগ্রতার জন্যই এই বৃহৎ পুস্তকখানি আজ আপনাদের কাছে পরিবেশন করিতে পারিতেছি। আমি বিমলাবাবুকে ও পবিত্রবাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকের প্রথম সংস্করণে ভুল-ক্রটি থাকা অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং আপনাদের দৃষ্টিপাতের পূর্বেই তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইতেছি। আশা করি আপনারা মার্জনা করিবেন।

উদ্ভিদ্-বিদ্যা ও প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ,
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মহাবিদ্যালয়,
নৈহাটী

হরিদাস গুপ্ত

সূচীপত্র

উদ্ভিদ্-বিদ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাণিতত্ত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

HIGHER SECONDARY COURSE

BIOLOGY SYLLABUS FOR CLASS XI

Course Contents	*Demonstration*	*Practical*	*Field Class*
Homology & Analogy	Specimen Charts		
Defensive organs			
Climbing organs	,, ,,		
Infloresence			
Raceme, Panicle, Spathe,			
Spikelet, Spadix, Umbel,	,, ,,		
Capitulum. One Simple	,, ,,		
Cymose, Hypanthodium,			
Verticillaster.		Draw	
Bract			
Simple, Epicalyx Involucre	Specimen Charts		
of bracts. Spathe.		Draw	
Parts of a typical flower and their functions,			
Types of flowers :	,, ,,		
Insertion of floral leaves,	,, ,,		
Complete, Incomplete,			

Course Contents	*Demonstration*	*Practical*	*Field Class*
Hermaphrodite, unisexual, Staminate, Pistillate Monoecious & Dioecious plants. Regular or Irregular.		Draw	
Calyx-duration	Specimen Charts	Draw	
Corolla (a few main forms) Androecium.			
Gynoecium.			
Placentation (common types)	" "		Field Class for Inflorescence and flowers.
Ovule-parts, forms	" "		
Flower is a modified shoot,	" "		
Cohesion and Adhesion.	" "		
Pollination—Types agents with stress on wind and insect pollinated.	" "		
Flowers contrivances favouring cross pollination	Charts		
Merits and demerits of self and cross pollination.			
Fertilization.	Charts		

5/0

Course Contents	*Demonstration*	*Experiment*
Fruit		
Simple Fleshy (Drupe, Berry)		
Dry-dehiscent. (Legume, Follicle capsule) —indehiscent	Specimen Charts	Draw
Caryopsis		
Acheme		
Nut, Samara.		
Aggregate—		
Composite—		
Sispersail of fruits and seeds.		
Wind	Specimen Charts	
Water		Field Class on fruits
Insect		
Mechanical		
Seeds		
Pea Caster, Rice—(Maize)	Specimen	Draw

Course Contents	*Demonstration*	*Experiment*	*Field Class*
Germination	Three sets of		
Conditions necessary	Three Bean experiment to		
Types—	test temperature factor,	Record	
Hypogeal Epigeal Vivipary	Speciment charts.		
Food in the plant organs		Draw	
Root, Stem, Leaf, Fruit, Seed, Test for Carbohydrates, Proteins, Fats & Oils	Test tube, experiment with extracts from plant organs.		
Essential Food elements (mention—trace elements)	Experiments (Water culture hydroponics), Charcoal culture, Sand culture, Charts showing picture, before and after expt.	Record	To agricultural farm & plant breeding str.
Types of Soil (Qualitative)			
Fertilizers			
Chemical, animal,	Simple expt. on physical		
Vegetative,	properties amount of air and	Record	—do—
Symbiosis—Rotation of crops,	watet-humus (by ignition).		
Nitrogen cycle (elementary)	Charts		
Carbon cycle (elementary)	Charts		
Growth	Simple expts, with space marker,		—do—
Movement (Light, Gravity, Water contact)			—do—
	Simple expts.		—do—

Course Contents	*Demonstration*	*Experiments*
1. Invertebrate.		
1. Structure and life history of *Amæba, Monocystis & Hydra.*	Demonstration by charts, models & actual specimens of *Amæba,* Trophozoite & Gametocyte stages of *Monocystis,* Paramoecium, Tr. Sec. & Long. Sec. of Hydra.	Examination and sketching of the Trophozoite and Gametocyte at ages of the Monocystis, T.S. & L.S. of Hydra.
2. *Prawn* — Gross anatomy (excluding details) of the alimentary, circulatory, respiratory, excretory, reproductive & nervous systems and an outline idea of their functions.	Demonstration & dissection of the external features & general viscera of Leech.	Dissection & sketching of the appendages, alimentary & nervous systems of Prawn.
	Demons, by charts & dissection of all the systems mentioned in the course content, and statocyst, simple eye and vertebrate eye.	
3. *Cockroach.* — Gross anatomy (excluding details) of the reproductive, nervous and circulatory systems.	Demonstration of the male and female reproductive organs of Cockroaches.	Dissection and sketching of the nervous system of Cockroach.
II. Vertebrata. — Gross anatomy (excluding details) of the almentary, respiratory, circulatory, excretory, reproductive, nervous and skeletal systems, eye and ear of toad and frog.	Demonstration by charts, models & dissection of all the systems mentioned in course content.	Dissection and sketching of the general viscera, alimentary, circulatory, and reproductive systems.
	Demonstration of the buccal cavity & pharyanx; blood film & circulation; different stages of the life-history; Tr. Sec. of liver, kidney and intestine.	
Outline functions of the different systems.		Study of sketching of the bones.

উদ্ভিদ্-বিদ্যা

উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা

পারিভাষিক শব্দ

(ইংরাজী হইতে বাংলা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

Analogy— সমবৃত্তিতা
Analogous organ- সমবৃত্তি অঙ্গ
Alkaloids— উপক্ষার
Arisæma— কচু-জাতীয় গাছ
Bristles— সূঁচালো-কণ্টক
Bracts— মঞ্জরীপত্র
Bracteate— মঞ্জরীপত্রযুক্ত
Basipetal— নিম্নমুখী
Biparous— বহুপার্শ্বীয় বিন্যাস
Cladode— ক্লাডোড
Caladium— একপ্রকার কচু-জাতীয় গাছ
Climbing organ of plants— উদ্ভিদের আরোহী অঙ্গ
Corymb— সমভূমি বা কোরিম্ব
Capitulum— শিরামঞ্জরী বা ক্যাপিটিউলম্‌
Cymose inflorescence — নিয়ত পুষ্পবিন্যাস
Centrifugal order— অপকেন্দ্রভাবে বিন্যাস
Defensive mechanism in plants— উদ্ভিদের রক্ষাকর যন্ত্র
Dense or stiff hairs- ঘন বা শক্ত রোম
Disc florets- মধ্য-পুষ্পিকা
Ebracteate- মঞ্জরীপত্রহীন
Epicalyx— উপবৃতি
Foliaceous— জংলীমটরে ফলকাকৃতি উপপত্র
Floret— পুষ্পিকা
Female flower— স্ত্রী-পুষ্প
Flowering glume— সপুষ্পক বর্মপত্র
Glandular hairs— গ্রন্থিরোম
Glume— বর্মাকার বা বর্মপত্র
Homology— সমসংস্থা
Homologous organ— সমসংস্থা অঙ্গ
Hook-climbers— মূলারোহী-রোহিণী
Hypanthodium— হাইপান্থোডিয়ম
Inflorescene- পুষ্পবিন্যাস
Involucre— পত্রাবরণী
Indefinite or Racemose— অনিয়ত
Leaf-tendril- পত্রাকর্ষ
Leafy- পত্রাকৃতি
Lodicule— শুষ্কপত্র
Latex— ক্ষারদ্রব্য
Mimicry— অনুকৃতি
Male flower— পুং-পুষ্প
Multiparous— বহুপার্শ্বীয় বিন্যাস
Myrmecophily- সহকৃতি
Odour— গন্ধ
Phylloclade— পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্লেড
Prickles— গাত্রকণ্টক
Poisonous substance— বিষাক্ত পদার্থ
Peduncle— পুষ্পদণ্ড
Pedicel- পুষ্পবৃন্তিকা
Pedicellate— সবৃন্তক
Petaloid— দলাকৃতি
Panicle— প্যানিকল্‌

Palea—শিরাবর্ম
Root-climbers—মূলারোহী-রোহিণী
Raceme—রেসীম
Ray-florets—প্রান্তপুষ্পিকা
Receptacle—পুষ্পাধার
Stem-climbers—বল্লী
Stem-tendril—শাখাকর্ষ
Sessile—অবৃন্তক
Spathe—স্পেথ
Scaly—শল্কাকার
Storage organ—ভাণ্ডার যন্ত্র
Spine—পত্র-কণ্টক
Stinging hairs—দংশ রোম
Spike—স্পাইক বা মঞ্জরী
Spadix—চমসাকৃতি বা স্প্যাডিক্স্
Spikelet- অনুমঞ্জরী বা স্পাইকলেট
Solitary cymose inflorescence—একক নিয়ত-বিন্যাস
Special forms of inflorescence—বিশিষ্ট আকৃতির পুষ্পবিন্যাস
Thorn—শাখাকণ্টক
Taste—স্বাদ
Tendril climbers—আকর্ষ-রোহিণী
Tendril—আকর্ষ
Thalamus or Receptacle—পুষ্পাক্ষ বা পুষ্পাধার
Umble—ছত্রাকৃতি
Uniparous—একপার্শ্বীয় বিন্যাস
Unisexual—একলিঙ্গ
Verticellaster—ভারটিসিলাষ্টার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

Androecium—পুং-স্তবক
Anther—পরাগধানী
Accessory whorl- অতিরিক্ত স্তবক
Asymmetrical—অপ্রতিসম
Accrecent—বৃদ্ধিশীল
Adnate or dorsifixed—পৃষ্ঠ-লগ্ন
Apocarpous—মুক্ত-গর্ভপত্রী
Adhesion—অসম-সংযোগ
Adelphy—গুচ্ছ
Axil—অক্ষীয়
Antipodal cell—প্রতিপদ কোষসমষ্টি
Anatropous - উর্দ্ধমুখ
Amphitropous—পার্শ্বমুখ
Androphore—পুংধর
Anthophore—দলধর
Bisexual—উভলিঙ্গ
Bilabiate—ওষ্ঠাধরাকৃতি
Bilocular—দ্বিকোষ্ঠ
Bifid—দ্বিখণ্ডিত
Basal—মূলীয়
Calyx—বৃতি
Corolla—দলমণ্ডল
Carpel- গর্ভপত্র
Complete flower—পূর্ণাঙ্গ ফুল
Calyx-lobes—বৃতিখণ্ড
Caducous—আশুপাতি
Corolla-lobes - দলখণ্ড
Corolla-tube—দলনল
Corona—মুকুট
Cruciform—ক্রুশাকার

Clawless—নখহীন
Campanulate—ঘণ্টাকার
Connective tissue—যোজক কলা
Cohesion—সমসংযোগ
Chalaza—ডিম্বক মূল
Campylotrepous—বক্রমুখ
Dumb-bell shaped—ডমরু-সদৃশ
Diclinous—একলিঙ্গ
Diœcious—ভিন্নবাসী
Didynamous—দীর্ঘদ্বয়ী
Dorsal suture—পৃষ্ঠ-সন্ধি
Definitive nucleus—ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়স
Epigyny—গর্ভশীর্ষ
Epiphyllous—পুষ্পপুটলগ্ন
Embryo-sac—ভ্রূণ-থলি
Egg apparatus—গর্ভযন্ত্র
Egg cell or ovum or oosphere—ডিম্বাণু
Flower—ফুল
Filament—পুংদণ্ড
Feathery—লোমশ
Free-central—মুক্ত-মধ্য
Female-gametophyte-স্ত্রী-লিঙ্গধর
Funiculus—ডিম্বকনাড়ী
Fertilization—গর্ভাধান
Gynæcium—স্ত্রী-স্তবক
Gamosepalous—যুক্তবৃতি
Gamopetalous—যুক্তদল
Glandular—গ্রন্থিযুক্ত
Gynandrous—যোষিৎপুংস্ক
Gynandrophore—উভলিঙ্গধর
Hypocrateriform—রঙ্গনাকার
Hilum—ডিম্বকনালী
Hypogyny—গর্ভপাদ
Incomplete Flower—অসম্পূর্ণ পুষ্প
Irregular—অসমাঙ্গ
Inferior—অধঃগর্ভ
Infundibulum—বিযুক্ত দল
Keel or Carina—তরী দল
Limb—দলবাহু
Ligulate—জিহ্বাকৃতি
Monoclinous—উভলিঙ্গ
Monœcious—সহবাসী
Multicarpellary—বহুগর্ভপত্রী
Multilocular—বহুকোষ্ঠ
Monadelphous—একগুচ্ছ
Marginal—প্রান্তীয়
Mycropyle—ডিম্বকরন্ধ্র
Neuter flower—ক্লীব পুষ্প
Nucellus—ভ্রূণপোষক
Orthoprotous—ঊর্ধ্বমুখ
Ovule—ডিম্বক
Ovum—ডিম্বাণু
Ovary—ডিম্বাশয়
Petal—পাপড়ি
Pistil—গর্ভকেশর
Perianth—পুষ্পপুট
Pistillate flower—স্ত্রী-পুষ্প
Pentamerous—পঞ্চশক
Perigyny—গর্ভকটি
Persistent—স্থায়ী
Polypetalous—বিযুক্তদল
Papilionaceous—প্রজাপতিসদৃশ
Personate—উপমুখ
Pollen sac—পরাগ-থলি
Pollen grain—পরাগরেণু
Parietal—প্রান্তীয়

Perfoliation—মুকুলপত্রবিন্যাস
Polar-nucleus—
পোলার নিউক্লিয়স
Pollination—পরাগ-সংযোগ
Regular —সমাঙ্গ
Rosaceous —গোলাপবৎ
Rotate —চক্রাকার
Radiate —তারকাকার
Sepals —বৃত্যংশ
Stamen—পুংকেশর
Style —গর্ভদণ্ড
Stig na—গর্ভমুণ্ড
St minate flower —পুং-পুষ্প
Superi r—অভিগর্ভ
Scale—শল্ক
Sepaloid—বৃতিসদৃশ
Staminode—বন্ধ্যা-পুংকেশর
Syngenesious—যুক্ত পরাগধানী
Superifical—গাত্রীয়
Synergids—সাহায্যকারী কোষ
Trimerous —ত্র্যংশক
Tetramerus—চতুরংশক
Thalamus —পুষ্পাক্ষ
Throat —কণ্ঠ
Tubular—নলাকার
Tetradynamous—চতুর্দীর্ঘ
Trifi l—ত্রিখণ্ডিত
Unilocular —এককোষ্ঠ
Vexillum or St ndard—ধ্বজ
Versatile —সর্বমুখ
Wings or alæ—পক্ষ
Zygomorphic -একপ্রতিসম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

Ane nophilous—বায়ুপরাগী
Adaptation —অভিযোজন
Achene—অ্যাকীন
Aggregate fruit —গুচ্ছিত ফল
Bracts—মঞ্জরীপত্র
Cross-pollination—ইতর-পরাগ-সংযোগ
Chalaza—ডিম্বক মূল
Chromosome —ক্রোমোজোম
Cleistogamy—অনুন্মীলিন
Dim rphic—দ্বিরূপতা
Do ble fertilization —দ্বিগর্ভাধান
Entomophilous—পতঙ্গপরাগী
Extine—রেণু-বহিত্বক্
Gymn sperm—ব্যক্তবীজী
Germpore—রেণুরন্ধ্র
He erostyle —অসমগর্ভদণ্ড
Herkogamy—স্বসঙ্গমরোধী
Homogamy—সমপরিণতি
Hydro hilous—জলপরাগী
Intine—রেণু-অন্তত্বক্
Meiosis—মেয়সিস্
Male-pronuc'eus —পুংজনন নিউক্লিয়স
Monoecius—সহবাসী
Nectary—রসগ্রন্থী
Pr b scis—শুঁড়
Protandary—প্রপুং-পরিণতি
Protogyny—প্রস্ত্রীং-পরিণতি
Pollinium —পলিনিয়ম
Self-sterility—স্ববন্ধ্যতা
Sperm-m ther cell —রেণু-মাতৃকোষ

Self-pollination—স্ব-পরাগ-সংযোগ

Tube nucleus or vegetative nucleus—
নালিকা নিউক্লিয়স বা বৃদ্ধি নিউক্লিয়স

Unisexuality—একলিঙ্গতা

Zoophilous—প্রাণিপরাগী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

Aggregate fruit—গুচ্ছিত ফল
Achene—অ্যাকীন
Berry—বেরী
Caryopsis—ক্যারিঅপ্‌সিস্
Capsule—ক্যাপসিউল
Claw—অঙ্কুশ
Dry—নীরস
Drupe—ড্রুপ
Dispersal—বিস্তার
Dehiscent fruit—বিদারী ফল
Exocarp—বহিস্ত্বক্
Endocarp—অন্তস্ত্বক্
Etærio—ইটারিও
Etærio of achene—অ্যাকীনের গুচ্ছ
Etærio of follicle—
ফলিকলের গুচ্ছ
Etærio of berries—বেরীর গুচ্ছ
Fruit—ফল
Follicle—ফলিকল
Fleshy fruit—সরস ফল
Fibrous drupe—তন্তুময় ড্রুপ
Indehiscent fruit—অবিদারী ফল
Legume—শিম্ব
Lomentum—বাবলা শিম্ব
Multiple fruit—যৌগিক ফল
Mesocarp—মধ্যত্বক্
Nut—নাট
Pericarp—ফলত্বক্
Simple fruit—সরল ফল
Samara—সামারা
Serosis—সেরোসিস
Syconus—সাইকোনাস

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Axis—ভ্রূণাক্ষ
Amyloplast—অ্যামাইলোপ্লাস্ট
Cotyledon—বীজপত্র
Caruncle—ক্যারঙ্কল্
Coleoptile—কলিওপটাইল
Coleorhiza—কলিওরহিজা
Carbohydrate—জল-অঙ্গার
Cellulose—সেলুলোজ
Cytase—সাইটেজ
Chemical analysis—রাসায়নিক বিশ্লেষণ
Deltoid area—আয়তাকার
Epicotyle—বীজপত্রাধিকাণ্ড
Epigeal—মৃদবর্তী
Endosperm—সস্য
Exalbuminous—অসস্যল
Easter—এস্টার
Essential elements—মূল উপাদান
Embryo—ভ্রূণ
Flowering glume—পুষ্পধর মঞ্জরীপত্র
Fat and oil—স্নেহপদার্থ
Germination—অঙ্কুরোদ্গম
Glucose or Fructose—দ্রাক্ষাশর্করা

Glycogen—গ্লাইকোজেন

Gravel-culture experiment—নুড়ি-কৃষ্টি পরীক্ষা

Glycerol—গ্লিসারল্

Hilum—ডিম্বক-নাভি

Hypocotyle—বীজপত্রাবকাণ্ড

Hypogeal—মৃদভেদী

Hyphæ—অনুসূত্র

Husk—তুষ

Inulin—ইনুলিন

Leucoplast—অবর্ণপ্লাষ্ট

Monocotyledonous—একবীজপত্রী

Micropyle—ডিম্বকরন্ধ্র

Nitrogenous food material—নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যপদার্থ

Non-essential elements—অনাবশ্যক উপাদান

Nodule—নোডিউল

Nodal zone—পর্বস্থান

Nitrogen-fixing bacteria—নাইট্রোজেন-স্থিতিকারক বীজাণু

Oblong—আয়ত

Plumule—ভ্রূণমুকুল

Palea—পেলিয়া

Protein—প্রোটিন

Proteid—প্রোটিড

Reddish brown—লোহিত বাদামী

Scutellum—স্কুটেলম্

Seed—বীজ

Semi-permeability—ভেদ্যতা

Sterilized—নির্বীজিত

Sand-culture experiment—বালুকা-কৃষ্টি পরীক্ষা

Testa—বীজ-বহিস্ত্বক্

Tegmen—বীজ-অন্তস্ত্বক্

Tuber—কন্দমূল

Volatile oil—বাষ্পীয় তৈল

Vivipary—জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

Alkaline—ক্ষারকীয় বা ক্ষারধর্মী

Acidic—অম্লধর্মী

Animal manure—প্রাণিজ সার

Artificial hard manure—কঠিন কৃত্রিম সার

Bone meal—হাড়ের গুঁড়া

Clay soil—এঁটেল মাটি

Compost manure—কম্পোষ্ট সার

Carbon cycle—কার্বন-বিবর্তন-চক্র

Carbon-monoxide—কার্বন-মনক্সাইড

Capillary water—ক্যাপিলারি জল

Chemical manure—রাসায়নিক সার

Fertilizers—সার

Farm-yard manure—ক্ষেতের সার

Gravel—কাঁকর

Green manure—সবুজ সার

Higher concentration—বেশী ঘনত্ব

Humus—হিউমস্

Loamy soil—দো-আঁশ মাটি

Less concentration—লঘু ঘনত্ব

Lime soil—চুনামাটি

Mild humus—মৃদু হিউমাস

Nitrifying bacteria—নাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়া

Natural manure—স্বাভাবিক সার
Nitrogen cycle—নাইট্রোজেন বিবর্তন-চক্র
Physiological dry soil—উষর মৃত্তিকা
Peat soil or Humus—পীট বা পচা মাটি
Peat humus—পীট হিউমাস
Rock soil or grave soil—কাঁকর-মাটি
Red soil—লাল মাটি
Rotation of crops—শস্য-বিবর্তন
Sandy soil—বালি-মাটি
Saline soil—লোনা মাটি
Soil—মাটি
Sedimentary soil—পালল-মৃত্তিকা
Symbiosis—মিথোজীবিতা বা অন্যোন্যজীবিত্ব
Symbiont—মিথোজীবী
Stoma—পত্ররন্ধ্র
Sedimentary rock—স্তরীভূত শিলা
Transported soil—স্থানান্তরিত মাটি
Vegetable manure—উদ্ভিদ্প্রদেয় সার

সপ্তম পরিচ্ছেদ

Anabolic activities of metabolic process—বৃদ্ধিকারী বিপাকীয় কার্য
Castalyst—অনুঘটক
Daily period of growth—দৈনিক বৃদ্ধি
Duration of light—আলোকের স্থিতিকাল
Direction of light—আলোকের গতি
Etiolated—পাণ্ডুর
Elasticity—সম্প্রসারণতা
Engyme—উৎসেচক
Growth in length - লম্বভাবে বৃদ্ধি
Graduated—অংশাঙ্কিত
Growth hormone—বৃদ্ধি-উদ্বোধক
Geotropism—অভিকর্ষণ বৃত্তি
Hormone—উদ্বোধক
Hydrotropism—জলবৃত্তি
Intensity of light—আলোকের উগ্রতা
Induced movement—আবিষ্ট সঞ্চলন
Katabolic activities of metabolic process—ধ্বংসকারী বিপাকীয় কার্য
Linear growth—সরল বৃদ্ধি
Light growth reaction—বৃদ্ধিপ্রতিক্রিয়া
Metabolic activities—বিপাকীয় কার্য
Movement—সঞ্চলন
Movement by light—আলোকের দ্বারা সঞ্চলন
Movement of gravity—অভিকর্ষের দ্বারা সঞ্চলন
Movement of water—জলের জন্য সঞ্চলন
Nagatively hydrotropism—জল-প্রতিকূলবর্তী
Negatively phototropic—আলোক-প্রতিকূলবর্তী
Negatively geotropic—প্রতিকূল অভিকর্ষ
Pointer—নির্দেশক
Phase of cell-division—কোষ-বিভাগ দশা
Phase of differentiation—বিভেদ দশা
Photoperiodism—ফটোপেরিওডিসম্
Photophilic—আলোকবিলাসী
Photophobic—আলোকবিমুখ
Positively phototropic—আলোক-অনুকূলবর্তী
Positively geotropism—অনুকূল অভিকর্ষী
Positively hydrotropism—জল-অনুকূলবর্তী

Phase of elongation—দীর্ঘকরণ দশা

Rate of growth—বৃদ্ধির হার

Response—স্ফুরণ

Stimulus—উদ্দীপক

Thermo-growth reaction—
তাপ-বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়া

Tropic movement—
উত্তেজনা-দিক্‌বর্তী সঞ্চলন

Transversely phototropic—
প্রস্থভাবে আলোকবৃত্তি

Transversely geotropic—
প্রস্থভাবে অভিকর্ষ

উদ্ভিদ্-বিদ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমসংস্থা ও সমবৃত্তিতা

(Homology and Analogy)

গাছের বিভিন্ন অঙ্গগুলি, যথা—ফুল, পাতা আকর্ষ, কাঁটা ও শাখা, এমনকি কুঁড়ি প্রভৃতির উৎপত্তির একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। আবার কতকগুলি অঙ্গ ঠিকমত উৎপত্তি লাভ করিলেও এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, তাহাদের গঠন আকৃতি ও কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায়। যে-সমস্ত অঙ্গের উৎপত্তি মূলতঃ একই কিন্তু কার্যকারিতার জন্য নানাবিধ আকার ধারণ করে, তখন এইসমস্ত অঙ্গগুলিকে **সমসংস্থ অঙ্গ** (*Homologous organ*) বলা হয়। সুতরাং উৎপত্তি অনুসারে একই রকমের অঙ্গগুলির গঠন, অবস্থান ও কার্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাকে **সমসংস্থা** (*Homology*) বলা হয়। আমরা হাত দিয়া খাদ্য গ্রহণ করি; আবার লেখা ও অন্যান্য যাবতীয় কার্য করিয়া থাকি। কিন্তু অনেক প্রকার প্রাণীর হাত নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদন করে। বাদুড়ের হাতটি ডানায় পরিবর্তিত হইয়াছে। পাখীদের হাতটি পালকপূর্ণ ডানায় পরিণত হইয়াছে এবং ইহার দ্বারাই পাখীরা উড়িতে পারে। তিমির হাত সম্পূর্ণ চামড়ার দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং জলে সাঁতারের জন্য দাঁড়রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মানুষের হাত, বাদুড় ও পাখীর ডানা এবং তিমির দাঁড় (paddle), প্রত্যেকটি অঙ্গের উৎপত্তি একই রকমের এবং উহাদের ভিতরকার হাড়গুলিও একই রকমের হওয়ায় এইসকল অঙ্গগুলিকে সমসংস্থ অঙ্গ বলা হয়। আবার এমন সব অঙ্গ আছে, যাহাদের উৎপত্তি, অবস্থান, গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও ইহাদের বাহিরের রূপ ও কার্য একই প্রকারের নয়। কার্যকারিতা

অনুসারে তখন সেই অঙ্গগুলিকে **সমবৃত্তি অঙ্গ** (*Analogous organ*) বলে। সুতরাং যে-কোন অঙ্গের বাহ্যিক রূপ ও ইহার কার্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাকে **সমবৃত্তিতা** (*Analogy*) বলা হয়। তোমরা জান, মটরশুঁটির পত্রক আকর্ষে পরিণত হয়। আবার ঝুমকোলতার কাক্ষিক মুকুল আকর্ষে পরিণত হয়। সকল আকর্ষের বাহ্যিক রূপ ও কার্যকারিতা এক রকমের হয়। ইহা দেখিতে সবুজ সুতার মত এবং ইহা দুর্বল উদ্ভিদ্‌কে আরোহণে সাহায্য করে। সুতরাং ইহারা সমবৃত্তি অঙ্গ। আবার মটর-শুঁটির আকর্ষের উৎপত্তি পাতার ন্যায় এবং ঝুমকোলতার আকর্ষের উৎপত্তি উহার কাক্ষিক মুকুলের ন্যায়। সুতরাং ইহারা সমবৃত্তি অঙ্গ হইলেও সমসংস্থ অঙ্গ নহে। বাগান-বিলাস গাছের কাক্ষিক মুকুল শাখাকণ্টকে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে বাগান-বিলাসের শাখাকণ্টক এবং ঝুমকোলতা গাছের আকর্ষের উৎপত্তি একই প্রকার হওয়ায় ইহারা সমসংস্থ অঙ্গ। কিন্তু বাহ্যিক রূপ ও কার্যকারিতা অনুসারে ইহাদের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ বিদ্যমান। সুতরাং ইহারা সমসংস্থ অঙ্গ হইলেও সমবৃত্তি অঙ্গ নহে। সমসংস্থ অঙ্গের প্রকৃত উৎপত্তি জানিতে হইলে উক্ত অঙ্গের বৃদ্ধির সময় (developmental stage) উহার প্রস্থচ্ছেদ গ্রহণ করিয়া অণুবীক্ষণের নিম্নে পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। এইভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে সমসংস্থ অঙ্গগুলি পাতা বা শাখা বা মুকুল হইতে সৃষ্ট হইয়াছে কিনা, তাহা বুঝা যায়। সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গের বিভিন্ন উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) সমসংস্থ-আরোহী অঙ্গ বা সমবৃত্তি আকর্ষ (Homology of climbing organs which are analogous to tendrils) :

আগেই বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিদে নানাপ্রকার আকর্ষ দেখা যায়। (i) ঝুমকোলতার আকর্ষের সমসংস্থ অঙ্গ হইতেছে উহার কাক্ষিক মুকুল। (ii) জংলীমটর গাছের আকর্ষের সমসংস্থ অঙ্গ হইতেছে ইহার পাতা। (iii) কলাইশুঁটির গাছের আকর্ষের সমসংস্থ অঙ্গ হইতেছে উহার যৌগিক পত্রের অগ্রভাগের পত্রক। (iv) উলটচণ্ডালের আকর্ষের - সমসংস্থ অঙ্গ হইতেছে উহার পাতার অগ্রাংশ। (v) কুমারিকা গাছের আকর্ষের সমসংস্থ অঙ্গ হইতেছে উহার উপপত্র। (xi) কুমড়া গাছের আকর্ষের সমসংস্থ অঙ্গ হইতেছে উহার কাক্ষিক মুকুল।
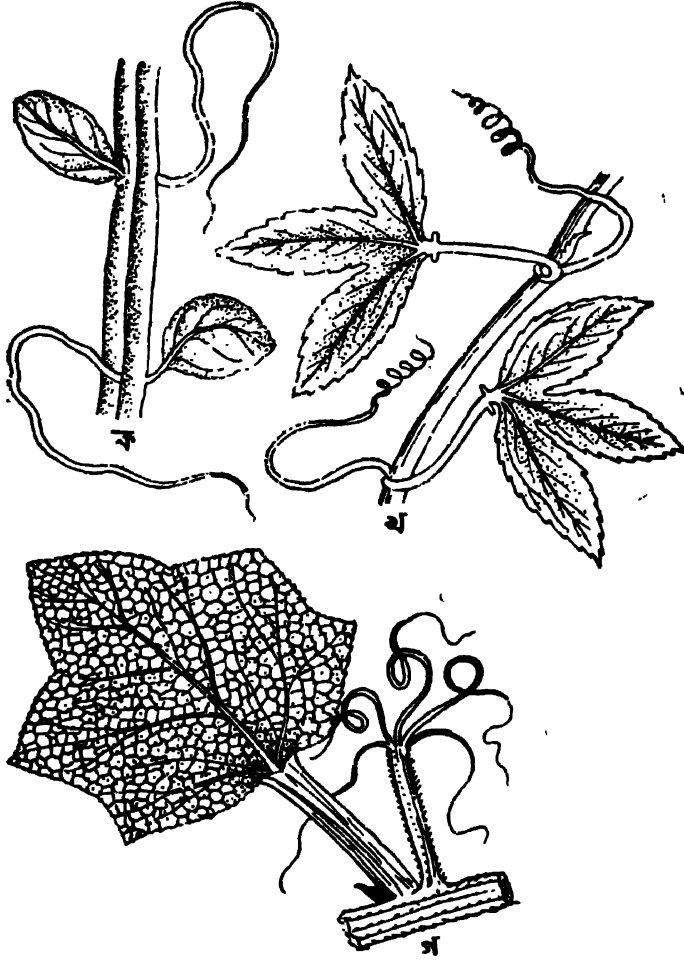
১নং চিত্র

বিবিধ সমসংস্থ অঙ্গ দেখানো হইতেছে।

ক, হাড়জোড়ার আকর্ষ ; খ, ঝুমকোলতার আকর্ষ ; গ, কুমড়োপাতার আকর্ষ।

(খ) সমসংস্থা-রক্ষাকর অঙ্গ (Homology of defensive organs which are analogous to thorns and spines) বা সমবৃত্তি শাখাকণ্টক ও পত্রকণ্টক ঃ

শাখাকণ্টক ও পত্রকণ্টক দুই-ই সমবৃত্তি অঙ্গ, যদিও শাখাকণ্টক শক্ত ও

কঠিন হয়। গাছের নানা অঙ্গ পরিবর্তিত হইয়া কণ্টকে পরিণত হয়; যেমন,—(i) বাগান-বিলাস ও মেহেদী গাছের শাখাকণ্টকগুলি উহাদের কাক্ষিকমুকুল বা শাখার পরিবর্তিত রূপ; (ii) বেল, লেবু ও বিলাতী
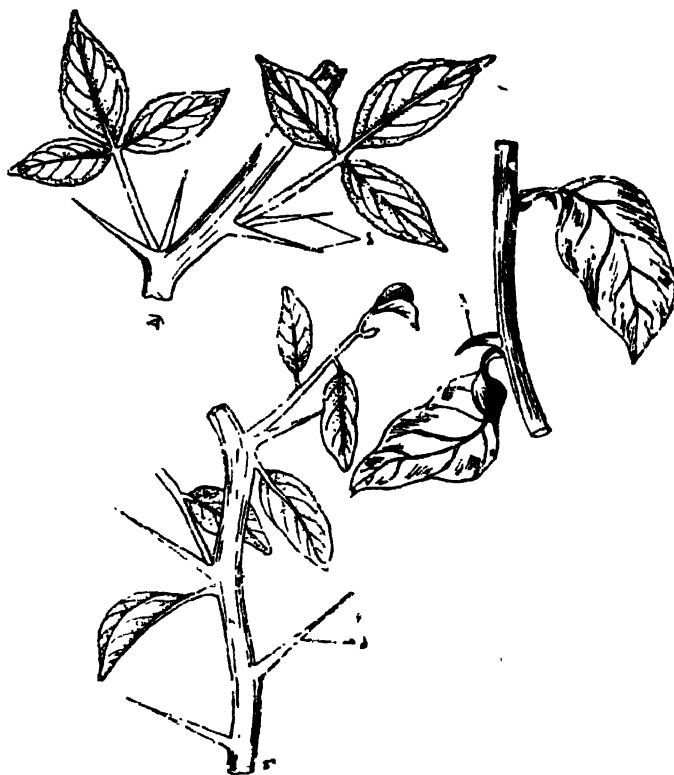
২নং চিত্র
বিবিধ সমসংস্থ অঙ্গ দেখানো হইতেছে।
ক, বেলগাছের শাখাকণ্টক; খ, বাগান-বিলাস গাছের শাখাকণ্টক;
গ, মেহেদী গাছের শাখাকণ্টক।

মেহেদী গাছের শাখাকণ্টকগুলি উহাদের শাখার পরিবর্তিত রূপ; (iii) বাবলা বা কুল গাছের পত্রকণ্টকগুলি উহাদের উপপত্রের পরিবর্তিত রূপ; (iv) ফণিমনসা বা শতমূলী গাছের পত্রকণ্টকগুলি উহাদের পাতার পরিবর্তিত রূপ; (v) পানিফলের কণ্টকগুলি উহার

ফুলের বৃতির পরিবর্তিত রূপ ; (vi) খেজুর গাছের কণ্টকগুলি উহার পাতার অগ্রাংশের পরিবর্তিত রূপ।
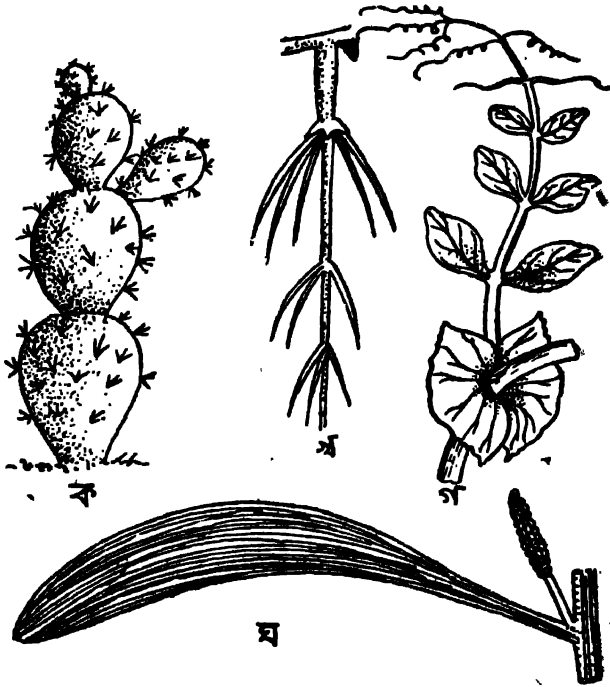
৩নং চিত্র

বিবিধ সমবৃত্তি অঙ্গ দেখানো হইতেছে।

ক, ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড ; খ, শতমূলীর ক্লাডোড ; গ, মটরপাতার ফলকাকার উপপত্র ; ঘ, বাবলা গাছের পর্ণবৃন্ত।

(গ) সমসংস্থা সালোকসংশ্লেষ অঙ্গ (Homology of photo-synthetic crgans) :

উদ্ভিদের নানাপ্রকার অঙ্গ সালোকসংশ্লেষের জন্য পরিবর্তিত হয় এবং ইহারা প্রত্যেকেই উদ্ভিদের পাতার সমবৃত্তি। (i) ফণিমনসা গাছের কাণ্ড রূপান্তরিত হইয়া পর্ণকাণ্ডে (Phylloclade) বা শতমূলী গাছের কোন অঙ্গ ক্লাডোডে (Cladode) পরিণত হয় এবং উহারা পাতার ন্যায় কার্য করে। সুতরাং পত্রকাণ্ড বা ক্লাডোড কাণ্ডের সমসংস্থ অঙ্গ কিন্তু পাতার সমবৃত্তি অঙ্গ।

(ii) আবার জংলী মটরের ফলকাকার (foliaceous) উপপত্র এবং আকাশ-

৪নং চিত্র

উদ্ভিদের বিবিধ সমবৃত্তি অঙ্গ দেখানো হইতেছে।

ক, আলু, খ, চুপড়ি আলু, গ রাঙা আলু।

মণির পর্ণবৃন্ত (Phyllode) সাধারণ পাতার মত সালোকসংশ্লেষ কার্য করে বলিয়া ইহারাও পাতার সমবৃত্তি অঙ্গ।

(ঘ) সমসংস্থার ভাণ্ডার অঙ্গ (Homology of storage organs):

গাছের মূল, কাণ্ড ও পাতা নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া সঞ্চিত খাদ্য ধারণ করিতে পারে। এই সকল অঙ্গগুলির বহিরাকৃতি ও কার্যকারিতা অনুসারে উহাদের ভাণ্ডার অঙ্গ (storage organ) বলা হয় এবং উহাদের

বহিরাকৃতি ও কার্যকারিতা একই রকমের হওয়াতে ইহারা সমবৃত্তি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। নিম্নে সমসংস্থ ভাণ্ডার অঙ্গের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল; যথা—(i) রাইজোম, গুঁড়িকন্দ ও স্ফীতিকন্দ প্রভৃতি ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডগুলি উদাহরণ-রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং উৎপত্তি অনুসারে ইহারা সমসংস্থ অঙ্গ, অথচ ইহাদের বহিরাকৃতি ও কার্যকারিতা অনুসারে ইহারা সমবৃত্তি অঙ্গরূপে পরিচিত। (ii) পিঁয়াজের স্থূল শল্কপত্র রাইজোম ও গুঁড়িকন্দের মতই খাদ্য সঞ্চয় করে এবং যদিও ইহার উৎপত্তি ভিন্ন, তাহা হইলেও ইহা রাইজোমের মতই সমবৃত্তি অঙ্গ। (iii) ঘৃতকুমারী, পাথরকুচি গাছের পাতাও জল ও খাদ্য সঞ্চয় করে। (iv) সেইরূপ স্থূল বীজপত্র, বীজের সস্য ও নানাবিধ খাদ্যভাণ্ডার মূল সমবৃত্তি অঙ্গরূপে পরিগণিত।

(ক) উদ্ভিদের নাম	আকর্ষের সমসংস্থ অঙ্গ
(১) মটর	(১) যৌগপত্রের শীর্ষের কয়েকটি পত্রক
(২) জংলীমটর	(২) সমগ্র যৌগপত্র
(৩) ঝুমকোলতা	(৩) শাখা
(৪) কুমারিকা	(৪) উপপত্র

(খ) উদ্ভিদের নাম	কণ্টকে সমসংস্থ অঙ্গ
(১) লজ্জাবতী, বাব্‌লা, কুল	(১) উপপত্র
(২) বাগান-বিলাস, মেহেদী	(২) শাখা
(৩) খেজুর	(৩) পত্রের শীর্ষাগ্র
(৪) পানিফল	(৪) বৃতি

(গ) উদ্ভিদের নাম	আলোক-সংশ্লেষকারী অঙ্গ	সমসংস্থ অঙ্গ
(১) ফণিমনসা	(১) পর্ণকাণ্ড	(১) কাণ্ড
(২) আকাশমণি	(২) পর্ণবৃন্ত	(২) পত্রবৃন্ত
(৩) শতমূলী	(৩) একক পর্ণকাণ্ড	(৩) কাণ্ড
(৪) জংলীমটর	(৪) পত্রাকার উপপত্র	(৪) উপপত্র

(ঘ) উদ্ভিদের নাম	ভাণ্ডার অঙ্গ	সমসংস্থ অঙ্গ
(১) আদা	(১) রাইজোম	(১) কাণ্ড
(২) গোল-আলু	(২) স্ফীতকন্দ	(২) কাণ্ড
(৩) ওল	(৩) গুঁড়িকন্দ	(৩) কাণ্ড
(৪) খাম-আলু	(৪) বালবিল্	(৪) কাক্ষিক মুকুল
(৫) পিঁয়াজ	(৫) শল্কপত্র	(৫) পত্র
(৬) মূলা	(৬) মূলাকার প্রধানমূল	(৬) প্রধানমূল ও বীজপত্রাবকাণ্ড
(৭) গাজর	(৭) শাঙ্কব প্রধানমূল	(৭) প্রধানমূল
(৮) শালগম	(৮) শালগমাকার প্রধানমূল	(৮) প্রধানমূল ও বীজপত্রাবকাণ্ড
(৯) রাঙ্গা-আলু	(৯) কন্দাল মূল	(৯) অস্থানিক মূল
(১০) শতমূলী	(১০) গুচ্ছিত মূল	(১০) অস্থানিক মূল

উদ্ভিদের রক্ষাকর যন্ত্র
(Defensive Mechanism in Plants)

প্রাণিজগৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। বিক্ষুপ বা বিরুৎ ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্ শাকাশী প্রাণীদের একমাত্র খাদ্য। নানাবিধ প্রাণী যেমন শত্রুর আক্রমণ হইতে নানা উপায়ে নিজেকে রক্ষা করে, তেমনি উদ্ভিদ্ও শত্রু হইতে নানা উপায়ে নিজেকে রক্ষা করে। কিন্তু তোমরা জান, উদ্ভিদ্ চলৎ-শক্তিবিহীন। প্রাণীদের চলৎ-শক্তি থাকিবার জন্য উহারা শত্রু-দর্শনে দৌড়াইয়া বা সাঁতার কাটিয়া পলায়ন করে; আবার দরকার হইলে ধাবমান শত্রুকে নখ, দাঁত বা শিং দিয়া আক্রমণ করে। সেইরূপ উদ্ভিদের দেহে নানারূপ আত্মরক্ষা যন্ত্র জন্মায় এবং এই আত্মরক্ষা যন্ত্রের দ্বারাই উহারা শত্রুকে বধ করিতে সমর্থ হয়। নিম্নে উদ্ভিদের প্রধান কয়েকপ্রকার রক্ষাকর যন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হইল :

১। **শাখা-কণ্টক (Thorn)**: কোন কোন গাছের কাক্ষিক মুকুল শাখায় বিকাশলাভ না করিয়া একটি শক্ত, বহির্জনিষ্ণু, সরল বা শাখাবিশিষ্ট কণ্টকে রূপান্তরিত হয়। ইহাদের অগ্রভাগ সূচালো হয়। কণ্টকগুলি শাখার পরিবর্তিত রূপ হওয়াতে উহাদের শাখা-কণ্টক বলা হয়। বেল, লেবু, বাগান-বিলাস, ময়না কাঁটা, করঞ্জ গাছের উপরি-উক্ত প্রকারের শাখা-কণ্টক দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহারা সহজেই পুরু চামড়াবিশিষ্ট প্রাণীদের দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে।

২। **পত্র কণ্টক (Spine):** পাতা বা পাতার নানা অংশে ছোট ছোট

৩নং চিত্র

উদ্ভিদের বিবিধ রক্ষাকর যন্ত্র।

ক, বেলগাছের শাখা-কণ্টক ; খ, বাগান-বিলাস গাছের শাখা-কণ্টক ;

গ, মেহেদীর শাখা-কণ্টক।

কণ্টকে রূপান্তরিত হয়। এইরূপ পাতাপূর্ণ গাছের পত্র-কণ্টকের ভয়ে প্রাণীরা পাতা ভক্ষণ করিতে সাহস করে না। এইভাবে গাছ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। বাবলা, শিয়ালকাঁটা আনারস, বেগুন, ইউক্কা প্রভৃতি গাছের পাতায় এইভাবে ছোট ছোট কাঁটা জন্মায় এবং প্রধানতঃ শাকাশী প্রাণী হইতে ইহারা রক্ষা পায়।

৩। গাত্র-কণ্টক (Prickles): গাছের শাখা, প্রশাখা, পাতা ফুল ও ফলে একপ্রকার শক্ত, সূচালো বক্রকণ্টক দেখা যায়। ইহারা গাছের উপর অনিয়তভাবে প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। ইহাদের উৎপত্তি গাছের বাহিরের স্তর
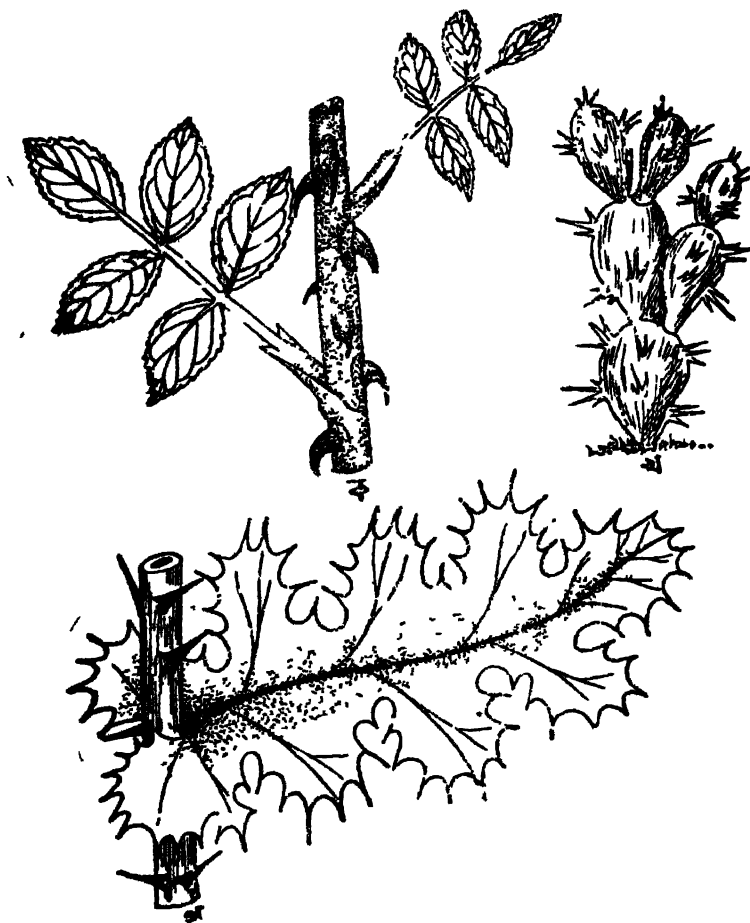
৬নং চিত্র
উদ্ভিদের বিবিধ রক্ষাকর যন্ত্র।
ক, গোলাপের গাত্র-কণ্টক ; খ, ফণিমনসার সূচালো-কণ্টক ;
গ, শিয়ালকাঁটা গাছের গাত্র-কণ্টক।

হইতে হওয়ায় কণ্টকগুলিকে পাশ দিয়া চাপ দিলে ভাঙিয়া যায়। বেগুন, গোলাপ, শিমুল, বেত, কণ্টিকারি, রামবেগুন প্রভৃতি গাছে গাত্র-কণ্টক দেখা যায়।

৪। **সূচালো-কণ্টক (Bristles) :** কতকগুলি বিভিন্ন গাছে সূচালো-কণ্টক দেখা যায়। আকারে ইহারা খুবই ক্ষুদ্র এবং সরু সূচের মত। সাধারণতঃ ইহারা একস্থানে অনেকগুলি করিয়া জন্মায়। ফণিমনসা, নাগমনসা ও অন্যান্য মনসা-জাতীয় গাছে সূচালো-কণ্টক প্রচুর দেখা যায়।

৫। **দংশ-রোম (Stinging hairs) :** কতকগুলি উদ্ভিদের পাতা বা ফলের উপর সূক্ষ্ম ও সূচালো কাঁটা দেখা যায়। এরূপ কাঁটাগুলিকে দংশ-রোম বলে। পাতা বা ফলের সর্বাঙ্গে দংশ-রোম ভরিয়া থাকে। রোমগুলি সরু নলের মত। নলের মুখটি পাতলা সিলিকা দ্বারা আবৃত থাকে। সামান্য আঘাতে রোমের সিলিকা-নিঃসৃত মুখটি ভাঙ্গিয়া যায়। সাধারণতঃ রোমরূপ নলের ভিতর বিষাক্ত অ্যাসিড থাকে। এইরূপ পাতা-বিশিষ্ট গাছ যখন প্রাণীদের সংস্পর্শে আসে, তখন দংশ-রোমের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়া বিষাক্ত এ্যাসিড উহাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। এ্যাসিডের সংস্পর্শে দেহে জ্বালা ধরে এবং দেহের দংশন-স্থলের চামড়া ফুলিয়া যায়। উদ্ভিদগুলি এইভাবে প্রাণীদের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করে। নানা ধরণের বিছুটি প্রভৃতিতে এইরূপ দংশ-রোম দেখা যায়। আলকুশি গাছের ফলের ত্বকের উপরও এই প্রকার রোম দেখা যায় এবং ইহারাও বিষাক্ত।
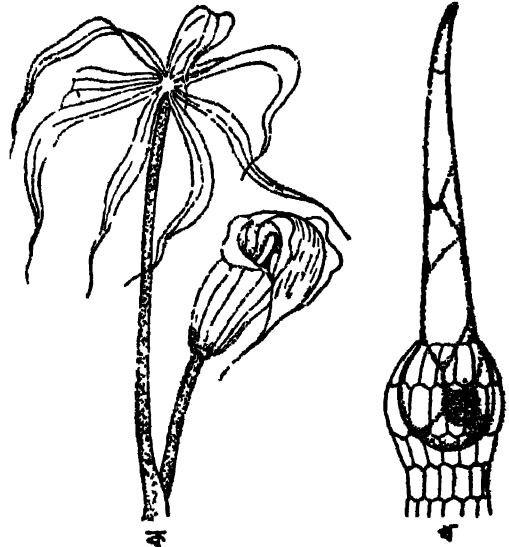
৭নং চিত্র
উদ্ভিদের বিবিধ রক্ষাকর যন্ত্র।
ক, এরিসিমা (সর্পবৃক্ষের অনুকৃতি পন্থা)
খ, বিছুটির দংশ-রোম।

৬। **গ্রন্থি-রোম (Glandular hairs) :** কতকগুলি গাছের পাতা, কাণ্ড ও ফলের উপর গ্রন্থি-রোম জন্মায়। এই প্রকার গ্রন্থি হইতে আঠাল পদার্থ নির্গত হয়। যখনই কোন প্রাণী উহাদের ভক্ষণের জন্য আক্রমণ করে,

তখনই গ্রন্থি হইতে নির্গত আঠা উহাদের মুখের চারিপাশে লাগিয়া যায় এবং এতদ্দ্বারা উহারা প্রচুর অসুবিধা ভোগ করে। সুতরাং গ্রন্থি-রোম-যুক্ত গাছ দেখিলেই শাকাশী প্রাণীরা উহা সহজে ভক্ষণ করে না। এইভাবে গাছগুলি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে। চিতা, ভেরেণ্ডা ও পুনর্নভা প্রভৃতি গাছে এইরূপ গ্রন্থিরোম দেখা যায়।

৭। **ঘন ও শক্ত রোম** (**Dense and stiff hairs**): কতকগুলি ঘন ও শক্ত রোম উহাদের সর্বাঙ্গে জন্মায়। প্রাণীরা প্রথমে এইরূপ গাছের পাতা ভক্ষণ করে। ভক্ষণ করিবার পর ছোট ছোট অথচ শক্ত রোমগুলি প্রাণীদের কণ্ঠনালীর ভিতরে নরম ত্বকে আটকাইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা উহারা অস্বস্তিবোধ করে। আবার কতকগুলি বড় আকারের শক্ত রোম প্রাণীদের দেহ ও মুখবিবরে ক্ষত সৃষ্টি করে। আকন্দ ও সাধারণ কাঁটাগাছ—এইরূপ গাছের উদাহরণ।

উপরি-উক্ত রক্ষাকর যন্ত্রগুলি ব্যতীত গাছ নানা উপায়ে প্রাণীদের আক্রমণ হইতে নিজ নিজ দেহ রক্ষা করে। নিম্নের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল :

(i) **বিষাক্ত পদার্থ** (**Poisonous substance**): এমন কতকগুলি গাছ আছে যাহাদের পাতা, ফল বা শাখায় জলীয় বিষাক্ত দ্রব্য জমা থাকে। প্রাণীরা এইরূপ গাছের পাতা বা ফল ভক্ষণ করে না এবং সতর্কতার সহিত পরিহার করে। তামাক, সিনকোনা, ধুতুরা, করবী বা কল্কে প্রভৃতি গাছের নাম উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

(ii) **স্বাদ** (**Taste**): উচ্ছে, নিম, গুলঞ্চ, চিরেতা, আদা, হলুদ প্রভৃতি গাছের তিক্ত বা ঝাল স্বাদের জন্য প্রাণীরা উহাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করে না।

(iii) **গন্ধ** (**Odour**): গান্দাল, তুলসী, ঘেঁটু, চোত্রা, পিপারমিণ্ট ও গুলের পুষ্পবিন্যাসের গন্ধ খুবই অপ্রীতিকর হওয়াতে প্রাণীরা উহাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করে না।

(iv) **ক্ষীরদ্রব্য** (**Latex**): আকন্দ, ফণিমনসা, মনসা, করবী, কল্কে, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি গাছে আঠাপূর্ণ ক্ষীরনালী থাকায় প্রাণীরা সহজে উহাদের ভক্ষণ করে না। ভক্ষণ করিলে প্রাণীদের পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয় এবং অজীর্ণ

হইয়া পড়ে। সুতরাং ক্ষীরনালীপূর্ণ গাছগুলি প্রাণীদের হাত হইতে রক্ষা পায়।

(v) **উপক্ষার (Alkaloids) :** সিনকোনা গাছের বন্ধলে কুইনাইন, তামাক পাতায় নিকোটিন, আফিং গাছের ফলে মরফিন, কুচিলার বীজে স্ট্রিকনিন, কোকো গাছের পাতায় কোকেন, চা গাছের পাতায় থিন ও কফির পাতায় কেফিন প্রভৃতি উপক্ষার দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি অতি বিষাক্ত এবং কতকগুলি ক্ষতিকর হওয়ায় প্রাণীরা উপরি-উক্ত গাছগুলিকে ভক্ষণে বিরত থাকে। নাক্সভমিকা, একোনাইট ইত্যাদি উপক্ষার-নির্গত-দেহী গাছগুলি অতীব বিষাক্ত।

(vi) **বর্জ্য পদার্থ বা রেচন দ্রব্য (Waste products) :** কচু, মানকচু, ওল প্রভৃতি গাছে র‍্যাফাইড নামক ধাতব কেলাস দ্রব্য থাকায় প্রাণীরা উপরি-উক্ত গাছগুলিকে ভক্ষণ করে না। সেইরূপ গঁদ, রজন প্রভৃতি রেচন দ্রব্যপূর্ণ গাছগুলিকে প্রাণীরা সহজে ভক্ষণ করে না। হরিতকি, বহেড়া আমলকী প্রভৃতি গাছে প্রচুর ট্যানিন থাকায় প্রাণীরা উহাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করে না।

(vii) **অনুকৃতি (Mimicry) :** কতকগুলি গাছ প্রাণী হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাপ বা অন্যান্য অচেতন পদার্থের হুবহু অনুকরণ করে। শাকাশী প্রাণীরা এইরূপ গাছ দেখিলে ভয় পাইয়া যায় এবং খাইতে সাহস করে না। ক্যালাডিয়াম (*Caladium*) নামক কচুজাতীয় গাছের রঙ নানা প্রকারের হয় এবং পাতাগুলিতে প্রচুর ফুটকি থাকে। বন-ওলের পুষ্পবিন্যাস যখন মাটি ভেদ করিয়া আলোকে বিকশিত হয়, তখন দূর হইতে মনে হয় যেন একটি বিষধর সাপ ফণা তুলিয়া আছে। এরিসিমা (*Arisaema*) নামক কচু-জাতীয় উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ আসাম রাজ্যের শিলং শহরে প্রচুর পাওয়া যায়। বর্ষাকালে এরিসিমা প্রচুর জন্মায়। ইহার মঞ্জরীপত্র পুষ্পবিন্যাসকে সাপের ফণার মত রক্ষা করে। মঞ্জরীপত্রটির বাহিরের রঙ সবুজ ও ভিতরের রঙ লাল হয়। সমগ্র পুষ্পবিন্যাসটিকে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটি সাপ ফণা তুলিয়া আগাইয়া আসিতেছে।

(viii) **সহকৃতি (Myrmecophily) :** আম, লিচু, গোলাপ প্রভৃতি গাছগুলি নানাজাতীয় পিপীলিকার আশ্রয়স্থল। ইহারা শাখা-প্রশাখা বা কক্ষে

বাসা বাঁধে। কোন প্রাণী ইহাদের ভক্ষণ করিতে আসিলে এবং উহাদের শাখা-প্রশাখা স্পর্শ করিলে পিপীলিকাগুলি আক্রমণকারী প্রাণীদের দংশন করে। বিষাক্ত দংশনের জ্বালায় প্রাণীগুলি পলায়ন করে। সুতরাং পিপীলিকাগুলি উপরি-উক্ত গাছগুলিকে প্রহরীর মত রক্ষা করে। গাছগুলি ইহার পরিবর্তে পিপীলিকাগোষ্ঠীকে নিজ কোটরে আশ্রয় দান করে। এইরূপ পিপীলিকা-প্রীতিকেই সহকৃতি বলা হয়। সহকৃতি মিথোজীবিতার একটি আদর্শ উদাহরণ।

উদ্ভিদের আরোহণ যন্ত্র

(Climbing organs of plants)

সকল গাছ মাটির উপর সোজাভাবে দাঁড়াইতে পারে না। সাধারণতঃ বিরুৎ-জাতীয় গাছের কাণ্ড নরম হয় এবং ইহারা নানা প্রকারের অঙ্গের দ্বারা অন্য বৃক্ষ বা কোনো আশ্রয়ের উপর আলোক ও বাতাস শোষণ করিবার জন্য আরোহণ করে। এইরূপ অঙ্গগুলিকে গাছের আরোহণ অঙ্গ বলে। গাছের কাণ্ড, মূল, বৃতি ও পাতা পরিবর্তিত হইয়া গাছের আরোহণ-অঙ্গের রূপান্তরিত হয়। বিবিধ প্রকারের রোহিণীর বিষয় 'জীববিজ্ঞান-প্রবেশ' প্রথম ভাগে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নে আরোহণ-প্রণালী অনুযায়ী বিবিধ প্রকারের আরোহী উদ্ভিদের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। যথা—

১। মূলারোহী-রোহিণী (Root climbers) :

এইপ্রকার লতানো-উদ্ভিদ্‌, অন্যান্য সরল-কাণ্ড উদ্ভিদ্‌কে বা অন্য কোন আশ্রয়ের উপর পর্বের অন্তঃস্থিত অস্থানিক মূলের দ্বারা আরোহণ করে। এই অস্থানিক মূলগুলি আশ্রয়কে জড়াইয়া থাকে এবং উদ্ভিদ্‌ তাহারই সাহায্যে সূর্যালোকের জন্য উপরে উঠিতে পারে ; যথা—পানগাছ, গাছপিপুল ও আইভি-লতা ইত্যাদি। লতানো-উদ্ভিদ্‌ মূলের দ্বারা আরোহণ করে। স্বর্ণলতা গাছের শোষকমূলগুলি আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাদের দেহ হইতে খাদ্য-সার শোষণ করে এবং আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের সাহায্যেই আরোহণ করে।

২। অঙ্কুশ-রোহিণী (Hook-climbers) :

এইপ্রকার লতানো-উদ্ভিদের দেহ হইতে আঁকড়ার মত একপ্রকার অঙ্গ বাহির হয় ; সেই অঙ্গকে অঙ্কুশ (hook) বলা হয়। এই অঙ্কুশ আশ্রয়কে

আঁকড়াইয়া ধরে ও উদ্ভিদ্ ইহার সাহায্যে আশ্রয়ের উপর আরোহণ করে ; যথা—কাঁঠালি-চাঁপা, অ্যানকারিয়া ইত্যাদি।
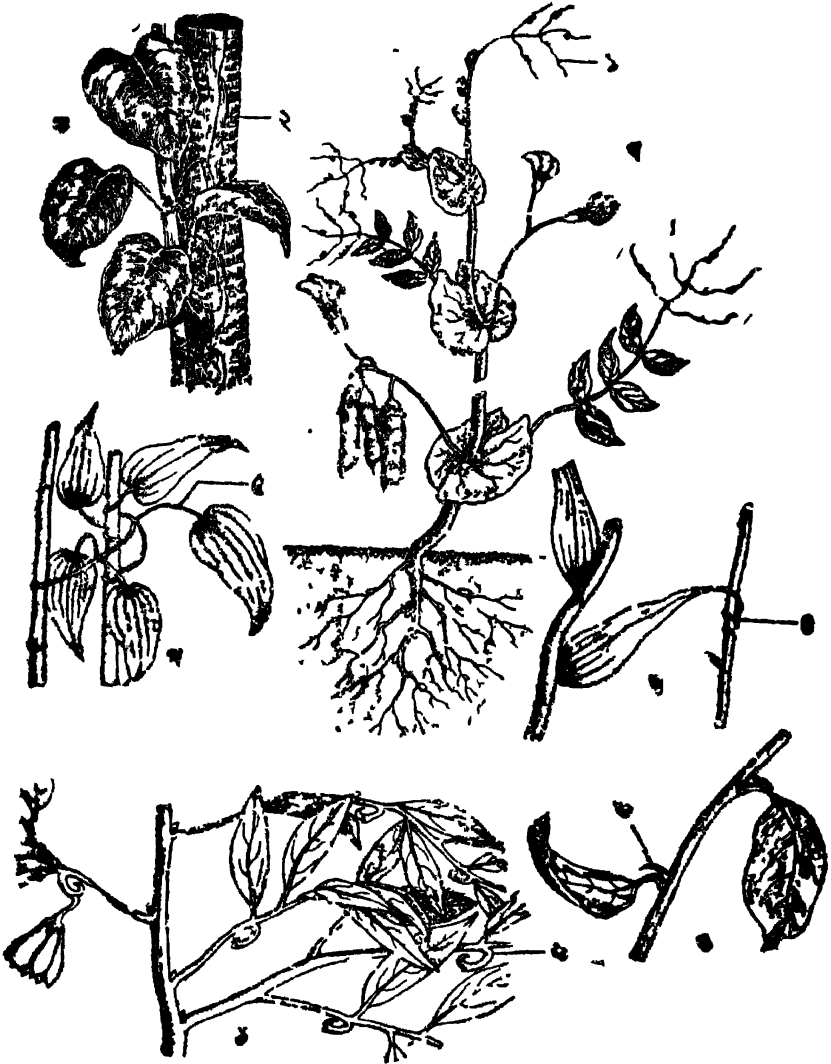
৮নং চিত্র—উদ্ভিদের আরোহণ যন্ত্র।

ক, মূলারোহী-রোহিণী (পান), ২, উদ্ভিদের মূল। খ, আকর্ষ-রোহিণী (মটর) ; ১, আকর্ষ। গ, বৃন্ত-রোহিণী (ছাগলবটি) ; ৫, উদ্ভিদের বৃন্ত। ঘ, পর্ণারোহী (উলটচণ্ডাল), ৪, পর্ণের অগ্রভাগ। ঙ, কণ্টক-রোহিণী (বাগান-বিলাস) ; ৩, কণ্টক। চ, অঙ্কুশ-রোহিণী (কাঁঠালিচাঁপা) ; ৬, অঙ্কুশ-রোহিণী।

৩। **কণ্টক-রোহিণী (Thorn-climbers):**

এইপ্রকার রোহিণী, আশ্রয়ের দেহে অঙ্কুশের পরিবর্তে, কাঁটার সাহায্যে আটকাইয়া থাকে। কাঁটাগুলি বেশ শক্ত ও সূচালো হওয়ায় আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের দেহে বিদ্ধ হইয়া থাকে এবং ইহারই সহায়তায় উদ্ভিদ্ উপরে আরোহণ করিতে পারে; যথা—বাগান-বিলাস, বেতগাছ, পীতগোলাপ ইত্যাদি।

৪। **বল্লী (Stem-climbers):**

এক প্রকার আরোহী-লতার কাণ্ড ও শাখাগুলি কৃশ ও লম্বাকার হয়। এই কাণ্ড ও শাখার দ্বারা আরোহী-লতা আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্‌কে জড়াইয়া উপরে আরোহণ করে। যখন এই কাণ্ড বা শাখা ঘড়ির কাঁটার মত আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্‌কে বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে আবর্তিত করে, তখন এই ধরনের বল্লীকে দক্ষিণাবর্ত (dextrose) বলা হয়; যথা—খাম-আলু, তারালতা ইত্যাদি। আবার যখন এই কাণ্ড বা শাখা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত চলনপন্থা অনুকরণ করিয়া আশ্রয়কে দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে আবর্তিত করে, তখন এই ধরনের

৯নং চিত্র

ক, দক্ষিণাবর্ত-রোহিণী (খাম-আলু); খ, বামাবর্ত-রোহিণী (অপরাজিতা)।

বল্লীকে বামাবর্ত (Sinistrose) বলা হয়; যথা—অপরাজিতা, তরুলতা, কুঁচলতা ইত্যাদি।

৫। কাষ্ঠললতা (Lianes) :

এইপ্রকার উদ্ভিদ্ প্রকৃত বল্লীশ্রেণী। ইহাদের কাণ্ড লম্বাকার ও কাষ্ঠল হয়। ইহারা বহুবর্ষজীবী এবং বৃহৎ বৃক্ষকে আশ্রয় করে। এইসকল উদ্ভিদের কাণ্ড ধীরে ধীরে উপরে আরোহণ করিতে করিতে আশ্রয়-বৃক্ষের অগ্রভাগ পর্যন্ত পৌছাইয়া গিয়া আবার দ্বিতীয় আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়া আরও উপরে সূর্য-আলোকের জন্য আরোহণ করে; যথা—মাধবীলতা, কাঞ্চনলতা ইত্যাদি।

৬। আকর্ষ-রোহিণী (Tendril-climbers) :

এইপ্রকার রোহিণীর দেহ হইতে একপ্রকার লম্বাকার কৃশ ও পত্রহীন অঙ্গ উৎপন্ন হয়। ইহা অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়াতে যে-কোন আশ্রয়ের সংস্পর্শ পাইলেই তৎক্ষণাৎ উহাকে জড়াইয়া উদ্ভিদ্‌কে আশ্রয়ের সাহায্যে উপরে উঠিতে সহায়তা করে। এই লম্বা, সরু, পত্রহীন অঙ্গকে আকর্ষ (tendril) বলা হয় এবং দেখা গিয়াছে যে, উদ্ভিদের কাণ্ড, পত্র, এমনকি পুষ্পদণ্ডক (peduncle) সকলও আকর্ষতে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয়; যথা—কুমড়া, লাউ, মটর, কুমারিকা, বিশালাঙ্গুলী ইত্যাদি। আকর্ষের উৎপত্তি অনুযায়ী বিবিধ প্রকারের আকর্ষের বিবরণ দেওয়া হইতেছে :

(i) **পত্রাকর্ষ (Leaf Tendril) :** এইসকল রোহিণীর বা লতানো উদ্ভিদের পাতার অগ্রভাগ সংবেদনশীল আকর্ষে রূপান্তরিত হয় এবং ইহা উদ্ভিদের আশ্রয়কে জড়াইয়া উপরে আরোহণ করিতে পারে; যথা—উলটচণ্ডাল ইত্যাদি।

(ii) **বৃন্তাকর্ষ (Petiole-tendril) :** এইসকল উদ্ভিদের পাতার বৃন্তগুলি লম্বাকার, সূক্ষ্ম ও কোমল হয়। ইহা আকর্ষের মত আশ্রয়কে জড়াইয়া উপরে আরোহণ করে; যথা—ছাগলবটি, ঈশ্বরমূল ইত্যাদি।

(iii) **উপপত্রাকর্ষ (Stipule tendril) :** কতকগুলি উদ্ভিদের উপপত্রগুলি আকর্ষে পরিণত হয় এবং উদ্ভিদ্ এই উপপত্রাকর্ষের সাহায্যে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্‌কে জড়াইয়া ধরে এবং উপরে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়; যথা—কুমারিকা ইত্যাদি উদ্ভিদ্।

(iv) **পত্রকাকর্ষ (Leaf-tendril) :** কতকগুলি উদ্ভিদের যৌগিক-পত্রের অগ্রভাগের পত্রগুলি আকর্ষে পরিণত হয় এবং উদ্ভিদ্ এই পত্রকাকর্ষের সাহায্যে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্‌কে সূতার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া

বেড়িয়া আটকাইয়া ধরে এবং তদ্দ্বারা উপরে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়; যথা—মটর উদ্ভিদ্।

(v) **পূর্ণপত্রাকর্ষ (Whole leaf-tendril)**ঃ জংলী মটর (Lathyrus) উদ্ভিদের সমগ্র পাতাটি একটি বড় আকর্ষে রূপান্তরিত হয়। ইহার উপপত্রগুলি পাতার কার্য করে এবং সেইজন্য উপপত্রগুলিকে পাতা বলিয়া মনে হয়।

(vi) **শাখাকর্ষ (Stem-tendril)**ঃ এইসকল উদ্ভিদের শাখাগুলি সরু আকর্ষে পরিণত হয় এবং সাধারণতঃ আক্ষিক-শাখাগুলিই এইরূপ পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ইহা অন্যান্য আকর্ষের মত আশ্রয়কে জড়াইয়া উদ্ভিদ্‌কে উপরে উঠিতে সাহায্য করে; যথা—কুমড়া, লাউ, ঝুমকোলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ইহার উদাহরণ।

পুষ্পবিন্যাস

(The Inflorescence)

যে-কোন গাছের ফুল জন্মাইবার পূর্বে উহার শাখায় শাখায় পুষ্পমুকুল জন্মায়। এই পুষ্পমুকুল কখনও এক-শাখাবিশিষ্ট, আবার কখনও বা বহু-শাখাবিশিষ্ট হয়। আমের মুকুল তোমরা সকলে দেখিয়াছ, আবার কৃষ্ণচূড়ার মুকুলও দেখিয়াছ। এইরূপ এক-শাখাবিশিষ্ট বা বহু-শাখাবিশিষ্ট সমগ্র পুষ্পমুকুলকেই উদ্ভিদের **পুষ্পবিন্যাস** (*inflorescence*) বলা হয়। পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিকমুকুল এবং শীর্ষমুকুল উভয়ের ক্রমবিকাশের ফল। যখন পুষ্পমুকুলে একটিমাত্র শাখাবিশিষ্ট ফুল জন্মায়, তখন এই শাখাটিকে পুষ্পবিন্যাসের **পুষ্পদণ্ড** (*peduncle*) বলা হয়। আবার যখন পুষ্পমুকুলে বা মঞ্জরীতে অনেক শাখাবিশিষ্ট ফুল জন্মায়, তখন প্রতিটি ফুলের শাখাকে **পুষ্পবৃন্তিকা** (*pedicel*) বলে। যে-সকল ফুলের পুষ্পবৃন্তিকা থাকে, তাহাদের **সবৃন্তক** (*pedicellate*) ফুল বলা হয়। সেইরূপ যে-সকল ফুলে পুষ্পবৃন্তিকা থাকে না, অর্থাৎ যে-সকল ফুল প্রত্যক্ষভাবে পুষ্পদণ্ড হইতে জন্মায়, তাহাদের **অবৃন্তক** (*sessile*) ফুল বলে। পুষ্পদণ্ড বা পুষ্পবৃন্তিকার স্থূল অগ্রভাগকে **পুষ্পাক্ষ** বা **পুষ্পাধার** (*thalamus* or *receptacle*) বলা হয়। পুষ্পাধারের উপর ফুলের বিভিন্ন অংশ সজ্জিত থাকে। ফুলের নিম্নে বা মূলে সবুজ পাতার মত মঞ্জরীপত্র (*bracts*) থাকিতে দেখা যায়। নিম্নে বিবিধ প্রকারের মঞ্জরীপত্রের বিবরণ দেওয়া হইল:

মঞ্জরীপত্র

(Bracts)

ফুলের কুঁড়ি সাধারণতঃ পাতার কুঁড়ির মত শাখার শীর্ষে বা পাতার কক্ষে জন্মায়। কিন্তু পুষ্পবিন্যাসের কুঁড়িগুলি বিশেষ ধরনের ছোট ছোট পাতার কক্ষ হইতে জন্মায় এবং এইরূপ বিশেষ ধরনের পাতাগুলিকে **মঞ্জরীপত্র** (*bracts*) বলা হয়। যে-সকল ফুলে মঞ্জরীপত্র থাকে, তাহাদের **মঞ্জরীপত্র-যুক্ত** (*bracteate*) পুষ্প বলা হইয়া থাকে। সেইরূপ যে-সকল ফুলে মঞ্জরীপত্র থাকে না, তাহাদের **মঞ্জরীপত্রহীন** (*ebracteate*) পুষ্প বলা হয়। নানাবিধ মঞ্জরীপত্রের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ মঞ্জরীপত্রের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইতেছে :

১। **পত্রাকৃতি (Leaf)**ঃ যখন মঞ্জরীপত্রগুলি সবুজ পাতার মত হয়, এবং পাতার যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে, তখন এইরূপ মঞ্জরীপত্রগুলিকে পত্রাকৃতি মঞ্জরীপত্র বলা হয়; যথা—মুক্তাঝুরি, বাসক, সাদা হুরহুরে প্রভৃতি উদ্ভিদের মঞ্জরীপত্রের কথা উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

২। **দলাকৃতি (Petaloid)**ঃ যখন পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীপত্রগুলি ফুলের পাপড়ির মত উজ্জ্বল রঙের হয় এবং ফুলের পাপড়ি বলিয়া ভ্রম হয়, তখন এইরূপ মঞ্জরীপত্রকে দলাকৃতি মঞ্জরীপত্র নামে অভিহিত করা হয়। বাগান-বিলাস ও লালপাতার পুষ্পবিন্যাস ইহার উদাহরণ।

৩। **স্পেদ (Spathe)**ঃ যখন মঞ্জরীপত্রটি বেশ বড় হয় এবং সমগ্র পুষ্পবিন্যাসকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, তখন এইরূপ মঞ্জরীপত্রকে 'স্পেদ' বলা হয়। 'স্পেদ' সাধারণতঃ সবুজ বা লাল রঙের হয়; যথা—কচু, কলা, তাল ইত্যাদি উদ্ভিদের পুষ্পবিন্যাস।

৪। **বর্মাকার (Glume)**ঃ এইরূপ মঞ্জরীপত্রগুলি শুষ্ক, শিরাবিশিষ্ট ছোট কাগজের মত হয়। ধান, ভুট্টা, গম প্রভৃতি উদ্ভিদের পুষ্পবিন্যাসে বর্মাকার মঞ্জরীপত্র থাকে।

৫। **পত্রাবরণী (Involucre)**ঃ এইরূপ মঞ্জরীপত্রগুলি ফুল বা পুষ্প-বিন্যাসের নিম্নদেশে একত্রিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পত্রাবরণী মঞ্জরীপত্র দেখিতে পাতার মত সবুজ হয়। সূর্যমুখী, গাঁদা, ডালিয়া প্রভৃতি ফুলগাছের পুষ্পবিন্যাসের নিম্নে এইপ্রকার মঞ্জরীপত্রের সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

৬। **উপবৃতি (Epicalyx) :** কতকগুলি সরু সরু সবুজ রঙের মঞ্জরী-পত্র পুষ্পবিন্যাসের বা ফলের বৃতির নিম্নদেশে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া থাকিতে দেখা যায়। এইরূপ মঞ্জরীপত্রকে উপবৃতি বলা হয়; যথা—জবা ফুল।

৭। **শল্কাকার (Scaly) :** যখন একটি পুষ্পবিন্যাসের ছোট ছোট **পুষ্পিকার** (*floret*) মূলে আঁশের মত সাদা মঞ্জরীপত্র থাকে, তখন এইরূপ মঞ্জরীপত্রকে শল্কাকার মঞ্জরীপত্র বলা হয়। সূর্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতি পুষ্পবিন্যাসের পুষ্পিকার এইরূপ মঞ্জরীপত্র দেখা যায়।

পুষ্পবিন্যাসের প্রকারভেদ
(Kinds of Inflorescence)

পুষ্পবিন্যাস প্রধানতঃ তিন প্রকারের হয়। নিম্নে বিবিধ প্রকারের পুষ্প-বিন্যাসের বিবরণ দেওয়া হইতেছে :

(ক) **অনিয়ত (Indefinite or Racemose) :**

এইরূপ পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ডটি অনির্দিষ্টভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ফুলগুলি **অগ্রোন্মুখভাবে** (*acropetal order*) বিকশিত হয়, অর্থাৎ মঞ্জরীদণ্ডের তলদেশে ফুলটি বা মঞ্জরীদণ্ডের ঠিক প্রথম ফুলটি সবচেয়ে আগে বিকশিত হয় এবং শেষ ফুলটি বা মঞ্জরীদণ্ডের ঠিক শীর্ষাগ্রের ফুলটি সবচেয়ে শেষে বিকশিত হয়। যখন পুষ্পবিন্যাসটি বৃত্তাকার হয়, তখন মঞ্জরীদণ্ড হইতে সর্বাপেক্ষা দূরের ফুলটি আগে প্রস্ফুটিত হয় এবং ধীরে ধীরে পর পর ফুলগুলি ফুটিতে ফুটিতে মঞ্জরীদণ্ডের শীর্ষস্থ শীর্ষের নিকটতম ফুলটি শেষে বিকশিত হয়। এইরূপ ফুলের বিকাশ প্রণালীকে **অভিকেন্দ্র** (*centripetal*)
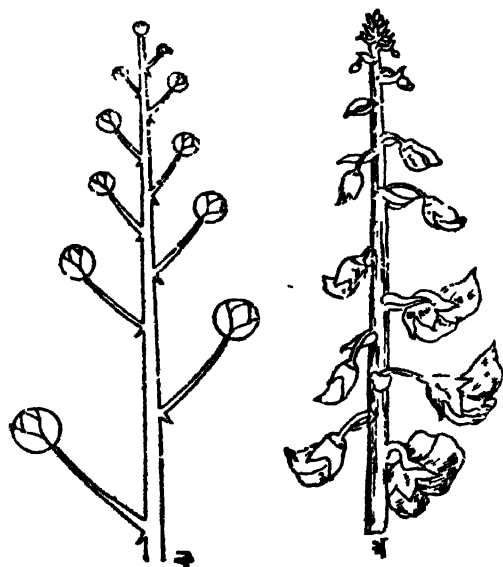
১০নং চিত্র
উদ্ভিদের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস।
ক, রেখাচিত্রের দ্বারা অনিয়ত রেসমী বিন্যাস।
খ, অতসী ফুলের অনিয়ত বিন্যাস।

ভাবে বিকাশ বলা হয়। বহুপ্রকারের পুষ্পবিন্যাস অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের ধারা অনুসরণ করে। নিম্নে বিবিধ প্রকারের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের বিবরণ দেওয়া হইতেছে:

১। সবৃন্তক পুষ্পবিশিষ্ট অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস:

সবৃন্তক পুষ্পবিশিষ্ট অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস নানা প্রকারের হয়। নিম্নে উহাদের বিবরণ দেওয়া হইতেছে: (১) **রেসীম** (*Raceme*): এইপ্রকার পুষ্পবিন্যাসকে আদর্শ অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস বলা হয়। পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ডটি বেশ লম্বা হয় এবং পুষ্পবৃন্তিকার মূলে সরল মঞ্জরীপত্র থাকে। সাধারণতঃ সরিষা, অতসী, মূলা প্রভৃতি উদ্ভিদে এইরূপ পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। সরল রেসীম ব্যতীত অনেক উদ্ভিদে যৌগিক রেসীম পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। এইরূপ পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ড শাখাবিশিষ্ট হয় এবং প্রতিটি শাখায় সরল রেসীমের মত সবৃন্তক পুষ্প জন্মায়। প্রতিটি পুষ্পবৃন্তিকার মূলে মঞ্জরীপত্র থাকে। আম, নিম, মেহগিনি প্রভৃতি গাছে এইরূপ যৌগিক রেসীম পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। যৌগিক রেসীম পুষ্পবিন্যাসকে প্যানিক্‌ল্ (Panicle) বলে। আমের মুকুল বা নিমের মুকুল তোমরা সহজেই পরীক্ষা করিতে পার। ইহা যৌগিক পুষ্পবিন্যাস হওয়ায় প্রতিটি পুষ্পবৃন্তের মূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঞ্জরীপত্র থাকে। পুষ্পবৃন্তের মূলে মঞ্জরীপত্রের স্থিতি অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।
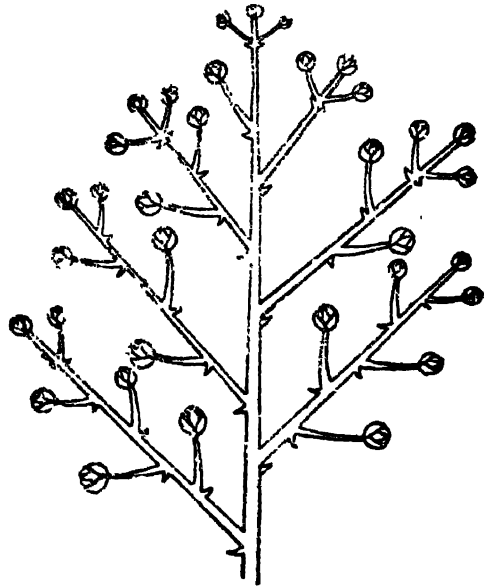
১১নং চিত্র
উদ্ভিদের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস। রেখাচিত্রের দ্বারা যৌগিক অনিয়ত (Compound racemose) বিন্যাস দেখানো হইতেছে।

*২। সমভূমি বা কোরিম্ব (Corymb) : ইহাও রেসীমের মত ; কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান মঞ্জরীদণ্ডটি খুব বেশী বড় হয় না এবং মঞ্জরীদণ্ডের নিম্নের ফুলগুলির বৃন্তসকল এমনভাবে বৃদ্ধি পায়, যাহাতে পুষ্পবিন্যাসের সকল ফুল প্রায় একই সমতলে সজ্জিত থাকে। প্রথম ফুলের বৃন্তটি অপেক্ষাকৃত বড় হয়। দ্বিতীয় ফুলের বৃন্তটি অপেক্ষাকৃত সামান্য ছোট হয় এবং এইভাবে সমস্ত ফুলগুলি একই লাইনে আসিয়া অবস্থান করে। কালকাসিন্দা, আইবেরিস (Iberis) প্রভৃতি উদ্ভিদে এইরূপ পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়।
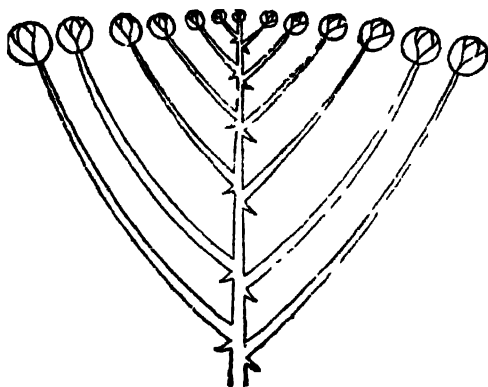
১২নং চিত্র
উদ্ভিদের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস। রেখাচিত্রের দ্বারা কোরিম্ব মঞ্জরী দেখানো হইতেছে।

৩। ছত্রাকৃতি (Umbel) : এইপ্রকার পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ডের শীর্ষবিন্দু হইতে সমান দৈর্ঘ্যের বৃন্তযুক্ত ফুল অর্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায়। পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ডটি খুবই ছোট হয়। সবৃন্তক পুষ্পগুলি মঞ্জরীদণ্ডের উপর এমনভাবে সাজানো থাকে যে, দেখিলে খোলা ছাতার মত মনে হয়। থানকুনি, ধনে, গাজর প্রভৃতি উদ্ভিদে এইরূপ পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়।
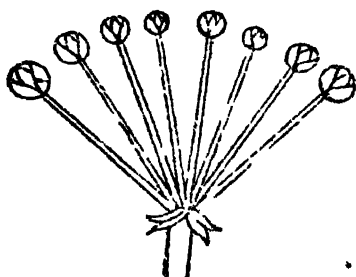
১৩নং চিত্র
উদ্ভিদের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস। রেখাচিত্রের দ্বারা ছত্রাকৃতি (umbel) মঞ্জরী দেখানো হইতেছে।

* সমভূমি বা কোরিম্ব পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত অংশ।

ধনে, পিঁয়াজ প্রভৃতি উদ্ভিদের পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ডটি শাখাবিশিষ্ট হয়; তখন এইরূপ পুষ্পবিন্যাসকে যৌগিক ছত্রাকৃতি পুষ্পবিন্যাস বলা হয়।

অবৃন্তক পুষ্পবিশিষ্ট অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস : ইহা বহু প্রকারের হয়; যথা—

৪। **স্পাইক বা মঞ্জরী (Spike) :** এইপ্রকার পুষ্পবিন্যাসে মঞ্জরী-দণ্ডটি বেশ লম্বা হয়। কিন্তু ফুলগুলি অবৃন্তক হয়। প্রতিটি ফুলের নিচে মঞ্জরীপত্র থাকে। আপাং, রজনীগন্ধা, নটে-শাক ইত্যাদি উদ্ভিদে এইরূপ পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। একটি রজনীগন্ধার পুষ্পবিন্যাস (যাহা বাজারে সহজেই পাওয়া

১৪নং চিত্র
উদ্ভিদের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস।
ক, স্পাইকের রেখাচিত্র; খ, রজনীগন্ধার স্পাইক।

যায়) ফুলদানিতে জল দিয়া রাখিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার গোড়ার ফুলগুলি আগে ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িবে এবং শেষে মঞ্জরীদণ্ডের শীর্ষাগ্রের ফুল ফুটিবে। পুষ্পবিন্যাসের সমস্ত ফুল ফুটিতে প্রায় চারদিন লাগে। এইপ্রকার

নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বদিকে ক্রমান্বয়ে প্রস্ফুটন প্রণালীই অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৫। **চসমাকৃতি বা স্প্যাডিক্স্** (**Syadix**)ঃ ইহা স্পাইকের পরিবর্তিত রূপ। এইপ্রকার পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ডটি অপেক্ষাকৃত লম্বা, স্থূল ও শাঁসালো হয়। ইহার অগ্রভাগ বেশ সরু, রঙীন ও পুষ্পহীন হয়। মঞ্জরীদণ্ডের নিচের অংশের উপরিভাগে **পুং-পুষ্প** (*male flower*) জন্মায় এবং উহার নিচের অংশের নিম্নভাগে **স্ত্রী-পুষ্প** (*female flower*) জন্মাইতে দেখা যায়। সমস্ত মঞ্জরীদণ্ডটি নৌকার মত একটি বিশেষ ধরনের মঞ্জরীপত্র বেষ্টন করিয়া থাকে। এইরূপ মঞ্জরীপত্রকে 'স্পেদ' বলা হয়। স্প্যাডিক্স্ পুষ্পবিন্যাস কেবল মাত্র একবীজপত্রী উদ্ভিদে দেখা যায়; যেমন—কচু, কলা ইত্যাদি।
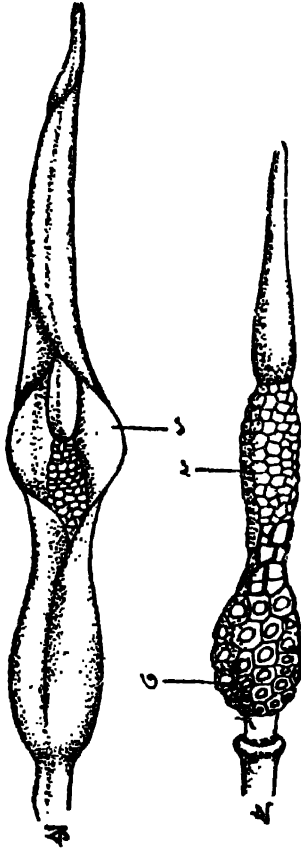
১৫নং চিত্র
উদ্ভিদের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস।
ক, চসমাবৃত কচুমঞ্জরী; খ, চসমাহীন কচুমঞ্জরী; ১, চসমা (spathe) ২, পুং-পুষ্প; ৩, স্ত্রী-পুষ্প।

৬। **অনুমঞ্জরী বা স্পাইকলেট্** (**Spikelet**)ঃ ইহা খুবই ছোট পুষ্পবিন্যাস। অনুমঞ্জরী, মঞ্জরী পুষ্পবিন্যাসের পরিবর্তিত রূপ। মঞ্জরীদণ্ডে এক বা একাধিক অবৃন্তক পুষ্প থাকিতে পারে। প্রতিটি ফুলের নিচে কয়েকটি বিশেষ ধরনের মঞ্জরীপত্র থাকে। ইহাদের **বর্মপত্র** (*glume*) বলা হয়। পুষ্পবিন্যাসের নিম্নস্থ প্রথম দুইটি মঞ্জরীপত্রে কোনও ফুল জন্মায় না বলিয়া উহাদের **অপুষ্পক বর্মপত্র** (*empty glume*) বলা হয়। তৃতীয় বর্মপত্রের কক্ষে একটি পুষ্পবৃন্তিকা (pedicel) জন্মায়। এই পুষ্পবৃন্তিকার শীর্ষে শীর্ষে

পুষ্প জন্মায় এবং সেইজন্য তৃতীয় বর্মপত্রকে **সপুষ্পক বর্মপত্র** (*Flowering glume*) বলা হয়। পুষ্পবৃন্তিকায় একটি পাতার মত শিরাবিশিষ্ট মঞ্জরীপত্র জন্মায়। উহাকে **শিরাবর্ম** (*Palea*) বলা হয়। শিরাবর্মের সামান্য উপরে
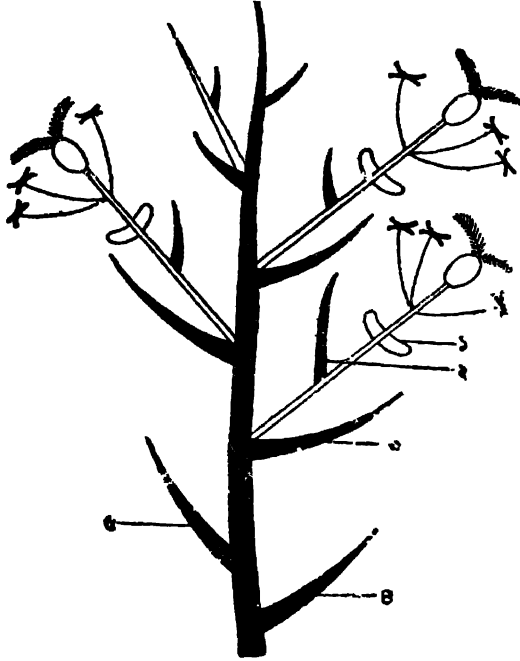
১৬নং চিত্র

উদ্ভিদের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস। ঘাসের অনুমঞ্জরী বা স্পাইকলেট্ দেখানো হইতেছে।
১, শল্কদল (lodicules); ২, শিরাবর্ম (palea); ৩, সপুষ্পক বর্মপত্র (flowering glume); ৪, ৫, অপুষ্পক বর্মপত্র (empty glume)।

পুষ্পবৃন্তিকার দুই পাশ হইতে একজোড়া আঁশের মত পাতা দেখা যায়। এইগুলিকে **শল্কদল** (*Lodicules*) বলে। শল্কদলের উপরেই ফুলের অংশ সজ্জিত থাকে। ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি উদ্ভিদে এইরূপ পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়।

৭। **শিরমঞ্জরী বা ক্যাপিটিউলম (Capitulum):** এইপ্রকার পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ডের অগ্রভাগ স্থূল হয়। মঞ্জরীদণ্ডের পুষ্পাক্ষটি গোলাকারে পরিণত হয় এবং উহার উপরিভাগ উত্তল। পুষ্পাক্ষের উপর প্রচুর ছোট ছোট ফুল সজ্জিত থাকে। পুষ্পাক্ষের তলদেশে পাতার মত মঞ্জরীপত্রগুলি চক্রাকারে

বেষ্টন করিয়া থাকে। এইরূপ মঞ্জরীপত্রগুলিকে **পত্রাবরণী** (*Involucre*) বলা হয়। সমগ্র পুষ্পবিন্যাসকে একটি ফুল বলিয়া ভ্রম হয়। চলিতকথা "গাঁদাফুল ফুল নহে"—ইহা সত্য। পুষ্পবিন্যাসের ফুলগুলিকে পুষ্পিকা

১৭নং চিত্র

উদ্ভিদের পুষ্পবিন্যাস। সূর্যমুখীর ক্যাপিটিউলম (Oapi ulum) বিন্যাসের লম্বচ্ছেদ।
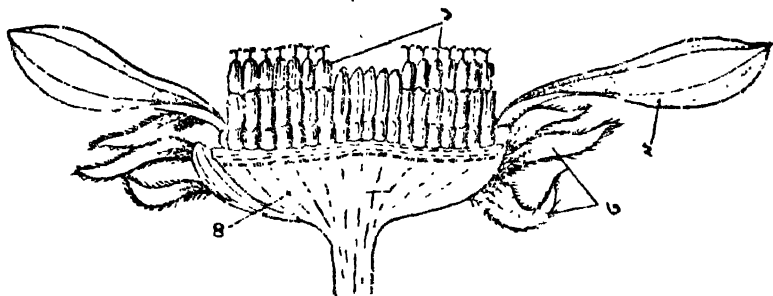
১, মধ্যপুষ্পিকা (diao floret); ২, প্রান্তপুষ্পিকা (ray floret); ৩, পত্রাবরণী (iuvolucre); ৪, পুষ্পাক্ষ (receptacle)।

(*florets*) বলে। পুষ্পবিন্যাসের পরিধি বেষ্টন করিয়া অপেক্ষাকৃত বড় পুষ্পিকাগুলিকে **প্রান্তপুষ্পিকা** (*Ray-florets*) বলা হয়। পুষ্পবিন্যাসের কেন্দ্রের চারিপাশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুষ্পিকাগুলিকে **মধ্যপুষ্পিকা** (*Disc florets*) বলা হয়। এইরূপ পুষ্পবিন্যাস সূর্যমুখী, গাঁদা, ডালিয়া প্রভৃতি ফুলগাছে দেখা যায়। কোন কোন উদ্ভিদে দুইপ্রকার পুষ্পিকার বদলে একই প্রকার পুষ্পিকা জন্মায়; যথা—কুকশিমা ও শিয়ালকাঁটা ইত্যাদি।

(খ) **নিয়ত পুষ্পবিন্যাস** (Cymose inf orescence):

নিয়ত পুষ্পবিন্যাস মঞ্জরীদণ্ডের বৃদ্ধি নির্দিষ্ট এবং ইহার অগ্রাংশে ফুল ফুটিয়া উহার বৃদ্ধি স্থগিত করে। সেইজন্য এইরূপ পুষ্পবিন্যাসকে **নিয়ত পুষ্পবিন্যাস** (*Cymose* or *Definite inflorescence*) বলে। মঞ্জরীদণ্ডের শীর্ষাগ্রে ফুলের ভিতর কিছু নিচে মঞ্জরীদণ্ডের দুই বিপরীত দিক হইতে বা একদিক হইতে পুষ্পবৃন্তিকা জন্মায়। পুষ্পবৃন্তিকাগুলিও পর্যায়ক্রমে শীর্ষে এক একটি ফুল ধারণ করিয়া উহার বৃদ্ধি স্থগিত করে। পুষ্পবৃন্তিকার ফুলটির নিচে আবার উহার দুই দিকে দুইটি সবৃন্তক ফুল জন্মায়। এইভাবে দৈর্ঘ্যে পুষ্পবিন্যাসটি প্রসারিত হয়। নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ডের শীর্ষক ফুলটি প্রথম ফুল এবং প্রথম ফুল হইতে

সবচেয়ে দূরের ফুলটি সর্বশেষ ফুল। এইরূপ প্রণালীতে ফুলের বৃদ্ধিকে **নিম্নমুখী** (*basipetal*) বলা হয়। প্রথম ফুলটি সবচেয়ে আগে প্রস্ফুটিত হয় এবং সর্বশেষ ফুলটি সর্বশেষে প্রস্ফুটিত হয়।

সুতরাং নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের ফুলগুলি কেন্দ্র হইতে ধীরে ধীরে পরিধির দিকে

১৮নং চিত্র

উদ্ভিদের নিয়ত পুষ্পবিন্যাস।

ক, জবাফুলের নিয়ত বিন্যাস (solitary ৎymose) ;

খ, যুঁইফুলের দ্বিপার্শ্বীয় নিয়ৎবিন্যাস ; গ, হাতীশুঁড়ের একপার্শ্বীয় নিয়তবিন্যাস।

প্রস্ফুটিত হয়। এইরূপ ফুলের বিকাশ-বৈশিষ্ট্যকে **অপকেন্দ্রভাবে বিকাশ** (*Centrifugal order*) বলা হয়।

নিয়ত পুষ্পবিন্যাস তিন প্রকারের ; যথা—(১) **একপার্শ্বীয়** (*Uniparous* or *Monochasium*); (২) **দ্বিপার্শ্বীয়** (*Biparous* or *Dichasium*) ও (৩) **বহুপার্শ্বীয়** (*Multiparous* or *Polychasium*)। ইহার মধ্যে

দ্বিপার্শ্বীয় নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের (*Biparous* , *bi*=two ; *parene*=to produce) বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

দ্বিপার্শ্বীয় নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ডের আগায় একটি ফুল ফুটিবার পর ইহার সামান্য নিচে দুইটি বিপরীত কক্ষে পুষ্পবৃন্তিকাসহ ফুল জন্মায় ; আবার পুষ্পবৃন্তিকার সামান্য নিচে দ্বিতীয় পুষ্পবৃন্তিকাসহ ফুল জন্মায়। এইভাবে দুই দিকে পুষ্পবিন্যাসের শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হয়। শেফালিকা, যুঁই, রঙ্গন ও ঘেঁটু প্রভৃতি উদ্ভিদে এইরূপ পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। জবা গাছের পুষ্পবিন্যাস নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। কক্ষ হইতে মঞ্জরীদণ্ডের একটিমাত্র ফুল প্রস্ফুটিত হয়। এইরূপ পুষ্পবিন্যাসকে **একক নিয়ত পুষ্পবিন্যাস** (*Solitary cymose inflorescence*) বলা হয়।

(গ) **বিশিষ্ট আকৃতির পুষ্পবিন্যাস** (**Special forms of inflorescence**) :

এমন কতকগুলি উদ্ভিদের পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়, যাহাকে নিয়মিত বা নিয়ত পুষ্পবিন্যাস গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না। নিম্নে এইরূপ দুইটি বিশিষ্ট আকৃতির পুষ্পবিন্যাসের বিবরণী দেওয়া হইতেছে :
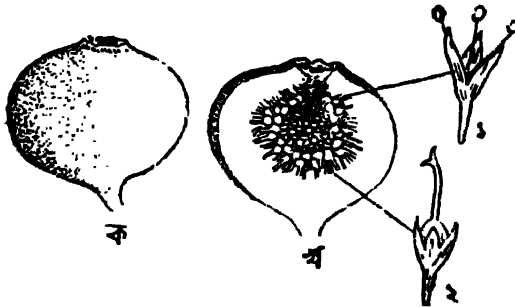
১৯নং চিত্র
উদ্ভিদের বিশিষ্ট আকৃতির পুষ্পবিন্যাস।
ডুমুরের হাইপানথোডিয়ম (hypanthodium) বিন্যাস। ক, একটি সম্পূর্ণ ডুমুর।
খ, ডুমুরের লম্বচ্ছেদ ; ১, পুং-পুষ্প ; ২, স্ত্রী-পুষ্প।

১। **হাইপানথোডিয়ম বা উদুম্বর (Hypanthodium) :** এই-প্রকার পুষ্পবিন্যাসের মঞ্জরীদণ্ড পুষ্পাক্ষটি পুষ্পাধারে (*receptacle*) পরিণত হয়। অর্থাৎ পুষ্পাক্ষটির বেড় উচ্চাকারে একটি গোলাকার পেয়ালার মত হয়। পেয়ালার মত মুখটি বন্ধ হইয়া যায়, কেবলমাত্র একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র মুখের শীর্ষে

বিদ্যমান থাকে। বাহির হইতে পুষ্পবিন্যাসটিকে ফলের মত দেখায়। পেয়ালার গহ্বরের গাত্রে অসংখ্য একলিঙ্গ-বিশিষ্ট (*unisexual*) ফুল জন্মায়। ফুলগুলি বৃন্তহীন। স্ত্রী-ফুলগুলির গহ্বরের নিচের দিকে এবং পুং-ফুলগুলি গহ্বরের উপরের দিকে বিদ্যমান। সূক্ষ্ম ছিদ্রটি আবার কতকগুলি ছোট ছোট শল্কপত্রের দ্বারা আবৃত থাকে। ডুমুর, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছে এইরূপ পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়।

২। **ভারটিসিলাসটার (Verticillaster)ঃ** এই পুষ্পবিন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে দ্বিপার্শ্বীয় নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের পরিবর্তিত রূপ। মঞ্জরীদণ্ডের অভিমুখ পত্রযুগলের কক্ষে এবং পর্বের চারিপাশে অসংখ্য ফুল বেষ্টন করিয়া থাকে। ফুলগুলি বৃন্তহীন কিংবা বৃন্ত থাকিলেও উহা খুবই ক্ষুদ্র। প্রকৃতপক্ষে দ্বিপার্শ্বীয় নিয়ত পুষ্পবিন্যাসের উভয় পার্শ্বের সমগ্র ফুলগুলি কক্ষে একত্রিত হইয়া উদ্ভিদে এইরূপ পুষ্পবিন্যাসের সৃষ্টি করে। রক্তদ্রোণ, শ্বেতদ্রোণ ও তুলসী প্রভৃতি উদ্ভিদের এইরূপ পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়।
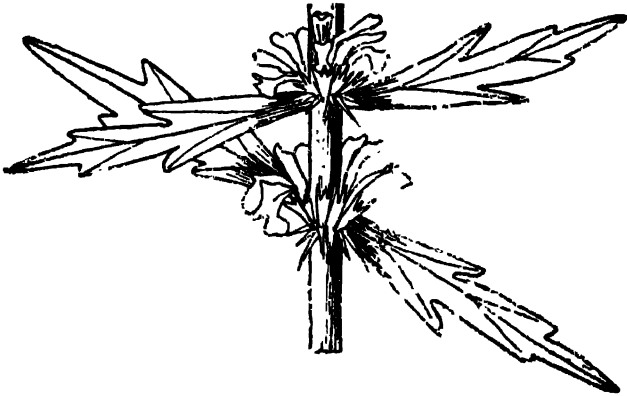
২০নং চিত্র

উদ্ভিদের বিশিষ্ট আকৃতির পুষ্পবিন্যাস।

রক্তদ্রোণের ভারটিসিলাসটার (Verticillaster) বিন্যাস দেখানো হইতেছে।

*৩। **স্যায়াথিয়ম (Cyathium)ঃ** স্যায়াথিয়ম নামে আরও একপ্রকার বিশিষ্ট আকৃতির পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। ইহা লাল পাতা, কাগজ ফুল ও মনসা গোত্রীয় উদ্ভিদের পুষ্পবিন্যাস। এইরূপ পুষ্পবিন্যাসের পুষ্পাক্ষটি পেয়ালার মত এবং ইহার মধ্যস্থলে গর্ভপত্রটি থাকে। গর্ভপত্রের চারিপাশে পুং-কেশরগুলি ঘিরিয়া

* স্যায়াথিয়ম পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত অংশ।

থাকে। ইহাদের মাঝে মাঝে আঠালো গ্রন্থিও দেখা যায়। গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ড ব্যতীত ফুলের সমস্ত অঙ্গগুলি পুষ্পাক্ষের দ্বারা আবৃত থাকে। সুতরাং পুষ্পবিন্যাসটিকে বাহির হইতে বুঝা যায় না। কিন্তু পুষ্পবিন্যাসটি লম্বালম্বিভাবে কাটিলে উহার ভিতরকার অঙ্গগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। সাধারণতঃ সমগ্র পুষ্পবিন্যাসটি দেখিতে গাঢ় লাল রঙের হয়।

নিম্নে বিবিধ পুষ্পবিন্যাসের একটি সাধারণ ছক দেওয়া হইল :
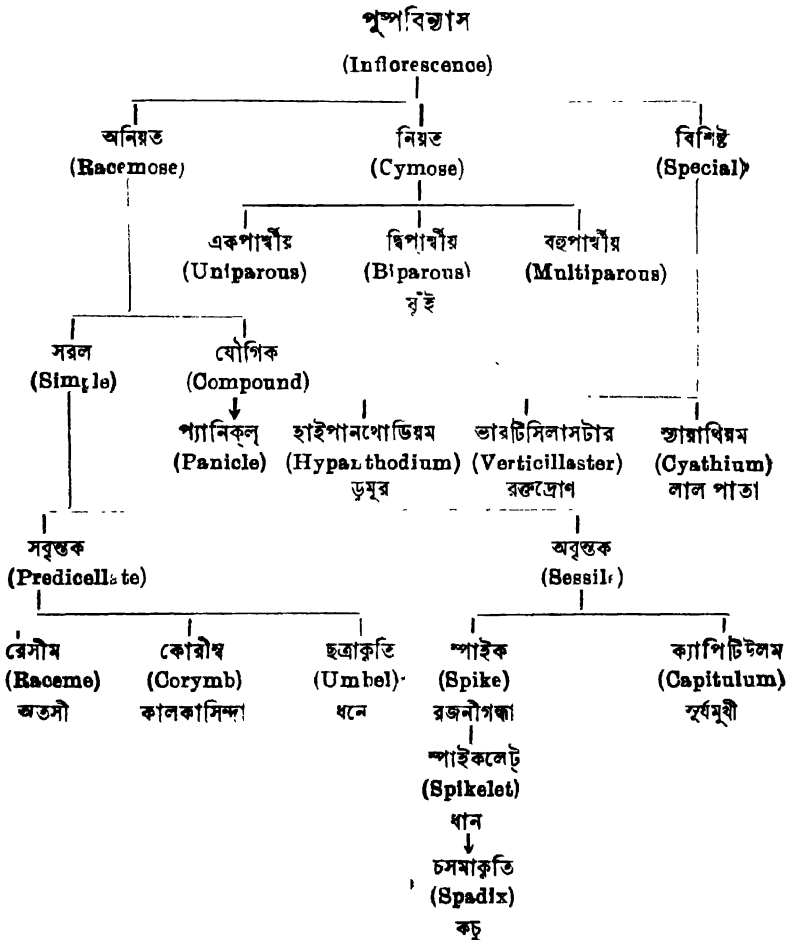
অনুশীলনী

১। উদ্ভিদের সমসংস্থা ও সমবৃত্তিতা বিষয়ে উদাহরণসহ যাহা জান লিখ। [Describe the phenomenon of homology and analogy of plants with suitable examples.]

২। উদ্ভিদের আরোহণ অঙ্গের কার্যকারিতা বর্ণনা কর। গাছের কোন্ কোন্ অঙ্গ আরোহণ অঙ্গে রূপান্তরিত হয়? [Describe the function of the climbing organs of plants. What are the parts usually modified for climbing purposes ?]

৩। উদ্ভিদ্ কি-ভাবে নিজদেহ রক্ষা করে? শাখা কণ্টক ও পত্র-কণ্টকের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও। [How a plant protects its body ? Explain the differences present in a thorn and a spine with suitable examples.]

৪। মঞ্জরীপত্র কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের মঞ্জরীপত্র অঙ্কন করিয়া বর্ণনা কর। [Define bracts. Explain various types of bracts with suitable examples and sketches.]

৫। পুষ্পবিন্যাস কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের অনিয়ত পুষ্পবিন্যাসের চিত্র অঙ্কন করিয়া দেশীয় উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [What is Inflorescence ? Describe various types of Racemose inflorescence with Indian examples and sketches.]

৬। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ [Write what you know of] :—

(i) ক্যাপিটিউলম (Capitulum) ; (ii) ভারটিসিলাসটার (Verticillaster) ;

(iii) হাইপানথোডিয়ম (Hypanthodium) ; (iv) গ্রন্থিরোম (Glandular hairs) ;

(v) অনুকৃতি (Mimicry) ; (vi) পিপীলিকাশ্রয়ী বা সহকৃতি (Myrmecophily).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফুল

(The Flower)

উদ্ভিদের জনন-প্রক্রিয়া কার্যকরী করিবার জন্য বিটপের আকৃতি অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হয়। বিপটের এই পরিবর্তিত রূপকেই ফুল বলে। নিম্নে একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হইতেছে :

আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ (Parts of a typical flower) :—

সাধারণতঃ একটি আদর্শ ফুলে চারিটি অংশ বা স্তবক (whorl) থাকে। স্তবকগুলি পুষ্পাক্ষের উপর সর্পিলভাবে বা আবর্তভাবে সজ্জিত থাকে। নিম্নে স্তবকগুলির বিবরণী দেওয়া হইতেছে :

১। **বৃতি (Calyx) :** ফুলের সবচেয়ে বাহিরের স্তবক ও প্রথম স্তবককে বৃতি বলা হয়। ইহা দেখিতে পাতার মত সবুজ এবং ফুলের নিচে থাকায় ভালোভাবে দেখা যায় না। কতকগুলি সরু সরু পাতার মত অঙ্গের সমষ্টিগত নামই বৃতি এবং এইরূপ প্রত্যেকটি অঙ্গের নাম বৃত্যংশ (*Sepals*)।

২। **দলমণ্ডল (Corolla) :** ইহা ফুলের বৃতির ভিতরকার স্তবক। বৃতির মত ইহাও কতকগুলি উজ্জ্বল রঙের পাপড়ির (petals) সমষ্টি। পাপড়িগুলি উজ্জ্বল রঙের হয় এবং অনেক ফুলের পাপড়িতে সুমিষ্ট গন্ধ থাকে। বৃতংশ ও পাপড়িতে সুস্পষ্ট শিরা থাকে।

৩। **পুংস্তবক (Androecium ; Andro = male ; cium = house) :** ফুলের দলমণ্ডলের ভিতরকার স্তবককে পুংস্তবক বলে। পুংস্তবকের প্রত্যেকটি অংশকে পুংকেশরকে (*Stamen*) বলে, অর্থাৎ পুংকেশরের সমষ্টিগত নাম পুংস্তবক। প্রতিটি পুংকেশরে একটি সরু দণ্ড থাকে। ইহাকে **পুংদণ্ড** (*Filament*) বলে এবং পুংদণ্ডের শীর্ষে একটি স্থূল থলি বিদ্যমান। এই থলিটিকে **পরাগধানী** (*Anther*) বলা হয়। পরাগধানীর ভিতরেই **রেণু** (*Pollen gram*) জন্মায়।

৪। **স্ত্রীস্তবক (Gynaecium ; Gynae = female ; cium = house) :** পুংস্তবকের ভিতরে বা ফুলের মধ্যস্থলে স্ত্রীস্তবক বিদ্যমান থাকে।

স্ত্রীস্তবকই ফুলের চতুর্থ বা শেষ স্তবক। ইহাকে **গর্ভকেশর**ও (*Pistil*) বলে। স্ত্রীস্তবকের প্রত্যেক অংশকে **গর্ভপত্র** (Carpel) বলা হয়। প্রতিটি গর্ভপত্র
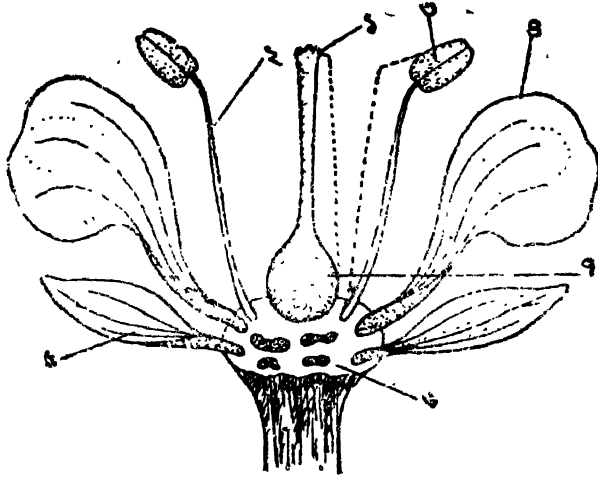
২১নং চিত্র

রেখাচিত্রের দ্বারা একটি আদর্শ ফুলের বিবিধ অঙ্গ দেখানো হইতেছে।
১, গর্ভপত্র (carpel) ২, পুংদণ্ড (filament); ৩, পুংকেশর (stamen); ৪, পাপড়ি (petals); ৫, বৃত্যাংশ (sepals); ৬, পুষ্পাক্ষ (thallamus); ৭, ডিম্বাশয় (ovary)।

আকারে লম্বা এবং ইহা গোলাকার, মধ্যভাগ সরু নলের মত, শীর্ষদেশ সাধারণতঃ প্রসারিত। গর্ভপত্রের তলদেশকে **ডিম্বাশয়** (*Ovary*), মধ্যভাগকে **গর্ভদণ্ড** (*Style*) এবং শীর্ষদেশকে **গর্ভমুণ্ড** (*Stigma*) বলে। ডিম্বাশয়ের ভিতরেই ডিম্বকের উৎপত্তি হয়।

ফুলের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা (Function of the flowering parts) :

কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের বৃতি সমস্ত কুঁড়িটিকে আবৃত করিয়া রাখে। তদ্দ্বারা বৃতি ফুলের ভিতরকার স্তবকগুলিকে তাপ, শৈত্য ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে। কতকগুলি ফুলের বৃতির উপর কাঁটা বা গ্রন্থিরোম জন্মায় এবং ইহার দ্বারা বৃতি ফুলটিকে শাকাশী প্রাণী হইতে রক্ষা করিতে পারে। কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের দলমণ্ডল পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবককে তাপ, শৈত্য এবং বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে। দলমণ্ডলের পাপড়িগুলির আকার বড় ও প্রসারিত হয়। পাপড়িগুলি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করায় ইহারা কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদের আকৃষ্ট করে। আবার অনেক

ফুলের পাপড়িতে মধুর ও মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। এই গন্ধের উন্মাদনায় পতঙ্গগুলি ফুলের দিকে আকৃষ্ট হয়। এইভাবে পাপড়িগুলি পরোক্ষভাবে পতঙ্গের দ্বারা ফুলের **পরাগ-সংযোগে** (*Pollination*) সাহায্য করে। পুংস্তবকে পুংকেশর ফুলের বংশবৃদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ। পুংকেশরের পরাগধানীর ভিতর পরাগরেণু হইতেই পুংজনন নিউক্লিয়সের উৎপত্তি হয়। স্ত্রীস্তবকের ডিম্বাশয়ের মধ্যে **ডিম্বক** (*Ovule*) জন্মায়। ডিম্বক বংশবৃদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ এবং প্রজনন-প্রক্রিয়ার অপর অংশীদার। ডিম্বকের ভিতরে **ডিম্বাণুর** (*Ovum*) উৎপত্তি হয়।

পুংজনন নিউক্লিয়স এবং ডিম্বাণুর সংযোগ ও মিলনের ফলেই বীজের সৃষ্টি হয়। বীজ উদ্ভিদের বংশবিস্তারের বাহক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৃতি ও দলমণ্ডল ফুলের আবশ্যকীয় অঙ্গ হইলেও অপরিহার্য অঙ্গ নহে। কারণ ইহারা সক্রিয়ভাবে বীজগঠনে অংশ গ্রহণ করে না। কিন্তু উহারা পুংস্তবককে রক্ষা করে। বৃতি ও দলমণ্ডলকে সেইজন্য সাহায্যকারী স্তবক বা অতিরিক্ত স্তবক (*Accessory whorl*) বলা হয়। আবার পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবকগুলি উদ্ভিদের বংশবিস্তারের জন্য অপরিহার্য অর্থাৎ ইহারা বীজগঠনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করায় ইহাদের জনন স্তবক বা **অপরিহার্য স্তবক** (*Essential whorl*) বলা হয়।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের কতকগুলি ফুলে বৃতি ও দলমণ্ডলগুলিকে পৃথকভাবে দেখা যায় না। এই দুইটি স্তবক সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হইয়া একটি স্তবকে পরিণত হয়। এই একত্রিত স্তবককে **পুষ্পপুট** (*Perianth*) বলে ; যথা—রজনীগন্ধার ফুল। যখন ফুলের মধ্যে উপরি-উক্ত চারিটি স্তর বিদ্যমান থাকে, তখন উক্ত ফুলটিকে **পূর্ণাঙ্গ ফুল** (*Complete flower*) বলা হয়। যদি কোন ফুলে যে-কোন একটি স্তবক না জন্মায়, সেই ফুলকে তখন **অসম্পূর্ণ ফুল** (*Incomplete flower*) বলা হয়। জবা, ধুতুরা প্রভৃতি গাছের ফুলগুলিকে পূর্ণাঙ্গ ফুলের উদাহরণ এবং রজনীগন্ধা, কুমড়া প্রভৃতি গাছের ফুলগুলিকে অসম্পূর্ণ ফুলের উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হয়। ফুলের যখন পুংকেশর ও গর্ভপত্র-দুই-ই থাকে, তখন এইরূপ ফুলগুলিকে **উভয়লিঙ্গ** (*Monoclinous* or *Harmaphrodite* or *Bisexual*) বলা হয়। আবার যখন যে-সমস্ত ফুলের পুংকেশর অথবা গর্ভপত্র থাকে, তখন সেইরকম ফুলগুলিকে **একলিঙ্গ** (*Diclinous* or

Unisexual) বলা হয়। জবা, ধুতুরা, তুলসী, মূলা, সরিষা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুল উভয়লিঙ্গের উদাহরণ। সেইরূপ কুমড়া, শশা, পেঁপে, ডালিম প্রভৃতি

২২নং চিত্র

বিবিধ প্রকারের ফুল।

ক, উভয়লিঙ্গ ফুল (জবা) ; খ, পুং-পুষ্প (কুমড়া) ; গ, স্ত্রী-পুষ্প (কুমড়া)।

উদ্ভিদের ফুল একলিঙ্গের উদাহরণ। ফুলে যখন কেবলমাত্র পুংকেশর থাকে এবং গর্ভপত্র আদৌ থাকে না, তখন সেইরূপ ফুলকে **পুংপুষ্প** (*male* or

staminate flower) বলা হয়। আবার ইহার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ যখন ফুলে কেবলমাত্র গর্ভপত্র থাকে এবং পুংকেশর আদৌ জন্মায় না, তখন সেইরূপ ফুলকে **স্ত্রী-পুষ্প** (*female* or *pistillate flower*) বলে। কোন কোন ফুলে পুংকেশর ও গর্ভপত্র উভয়ই থাকে না। সেইরূপ ফুলকে **ক্লীব-পুষ্প** (*neuter flower*) বলা হয়। সুতরাং একলিঙ্গ এবং ক্লীব-পুষ্পগুলি অসম্পূর্ণ পুষ্পের অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলি গাছে পুং-পুষ্প এবং স্ত্রী-পুষ্প উভয়ই ফুটিতে দেখা যায়; যেমন—কুমড়া, শশা, লাউ গাছের ফুল। এইরূপ গাছকে **সহবাসী** (*Monoecious. Mono* = one ; *cikos* = house) বলে। আবার কতকগুলি গাছে কেবলমাত্র পুং-পুষ্প অথবা স্ত্রী-পুষ্প জন্মায়; যেমন—তালগাছের ফুল। এইরূপ গাছগুলিকে **ভিন্নবাসী** (*dioecious*) বলা হয়। এমনও দেখা গিয়াছে যে, একই গাছে পুং-পুষ্প, স্ত্রী-পুষ্প ও উভয়লিঙ্গ-পুষ্প এবং সময় সময় ক্লীব-পুষ্পও জন্মাইতে দেখা যায়; যেমন—আমগাছের মুকুলে বিবিধ প্রকারের ফুল। এইরূপ বিচিত্র গাছকে **মিশ্রবাসী** (*polygamous*) বলা হয়। কোন ফুলের প্রত্যেকটি স্তবকের অংশগুলি যখন আকারে সমান হয়, তখন সেইরকমের ফুলগুলিকে **সমাঙ্গ** (*regular*) ফুল বলা হয়; যেমন—জবা, ধুতুরা, শিয়ালকাঁটা ও আতা ইত্যাদি গাছের ফুল। আবার যখন কোন ফুলের প্রত্যেকটি স্তবকের অংশগুলি আকারে সমান হয় না, তখন সেই রকমের ফুলগুলিকে **অসমাঙ্গ** (*irregular*) বলে; যেমন—জংলীমটর, ছোলা, বক, অতসী ইত্যাদি উদ্ভিদের ফুল।

প্রতিসাম্য (**symmetry**) অনুসারে ফুল আবার তিন প্রকারের; যথা—(১) **বহুপ্রতিসম** (*actinomorphic*): কোন ফুলকে যখন উহার কেন্দ্রের মধ্য দিয়া দুই সমান অংশে বহুবার ভাগ করা যায়, তখন সেইরূপ ফুলগুলিকে বহুপ্রতিসম বলে; যেমন—জবা ও সরিষা উদ্ভিদের ফুল। সাধারণতঃ বহুপ্রতিসম ফুলই বেশী। (২) **একপ্রতিসম** (*Zygomorphic*): কোন ফুলকে যখন উহার কেন্দ্রের মধ্য দিয়া কেবলমাত্র একবার দুই সমান ভাগে ভাগ করা যায়, তখন এইরূপ ফুলকে এক প্রতিসম বলা যায়; যেমন—বক, অতসী ও মটর গাছের ফুল। (৩) **অপ্রতিসম** (*Asymmetrical*): কোন ফুলকে যখন উহার কেন্দ্রের মধ্য দিয়া কিছুতেই সমান দুই অংশে ভাগ করা যায় না, তখন এইরূপ ফুলগুলিকে অপ্রতিসম বলা হয়; যেমন—সর্বজয়া, রাস্না ইত্যাদি উদ্ভিদের ফুল।

ফুলের প্রত্যেক স্তবক-অংশের সংখ্যা অনুসারে উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ বিবিধ ফুলকে এক একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এমন কতকগুলি ফুল দেখা যায়, যাহাদের প্রত্যেক স্তবক-অংশের সংখ্যা (যেমন—বৃত্যংশ, পাপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভপত্র) তিন বা তিনের কোন গুণিতক (multiple of three) হয়, তখন সেইরূপ ফুলগুলিকে **ত্র্যংশক** (*trimerous*) বলা হয়। ত্র্যংশক ফুলের মত **চতুঃশক** (*tetramerous*) এবং **পঞ্চশক** (*Pentamerous*) ফুলও প্রচুর দেখা যায়। সাধারণতঃ চতুঃশক ও পঞ্চশক ফুল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।

পুষ্পাক্ষের উপর পুষ্পপত্রের সন্নিবেশ
(Insertion of Floral leaves on the Thalamus)

তোমরা জান, পুষ্পাক্ষ হইতেছে মঞ্জরীদণ্ডের স্ফীত ও প্রসারিত অগ্রাংশ। পুষ্পাক্ষের উপর ফুলের চারিটি স্তবক বা পুষ্পপত্র সজ্জিত থাকে।
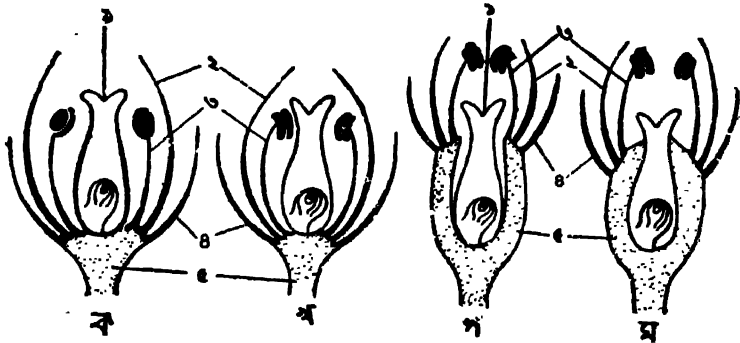
২৩নং চিত্র

ক, গর্ভপাদ (hypogynous) ; খ, গর্ভকটি (perigynous) ; গ, গর্ভশীর্ষ (epigynous)

১, গর্ভপত্র ; ২, পাপড়ি ; ৩, পুংকেশর ; ৪, বৃত্যংশ ; ৫, পুষ্পাক্ষ।

সাধারণতঃ স্তবকগুলি পুষ্পাক্ষের উপর তিনপ্রকার ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে এবং তদনুসারে ফুলগুলি তিন প্রকারের হয় ; যথা—

(১) **গর্ভপাদ** (**Hypogyny or Hypogynous** ; *Hypo* = above ; *Gynae* = female) :

এইপ্রকার ফুলের পুষ্পাক্ষ উত্তল বা মোচাকৃতি হয়। পুষ্পাক্ষের সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থানে ও কেন্দ্রস্থলে গর্ভপত্র বিদ্যমান থাকে। গর্ভপত্রের নিম্নে পুংকেশর, পাপড়ি, বৃত্যংশ পর্যায়ক্রমে সর্পিলভাবে বা আবর্তভাবে সজ্জিত থাকে। ফুলে

যখন পুষ্পপত্র বা স্তবকগুলি সন্নিবিষ্ট থাকে, তখন উহার গর্ভপত্রের ডিম্বাশয়কে (*ovary*) **অধিগর্ভ** (*superior*) বলা হয়। সরিষা, জবা, বেগুন, চাঁপা, ধুতুরা, আদা ইত্যাদি গাছের ফুলগুলি গর্ভপাদ গোষ্ঠীভুক্ত।

(২) **গর্ভকটি** (**Perigyny or Perigynous** ; *Peri* = middle) :

এইপ্রকার ফুলের পুষ্পাক্ষ হয় চ্যাপটা, নয় পেয়ালার মত গহ্বরযুক্ত। গর্ভপত্র পুষ্পাক্ষের মাঝে থাকে এবং পুষ্পাক্ষের কানার উপর পুংকেশর, পাপড়ি ও বৃত্যংশ পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট থাকে। এইরূপ ফুলের ডিম্বাশয়কে অধিগর্ভ বলা হয়। মটর, বক, গোলাপ ইত্যাদি উদ্ভিদের ফুলও গর্ভকটি গোষ্ঠীভুক্ত।

(৩) **গর্ভশীর্ষ** (**Epigyny or Epigynous** ; *Epi* = below) :

এই ধরনের ফুলের পুষ্পাক্ষ সম্পূর্ণ পেয়ালার মত গহ্বরযুক্ত এবং গর্ভপত্রটি পেয়ালার ভিতরে পুষ্পাক্ষের সহিত সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত থাকে; কেবলমাত্র গর্ভপত্রের শীর্ষভাগ দেখা যায়। পুংকেশর, পাপড়ি ও বৃত্যংশ পর্যায়ক্রমে গর্ভপত্রের উপরিভাগে সজ্জিত থাকে। কুমড়া, সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি গাছের ফুলগুলি গর্ভশীর্ষ গোষ্ঠীভুক্ত। এইরূপ ফুলের ডিম্বাশয়কে **অধঃগর্ভ** (*inferior*) হয়।

বৃতি

(Calyx)

আগেই বলা হইয়াছে যে, ফুলের সবচেয়ে বাহিরের স্তবক বা পুষ্পপত্র হইতেছে বৃতি এবং উহা বৃত্যংশ দিয়া গঠিত। সাধারণতঃ বৃত্যংশগুলি সবুজ রঙের হয়। কিন্তু কখনও কখনও উজ্জ্বল রঙেরও হয়; যেমন—কৃষ্ণচূড়া ফুলের বৃত্যংশ। এইরূপ বৃত্যংশকে **দলসদৃশ** (*petaloid*) বলা হয়। কতকগুলি ফুলের বৃত্যংশ ফুলটি ফলে পরিণত হইবার পর হাল্কা শুঁয়ায় পরিণত হয়। এইরূপ শুঁয়াকে **প্যাপাস** (*pappus*) বলা হয়। ইহা ফল-বিস্তারে সাহায্য করে। সূর্যমুখী, ডালিয়া, গাঁদা প্রভৃতি গাছের ফলে প্যাপাস দেখা যায়।

যখন বৃতির বৃত্যংশগুলি সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকে, তখন এইরূপ বৃতিকে **বিযুক্তবৃতি** (*polysepalous*) বলা হয়; যেমন—কুমড়া ফুলের পাতার মত (leafy) পৃথক পৃথক বৃত্যংশ। আবার কোন কোন ফুলের বৃতির বৃত্যংশগুলি

পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটি **বৃতিনল** (*Calyx-tube*) উৎপন্ন করে। এইরূপ বৃতিকে **যুক্তবৃতি** (*Gamo-sepalous*) বলা হয়। যুক্তবৃতি বৃত্যংশের সংখ্যা জানিতে হইলে বৃতির উপরকার **বৃতিখণ্ডগুলি** (*calyx-lobes*) গণনা করিলেই জানা যায়।

সূর্যমুখী ফুলের বৃতি **শল্কে** (*scale*) পরিণত হয়। আবার পাণিফলের বৃতি **কাঁটায়** (*spine*) পরিণত হয়।

বৃতির স্থিতি (Duration of Calyx) : ফুলের বৃতি, আয়ু বা স্থিতি নানা উদ্ভিদে নানাপ্রকার। কোন কোন গাছের ফুল প্রস্ফুটিত হইবার আগেই উহার বৃতি ঝরিয়া পড়ে। আবার কোন কোন গাছের ফুল ফলে পরিণত হইবার পরেও উহার বৃতি সুন্দর ও সতেজ থাকে। সুতরাং বৃতির স্থিতি উদাহরণ-সাপেক্ষ। যখন ফুল ফুটিবার আগেই বৃতি ঝরিয়া পড়ে, তখন সেইরূপ বৃতিকে **আশুপাতি** (*Cabucus*) বলা হয়; যেমন—আফিং, শিয়ালকাঁটা, চাঁপা ইত্যাদি ফুলের বৃতি। আবার যখন ফুলের বৃতি **গর্ভাধানের** (*fertilization*) পর পাপড়ির সঙ্গে ঝরিয়া পড়ে, তখন সেইরূপ বৃতিকে **বৃতিমোচী** (*Deciduous*) বলে; যেমন—পদ্মফুলের বৃতি। ফুল ফলে পরিণত হইবার পরেও যখন উহার বৃতি তলদেশে থাকে, তখন এইরূপ বৃতিকে **স্থায়ী** (*Persistant*) বলে; যেমন—বেগুন, টমাটো ও লঙ্কা ফলের তলাকার বৃতি।

আবার আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন ফুলের বৃতি যে কেবলমাত্র ফলের তলদেশে বিদ্যমান তাহা নয়, ইহা ফলের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং ফলের অংশরূপে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া স্ফীত হয়। চালতে, টেপারি প্রভৃতি ফলের যে অংশ আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, তাহা বৃতির অংশ এবং আসল ফল আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকি। এইরূপ বৃতিকে **বৃদ্ধিশীল** (*accrecent*) বলা হয়। বৃতি প্রধানতঃ ফুলের রক্ষাকর অঙ্গ।

দলমণ্ডল

(Corolla)

দলমণ্ডল ফুলের দ্বিতীয় স্তবক বা পুষ্পপত্র। ইহার প্রত্যেকটি অংশকে পাপড়ি বলে। আগেই বলা হইয়াছে, পাপড়ি সাধারণতঃ দেখিতে গাঢ় উজ্জ্বল রঙের হয় এবং প্রায়ই সুবাসিত হয়। ইহাদের দ্বারাই কীট-পতঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া

ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ইহার দ্বারা ফুলে ফুলে পরাগ-সংযোগ সাধিত হয়। ইহাই দলমণ্ডলের প্রধান কার্য। ইহার দ্বিতীয় কার্য হইল কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের অপরিহার্য অঙ্গগুলিকে রক্ষা করা। বৃত্যংশের মত কতকগুলি ফুলের পাপড়ি সবুজ ও সরু পাতার মত হয়। এইরূপ পাপড়িকে **বৃতিসদৃশ** (*Sepaloid*) বলা হয়; যেমন—দেবদারু ও আতা গাছের ফুলের পাপড়ি। যখন দলমণ্ডলের পাপড়িগুলি মুক্ত থাকে বা বিযুক্ত থাকে, তখন ইহাদের **বিযুক্তদল** (*Polypetalous*) বলা হয়। আবার যখন দলমণ্ডলের পাপড়িগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে, তখন পাপড়িগুলিকে **যুক্তদল** (*Gamopetalous*) বলে। যুক্তদলের অগ্রাংশকে প্রসারিত অংশকে **দলখণ্ড** (*Corolla lobes*) বলা হয়। উহার নিম্নভাগের সরু নলকে **দলনল** (*Corolla tube*) বলে। প্রসারিত দলখণ্ড এবং দলনলের সংযোগস্থলকে **কণ্ঠ** (*Throat*) নামে অভিহিত করা হয়। দলমণ্ডলের পাপড়িগুলি যখন যুক্ত থাকে, তখন প্রত্যেকটি পাপড়ির দুইটি অংশ থাকে। উহার প্রসারিত অংশকে **দলবাহু** (*Limb*) এবং লম্বা ও সরু অংশকে উহার **দণ্ড** (*Claw*) বলা হয়। যুক্তদল পাপড়ির কণ্ঠদেশে মাঝে মাঝে কতকগুলি ফুলে শল্ক, রোম বা ছোট ছোট উপখণ্ডের উৎপত্তি হয়। এইরূপ অঙ্গগুলিকে **মুকুট** (*Corona*) বলা হয়; যেমন—করবী, ঝুমকো ইত্যাদি ফুলে দেখা যায়। মুকুট ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং প্রত্যক্ষভাবে পরাগ-সংযোগ ক্রিয়ায় সাহায্য করে।

দলমণ্ডলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আকার
(A Few Forms of Corolla)

দলমণ্ডলকে আকার অনুসারে প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করা যায়; যথা—

(ক) **সমাঙ্গ ও বিযুক্ত দলবিশিষ্ট** (**Regular and polypetalous**): এইরূপ দলমণ্ডলের পাপড়িগুলি আকারে সমান এবং প্রত্যেকেই বিযুক্ত সমাঙ্গ। বিযুক্তদলবিশিষ্ট দলমণ্ডল আবার দুই প্রকারের; যথা—(১) **ক্রুসাকার** (*Cruciform*): এইরূপ ফুলের পাপড়ি ক্রুসের মত আড়াআড়িভাবে থাকে। মূলা, সরিষা ইত্যাদি উদ্ভিদের ফুলের দলমণ্ডলগুলি ক্রুসাকার। (২) **গোলাপবৎ** (*Rosaceous*): এইরূপ ফুলের পাপড়ি

দণ্ডহীন (*clawless*) হয়। ফুলের পাঁচটি পাপড়ি বৃত্তাকারে ছড়াইয়া থাকে। গোলাপ, চা ইত্যাদি উদ্ভিদ্ ফুলের দলমণ্ডল গোলাপবৎ।

(খ) **সমাঙ্গ যুক্তদলবিশিষ্ট** (**Regular and Gamopetalous**): এরূপ দলমণ্ডলের পাপড়িগুলির আকার সমান হয় কিন্তু প্রত্যেক
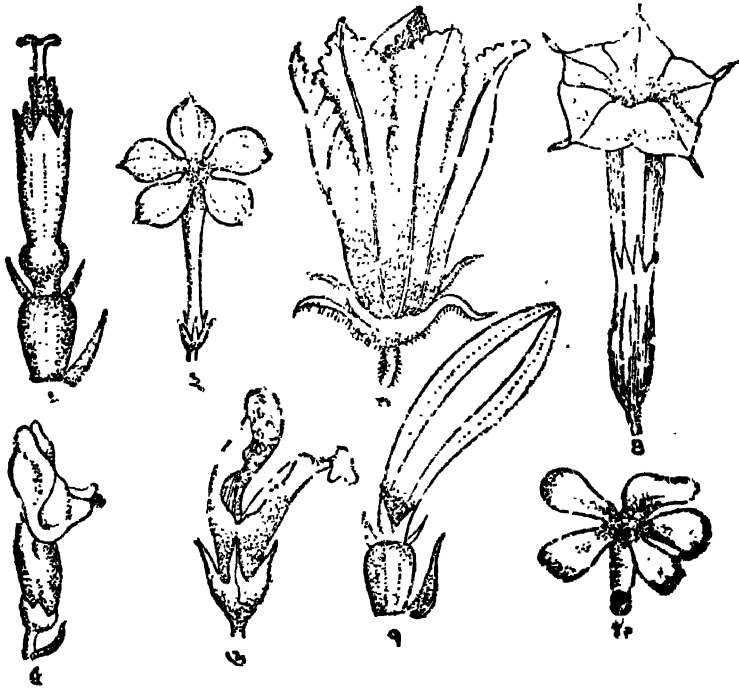
২৪নং চিত্র

বিভিন্ন ফুলের বিবিধ প্রকারের দলমণ্ডল।

১। নলাকার; ২। রঞ্জনাকার; ৩। ঘণ্টাকার; ৪। ধুতুরাকার; ৫। উপমুখ; ৬। ওষ্ঠাধরাকৃতি; ৭। জিহ্বাকার; ৮। চক্রাকার।

পাপড়িটি পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত। এইরূপ দলমণ্ডলবিশিষ্ট ফুল নানা প্রকারের হয় এবং নিম্নে কয়েক প্রকার ফুলের উদাহরণ দেওয়া হইল; যথা—

১। **নলাকার** (**Tubular**): এইরূপ ফুলের পাপড়িগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত এমনভাবে যুক্ত হয়, যাহাতে ইহাদের মিলিত আকার একটি

নলে পরিণত হয়। সূর্যমুখী, গাঁদা ইত্যাদির মধ্যপুষ্পিকাগুলি (*Disc florets*) নলাকার দলমণ্ডলের উদাহরণ।

২। **রঙ্গনাকার (Hypocrateriform) :** এইরূপ ফুলের দলনলটি সরু ও লম্বা হয় এবং দলখণ্ডগুলি গোলাকার প্রসারিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দলখণ্ডগুলি (limbs) যুক্ত থাকে। রঙ্গন, টগর, তরুলতা, নয়নতারা ইত্যাদি ফুলের দলমণ্ডল রঙ্গনাকার।

৩। **ঘণ্টাকার (Campanulate) :** এইরূপ ফুলের দলমণ্ডলগুলির পাপড়ি একত্রিত হইয়া ঠিক পূজার ঘণ্টার মত আকার ধারণ করে; যেমন—কুমড়া, শসা ও লাউগাছের দলমণ্ডল।

২৫নং চিত্র
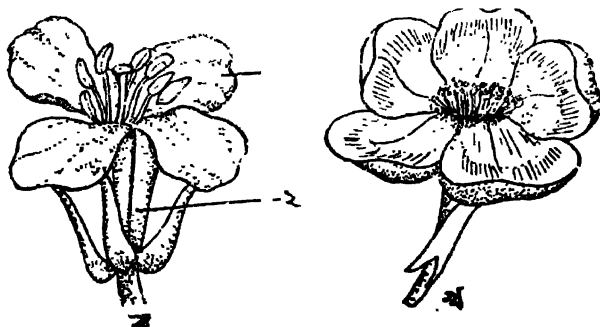
বিভিন্ন ফুলের বিবিধ প্রকারের দলমণ্ডল।

ক। ক্রুসাকার; খ। গোলাপবৎ।

৪। **ধুতুরাকার (Infundibulum) :** এইরূপ ফুলের দলনলটি সরু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে যুক্তদলখণ্ডের দ্বারা গোলাকারে প্রসারিত হয়। আকারটি ফানেল-সদৃশ। ধুতুরা, বেলপাতা, কলমিশাক প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলের দলমণ্ডল ইহার উদাহরণ।

৫। **চক্রাকার (Rotate) :** এইরূপ দলমণ্ডলের দলনলটি খুবই ছোট হয় এবং যুক্তদলখণ্ডগুলি দলনলের সহিত লম্বাভাবে প্রসারিত থাকে; যথা—বেগুন ও শিউলি গাছের ফুলের দলমণ্ডল।

(গ) অসমাঙ্গ ও বিযুক্তদলবিশিষ্ট (Irregular and polypetalous) : এইরূপ দলমণ্ডলের পাপড়ির আকার সমান হয় না এবং পাপড়িগুলিও বিযুক্ত। এইপ্রকার দলমণ্ডলের একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া হইল ; যথা—(১) প্রজাপতিসদৃশ (*Papilionaceous* ; *papilion* = butterfly) : এইরূপ ফুলের পাপড়িগুলি এমনভাবে সজ্জিত থাকে যাহাতে দূর হইতে ফুলটিকে দেখিলে প্রজাপতির মত মনে হয়। এইপ্রকার ফুলে পাঁচটি অসমান পাপড়ি থাকে। প্রথম পাপড়িটি সর্বাপেক্ষা বড় এবং প্রসারিত। ইহা অন্যান্য পাপড়িগুলিকে বেষ্টন করিয়া থাকে। প্রথম পাপড়িটিকে ধ্বজা (*Vexillum* or *Standard*) বলা হয়। ধ্বজার ভিতরে পাশাপাশি ডানার মত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাপড়িগুলিকে দেখা যায় ; এই দুইটি পাপড়ি প্রথম পাপড়ির চেয়ে

২৬নং চিত্র
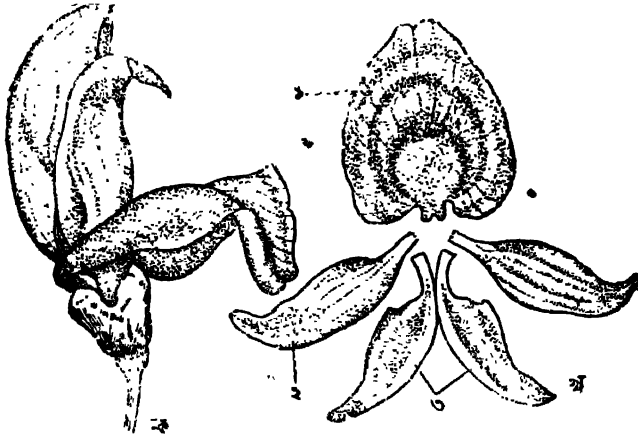
বিভিন্ন ফুলের বিবিধ প্রকারের দলমণ্ডল।

ক, প্রজাপতিসদৃশ দলমণ্ডল (বকফুল) ; খ, প্রজাপতিসদৃশ দলমণ্ডলের পাপড়িগুলির অবস্থান। ১, ধ্বজা (standard) ; ২, পক্ষ (wing) ; ৩, তরীদল (keel)।

অপেক্ষাকৃত ছোট। এই দুইটি পাপড়িকে পক্ষ (*Wings* or *Alae*) বলা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাপড়ির মধ্যবর্তী স্থানে চতুর্থ ও পঞ্চম পাপড়ি বিদ্যমান। এই দুইটি পাপড়ি এমনভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত আটকাইয়া থাকে, যাহা দেখিতে নৌকার মত মনে হয়। সেইজন্য চতুর্থ ও

পঞ্চম পাপড়িগুলিকে **তরীদল** (*Keel* or *Carina*) বলে। তরীদল পাপড়ি দুইটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। অতসী, অপরাজিতা, মটর ও বকুল ফুলের দলমণ্ডলগুলি ইহার উদাহরণ।

(ঘ) **অসমাঙ্গ ও যুক্তদলবিশিষ্ট** (**Irregular and Gamopetalous**) **:** এইরূপ দলমণ্ডলের পাপড়ির আকার সমান হয় না এবং পাপড়িগুলি নানাপ্রকার অসমাঙ্গ ও যুক্তদলবিশিষ্ট। দলমণ্ডল প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত ; যথা—

১। **ওষ্ঠাধরাকৃতি** (**Bilabite**) **:** এইরূপ দলমণ্ডলে পাঁচটি পাপড়ি থাকে। ইহারা মিলিত হইয়া দুইটি ওষ্ঠাধর গঠন করে। প্রথম দুইটি পাপড়ি যুক্ত হইয়া উপরের ওষ্ঠাধরের আকার দেয় এবং অবশিষ্ট তিনটি পাপড়ির মিলন নিম্নের ওষ্ঠাধর গঠন করে। এই দুই ওষ্ঠাধরের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা থাকে। তুলসী, রক্তদ্রোণ, শ্বেতদ্রোণ ও বাসক ফুলের দলগুলি ইহার উদাহরণ।

২। **জিহ্বাকার** (**Ligulate**) **:** এইরূপ ফুলের দলমণ্ডলগুলির দলনলটি সরু এবং ইহার যুক্তদলগুলি জিহ্বার মত চওড়া ও প্রসারিত। সূর্যমুখী ও গাঁদা ফুলের প্রান্তপুষ্পিকা (ray-florets) ইহার উদাহরণ।

৩। **উপমুখ** (**Personate**) **:** এইরূপ ফুলের দলমণ্ডলের আকৃতি কিছুটা ওষ্ঠাকৃতির মত। কিন্তু উপরের ও নীচের ওষ্ঠাধরের মধ্যে ভাঁজ থাকে, ফাঁক থাকে না। নীচের ওষ্ঠাধর হইতে একটি অভিক্ষেপের দ্বারা মুখের ফাঁকা স্থানটি বন্ধ হইয়া যায়। এই অভিক্ষেপকে **প্যালেট** (*Palate*) বলা হয়। বাসন্তী, স্ন্যাপ ড্রাগন প্রভৃতি ফুলের দলমণ্ডল ইহার উদাহরণ।

দলমণ্ডল (Corolla)
সমাঙ্গ
(Regular)
অসমাঙ্গ
(Irregular)
বিযুক্তদল
(Polypetaloue)
যুক্তদল
(Gamopetalous)
বিযুক্তদল
যুক্তদল
ক্রুসাকার
(Cruciform)
মূলা
গোলাপবৎ
(Rosaceous)
গোলাপ
প্রজাপতি-সদৃশ
(Papilionaceous)
বক
জিহ্বাকার
(Ligulate)
সূর্যমুখী
প্রান্তপুষ্পিকা
ওষ্ঠাধরাকৃতি
(Bilabiate)
রক্তদ্রোণ
উপমুখ
(Personate)
বাসন্তী
নলাকার
(Tubular)
সূর্যমুখী
মধ্যপুষ্পিকা
ঘণ্টাকার
(Campanulate)
কুমড়া
ধুতুরাকার
(Infundibulum)
ধুতুরা
চক্রাকার
(Rotate)
বেগুন
রঙ্গনাকার
(Hypocrateriform)
রঙ্গন
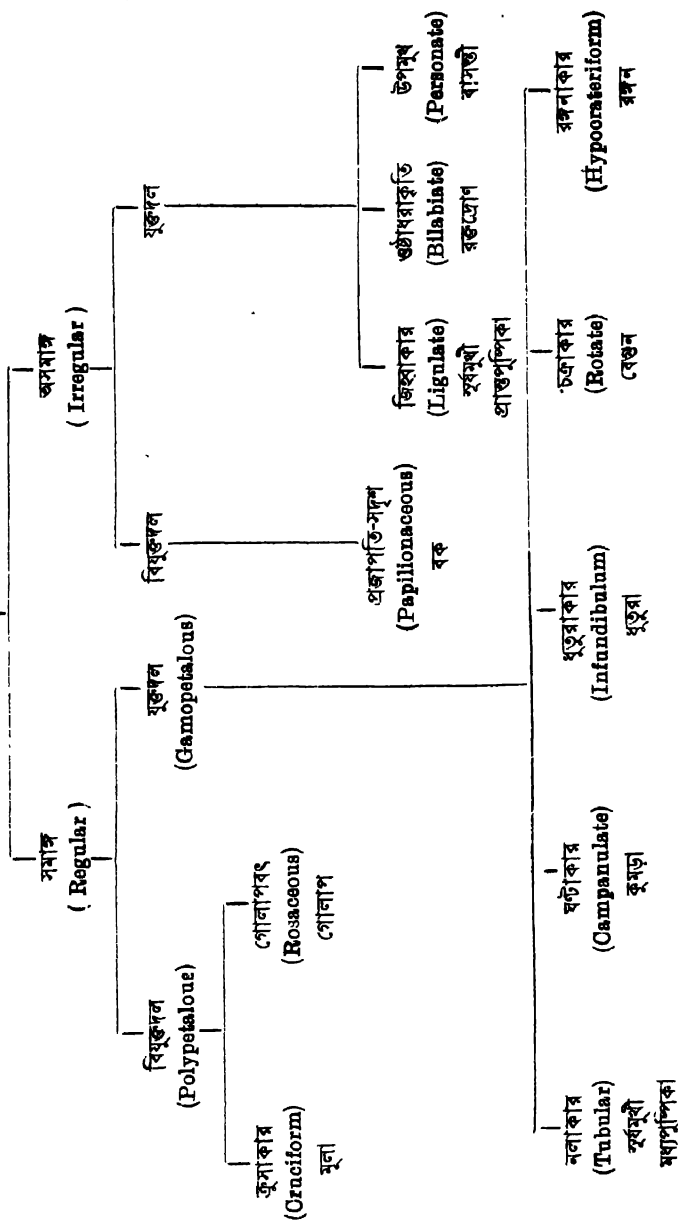
পুংস্তবক

(Androecium)

তোমরা জান পুংস্তবক ফুলের তৃতীয় স্তবক। পুংস্তবক পুংকেশর দিয়া গঠিত। ইহা একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ এবং ইহা যৌন-জননের অংশীদার।
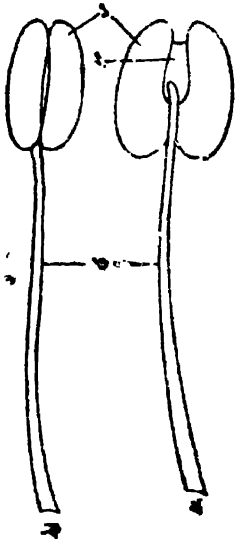
২৭নং চিত্র
পুংকেশরের বিবিধ অঙ্গ দেখান হইতেছে।
ক, পুংকেশরের পৃষ্ঠদিক ; ১, পরাগথলি ; খ, পুং-কেশরের অঙ্কীয় দিক ; ২, যোজক কলা ; ৩, পুংদণ্ড।

প্রত্যেকটি **পুংকেশরে** (*Stamen*) প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চল আছে ; সরু, লম্বা নলের মত অঞ্চলটিকে **পুংদণ্ড** (*Filament*) বলে। পুংদণ্ডের অগ্রভাগের গোলাকার বা থলির মত অংশটিকে **পরাগধানী** (*Anther*) বলা হয়। যে-সকল পুংকেশরে পুংদণ্ড থাকে না, যেমন—কনকচাঁপা ফুলে, তখন এইরূপ ফুলের পুংকেশরকে **বন্ধ্যা পুংকেশর** (*Staminode*) বলা হয়। সাধারণতঃ পরাগধানী দুইটি লম্বাকৃতি খণ্ডে (pollen lobe) গঠিত। এই খণ্ড দুইটি পরস্পর কয়েক স্তর কলার (tissue) দ্বারা লম্বালম্বিভাবে যুক্ত থাকে। এইরূপ সংযোজক কলাকে **যোজক কলা** (*Connective tissue*) বলা হয়। পরাগধানীর প্রতিটি খণ্ড আবার ভিতরে আড়াআড়িভাবে দুইভাগে বিভক্ত হয়। সুতরাং একটি পরাগধানীতে চারিটি কুঠরী থাকে। কুঠরীগুলিকে **পরাগথলি** (*Pollen-sac*) বলে। প্রতিটি পরাগথলির ভিতর অসংখ্য হরিদ্রাভ রঙের বা শ্বেতবর্ণের ধূলার সজীব পদার্থ থাকে। ইহাদিগকে **পরাগরেণু** (*Pollen grains*) বলা হয়। পরাগরেণু হইতেই পুংজনন-কোষের জন্ম হয়। এমন কতকগুলি ফুল আছে, যাহাদের পুংকেশরের পরাগধানীতে একটিমাত্র পরাগখণ্ড ও দুইটি পরাগথলি থাকে। পুংদণ্ডটি নানা ফুলে নানা ভঙ্গিতে পরাগধানীতে অবস্থান করে। যখন পুংদণ্ড পরাগধানীর সর্বনিম্নে সংযুক্ত থাকে, তখন এইরূপ

পরাগধানীকে **পাদলগ্ন** (*Innate* or *Basifixed*) বলা হয় ; যেমন—সরিষার পরাগধানী। আবার যখন পুংদণ্ড পরাগধানীর সমস্ত পৃষ্ঠরেখার সহিত সংযুক্ত থাকে, তখন এইরূপ পরাগধানীকে **পৃষ্ঠলগ্ন** (*Adnate* or *Dorsifixed*) বলা হয় ; যেমন—শালুকের পরাগধানী। কতকগুলি ফুলের পুংকেশরের পুংদণ্ড পরাগধানীর পৃষ্ঠরেখার মধ্যস্থলে একটি বিন্দুর দ্বারা যুক্ত থাকে। এইরূপ ফুলের পুংদণ্ডগুলি বেশ সরু ও লম্বা এবং পুংকেশরটি ফুলের পাপড়ি-আবরণ অতিক্রম করিয়া বায়ুতে ঝুলিয়া থাকিতে দেখা যায়। পুংদণ্ডের সহিত পরাগধানীর এই অভিনব সংযোগপন্থাকে **সর্বমুখ** (*Versatile*) বলা হয়। ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে এইরূপ পুংকেশর ইহার উদাহরণ।
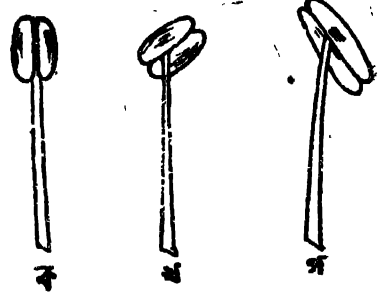
২৮নং চিত্র
পুংদণ্ডের সহিত পরাগধানীর বিবিধ সংযোগ। ক, পাদলগ্ন (Basifixed) ; খ, পৃষ্ঠলগ্ন (Dorsifixed) ; গ, সর্বমুখ (Versatile)।

পুংকেশরের দৈর্ঘ্য সর্বদা সমান হয় না। তুলসী, শ্বেতদ্রোণ প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে চারিটি পুংকেশর থাকে। এইরূপ চারিটি পুংকেশরের মধ্যে ভিতরকার দুইটি পুংকেশর লম্বায় ছোট এবং বাহিরের দুইটি লম্বায় বড় হয়। পুংকেশরের এই প্রকারের আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যকে **দীর্ঘদ্বয়ী** বা **ডিডাইনামাস্** (*Didynamous* ; *di*=two, *dynamous*=strength) বলা হয়। আবার এমন কতকগুলি পুংকেশরবিশিষ্ট ফুল দেখা যায়, যাহাদের ভিতরকার চারিটি পুংকেশর বড় এবং বাহিরের বাকি দুইটি পুংকেশর দৈর্ঘ্যে ছোট হয়। সাধারণতঃ সরিষা, মূলা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে এইরূপ আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট পুংকেশর দেখা যায় এবং এইপ্রকার পুংকেশরের অবস্থানকে **চতুষ্টয়ী** বা **টেট্রাডাইনামাস্** (*Tetradynamous* ; *tetra*=four) বলা হয়।

স্ত্রীস্তবক

(Gynaecium)

ফুলের চতুর্থ স্তবককে **স্ত্রীস্তবক** বা **গর্ভকেশর** (*Pistil*) বলা হয়। ইহা পুষ্পাক্ষের মধ্যস্থলে অবস্থান করে এবং গর্ভপত্রের (Carpel) দ্বারা গঠিত। পুংকেশরের ইহাও অত্যাবশ্যক অঙ্গ এবং যৌন-জনন-ক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশীদার। গর্ভপত্রের ভিতর ডিম্বক জন্মায় এবং ডিম্বকের ভিতর স্ত্রী-জনন-কোষ উৎপন্ন হয়। ইহার সহিত পুংজনন-কোষের মিলনেই বীজের উৎপত্তি হয় এবং বীজই উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির বাহক। গর্ভকেশরে এক হইতে একাধিক গর্ভপত্র থাকে। গর্ভকেশরে একটি মাত্র গর্ভপত্র থাকিলে, এইরূপ গর্ভকেশরকে **একগর্ভপত্রী** (*Monocarpellary*) বলা হয়। মটর, শিম, কালকাসিন্দা, বাবলা, তেঁতুল প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে একগর্ভপত্রী গর্ভকেশর থাকে। সেইরূপ দুইগর্ভপত্র-বিশিষ্ট গর্ভপত্রকে **দ্বিগর্ভপত্রী** (*Bicarpellary*) বলা হয়। সরিষা, মূলা, সূর্যমুখী, ধুতুরা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে দ্বিগর্ভপত্রী গর্ভকেশর বিদ্যমান। আবার যখন গর্ভকেশরে তিনটি পাত্র গর্ভপত্র থাকে, তখন এইরূপ গর্ভকেশরকে **ত্রিগর্ভপত্রী** (*Tricarpellary*) বলা হয়। কুমড়া, লাউ ও লিলি উদ্ভিদের ফুলে ত্রিগর্ভপত্রী গর্ভকেশর দেখা যায়। যদি কোন গর্ভকেশরে তিনটির চেয়ে বেশী থাকে, তখন সেইরূপ গর্ভকেশরকে **বহুগর্ভপত্রী** (*Multicarpellary*) বলা হয়। জবা, ঢেঁড়স, আতা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে বহুগর্ভকেশর দেখা যায়।

২৯নং চিত্র

পুংকেশরের আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য দেখানো হইতেছে।
ক, টেট্রাডাইনামাস্ (Tetradynamous) ;
খ, ডিডাইনামাস্ (Didynamous) ।

সাধারণতঃ গর্ভপত্র আকারে কাচের ফ্লাস্‌কের (*Flask*) মত। ইহার তিনটি অঞ্চলের মধ্যে নিম্ন অঞ্চলটি বা গোড়াটি স্থূল ও গোলাকার। এই অংশকে **ডিম্বাশয়** (*Ovary*) বলা হয়। গর্ভপত্রের মধ্য-অঞ্চলটি পুংদণ্ডের মত সরু নলের ন্যায়। ইহাকে গর্ভপত্রের **গর্ভদণ্ড** (*Style*) বলে। গর্ভদণ্ডের অগ্রভাগ প্রসারিত এবং গর্ভপত্রের এই অঞ্চলকে **গর্ভমুণ্ড** (*Stigma*) বলা হয়।

৩০নং চিত্র
গর্ভপত্রের বিবিধ অংশ দেখানো হইতেছে।
১, গর্ভমুণ্ড ; ২, গর্ভদণ্ড ; ৩, গর্ভাশয়।

গর্ভকেশরের গর্ভপত্রগুলি যখন পৃথক থাকে অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকে না, তখন এইরূপ গর্ভকেশরকে **মুক্তগর্ভপত্রী** (*Apocarpous*) বলে। আতা, চাঁপা, গোলাপ, পদ্ম প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে মুক্তগর্ভপত্রী গর্ভকেশর দেখা যায়। আবার অনেক ফুলে গর্ভকেশরে গর্ভগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে। এইরূপ যুক্তগর্ভবিশিষ্ট গর্ভকেশরকে **যুক্তগর্ভপত্রী** (*Syncarpous*) বলা হয়। জবা, সরিষা, বেগুন, কুমড়া ইত্যাদি উদ্ভিদের ফুলে যুক্তগর্ভপত্রী গর্ভকেশর দেখা যায়। যুক্তগর্ভপত্রী গর্ভকেশরে একটিমাত্র গর্ভদণ্ড ও গর্ভাশয় সৃষ্টি হয়। গর্ভাশয় কখনও কখনও এক-কুঠরীযুক্ত বা **এককোষ্ঠ** (*Unilocular*) হয়; যথা—আফিং ও পেঁপের গর্ভাশয়। সেইরূপ তুলসী প্রভৃতি ফুলের গর্ভাশয়ে দুইটি কুঠরী থাকে। বেগুনের এইরূপ গর্ভাশয়কে **দ্বিকোষ্ঠ** (*Bilocular*) বলা হয়। শতমূলী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুলের গর্ভাশয়ে তিনটি কুঠরী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাদের **ত্রিকোষ্ঠ** (*Trilocular*) গর্ভাশয় বলা হয়। যখন গর্ভাশয়ে তিনটির চেয়েও বেশী কুঠরী থাকে, তখন এইরূপ গর্ভাশয়কে **বহুকোষ্ঠ** (*Multilocular*) বলা হয়। জবা, ঢেঁড়স প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে এইরূপ গর্ভাশয় দেখা যায়।

গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ড সাধারণতঃ প্রসারিত হয়। ইহা পুষ্ট হইলে আঠালো

রস নির্গত করে গর্ভমুণ্ড নানা আকারের দেখা যায় ; যথা—আফিং ফুলে ইহা তারকাকার (*Radiate*); করবী ফুলে ইহা ডমরু-সদৃশ (*Dumb-bell shaped*); ধানের ফুলে ইহা লোমশ (*Feathery*) এবং পদ্মফুলের গর্ভমুণ্ডটি শাঁসালো গ্রন্থিযুক্ত (*Glandular*) হয়।
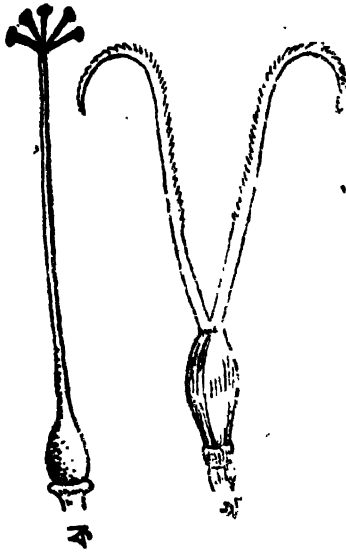
৩২নং চিত্র
গর্ভপত্রের সংযোগ দেখান হইতেছে।
ক, মুক্তগর্ভপত্রী (Apocarpous) ;
খ, যুক্তগর্ভপত্রী (Synocarpous)।

অনেক ফুলে গর্ভমুণ্ড দুইভাগে বিভক্ত দেখা যায়। এইরূপ গর্ভমুণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত (*Bifid*) বলে। ধুতুরা, বেগুন প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ড ইহার উদাহরণ। ত্রিখণ্ডিত (*Trifid*) গর্ভমুণ্ড কুমড়া ও লিলি ফুলে দেখা যায়।

সমসংযোগ ও অসমসংযোগ
(Cohesion and Adhesion)

(ক) সমসংযোগ (Cohesion):

পুংকেশরগুলি নিজেদের মধ্যে যখন যুক্ত হয়, তখন এইরূপ সংযুক্তিকে সমসংযোগ বলা হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পুংকেশরে দুইটি অঞ্চল আছে ; যথা—পুংদণ্ড ও পরাগধানী। পুংকেশরের পুংদণ্ডগুলি যখন পরস্পর যুক্ত হয়, তখন অনেকগুলি পুংকেশরের পুংদণ্ড একটি বা একাধিক গুচ্ছে (*adelphy*) পরিণত হয়। নিম্নে বিবিধ প্রকারের পুচ্ছ-সংযোগের বিবরণ দেওয়া হইল :

১। **একগুচ্ছ (Monadelphous ; Monos = one ; adelphous = bundle) :**

পুংকেশরের সকল পুংদণ্ডগুলি যুক্ত হইয়া যখন একটি পুচ্ছে পরিণত হয়,

তখন এইরূপ পুংকেশরকে একগুচ্ছ বলা হয়। একগুচ্ছ পুংকেশরে পরাগধানী-গুলি পৃথক বা যুক্ত থাকে। জবা ও কার্পাস ফুলে এইরূপ একগুচ্ছ পুংকেশর দেখা যায়।

২। **দ্বিগুচ্ছ** (**Diadelpho is**) ঃ যখন পুংকেশরের দণ্ডগুলি যুক্ত হইয়া ছুইটি প্রধান গুচ্ছে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রেও পরাগধানীগুলি যুক্ত থাকে।
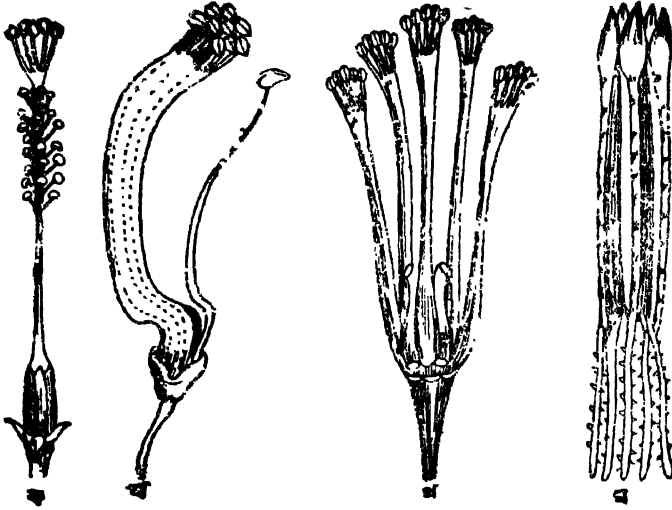
৩২নং চিত্র

পুংকেশরের সংযোগ।

ক, একগুচ্ছ। খ, দ্বিগুচ্ছ; গ, বহুগুচ্ছ; ঘ, যুক্তপরাগধানী।

অপরাজিতা, বক, মটর প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে এইরূপ দ্বিগুচ্ছ পুংকেশর দেখা যায়।

৩। **বহুগুচ্ছ** (**Polyadelphous : po'y** = *many*)—যখন পুংকেশরের দলগুলি যুক্ত হইয়া ছুইটির চেয়ে বেশী গুচ্ছে :পরিণত হয়, তখন এইরূপ পুংকেশরকে বহুগুচ্ছ পুংকেশর বলে। বহুগুচ্ছ পুংকেশরেও পরাগধানীগুলি যুক্ত থাকে। লেবু, শিমুল প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে বহুগুচ্ছ পুংকেশর দেখা যায়।

এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন ফুলের পুংকেশরে পরাগধানীগুলি পরস্পর যুক্ত থাকে, অথচ ইহাদের পুংদণ্ডগুলি পৃথক দেখা যায়। এইরূপ পরাগধানীর

সংযোগকে **যুক্তপরাগধানী** (*Syngenesious* ; *syn* = togther ; *genes* = to form) বলা হয়। কুমড়া উদ্ভিদের পুং-পুষ্পে যুক্তপরাগধানী খুবই সুস্পষ্ট দেখা যায়।

(খ) **অসমসংযোগ (Adhesion) :**

পুংকেশরগুলি যখন ফুলের অন্য কোন স্তবকের সহিত যুক্ত হয়, তখন এই
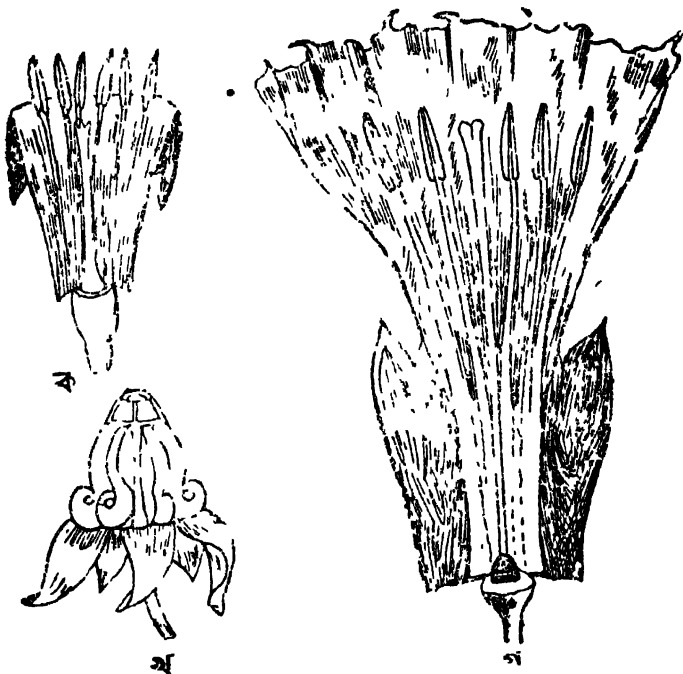
৩৩নং চিত্র

পুংকেশরের অসমসংযোগ দেখান হইতেছে।

ক, রজনীগন্ধার পুষ্পপুটলগ্ন ; খ, ধুতুরার দললগ্ন ; গ, যোষিৎপুংস্ক।

সংযুক্তিকে **অসমসংযোগ** (*Adhesion*) বলা হয়। এইরূপ অসমসংযোগ প্রধানতঃ তিন প্রকারের : (১) **পুষ্পপুটলগ্ন** (*Epyphyllous*)—পুংকেশরের পুংদণ্ডগুলি যখন ফুলের **পুষ্পপুটের** (*Perianth*) সহিত যুক্ত হয়, তখন এইরূপ অসমসংযোগকে পুষ্পপুটলগ্ন বলে ; যথা—রজনীগন্ধা, ক্রীমাম প্রভৃতি

ফুল ইহার উদাহরণ। (২) **দললগ্ন** (*Epipetalous*): পুংকেশরের যখন পুংদণ্ডগুলি ফুলের পাপড়ির সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তখন সংযোগকে দললগ্ন বলা হয়; ধুতুরা, তুলসী, রক্তদ্রোণ প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুল ইহার উদাহরণ। **যোষিৎপুংস্ক** (*Gynandrous*): পুংকেশরের পুংদণ্ড যখন গর্ভপত্রের গর্ভদণ্ডের সহিত যুক্ত দেখা যায়, তখন এইরূপ সংযোগকে যোষিৎপুংস্ক বলা হয়; আকন্দ, অর্কিড প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলগুলি ইহার উদাহরণ।

অমরাবিন্যাস
(Placentation)

গর্ভপত্র সাধারণতঃ পাতার পরিবর্তিত রূপ। পাতার দুই প্রান্ত সংযুক্ত হইয়া নলাকার গর্ভপত্রের সৃষ্টি হয়। গর্ভপত্রের মধ্যশিরাকে **পৃষ্ঠ-সন্ধি** (*Dorsal suture*) বলা হয় এবং প্রান্ত-সংযুক্তিকে **অঙ্কীয় সন্ধি** (*Ventral suture*) বলা হয়। গর্ভপত্রের সংযুক্ত কিনারায় স্থূল কলার উৎপত্তি হয়। এইরূপ স্থূল কলার উপর এক বা একাধিক **ডিম্বকের** (*Ovule*) উৎপত্তি হয়। স্থূল কলাসমষ্টিগুলিকে **অমরা** (*Placenta*) বলা হয়। ডিম্বাশয়ের ভিতরে অমরার উৎপত্তি ও নানাবিধ অবস্থানের প্রণালীকে **অমরাবিন্যাস** (*Placentation*) বলা হয়। অমরাবিন্যাস সাধারণতঃ ছয় প্রকারের হয়; যথা—

১। **প্রান্তীয়** (**Marginal**): এইরূপ অমরাবিন্যাসের ডিম্বাশয় এক-গর্ভপত্রী এবং গর্ভপত্রের অঙ্কীয় সন্ধির উপর অমরার উৎপত্তি হয়। প্রান্তীয় অমরাবিন্যাসের ডিম্বাশয় সাধারণতঃ এককোষবিশিষ্ট হয়। ছোলা, মটর, সিম, কলাই প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে এইরূপ অমরাবিন্যাস দেখা যায়।

২। **বহুপ্রান্তীয়** (**Parital**): দুই বা ততোধিক গর্ভপত্রের সংযুক্ত প্রান্তের ভিতরের দিকে যখন অমরার উৎপত্তি হয়, তখন এইরূপ অমরাবিন্যাসকে বহুপ্রান্তীয় অমরাবিন্যাস বলা হয়। ডিম্বাশয়টি প্রান্তীয় অমরাবিন্যাসের মত এককোষ্ঠবিশিষ্ট হয়। শিয়ালকাঁটা, শশা, পেঁপে ইত্যাদি ফুলে বহুপ্রান্তীয় অমরাবিন্যাস দেখা যায়। সরিষা ফুলের ডিম্বাশয় প্রথমে বহুপ্রান্তীয় হয়, পরে

উহার দুইটি অমরার মধ্যবর্তী স্থান হইতে একটি পর্দার (*replum*) সৃষ্টি হইয়া এককোষ্ঠবিশিষ্ট ডিম্বাশয়টিকে দ্বিকোষ্ঠবিশিষ্ট ডিম্বাশয়ে পরিণত করে। এইরূপে কুমড়া ফুলের ডিম্বাশয় পূর্ণাঙ্গ অবস্থার পর ত্রিকোষ্ঠে পরিণত হয়।

৩। **অক্ষীয় (Axil) ঃ** এইক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক গর্ভপত্রের কিনারাগুলি ভাঁজযুক্ত হইয়া ডিম্বাশয়ের কেন্দ্রে মিলিত হয়, এবং অক্ষ নির্মাণ করে। এইরূপ অক্ষীয়ের বাহিরের দিকে অমরার উৎপত্তি হয়। এইপ্রকার অমরাবিন্যাসকে অক্ষীয় বলা হয় এবং ইহা জবা, ঢেঁড়স, রজনীগন্ধা ও শতমূলী প্রভৃতি উদ্ভিদের ডিম্বাশয়ে দেখা যায়। এইক্ষেত্রে ইহাই উল্লেখযোগ্য যে, গর্ভপত্রের সংখ্যা অনুযায়ী ডিম্বাশয়ের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় ; যেমন—জবাফুলের পাঁচটি গর্ভপত্র থাকায় উহার ডিম্বাশয়ে পাঁচটি প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান।
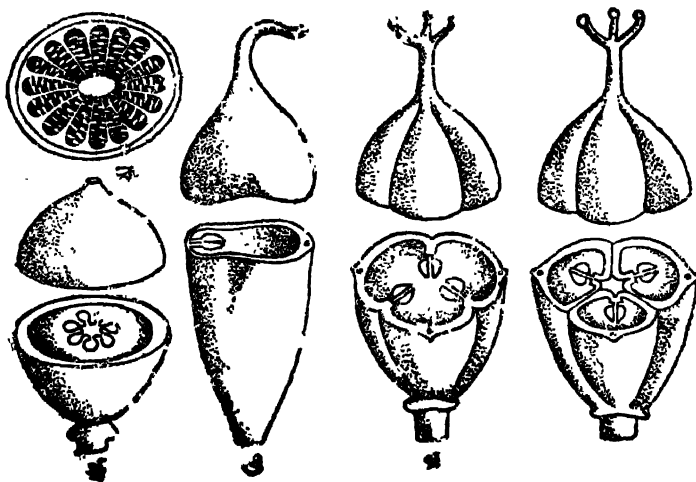
৩৪নং চিত্র

বিবিধ প্রকারের অমরাবিন্যাস দেখানো হইতেছে।

ক, গাত্রীয় (Superficial) ; খ, মুক্ত-মধ্য (Free-central) ; গ, বহুপ্রান্তীয় (Parietal) ; ঘ, অক্ষীয় (Axil) ও প্রান্তীয় (Marginal)।

৪। **মুক্তমধ্য (Free-central) ঃ** এইরূপ অমরাবিন্যাস অক্ষীয় অমরাবিন্যাসের পরিবর্তিত রূপ। এইক্ষেত্রে গর্ভপত্রের ভাঁজযুক্ত প্রাচীরগুলি

ভাঙিয়া যায় এবং ডিম্বাশয়ের কেন্দ্রের অক্ষের উপর অমরাগুলি বৃত্তাকারে অবস্থান করে। ভাঁজযুক্ত প্রাচীরগুলি ভাঙিয়া যাওয়ায় ডিম্বাশয় এককোষ্ঠবিশিষ্ট হয়। তুঁত বা পিঙ্ক (pink) ফুলের ডিম্বাশয় ইহার উদাহরণ।

৫। **গাত্রীয় (Superficial) :** এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা বহুকোষ্ঠবিশিষ্ট ডিম্বাশয়ের প্রাচীরের ভিতর ও পার্শ্ব হইতে উৎপন্ন হয়; যথা—শাপলা ও শালুক ফুলের ডিম্বাশয়।

৬। **মূলীয় (Basal) :** এইপ্রকার অমরাবিন্যাসে ডিম্বাশয়ের মূল হইতে অমরার উৎপত্তি হয় এবং ডিম্বাশয়ের ভিতরকার গাত্র মসৃণ। গাঁদা ও সূর্যমুখী মধ্য-পুষ্পিকার ডিম্বাশয়ের মূলীয় অমরাবিন্যাস দেখা যায়।

ডিম্বক

(Ovule)

ডিম্বকের অন্তর্গঠন (Structure of Ovule):

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বকের উৎপত্তি হয়। ডিম্বকগুলি অমরার উপর অবস্থান করে। অমরার সহিত প্রতিটি ডিম্বক একটি সরু বৃন্তের মত অঙ্গের দ্বারা সংযুক্ত। এই বৃন্তের মত অঙ্গকে **ডিম্বকনাড়ী** (*Funiculus or Funicle*) বলা হয়। ডিম্বকনাড়ীর যে অংশের সহিত ডিম্বকটি সংযুক্ত হয়, তাহাকে **ডিম্বকনাভী** (*Hilum*) বলে। ডিম্বকের দেহকলাকে **ভ্রূণপোষক** (*Nucellus*) বলা হয়। ভ্রূণপোষকটি দুইটি ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে। ভ্রূণপোষকের এই আবরণগুলিকে **ডিম্বকত্বক্** (*Integuments*) বলা হয়। কোন কোন ফুলের ডিম্বকে (চন্দন) একটিমাত্র ডিম্বকত্বক্ থাকে না। ডিম্বকত্বক্-গুলি ডিম্বককে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে না। ইহারা ডিম্বকের শীর্ষদেশের সামান্য অংশ (ছিদ্রের ন্যায়) অনাবৃত রাখে। এই অনাবৃত অংশকে **ডিম্বকরন্ধ্র** (*Mycropyle*) ও ভ্রূণপোষকের যে অংশ হইতে ডিম্বকত্বক্গুলি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অংশটিকে **ডিম্বকমূল** (*Chalaza*) বলা হয়। এখন যে কোন একটি ডিম্বকের লম্বচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে, উহার ভিতরে একটি বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে **ভ্রূণস্থলী** (*Embryo-sac*) বলা হয়। ভ্রূণস্থলী ডিম্বকের উপরের দিকে বা ডিম্বকরন্ধ্রের নিম্নে বিদ্যমান। ভ্রূণস্থলী উদ্ভিদের স্ত্রী-লিঙ্গধর (Female gametophyte) দশা। একটি পূর্ণাঙ্গ ডিম্বকের

ভ্রূণস্থলীতে গর্ভাধানের পূর্বে অনেকগুলি কোষ থাকে। ইহাদের মধ্যে ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে অবস্থিত তিনটি কোষকে একত্রে **গর্ভযন্ত্র** (*Egg-apparatus*) বলা হয়। গর্ভযন্ত্রের তিনটি কোষের মধ্যে প্রথম দুইটি আকারে অপেক্ষাকৃত
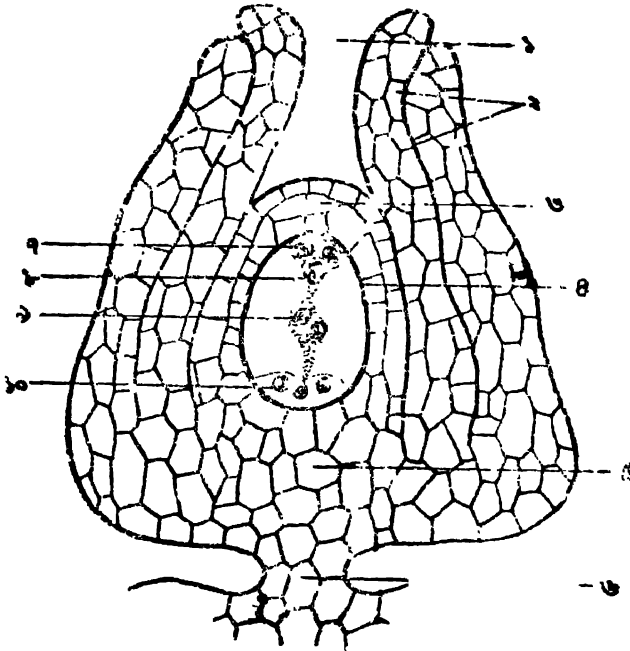
৩৫নং চিত্র

ডিম্বকের বিভিন্ন অংশ।

১, ডিম্বকরন্ধ্র ; ২, ডিম্বকত্বক্ ; ৩, ভ্রূণপোষক ; ৪, ভ্রূণস্থলী ; ৫, ডিম্বকমূল ; ৬, ডিম্বকনাড়ী ; ৭, সাহায্যকারী কোষ ; ৮, ডিম্বাণু ; ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়স ; ১০, প্রতিপাদ কোষসমষ্টি।

ছোট। ইহাদের **সাহায্যকারী কোষ** (*Symergids or Helping cell*) বলা হয়। তৃতীয় কোষটি বড় এবং ইহাকেই ডিম্বকের **ডিম্বাণু** (*Egg-cell* or *Ovum* or *Oosphere*) বলে। গর্ভযন্ত্রের ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ ডিম্বকমূলের ঠিক উপরে আরও তিনটি কোষ দেখা যায়। ইহাদের **প্রতিপাদ কোষসমষ্টি** (*Antipedal cells*) বলে।

ভ্রূণস্থলীর মধ্যস্থলে দুইটি নিউক্লিয়স-পূর্ণ একটি কোষ দেখা যায়। এই দুইটি নিউক্লিয়সকে **পোলার নিউক্লিয়স** (*Polar nucleus*) বলা হয়। পোলার

নিউক্লিয়স দুইটি মিলিত হইয়া পরে একটি নিউক্লিয়সে পরিণত হয়; তখন এই একক নিউক্লিয়সটিকে **ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়স** (*Definitive nucleus* or *Secondary nucleus* or *Polar fusion nucleus*) বলা হয়। সাধারণতঃ উপরি-উক্ত নিউক্লিয়সযুক্ত কোষগুলিতে কোষপ্রাচীর থাকে না; থাকিলেও উহা অতীব সূক্ষ্ম ও সেলুলোজ-নির্মিত।

ডিম্বকের প্রকারভেদ (**(Kinds of ovule)** :

সাধারণতঃ ডিম্বক চারি প্রকারের হয়; যথা—

১। **ঊর্ধ্বমুখ Orthotropous ; ortho** = *straight* ; **tropous** = *turn*) : এইক্ষেত্রে ডিম্বকটি সোজাভাবে অবস্থান করে এবং ডিম্বকরন্ধ্র, ডিম্বকমূল ও ডিম্বকনাভি একই লম্বাকার সরলরেখার উপর অবস্থান করে। পানমরিচ, গোলমরিচ, পিপুল প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে এইরূপ ডিম্বক দেখা যায়।
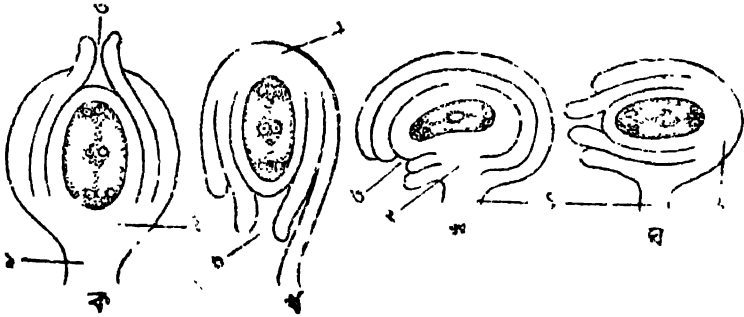
৩৬নং চিত্র

ডিম্বকের প্রকারভেদ দেখানো হইতেছে।

ক, ঊর্ধ্বমুখ; খ, অধঃমুখ; গ, বক্রমুখ; ঘ, পার্শ্বমুখ।

১, ডিম্বকনাড়ী; ২, ডিম্বকমূল; ৩, ডিম্বকরন্ধ্র।

২। **অধঃমুখ (Anatropous ; ana** = *backwards* or *up*) :— ইহাকে উল্টানো ডিম্বকও বলা হয়। এইরূপ ডিম্বকে ডিম্বকমূল ভ্রূণস্থলীর শীর্ষদেশে এবং ডিম্বকরন্ধ্র ভ্রূণস্থলীর নিম্নে বিদ্যমান। এইরূপ ডিম্বকে ডিম্বকনাভি এবং ডিম্বকনাড়ী খুবই কাছাকাছি থাকে। মটর, ছোলা প্রভৃতি ফুলের ডিম্বক এই ধরনের।

৩। **পার্শ্বমুখ (Amphitropous ; amphi** = *both sides*) : যখন ডিম্বক তির্যক্‌ভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ যখন ইহা এমনভাবে বাঁকিয়া যায়,

যাহাতে ইহার ডিম্বকরন্ধ্র এক ডিম্বকনাড়ীর সংযোগে প্রায় এক সমকোণ হয়। আফিং ও কাসুন্দিপানা ফুলে এইরূপ ডিম্বক দেখা যায়।

৪। **বক্রমুখ (Campylotropous ; kampylos = *curved*)** : এই-রকমের ডিম্বক খুব বেশী বাঁকিয়া ঘোড়ার খুরের মত দেখিতে হয়। এইরূপ ডিম্বকে ডিম্বকরন্ধ্র ও ডিম্বকমূল এক সরলরেখার উপর অবস্থান করে না এবং ডিম্বকনাড়ী অংশটি ডিম্বকরন্ধ্র ও ডিম্বকমূলের মধ্যবর্তী স্থানে বিদ্যমান। ক্যাপসেলা ও সরিষা উদ্ভিদের ফুলে এইরূপ ডিম্বক দেখা যায়। নিম্নে ডিম্বকের বিভিন্ন অংশের একটি ছক দেওয়া হইল :
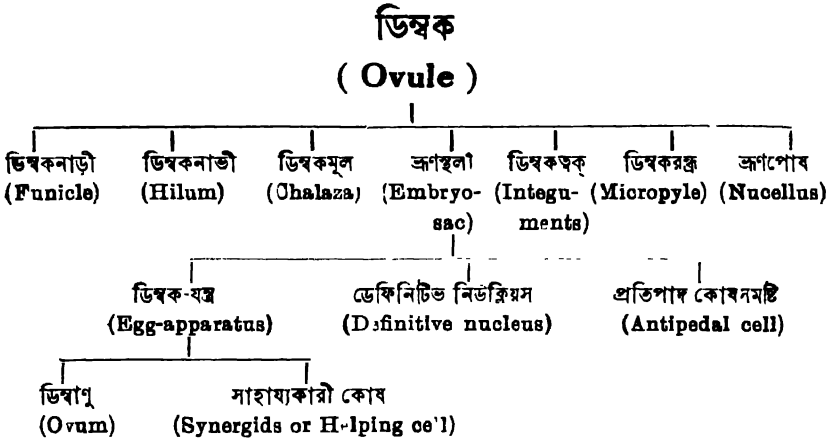
পরিবর্তিত বীটপ-ই পুষ্প

(Flower is a modified shoot)

বিটপ ফুলে রূপান্তরিত হয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। এমন কতকগুলি ফুল দেখা যায়, যাহার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে ফুলের বিভিন্ন স্তবকগুলি বিটপের পাতা এবং উহার পুষ্পাক্ষটি বীটপের শাখা। নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ, উদাহরণসহ উল্লেখ করা হইল :

(১) ফুলের পুষ্পাক্ষটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে ইহাতে চারিটি পর্ব ও তিনটি পর্বমধ্য বিদ্যমান। কিন্তু এই অঞ্চলগুলি এতই সংক্ষিপ্ত যে উহা সহজে বোঝা যায় না। এইরূপ পর্ব হইতেই ফুলের চারিটি স্তবক জন্মায়। স্তবকগুলি আবর্তাকারে বা সর্পিলভাবে পুষ্পাক্ষের উপর সজ্জিত থাকে।

কোন কোন ফুলে পুষ্পাক্ষটি বেশ লম্বা হয়, তখন উহার পর্ব ও পর্বমধ্যগুলি সহজেই দেখা যায়। বৃতি ও দলমণ্ডলের মধ্যবর্তী পর্বমধ্যকে **দলধর** (*Anthophore*) বলে। দলমণ্ডল ও পুংস্তবকের মধ্যবর্তী পর্বমধ্যকে **পুংধর** (*Androphore*) বলা হয়। সেইরূপ পুংস্তবক ও স্ত্রী-স্তবকের মধ্যবর্তী পর্বমধ্যকে **স্ত্রীধর** (*Gynophore*) বলে। **ঝুমকোলতা** (*Passion flower*) ফুলের পুংধর বেশ সুস্পষ্ট। কনকচাঁপা ফুলের স্ত্রীধরটিকে পরিষ্কার দেখা যায়। সাদা **হুড়হুড়ি ফুল** (*Gynandropsis*) পুংধর ও স্ত্রীধর উভয়ই বিদ্যমান। এই অংশে যখন পুংধর ও স্ত্রীধর দেখা যায়, তখন এই অঞ্চলকে **উভলিঙ্গধর**

৩৭নং চিত্র

বিটপের পুষ্পে পরিণতি দেখানো হইতেছে।

ক, সাদা হুড়হুড়ি গাছের (Gynandropsis) ফুল : ১, স্ত্রীধর, ২, পুংধর।

খ, ঝুমকোলতার ফুল : ১, পুংধর।

(*Gynandrophore* ; *gynae* = female ; *andro* = male ; *phore* = holder) বলে। **রাক্ষস গোলাপ** (*Monstrous rose*) ফুলের পুষ্পাক্ষ সত্যই বিচিত্র। পুষ্পাক্ষটি প্রথমে ফুলের চারিটি স্তবক উৎপন্ন করে কিন্তু এক্ষেত্রে ইহা সংক্ষিপ্ত না হইয়া বর্ধনশীল শাখার মত বৃদ্ধিলাভ করে এবং উহার পর্ব ও পাতার কক্ষে শাখা-প্রশাখা জন্মায়।

(২) ফুলের স্তবকগুলি যে প্রকৃতপক্ষে পাতার পরিবর্তিত রূপ, তাহা সহজেই

প্রতীয়মান হয়। ইহাদের ত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে। বেবিনা বা রসেন্ডা (*Russenda*) ফুলের অনেকগুলি বৃতির মধ্যে একটি বৃতি সবুজ পাতায় পরিণত হয়। শালুক ফুলের চারিটি স্তবকের অংশগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহারা পাতা হইতে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহাদের বৃতি ও পাপড়ির আকার পাতার মত হয়। গর্ভপত্রগুলি পরিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে এবং ইহারা আকারে আরও ক্ষুদ্র ও নলের মত হয়। কয়েক প্রকার গোলাপ, স্থলপদ্ম প্রভৃতি ফুলের পুংকেশর পাপড়িতে পরিবর্তিত হয়। সবুজ গোলাপ ফুলের গর্ভপত্র সবুজ পাতায় পরিণত হয়। সর্বজয়া বা কলাবতী

৩৮নং চিত্র

বিটপের পুষ্পে পরিণতি দেখানো হইতেছে।

ক, জংলী গোলাপ ; খ, পদ্মফুলের পাপড়ির পর্যায়ক্রমে পুংকেশরে পরিণতি।

ফুলের গর্ভপত্রগুলি পাপড়ির মত দেখিতে হয়। জিনিয়া ফুলের গর্ভপত্র পাপড়িতে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। মটর ও বক ফুলের গর্ভপত্রটির সবুজ রঙের হয় এবং ইহাতে স্পষ্টভাবে শিরা-উপশিরা দেখা যায়। উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণের মতে, সবুজ পাতার দুইপ্রান্ত লম্বালম্বিভাবে সংযুক্ত হইয়া উক্ত গর্ভপত্রের সৃষ্টি করে। ইহা ব্যতীত মুকুলের মধ্যে পাতা যেভাবে থাকে (**মুকুলপত্রবিন্যাস**—বিদ্ধপত্রবিন্যাস—*Perfoliation*), ঠিক একই পদ্ধতিতে পুষ্পমুকুলের মধ্যে পুষ্পপত্রগুলিও সজ্জিত থাকে। সুতরাং উপরি-উক্ত তত্ত্বগুলি লক্ষ্য করিলে সহজেই প্রমাণ হয় যে, পরিবর্তিত বিটপই ফুল।

অনুশীলনী

১। চিত্রসহ একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দাও। ফুলের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা বর্ণনা কর। (Describe different parts of a typical flower. What are their functions ? Leave neat sketches.)

২। পুষ্পাক্ষের উপর পুষ্পপত্রের বা স্তবকের বিবিধ প্রকারের সন্নিবেশ উদাহরণ ও চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe various types of insertion of floral leaves on the Thalamus with suitable examples and sketches).

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ উদাহরণসহ বর্ণনা কর :—

(i) সমাঙ্গফুল, (ii) উভলিঙ্গ, (iii) পুংপুষ্প, (iv) স্ত্রীপুষ্প, (v) ভিন্নবাসী, (vi) অসমঙ্গ, (vii) বহুপ্রতিসম, (viii) পূর্ণাঙ্গ ফুল, (ix) মিশ্রবাসী। [Explain the following terms with suitable examples—(i) Regular, (ii) Hermaphrodite, (iii) Staminate flower, (iv) Pistillate flower, (v) Dioecious, (vi) Irregular, (vii) Actinomorphic, (viii) Complete flower, (ix) Polygamous].

৪। বৃতির রূপান্তর এবং স্থিতির বিষয় যাহা জান উদাহরণসহ লিখ।

(Give an account of modified Calyx and its duration with suitable examples).

৫। দলমণ্ডলের বিভিন্ন প্রকারের আকার উদাহরণসহ বর্ণনা কর। (Describe various forms of corolla with proper examples).

৬। একটি পুংকেশরের বিবিধ অংশ চিত্রসহ বর্ণনা কর। ডিডাইনামস্ ও টেট্রাডাইনামস্ কথার অর্থ কি ? (Give an account of the various regions of a stamen with sketches. What do you mean by the term "Didynamous and Tetradynamous" ?)

৭। একটি গর্ভপত্রের বিভিন্ন অঞ্চল চিত্রসহযোগে বর্ণনা কর। ইহার বিবিধ অঞ্চলের কার্য কি ? (Describe various regions of a carpel with sketches. What are the functions of these regions ?)

৮। সমসংযোগ ও অসমসংযোগ কাহাকে বলে ? পুংকেশর কি-ভাবে সমসংযোগ ও অসমসংযোগ পদ্ধতির দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা উদাহরণ ও চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Define cohesion and adhesion. Explain how stamens are modified by cohesion and adhesion with sketches and examples).

৯। অমরা কাহাকে বলে ? বিবিধ প্রকারের অমরাবিন্যাসের উদাহরণ দাও ও চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Define placenta. Explain various forms of placentation with examples. Leave neat sketches).

১০। গর্ভাধানের পূর্বে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিম্বকের বহির্গঠন ও অন্তর্গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe the structure of a typical ovule before fertilization. Leave neat sketches).

১১। ডিম্বকের বিবিধ আকার উদাহরণ ও চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Explain various types of ovules with sketches and examples).

১২। বিটপ-ই পরিবর্তিত হইয়া ফুলের বিবিধ অংশে পরিণত হইয়াছে তাহা কি ভাবে প্রমাণ করিতে পারা যায়, বর্ণনা কর। (Explain how could you prove that a flower is a modified shoot)

১৩। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ। (Write what you know of) :—

(ক) যুক্তগর্ভপত্রী, (খ) দ্বিগুচ্ছ, (গ) যুক্তপরাগধানী, (ঘ) উভলিঙ্গধর, (ঙ) ভ্রূণস্থলী। [(a) Syncarpous, (b) Diadelphous, (c) Syngenesious, (d) Gynandrophore, (e) Embryosac.]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরাগ-সংযোগ

(Pollination)

গর্ভাধানের জন্যই ফুলের সৃষ্টি হয়। সুতরাং একজাতীয় ফুলের পরাগরেণু সেইজাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। কারণ পুংকেশরের পরাগধানীর ভিতর পরাগরেণু জন্মায় এবং গর্ভপত্রে ডিম্বকের ভিতর জন্মায় ডিম্বাণু। এই দুইটি পুং ও স্ত্রী-জননকোষের সংযোগের ফলেই বীজের উৎপত্তি হয় এবং এইরূপ স্ত্রী-ও পুং-জননকোষের সংযোগকে **গর্ভাধান** (*Fertilization*) বলে। সুতরাং গর্ভধান প্রক্রিয়া সক্রিয় করিতে হইলে পরাগরেণুর স্থানান্তরিত হওয়া দরকার। পরাগধানী হইতে পরাগরেণুর গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডের উপর স্থানান্তর-পন্থাকে **পরাগ-সংযোগ** (*Pollination*) বলা হয়। একজাতীয় ফুলের পরাগরেণু যখন সেই ফুলের বা সেই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হয়, তখন এইরূপ পরাগ-সংযোগকে **স্ব-পরাগ সংযোগ** (*Self-Pollination* or *Autogame* ; *auto* = self, *gomos* = marrage) বলা হয়। আবার যখন একজাতীয় ফুলের পরাগরেণু সেইজাতীয় অন্য গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়, তখন সেইরূপ পরাগ-সংযোগকে **ইতর পরাগ-সংযোগ** (*Cross-fertilization* or *Allogamy* ; *allos* = different) বলা হয়। ফুল পরাগ-সংযোগের জন্য জলপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বাতাস, জল, কীট-পতঙ্গ, প্রাণী প্রভৃতি প্রকৃতির হাতিয়ারের দ্বারাই পরাগ-সংযোগ সাধিত হয়। তদনুসারে ফুলের শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে করা হইয়াছে ; যথা—(১) **বায়ুপরাগী** (*Anemophilous*); (২) **পতঙ্গপরাগী** (*Entomophilous*); (৩, **জলপরাগী** (*Hydrophilous*) ; এবং (৪) **প্রাণিপরাগী** (*Zoophilous*)। এইসকল ফুলের বিশেষত্ব একে একে বর্ণনা করা হইতেছে।

১। বায়ুপরাগী (Anemophilous or Anemophily ; ***anemos*** **= wind) :**

বায়ু দ্বারা যে-সমস্ত ফুলের পরাগ-সংযোগ হয়, তাহাদের বায়ুপরাগী বলে। এইপ্রকার ফুলগুলি আকারে ছোট হয়। ইহাদের রঙ উজ্জ্বল হয় না বা

এইরূপ ফুলে গন্ধ থাকে না; ফুলগুলি শুষ্ক হয়, অর্থাৎ ইহাদের গর্ভপত্রের ভিতর মিষ্টরস নিঃসৃত হয় না। এইরূপ ফুলের পুংকেশরের **পুংদণ্ডটি** (*Filament*) বেশ বড় এবং পরাগধানীটি **সর্বমুখভাবে** (*Versatile*) পুংদণ্ডের সহিত সংযুক্ত। শুধু ইহাই নহে, ফুলের পুংদণ্ডটি বড় হওয়ায় পরাগধানীটি ফুলের পাপড়ি অতিক্রম করিয়া বাতাসে ঝুলিতে থাকে। পরাগরেণুগুলি সাধারণতঃ সূক্ষ্ম বা অতিক্ষুদ্র ধূলিকণার মত হয় এবং সেইজন্য খুব হালকা। এইরূপ ফুলের পরাগরেণু প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। বাতাসের দ্বারা পরাগসংযোগ হওয়াতে ফুলের পরাগরেণুগুলি বাতাসে উড়িয়া নানাস্থানে পতিত হয় এবং এতদ্দ্বারা বহুল পরিমাণে বৃথা নষ্ট হয়। ফুলের গর্ভপত্রটি বেশ বড় হয় এবং ইহার গর্ভমুণ্ডটি পাপড়ি অতিক্রম করে। গর্ভমুণ্ডটি **শাখাযুক্ত** (*branched*) এবং **পক্ষল** (*feathery*) হয়। ভুট্টার রেশমের মত সুতাগুলি গর্ভপত্রের গর্ভদণ্ড (*Style*)। ভুট্টা ব্যতীত ধান, নানাবিধ ঘাস, আখ, নারিকেল, তাল, খেজুর ও নানাপ্রকার তাল-জাতীয় গাছের ফুল উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে। বহু **ব্যক্তবীজী** (*Gymnosperm*) উদ্ভিদের ফুল বাতাসের দ্বারা পরাগ-সংযোগ করে। পাইনের পরাগধানীতে হালকা **পাখ্না** (Wing) থাকায় উহা সহজেই বাতাসের দ্বারা গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়।

২। **পতঙ্গপরাগী ফুল** (**Entomophilous ; entomon = an insect ; phileo = to love**) : যে-সকল ফুল কীট ও পতঙ্গের সাহায্যে পরাগ-সংযোগ করে, তাহাদের পতঙ্গপরাগী বলা হয়। এইরূপ ফুলে বায়ুপরাগী ফুলের মত কতকগুলি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। ফুলগুলি সাধারণতঃ উজ্জ্বল রঙের হয়। ফুলের পাপড়িগুলি যত বেশী উজ্জ্বল ও বিক্ষিপ্ত হয়, ততই পতঙ্গগুলিকে আকৃষ্ট করিতে পারে। বেবিনা ফুলের পাপড়ি খুবই ছোট কিন্তু উহার বৃত্যংশগুলি পাপড়ির মত উজ্জ্বল ও আকারে বড় হয়। সুতরাং পতঙ্গ বৃত্যংশের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। বাগানবিলাস ও লালপাতার **মঞ্জরীপত্রগুলি** (*Bracts*) উজ্জ্বল লাল রঙের হয় ও আকারে সাধারণ পাতার মত হয় এবং ইহারাই পতঙ্গকুলকে আকৃষ্ট করে। এইরূপ কচু, কলা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলগুলিকে আবৃত করিয়া রাখে একপ্রকার অতিউজ্জ্বল ও বৃহৎ মঞ্জরীপত্র বা 'স্পেদ'। স্পেদের আকর্ষণে পতঙ্গ ফুলের উপর অবস্থান করে। পতঙ্গগুলি পরাগধানীর উপর অবস্থান করিবার সময় উহার ডানায় ও পদে পরাগরেণু লাগিয়া যায় এবং এইভাবে উহারা উড়িয়া নানারূপে পরাগরেণু ছড়াইয়া

দেয়। পরাগরেণুগুলি গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডে পতিত হইলে পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন হয়।

নানা ফুলে মিষ্টরস ও গন্ধ থাকে। মিষ্টরস ফুলের **রসগ্রন্থি** (*Nectary*) হইতে নিঃসৃত হয়। মিষ্টরসগ্রন্থি সাধারণতঃ যুক্ত পাপড়ির মূলে বা পুষ্পাক্ষের

৩১নং চিত্র
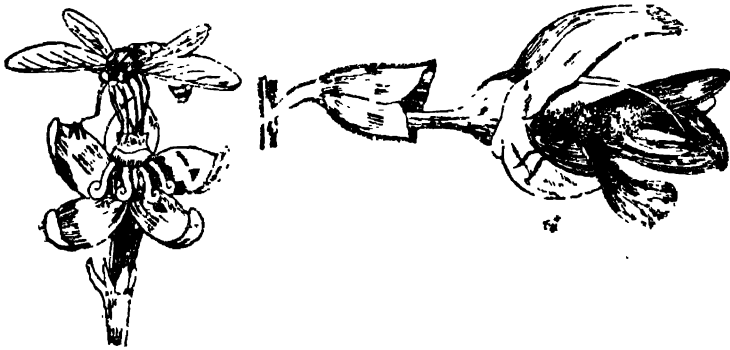
উদ্ভিদের অভিনব পরাগ-সংযোগ দেখানো হইতেছে।

ক, আকন্দফুলে পতঙ্গের দ্বারা পরাগ-সংযোগ দেখান হইতেছে। খ, সালভিয়া ফুলে পতঙ্গের দ্বারা পরাগ-সংযোগ দেখানো হইতেছে।

উপর থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের **পুষ্পপুটের** (*Perianth*) ভিতরে মিষ্টরসের গ্রন্থি বিদ্যমান। সাধারণতঃ মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গেরাই মিষ্টরসের লোভে উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফুলের উপর অবস্থান করে এবং পরাগ-সংযোগ-সাধনে সহায়তা করে।

পালিক, স্ট্রবেরী, ব্ল্যাকবেরী, বেড্‌ট্র ও একজাতীয় ছোট গোলাপফুল উড়ন্ত ছোট ছোট **পতঙ্গের** (*Beetle*) দ্বারা পরাগ-সংযোগ করে। আবার জবা, স্ন্যাপ-ড্রাগন, একোনিটম, লার্কস্পার, বক, অতসী ও অপরাজিতা ফুল মৌমাছির দ্বারা পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে। সেইরূপ কলমিশাক, ঝুমকোলতা, রঙ্গন, রজনীগন্ধা, হাস্নুহানা, বেললতা, যুঁই প্রভৃতি ফুল প্রজাপতির দ্বারা পরাগ-সংযোগ সাধন করে। সূর্যমুখী, ডালিয়া গাঁদা, জিনিয়া প্রভৃতি পুষ্প-বিন্যাসের ছোট ছোট ফুলগুলি (পুষ্পিকা) একসঙ্গে থাকায় উজ্জ্বল দেখায়। এই উজ্জ্বলতার জন্য বা ইহাদের রূপের মোহে পতঙ্গকুল আকৃষ্ট হয়। মথ এবং রাতের পতঙ্গগুলি সাধারণতঃ হাস্নুহানা, শিউলী ও যুঁই ফুলের গন্ধে

আকৃষ্ট হয়; কচু-পুষ্পবিন্যাসের গন্ধ কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রেণীর পতঙ্গের অতি প্রিয়। পতঙ্গপরাগী ফুলের পরাগধানী হইতে পরাগরেণু অপেক্ষাকৃত কম নির্গত হয়। ফুলগুলির গর্ভপাতের গর্ভদণ্ড আঠালো এবং কখনও কখনও কাঁটাযুক্ত হয়। পতঙ্গগুলি মিষ্টরসগ্রন্থি বা রং কিংবা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ফুলের উপর অবস্থান করিবার পর উহাদের ডানা বা পদ কিংবা ঠোঁটে (*Proboscis*) আঠালো কিংবা কাঁটাযুক্ত পরাগগুলি আটকাইয়া যায় এবং উহা যখন অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে, তখন পরাগ-সংযোগ কার্যকরী হয়। আলু, আফিং প্রভৃতি ফুলের পরাগরেণুগুলিকে বহু পতঙ্গ খাদ্যরূপে ব্যবহার করে এবং এতদ্দ্বারা উহারা নিজ পদের দ্বারা এক ফুল হইতে অন্য ফুলে রেণুগুলিকে বহন করে। ডুমুর-পুষ্পবিন্যাসের উপরিস্থ ছিদ্রের ভিতর দিয়া কীট প্রবেশ করে। ডুমুর ফুলের পুংকেশর ও গর্ভপত্র একই সঙ্গে পুষ্ট না হওয়ায় কীট উহাদের রেণু বহন করিয়া বিভিন্ন ডুমুরে পরাগ-সংযোগ সাধন করে। সেইরূপ ভুঁইতুলসী ফুলে চারিটি পুংকেশরের মধ্যে দুইটি উপরে ও দুইটি নিচে সজ্জিত থাকে। উপরের দুইটি পুংকেশর প্রথমে পুষ্ট হয়। পতঙ্গগুলি নিচের অপুষ্ট পুংকেশরের উপর উড়িয়া আসিয়া অবস্থান করিলে উহার পিঠ পুষ্ট পুংকেশরের পরাগধানীর সংস্পর্শে আসে এবং আঘাতের ফলে পরাগধানীপুষ্ট রেণুগুলি পতঙ্গের পিঠে লাগিয়া যায়। এইভাবে পতঙ্গ রেণুগুলিকে বহন করিয়া অন্য ফুলে যায় এবং পরাগ-সংযোগ কার্যকরী করে।

৩। জলপরাগী Hydrophilous or Hydrophily):

জলের সাহায্যে খুব কমসংখ্যক সপুষ্পক উদ্ভিদের ফুল পরাগ-সংযোগ ক্রিয়া কার্যকরী করে। জলপরাগী ফুলগুলির পরাগরেণু জলের চেয়ে ভারী হয় না, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল হইলে জলের উপর ভাসিতে থাকে এবং ইহাদের পরাগরেণু হালকা ও ক্ষুদ্র হয়। সিরাটোফাইলম্ ফুলের রেণুগুলি ভারী হওয়ায় জলের তলাকার মাটিতে পতিত হয় এবং তথায় পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন হয়। হাইড্রিলা ও পাতাশ্যাওলা ইত্যাদি জলের উদ্ভিদের পরাগ-সংযোগ জলের উপরিস্তরে ভাসমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়। পাতাশ্যাওলার পরাগ-সংযোগ উন্নত ধরনের এবং আশ্চর্যজনক। পাতাশ্যাওলার পুংগাছের ফুলগুলি অবৃন্তক এবং ইহাদের মঞ্জরীদণ্ডটি খুবই ছোট হয়। মঞ্জরীদণ্ড হইতে ফুলগুলি একে একে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। স্ত্রী-ফুলগুলি সবৃন্তক এবং

বৃন্তগুলি খুব লম্বা। স্ত্রী-ফুলগুলি পুষ্ট হইলে পেঁচানো বৃন্তটি সোজা হইয়া যায়, এবং স্ত্রী-ফুলটি জলের উপরিস্তরে ভাসিয়া উঠে। ফুলগুলি বৃন্তের
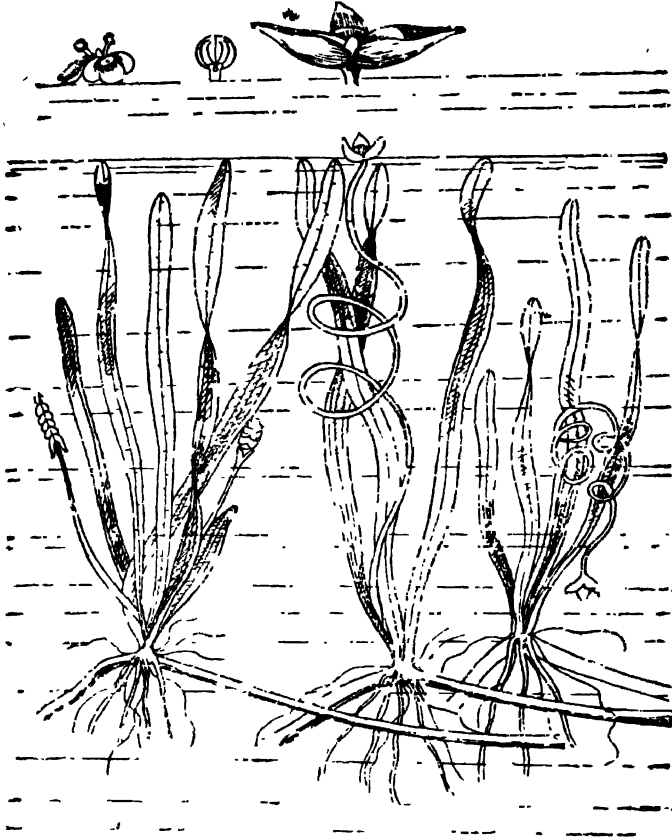
৪০নং চিত্র

উদ্ভিদের অভিনব পরাগ-সংযোগ দেখানো হইতেছে।

চিত্রে পাতাশ্যাওলার পরাগ-সংযোগ পদ্ধতি দেখানো হইতেছে।

দ্বারা জলের উপর ঘুরিয়া বেড়ায় এবং এই সময় পুং-ফুলের সংস্পর্শে আসে। পছন্দমত পুং-ফুলের সহিত স্ত্রী-ফুলগুলি পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে। ইহার পর স্ত্রী-ফুলের বৃন্তটি আবার পেঁচানো হইয়া যায় এবং ফুলটি জলের ভিতর পুনরায় প্রবেশ করে।

৪। **প্রাণিপরাগী (Zoophilous or Zoophily ; *zoon* = animal) :**

পাখী, কাঠবিড়ালী, বাদুড়, জলের শামুক ও ছোট ছোট পোকার দ্বারা ফুলের পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন হয়। প্রাণিপরাগী ফুল সাধারণতঃ বড় এবং অতি

৪১নং চিত্র
উদ্ভিদের অভিনব পরাগ-সংযোগ পদ্ধতি।
বিগোনিয়া ফুলের পাখী দ্বারা পরাগ-সংযোগ দেখানো হইতেছে।

উজ্জ্বল রঙের হয়। কাঠবিড়ালী ও পাখীরা মান্দার ফুলের পরাগরেণু ফুলে ফুলে বহন করে। পলাশ, শিমুল, কদম, বিগোনিয়া প্রভৃতি গাছের ফুলের সাধারণতঃ পাখীর দ্বারা পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন হয়। অনেক কচু-জাতীয় গাছে ফুল খুবই ক্ষুদ্র হয় এবং ইহাদের পরাগরেণু পোকাদের প্রিয় খাদ্য। পোকাগুলি ফুলে ফুলে খাদ্য অন্বেষণ করিবার সময় পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে।

স্ব-পরাগ-সংযোগ

(Self-pollination)

যদিও ইতর-পরাগ-সংযোগই প্রকৃতির রীতি, তবু ও অনেক ফুলে স্ব-পরাগ-সংযোগ কার্যকরী হয়। স্ব-পরাগ-সংযোগে নিম্নলিখিত অভিযোজন (adaptation) দেখা যায় ; যথা—(১) **সমপরিণতি** (**Homogamy** ; *homas* = same) :

সমপরিণতি পদ্ধতি বহু উভয়লিঙ্গ ফুলে দেখা যায়। উভয়লিঙ্গ ফুলে একই পুংকেশর ও গর্ভপত্র একই সময়ে পরিপক্ক বা পুষ্ট হয়। ইহাতে একই ফুলে বা একই গাছের বিভিন্ন ফুলে বাতাস বা পতঙ্গের দ্বারা পরাগ-সংযোগ সাধিত হয়। আবার কতক ফুলে গর্ভদণ্ড বাঁকিয়া পরাগধানীর ঠিক তলায় পৌঁছায়

এবং সামান্য বাতাসের দোলায় পরাগধানী হইতে রেণু ঝরিয়া নিম্নস্থ গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হয়। জবা, সূর্যমুখী, কৃষ্ণকলি বা সন্ধ্যামণি প্রভৃতি ফুলে এইরূপে পরাগ-সংযোগ দেখা যায়। শিয়ালকাঁটা গাছের ফুলে পুংকেশর ও গর্ভপত্র পুষ্ট হইবার পর পাপড়িগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে পুংকেশরের রেণুগুলি গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে এবং স্ব-পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে। সরিষাফুলে ইতর-পরাগ-সংযোগ বিফল হইলে, গর্ভপত্রের দুইপাশের পুংকেশর দুইটির পুংদণ্ড লম্বা হইয়া যায় এবং গর্ভপত্রের সংস্পর্শে আসে। রঙ্গন ফুলের দলনলটি (corolla tube) খুব সরু হয় এবং ইহার চারিপাশের পুংকেশরগুলি ভিড় করিয়া থাকে। ফুল প্রস্ফুটিত হইলে গর্ভপত্র এই দলনলীর ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসে এবং সেই সময় পুংকেশরের পরাগধানীতে আঘাত লাগে। আঘাতের ফলে পরাগরেণুগুলি গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হয় এবং এইরূপে স্ব-পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন হয়।

৪২নং চিত্র
ভুট্টা উদ্ভিদের উভলিঙ্গ দেখানো হইতেছে।
১, পুং-পুষ্পবিন্যাস ; ২, স্ত্রী-পুষ্পবিন্যাস।

(২) **অনুন্মীলিন (Cleisto-gamy ; *kleisto* = closed) :** কতকগুলি এমন উভয়লিঙ্গ ফুল দেখা যায়, যাহা কখনও প্রস্ফুটিত হয় না। এইরূপ ফুলকে অনুন্মীলিন ফুল বলা হয়। এইপ্রকার ফুলের পুং-কেশরগুলি কখনও গর্ভপত্রকে জড়াইয়া থাকে। অথবা গর্ভপত্র কোন কোন ক্ষেত্রে পুংকেশরকে জড়াইয়া থাকে। আবার কোন কোন ফুলে পরাগধানী এবং গর্ভপত্র মুখোমুখী অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থায় স্ব-পরাগ-সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। কানশিরা

গাছের ভূনিম্নস্থ অনুন্মীলিন ফুল স্ব-পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে। এইপ্রকার ফুল ক্ষুদ্র ও অনুজ্জ্বল। ইহাতে মিষ্টরসগ্রন্থি থাকে না বা ইহারা গন্ধহীন। আমরুল, সূর্যশিশির প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলের নাম উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইতর-পরাগ-সংযোগের অভিযোজন

(Adaptations for Cross Pollination)

প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী ইতর-পরাগ-সংযোগ অধিকতর সম্ভবপর হয়। নানাপ্রকারের ফুল বিভিন্ন উপায়ে স্ব পরাগ-সংযোগ যাহাতে সম্পন্ন না হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করে এবং বাধা দেয়। প্রতিটি ফুলই ইতর-পরাগ-সংযোগের পক্ষে এবং ইহা কার্যকরী করিবার জন্য ফুলের বিভিন্ন অভিযোজনগুলি নিম্নে দেওয়া হইল ; যথা—

১। **একলিঙ্গতা** (**Unisexuality or Dicliny** ; *di*=asunder ; *kline*=a bed) **:**

সাধারণতঃ সহবাসী গাছে একলিঙ্গ-বিশিষ্ট ফুল হয় ; যেমন—কুমড়া বা লাউ গাছের ফুল। কুমড়া গাছের স্ত্রী-পুষ্প ও পুং-পুষ্প আলাদা আলাদা জন্মায়। সুতরাং একত্রে স্ব-পরাগ-সংযোগ অসম্ভব। ভ্যারাণ্ডা, ভুট্টা প্রভৃতি গাছও **সহবাসী** (*Monoecious*)। আবার ভিন্নবাসী গাছের ফুলেও স্ব-পরাগ-সংযোগ অসম্ভব। পেঁপে, ডালিম, তুঁত প্রভৃতি গাছগুলি ভিন্নবাসী অর্থাৎ ইহাদের পুংগাছে পুংপুষ্প এবং স্ত্রীগাছে স্ত্রীপুষ্প জন্মায়। এইভাবে কতকগুলি গাছ স্ব-পরাগ-সংযোগ পন্থাকে বাধা দেয়।

২। **স্ববন্ধ্যাত্ব** (**Self-sterility**) **:**

কতকগুলি উভলিঙ্গ ফুলে যখন গর্ভপত্র পুষ্ট হয়, তখন এইরূপ ফুলের পরাগধানীর রেণুগুলি বন্ধ্যা থাকে। আবার কোনো কোনো ফুলের রেণুর পরিবর্তে ডিম্বাণু বন্ধ্যা থাকে। অর্কিডের ফুলের রেণুগুলি বন্ধ্যা হয় না, কিন্তু ইহা যখন একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়, তখন গর্ভপত্রের ভিতরকার ডিম্বাণুকে নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হইলে পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন হয়। ঝুমকোলতা ফুলের স্ববন্ধ্যাত্ব পদ্ধতি দেখা যায়।

এইভাবে যে-কোন একটি লিঙ্গ বন্ধ্যাত্বের দ্বারা ফুল ইতর-পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে।

৩। **বিষমপরিণতি** (Dichegamy ; *dicha*=in two):

নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ ফুলে একই সময় পুংকেশর ও গর্ভপত্র পুষ্ট হয় না। পুংকেশর কোন ফুলে যখন পুষ্ট হয়, সে সময়ে সেই একই ফুলের গর্ভপত্র পুষ্ট হয় না। আবার ইহার বিপরীতও হয়, অর্থাৎ একই পুংকেশর অপুষ্ট এবং গর্ভপত্র পুষ্ট হয়। ফুলের এইরূপ পরিণতিকে বিষমপরিণতি বলা হয়। অতএব বিষমপরিণতি অবস্থাপ্রাপ্ত ফুলগুলিতে স্ব-পরাগ-সংযোগ অসম্ভব এবং ইতর-পরাগ-সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। বিষমপরিণতি দুই প্রকারের; যথা—
(i) **প্রপুং-পরিণতি** (*protandry* ; *protas*=first, *andros*=male): এক্ষেত্রে ফুলের পুংকেশর প্রথমে পুষ্ট হয় এবং ইহার পরাগধানী ফাটিয়া গিয়া রেণু নির্গত করে। এ-সময় একই ফুলের গর্ভপত্র সম্পূর্ণ অপুষ্ট থাকে। সূর্যমুখী, জবা ও জোয়ান গাছের ফুলে প্রপুং-পরিণতি পন্থা দেখা যায়। (ii) **প্রস্ত্রী-পরিণতি** (*Protogyny* ; *gynoe*=female): এক্ষেত্রে ফুলের গর্ভপত্র প্রথমে পুষ্ট হয় এবং উহার গর্ভমুণ্ড রেণু ধরিবার জন্য তৈয়ারি থাকে। সেই সময় একই ফুলের পুংকেশর সম্পূর্ণ অপরিপক্ক থাকে চাঁপা, কাঁঠালিচাঁপা, দেবদারু, আতা, ঈশ্বরমূল, বেগুন প্রভৃতি গাছের ফুলগুলি প্রস্ত্রী-পরিণতি পন্থা অবলম্বন করে এবং স্ব-পরাগ-সংযোগ প্রণালীকে বাধা দিয়া ইতর-পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে।

৪। **স্ব-সঙ্গমরোধী** (Herkogamy ; *herkos*=a fence of barrier):

কোন কোন উদ্ভিজ্জ ফুলের পুংকেশর ও গর্ভপত্র একই সময়ে পুষ্ট হইলেও নানা উপায়ে ফুল স্ব-পরাগ-সংযোগ প্রণালীতে বাধা দেয়। বিশাল্যকরণী বা উলটচণ্ডাল ফুলের পুংকেশর ও গর্ভপত্র একই সময় পুষ্ট হইলেও পুংকেশরগুলি পরাগধানী হইতে রেণু নিঃসৃত হইবার পূর্বের গর্ভপত্র পুংকেশর হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং ইহার দ্বারা পরাগধানী রেণু নিঃসৃত করিলেও উহা গর্ভপত্রের মুণ্ডের উপর পতিত হয় না। নানাপ্রকার সরিষাগোত্রীয় ফুলের পুংকেশরগুলি গর্ভপত্রের নিম্নে অবস্থান করে এবং সেইজন্য স্ব-পরাগ-সংযোগ সম্ভবপর হয় না। ঈশ্বরমূল উদ্ভিদের ফুলের গঠন এমনই যে, ইহাদের ইতর-পরাগ-সংযোগ পন্থা

অবলম্বন ব্যতীত কোন উপায় থাকে না। আকন্দ, অর্কিড প্রভৃতি গাছের ফুলের মধ্যে একটি পাতলা পর্দা দেখা যায়। ইহাকে **পলিনিয়ম** (*Pollinium*)
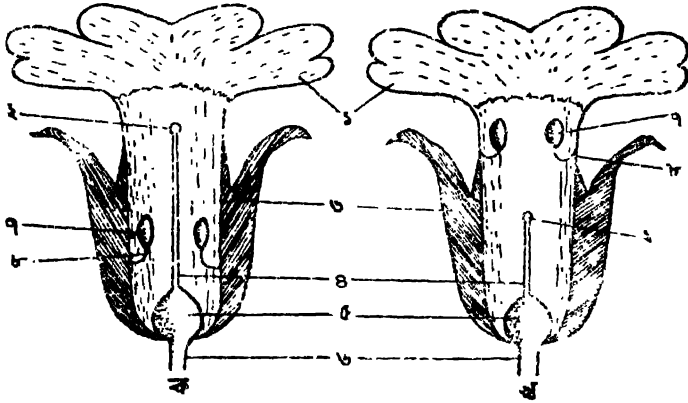
৪৩নং চিত্র

অসম গর্ভদণ্ডযুক্ত ফুলের দ্বিরূপতা দেখানো হইতেছে।

১. পুষ্পের দলমণ্ডল ; ২, গর্ভদণ্ড ; ৩, বৃতি ; ৪, গর্ভদণ্ড ; ৫, গর্ভাশয় ; ৬, বৃন্ত ; ৭, পরাগধানী ; ৮, পুংদণ্ড।

বলে। এই পর্দাটি পুংকেশর ও গর্ভপত্রটির মাঝে খাড়াভাবে অবস্থান করে এবং ইহার দ্বারা স্ব-পরাগসংযোগ সম্ভবপর নয়।

(৫) **অসমগর্ভদণ্ড** (**Heterostyly** : *Hetero* = different) ঃ

এইরূপ উভয়লিঙ্গ ফলে কখনও কখনও পুংকেশরের পুংদণ্ড লম্বা হয় এবং গর্ভপত্রের গর্ভদণ্ডটি ছোট হয় বা পুংকেশরের পুংদণ্ডটি ছোট হয় এবং গর্ভপত্রের গর্ভদণ্ডটি লম্বা হয়। সাধারণতঃ এইরূপ ফুল দুই প্রকারের ; যথা—

(ক) **দ্বিরূপতা** (**Dimorphic**) ঃ একই জাতীয় ফুল যখন দুই প্রকারের হয়, অর্থাৎ একপ্রকার ফুলে পুংকেশর লম্বা ও গর্ভপত্র আকারে ছোট হয় এবং দ্বিতীয় প্রকারের ফুলে পুংকেশর ছোট হয় এবং গর্ভপত্র আকারে বড় হয়। ফুলের এরূপ অবস্থার জন্য ইহাদের মধ্যে স্ব-পরাগ-সংযোগ অসম্ভব। সুতরাং ইতর-পরাগ-সংযোগ ইহাদের মধ্যে কার্যকরী হয়। লম্বা পুংকেশরবিশিষ্ট ফুলের রেণু দ্বিতীয় প্রকার লম্বা গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হয় এবং ইহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ

ছোট পুংকেশরবিশিষ্ট স্থলে রেণু দ্বিতীয় প্রকার ছোট গর্ভদণ্ডবিশিষ্ট ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হয়। এইভাবে ইতর-পরাগ-সংযোগ সম্ভব হয়। যূঁই, পানমরিচ, বিট প্রভৃতি গাছের ফুল এইপ্রকার পদ্ধতির উদাহরণ।

(খ) **ত্রিরূপতা (Trimorphic) :** যখন লম্বা, মাঝারি ও ছোট পুংদণ্ড ও গর্ভদণ্ডবিশিষ্ট তিনপ্রকার পুংকেশর এবং গর্ভপত্র একই ফুলে জন্মায়; যথা—কামরাঙ্গা, আমরুল গাছের ফুল ত্রিরূপতার উদাহরণ।

স্ব- ও ইতর-পরাগ-সংযোগ পদ্ধতির উপকারিতা ও অপকারিতা

(Advantages and disadvantages of Cross- and Self-Pollination)

স্ব-পরাগ-সংযোগের ফলে পরাগরেণু বেশী নষ্ট হয় না এবং এই পদ্ধতিতে গর্ভাধান অবশ্যম্ভাবী। ইহাই স্ব-পরাগ-সংযোগের উপকারিতা। কিন্তু ইহার ফলে যে-সকল বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা দুর্বল অর্থাৎ বীজগুলি দ্বারা দুর্বল গাছ জন্মায়। ইতর-পরাগ-সংযোগের ফলে যেসমস্ত বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা সবল ও সুপুষ্ট গাছ উৎপন্ন করে। এইপ্রকার গাছগুলির সহ্যশক্তি বেশী হয় এবং বেশীদিন জীবন ধারণ করিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে ফসল দেয়। ইতর-পরাগ-সংযোগে বেশী পরিমাণে বীজ জন্মায় এবং এইপ্রকার বীজ হইতে নূতন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গাছের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ইতর-পরাগ-সংযোগ বাতাস, পতঙ্গ, জল ও প্রাণীদের উপর নির্ভরশীল। সেইহেতু এই পদ্ধতি অনুযায়ী ফুলের প্রচুর পরাগরেণু নষ্ট হয় এবং এই পন্থায় গর্ভাধানের নিশ্চয়তা অপেক্ষাকৃত কম।

গর্ভাধান

(Fertilization)

গর্ভাধানই ফুলের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহার জন্যই পরাগ-সংযোগ হয়। আমরা জানি, ডিম্বকের মধ্যে ডিম্বাণু বা স্ত্রীজননকোষ থাকে এবং পরাগরেণুর ভিতর পুংজননকোষ বিদ্যমান। এই দুইটি বিসদৃশ জননকোষের মিলনকে গর্ভাধান

বলে। গর্ভাধানের পর ডিম্বাণুটি বীজে পরিণত হয়। সুতরাং একটি বীজের উৎপত্তির জন্য একটিমাত্র ডিম্বাণু এবং একটিমাত্র পরাগরেণু আবশ্যক। পরাগ-
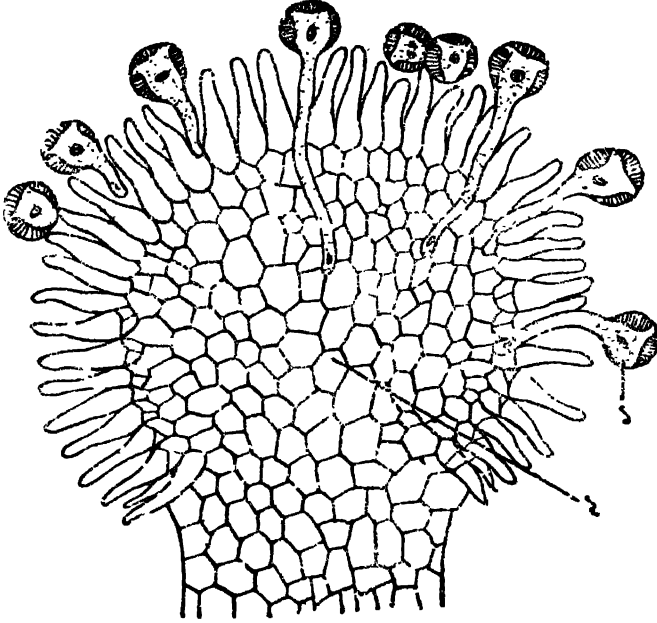
৪৪নং চিত্র

উদ্ভিদের গর্ভাধান।

গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডের উপর পরাগরেণুর ক্রমবৃদ্ধি দেখানো হইতেছে।

১, পরাগরেণু; ২, গর্ভমুণ্ড।

রেণুগুলি গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হইবার পর উহা গর্ভমুণ্ড হইতে নির্গত রসে আটকাইয়া যায়। গর্ভমুণ্ডের রসের উৎসেচকই পরাগরেণুগুলিকে অঙ্কুরোদ্গম করিতে প্রেরণা দেয়। পরাগরেণু আকারে নানাপ্রকার। উহার বাহিরের স্থূল কর্কশ আবরণটিকে **রেণু-বহিস্ত্বক** (*extine*) এবং ভিতরের সূক্ষ্ম আবরণটিকে **রেণু-অন্তস্ত্বক** (*intine*) বলা হয়। রেণু-বহিস্ত্বক পরাগরেণুকে সম্পূর্ণভাবে বণ্টন করে না। কতকগুলি বৃত্তাকার অংশ পাতলাই থাকিয়া যায়। এই পাতলা অংশগুলিকে **রেণুরন্ধ্র** (*germpore*) বলে। রেণু প্রথমতঃ গর্ভমুণ্ডের রসে ফুলিয়া উঠে এবং ইহার যে কোন একটি রেণুরন্ধ্রের ভিতর দিয়া একটি ছোট নল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে। এই নলটিকে **পরাগনালিকা** (*Pollen*

tube) বলা হয়। রেণু প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ একটি কোষ মাত্র। ইহার ভিতর **রেণু-মাতৃকোষ** (*Sperm mother-cell*) বিদ্যমান। এই কোষটি মাইটোসিস কোষ-বিভাগ পদ্ধতি অনুযায়ী দুই নিউক্লিয়সে বিভক্ত হয়। অপত্য নিউক্লিয়স দুইটি আকারে অসমান। বড় নিউক্লিয়সটি গোলাকার এবং ইহাকে **নালিকা**
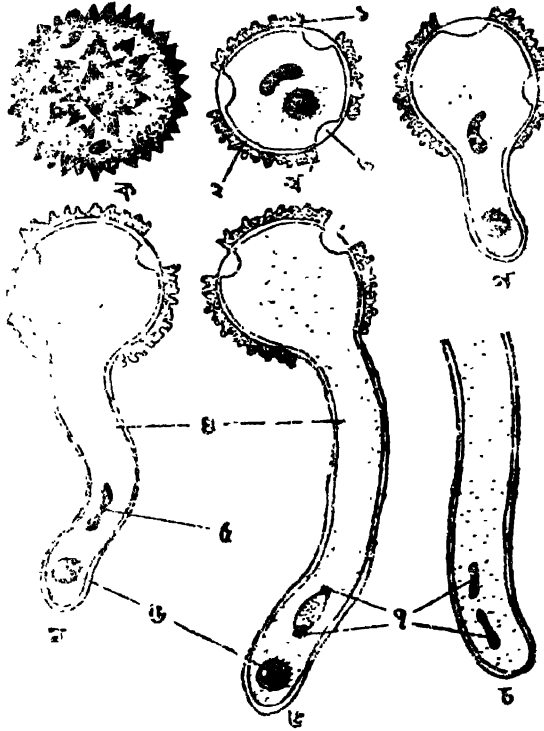
৪৫নং চিত্র

পরাগরেণুর ক্রমবৃদ্ধির বিবিধ দশা।

ক, পূর্ণাঙ্গ পরাগরেণু ; খ, পূর্ণাঙ্গ পরাগরেণুর লম্বচ্ছেদ ; গ, পরাগরেণু হইতে পরাগনালিকার ক্রমবিকাশ ; ঘ—চ, পরাগনালিকার বিবিধ অবস্থা ; ১, রেণু-বহিৰ্ত্বক ; ২, রেণু-অন্তস্ত্বক ; ৩, রেণুরন্ধ্র ; ৪, পরাগনালিকা ; ৫, জনন-নিউক্লিয়স ; ৬, বৃদ্ধি-নিউক্লিয়স ; ৭, কোষ-বিভক্তি দ্বারা জনন-নিউক্লিয়সের পুং-জনন নিউক্লিয়সে পরিণতি।

নিউক্লিয়স বা **বৃদ্ধি নিউক্লিয়স** (*Tube nucleus* or *Vegetative nucleus*) বলা হয়। অপর নিউক্লিয়সটি আকারে ক্ষুদ্র ও বক্র। ইহাকে **জনন-নিউক্লিয়স** (*Generative nucleus*) বলা হয়। পরাগনালিকাটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ

করিয়া গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়া শেষে ভ্রূণপোষকে পৌঁছায়। গর্ভদণ্ডের ভিতরকার কোষগুলি পরাগনালিকার অগ্রাংশ হইতে একপ্রকার উৎসেচক (*enzyme*) -দ্বারা দূরীভূত হইয়া যায় এবং এতদ্দ্বারা পরাগনালিকার পথ পরিষ্কার হয়।
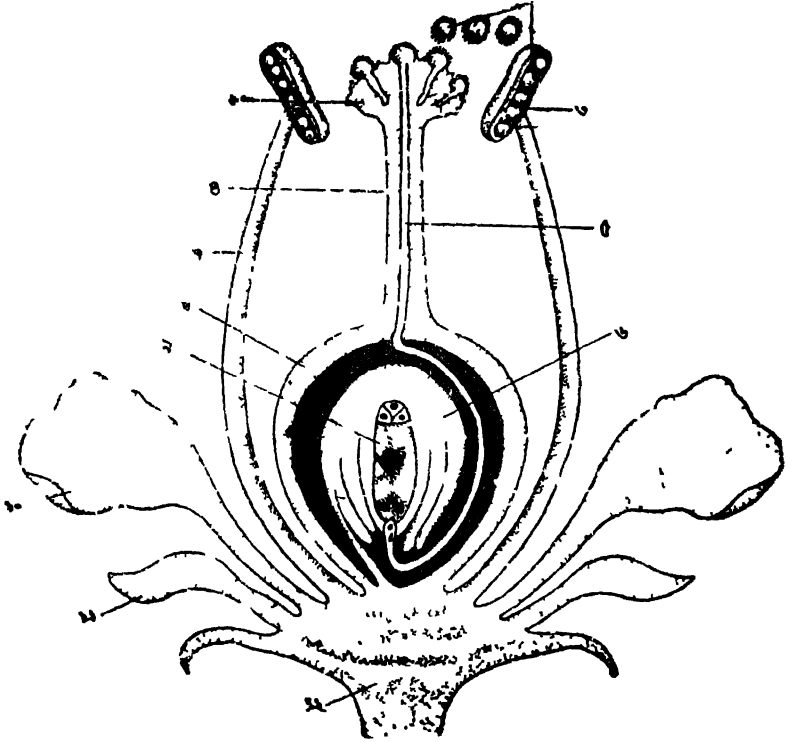
৪৬নং চিত্র

রেখাচিত্রের দ্বারা গর্ভাধান পদ্ধতি দেখানো হইতেছে।

১, পরাগরেণু, ২, গর্ভমুণ্ড, ৩, পরাগধানী, ৪, গর্ভদণ্ড, ৫, পরাগনালিকা ৬, ভ্রূণপোষক, ৭, পুংদণ্ড, ৮, গর্ভাশয়, ৯, গর্ভস্থলী, ১০, পাপড়ি, ১১, বৃত্যংশ, ১২, পুষ্পাক্ষ।

পরাগনালিকাটি ভ্রূণপোষকে পৌঁছাইবার পর উহার অগ্রভাগ ফাটিয়া যায় এবং নালিকা নিউক্লিয়সটি ভ্রূণস্থলীর সংস্পর্শে আসিয়া দ্রবীভূত হইয়া যায়। এই সময় জনন নিউক্লিয়সটি মাইটোটিস্‌• (*mitosis*) কোষ-বিভাগপদ্ধতি অনুসারে দুইটি পুংজনন-নিউক্লিয়সে পরিণত হয়। এখন পুংজনন-নিউক্লিয়স

(*male pro-nucleus*) দুইটি ডিম্বকের ভ্রূণস্থলীর ভিতরে প্রবেশ করে। ভ্রূণস্থলীর ভিতর পুংজনন-নিউক্লিয়সে প্রবেশ করিবার পূর্বে উহার ভিতরকার নিউক্লিয়সগুলির পরিবর্তন হয়। ভ্রূণস্থলীর সহকারী ও প্রতিপাদ কোষসমষ্টিগুলি দ্রবীভূত হইয়া খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। কেবলমাত্র ডিম্বাণু ও ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়স ভ্রূণস্থলীর ভিতরে অবস্থান করে। দুইটি পুংজনন নিউক্লিয়সের মধ্যে একটি ডিম্বাণু বা স্ত্রীজনন নিউক্লিয়সের সহিত মিলিত হয় এবং অপরটি ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়সের সহিত মিলিত হয়। পুংজনন নিউক্লিয়সের সহিত ডিম্বাণুর মিলনেই বীজের সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় পুংজনন নিউক্লিয়সের সহিত ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়সের মিলনের ফলে সস্য নিউক্লিয়সের উৎপত্তি হয়। সস্য নিউক্লিয়সের উৎপত্তিকে **দ্বি-গর্ভাধান** (*double fertilization*) বলা হয়। কারণ প্রথমতঃ ভ্রূণস্থলীর মধ্যে উহার দুইটি নিউক্লিয়সের মিলনে ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়সের সৃষ্টি হয় এবং ইহা আবার পুংজনন নিউক্লিয়সের সহিত দ্বিতীয়বার মিলিত হইয়া সস্য নিউক্লিয়স উৎপন্ন করে।

সাধারণতঃ পরাগনালিকা **ডিম্বকরন্ধ্রের** (*Micropyle*) ভিতর দিয়া ভ্রূণস্থলীর ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু অনেক ফুলে উহা **ডিম্বকমূলের** (*Chalaza*) ভিতর দিয়াও প্রবেশ করে। স্ত্রীজনন নিউক্লিয়স ও পুংজনন নিউক্লিয়সের মিলনের ফলে যে নিউক্লিয়সের সৃষ্টি হয়, তাহাকে **ভ্রূণাণু** (*Oospore*) বলা হয়। প্রত্যেকটি জনন-নিউক্লিয়সের অর্ধেকসংখ্যক **ক্রোমোজোম** (*Chromosome*) থাকে বা '*n*'-সংখ্যক বা **হ্যাপ্লয়েড** সংখ্যক (*Haploid number*) ক্রোমোজোম থাকে। সুতরাং সস্য নিউক্লিয়সটি পর পর তিনটি নিউক্লিয়সের সংযুক্তির ফলে সৃষ্টি হয় এবং ইহাকে আবার "*3n*" সংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট নিউক্লিয়সও বলা হয়। ডিম্বাণুর গর্ভাধানের পর ডিম্বাশয় ও ডিম্বকে নানাবিধ পরিবর্তন দ্রুতগতিতে ঘটে। অবশেষে ডিম্বাশয় ও ডিম্বক যথাক্রমে ফল ও বীজে পরিণত হয়। ডিম্বকের বিভিন্ন অংশ পরে বীজের বিবিধ অংশে পরিণত হয়। নিম্নে তাহার একটি ছক দেওয়া হইল। যথা—

ডিম্বক	বীজ
প্রথম ডিম্বকত্বক্ (1st integument)	বহিস্ত্বক (Testa)
দ্বিতীয় ডিম্বকত্বক্ (2nd integument)	অন্তস্ত্বক (Tegmen)
ডিম্বক নাড়ী (Funicle)	বীজদণ্ড (Seed stalk)

ডিম্বক	বীজ
ডিম্বক মূল (Chalaza)	ডিম্বক মূল (Chalaza)
ডিম্বক পোষক (Nucellus)	পরিভ্রূণ (Perisperm)
সহবাসী কোষ (Sanergids)	দ্রবীভূত হয়।
প্রতিপাদ কোষসমষ্টি (Antipedal)	দ্রবীভূত হয়।
সস্য নিউক্লিয়স (Endosperm nucleus)	সস্য (Endosperm)
ভ্রূণাণু (Oospore)	ভ্রূণ (Embryo)
ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle)	ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle)

অনুশীলনী

১। পরাগ-সংযোগ কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের পরাগ-সংযোগ বর্ণনা করিয়া উহার উপকারিতা ও অপকারিকতার বিষয় যাহা জান লিখ। (Define pollination. Describe various types of pollination and state its merits and demerits.)

২। গর্ভাধানের পূর্বে যে-কোন একটি পূর্ণাঙ্গ ডিম্বকের বহির্গঠন ও অন্তর্গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe the structure of a typical ovule before fertilization. Leave a neat sketch.)

৩। ফুলের পরাগ-সংযোগ কাহাকে বলে? বায়ুপরাগী ও পতঙ্গপরাগী ফুলগুলির বিবরণ দাও। (How flowers are pollinated ? Describe the peculiarities of anemophilous and entomophilous flowers.)

৪। ফুলের স্ব-পরাগ-সংযোগের ও ইতর-পরাগ-সংযোগের অভিযোজন বিশদভাবে বর্ণনা কর। (Define fertilization. Explain the process of fertilization of an ovule.)

৫। গর্ভাধান কাহাকে বলে? ডিম্বকে কিভাবে গর্ভাধান হয়, তাহা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। (Define fertilization. Explain the process of fertilization of an ovule.)

৬। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ : (i) পরাগরেণু ; (ii) ভ্রূণাণু ; (iii) জলপরাগী ; (iv) পরাগনালিকা ; (v) দ্বি-গর্ভাধান ; (vi) বিষম-পরিণতি। [Write short notes on :- (i) Pollen grain ; (ii) Oospore ; (iii) Hydrophilous ; (iv) Pollen tube ; (v) Double fertilization ; (vi) Dichogamy.]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফল

(Fruit)

গর্ভাধানের পর ডিম্বাশয়গুলি ফলে পরিণত হয়। সুতরাং পুষ্ট (ripen) বা পরিপক্ক (mature) ডিম্বাশয়কেই ফল বলা হয়। এমন কতকগুলি ফল দেখা গিয়াছে যাহার ডিম্বাশয় ব্যতীত অন্যান্য স্তবকগুলি গর্ভাধানের উত্তেজনায় পরিপক্ক হয় ও ডিম্বাশয়ের সহিত যুক্ত থাকে। চালতের ফল ইহার আদর্শ উদাহরণ। চালতের যে অংশটি আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, তাহা প্রকৃতপক্ষে ফুলের বৃত্যংশ। নানারকমের ফলকে প্রধানতঃ তিনভাবে বিভক্ত করা হয়। যথা—

(ক) **সরল ফল** (Simple Fruit) ঃ

ফুলে যখন একটিমাত্র ডিম্বাশয় থাকে এবং যখন তাহা পরিপক্ক হইয়া ফলে পরিণত হয়, তখন এইরূপ ফলকে সরল ফল বলে। আবার ফুলে যখন গর্ভপত্রগুলি যুক্ত হইয়া যুক্তগর্ভপত্রে পরিণত হয় এবং এককোষ্ঠ উৎপন্ন করে, তখন এইরূপ ফুলের ডিম্বাশয় পুষ্ট হইলে সরল ফলে পরিণত হয়। সুতরাং সরল ফল সৃষ্টিকারী ফুলে একটিমাত্র ডিম্বাশয় থাকে এবং উহা গর্ভাধানের পর একমাত্র ফলে পরিণত হয়। ফলের বাহিরের আবরণকে **ফলত্বক্** (*Pericarp*) বলে। ইহা কোন কোন ফলে **নীরস** (*Dry*) বা **সরস** (*Fleshy*) হয়। আবার কোন কোন সরল ফল পরিপক্ক হইতে হইতে আপন হইতেই ফাটিয়া যায় এবং উহার অন্তঃস্থ বীজগুলিকে ছড়াইয়া দেয়। এইরূপ ফলগুলিকে **বিদারী ফল** (*Dehiscent fruit*) বলা হয়। আবার অনেক ফল পরিপক্ক হইলেও ফাটিয়া উহার অন্তঃস্থ বীজগুলিকে ছড়াইয়া দেয় না। এইপ্রকার ফলগুলিকে **অবিদারী ফল** (*Indehiscent fruit*) বলে। সরল ফলগুলিকে উহার ত্বকের বৈশিষ্ট্য ও বীজ ছড়াইবার পদ্ধতি অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ; যথা—

(খ) **নীরস অবিদারী ফল (Dry Indehiscent Fruit):**

সাধারণতঃ এইরূপ ফলে একটিমাত্র বীজ থাকে। নীরস অবিদারী ফল ছয় প্রকারের। নিম্নে চারিপ্রকার ফলের বিবরণ দেওয়া হইল:
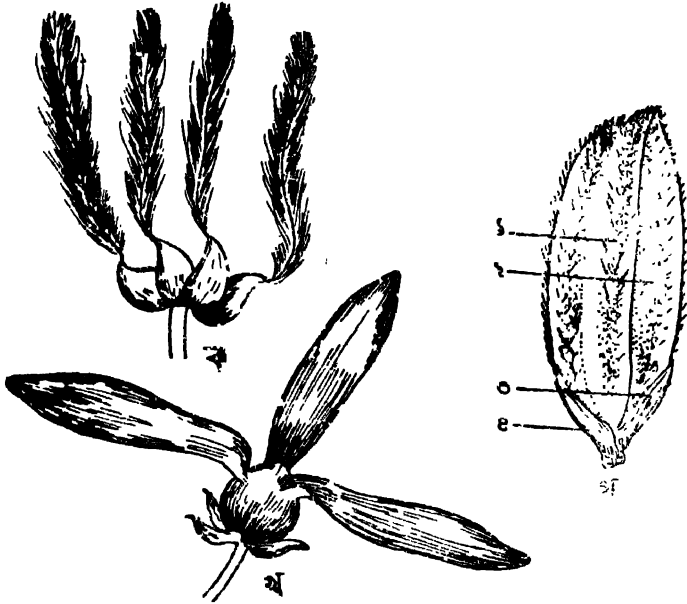
৪৭নং চিত্র

উদ্ভিদের সরল অবিদারী ফল।

ক, অ্যাকিন (ছাগলবটি) ; খ, সামারা (সজিনা), গ, ক্যারিঅপ্‌সিস্ (ধান)

১, বর্মপত্র ; ২, শিরাবর্ম ; ৩-৪, অপুষ্পক বর্মপত্র।

(i) **অ্যাকিন** (*Achene*): ইহা অধিগর্ভ (Hypogynous) এককোষ্ঠ-বিশিষ্ট (Unilocular) ডিম্বাশয় হইতে উৎপন্ন হয়। ডিম্বাশয়টিতে একটি মাত্র গর্ভপত্র বিদ্যমান। এইরূপ ফলে উহার ত্বক্ এবং উহার ভিতরকার বীজের বীজত্বক্ সম্পূর্ণ পৃথক থাকে। ছাগলবটি ও কালজিরার ফলগুলি অ্যাকিন-জাতীয়। (ii) **ক্যারিঅপ্‌সিস্** (*Caryopsis*): ইহা অ্যাকিনেরই

মত একটিমাত্র অধিগর্ভ গর্ভপত্র হইতে ইহার সৃষ্টি। কিন্তু এইরূপ ফলে উহার ফলত্বক্ এবং বীজত্বক্ এমনভাবে যুক্ত হয় যে, উহাদের পৃথক করা যায় না। ধান, ভুট্টা, গম ইত্যাদি ক্যারিঅপ্‌সিস্-জাতীয় ফলের উদাহরণ। (iii) **নাট** (*Nut*): এইরূপ ফলে একটিমাত্র বীজ থাকে ও ইহা এক, দুই বা তদধিক ডিম্বাশয় হইতে জন্মায়। গর্ভপত্রের ডিম্বাশয়টি অধিগর্ভ এবং এককোষ্ঠবিশিষ্ট। ফলত্বক্ চর্মবৎ বা কাষ্ঠল। রিটা, গর্জন, ওক ও হিজলিবাদাম (কাজুবাদাম) নাট ফলের আদর্শ উদাহরণ। (iv) **সামারা** (*Samara*): ইহা কতকগুলি যুক্তগর্ভপত্রবিশিষ্ট ফুল হইতে উৎপন্ন হয়। ডিম্বাশয় দুই বা তদধিক কোষ্ঠবিশিষ্ট হয়। ফলত্বক্ প্রসারিত হইয়া দুই বা তদধিক ডানায় (wings) পরিণত হয়। প্রতিটি ডানার মধ্যে একটি বীজ থাকে। মাধবীলতার ফল ইহার আদর্শ উদাহরণ।

৪৮নং চিত্র
উদ্ভিদের সরল অবিদারী ফল।
নাট-জাতীয় ফল (হিজলী বাদাম)।
১ ফল ; ২ পুষ্পাক্ষ।

(গ) **নীরস বিদারী ফল** (**Dry dehiscent fruit**):

নিম্নে প্রধানতঃ তিন প্রকারের নীরস ফলের বিবরণ দেওয়া হইল: (i) **শিম্ব** (*Legume* or *pod*): এই প্রকার ফল একটিমাত্র গর্ভপত্র হইতে সৃষ্ট হয়। ডিম্বাশয় অধিগর্ভ এবং এককোষ্ঠবিশিষ্ট হয়। ফল পাকিলে উহার দুই সন্ধি দিয়া ফাটিয়া যায়। বক, অতসী, মটর, ছোলা প্রভৃতি ফল শিম্ব-জাতীয়। যখন শিম্ব-জাতীয় ফল উহার ভিতরকার বীজের স্থিতি অনুসারে ভাঁজে ভাঁজে ভাগ হইয়া যায়, তখন এইরূপ ফলকে **বাবলা-শিম্ব** (*Lomentum*) বলা হয়। বাবলা গাছের ফল বাবলা-শিম্বের উদাহরণ:

(ii) **ফলিকল** (*Follicle*): ইহাও একটিমাত্র গর্ভপত্র হইতে সৃষ্ট হয়। এই গর্ভপত্রের ডিম্বাশয়টি অধিগর্ভ এবং এককোষবিশিষ্ট। কিন্তু এই ফলটি দুই সন্ধি দিয়া না ফাটিয়া অক্ষীয় দিকের সন্ধি দিয়া ফাটে। আকন্দ গাছের ফল ইহার আদর্শ উদাহরণ। (iii) **ক্যাপসিউল** (*Capsule*): ইহা
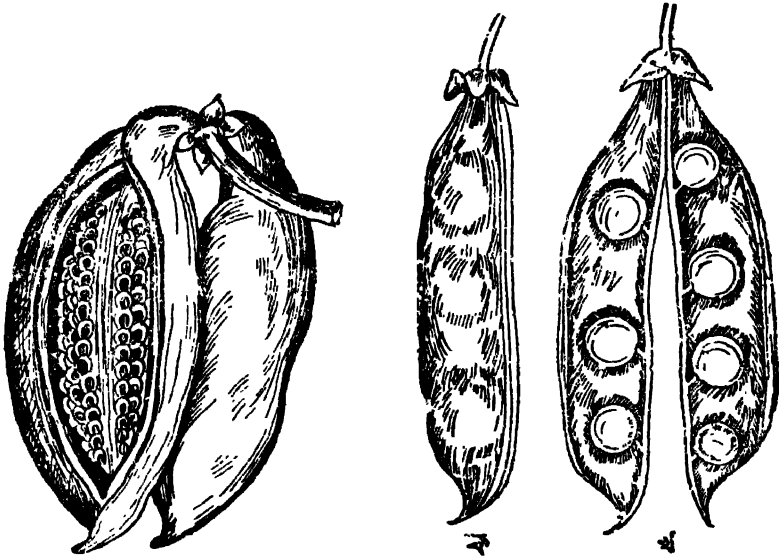
৪৯নং চিত্র
উদ্ভিদের সরল বিদারী ফল।
ফলিকল-জাতীয় ফল (আকন্দ)
দেখানো হইতেছে।

৫০নং চিত্র
উদ্ভিদের সরল বিদারী ফল।
ক, পূর্ণাঙ্গ শিম্ব-জাতীয় ফল (কলাইশুঁটি);
খ, বিদীর্ণ অবস্থায় দেখানো হইতেছে।

দুইটি বা তদধিক যুক্তগর্ভপত্র হইতে উৎপত্তিলাভ করে। ডিম্বাশয়টি অধিগর্ভ এবং বহুকোষবিশিষ্ট। ফল পাকিলে ফলত্বক্ কোষ্ঠ অনুযায়ী পাটে পাটে ফাটিয়া যায়। কার্পাস, ঢেঁড়স ও ধুতুরা প্রভৃতি গাছের ফল ক্যাপসিউল-জাতীয়।

(ক) **সরস ফল (Flesby fruit) :**
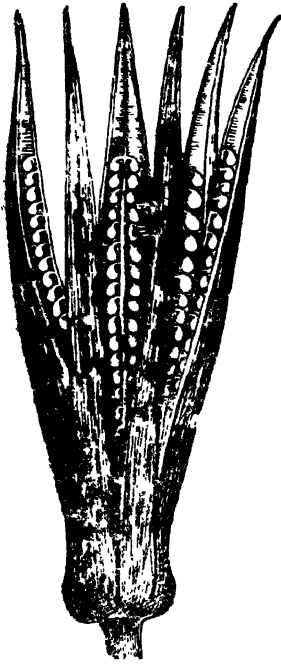
৫১নং চিত্র
উদ্ভিদের সরল বিদারী ফল।
ক্যাপসিউল-জাতীয় ফল (ঢেঁড়স)
দেখানো হইতেছে।

সরস ফল সকলেরই বিশেষভাবে পরিচিত। ইহাদের ত্বক্ পুরু ও রসাল হয়। ফলত্বক্‌টিকে তিন স্তরে পৃথক করা যায়; যথা—(১) **বহিস্ত্বক্** (*Ectocarp*) বা বাহিরের খোসা : (২) **মধ্যত্বক্** (*Mesocarp*) বা ফলত্বকের মাঝের অংশ। এই অংশটি বহিস্ত্বকের নিচে থাকে এবং সাধারণতঃ রসাল হয়; (৩) **অন্তস্ত্বক্** (*Endocarp*) বা ফলত্বকের ভিতরকার অংশ। ইহা সাধারণতঃ কঠিন হয়। সরস ফল কখনও ফাটে না। ফলটি পরিপক্ক হইলে মাটিতে পতিত হয় এবং উহার ত্বক্ পচিয়া গেলে বীজটি বাহির হইয়া পড়ে। বহুপ্রকার সরস ফলের মধ্যে মাত্র দুই প্রকারের বর্ণনা দেওয়া হইল : (i) **ড্রুপ** (*Drupe*) : ইহা একটি কিংবা বহু গর্ভপত্র হইতে সৃষ্ট হয়। ডিম্বাশয়টি অধিগর্ভ এবং ইহাতে একটিমাত্র বীজ থাকে। ফলে ত্বক্ তিনটি স্তরে, অর্থাৎ বহিস্ত্বক্, মধ্যত্বক্ ও অন্তস্ত্বকে বিভেদিত। আম, কুল, পিচ গাছের ফল ড্রুপ-জাতীয়। আমের বহিস্ত্বক্ পাতলা হয়। উহার মধ্যত্বক্‌টি রসাল ও সুমিষ্ট।

বহিস্ত্বক্‌টি পুরু ও কঠিন হইয়া বীজের চারিপাশে বেষ্টন করিয়া থাকে। নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি ফলও ড্রুপ-জাতীয়। ইহাদের মধ্যত্বক্‌টি তন্তুময়। নারিকেলের তন্তুময় মধ্যত্বক্ হইতেই দড়ি তৈয়ারী হয়। যে-সকল ফলের মধ্যত্বক্‌টি তন্তুময়, উহাদের **তন্তুময় ড্রুপ** (*Fibrous drupe*) বলে। (ii) **বেরি** (*Berry*) : ইহাও একটি গর্ভপত্র বা কতকগুলি যুক্ত-গর্ভপত্র হইতে উৎপত্তিলাভ করে। ইহার বহিস্ত্বক্ সাধারণতঃ পাতলা

ও মসৃণ হয়। মধ্যত্বক্ ও বহির্ত্বক্ কোন কোন ফলে যুক্ত থাকে, আবার কোন কোন ফলে ইহারা পৃথক অবস্থায় থাকে। ডিম্বাশয়ের অমরাবিন্যাস সাধারণতঃ বহুপ্রান্তীয় বা অক্ষীয় হয়। বিলাতী বেগুন, বেগুন, আঙ্গুর, কলা, পেয়ারা,
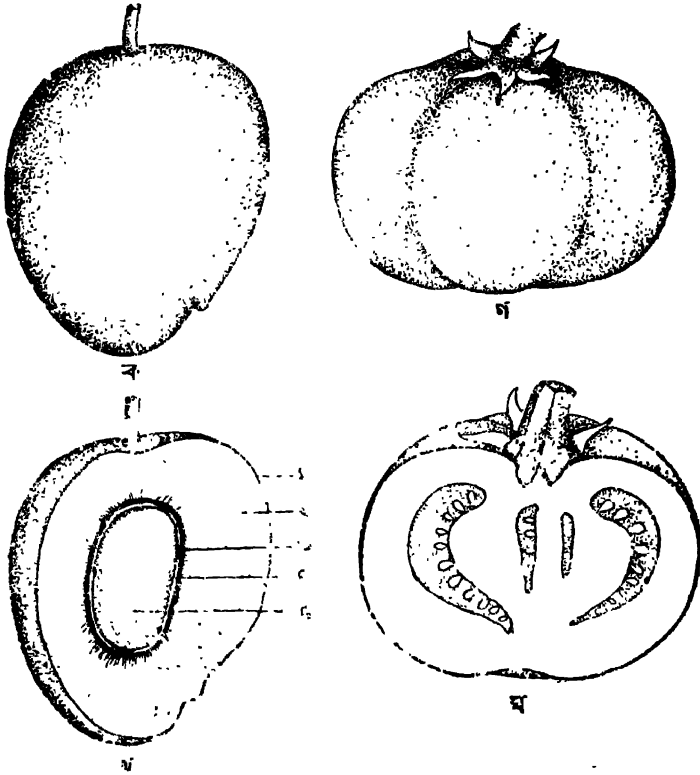
৫২নং চিত্র

উদ্ভিদের সবল সরস ফল।

ক, ড্রুপ-জাতীয় (আম) পূর্ণাঙ্গ ফল ; খ, আমের লম্বচ্ছেদ ; ১, বহির্ত্বক্ ; ২, মধ্যত্বক্ ; ৩-৪ অন্তস্ত্বক্ ; ৫, বীজ ; গ, বেরি জাতীয় (বিলাতী বেগুন) পূর্ণাঙ্গ ফল ; ঘ, বিলাতী বেগুনের লম্বচ্ছেদ।

খেজুর, পেঁপে প্রভৃতি গাছের ফল বেরি-জাতীয়। কলা ও পেয়ারা অধোগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে সৃষ্ট হয় এবং বাকিগুলির অধিগর্ভ ডিম্বাশয় হইতে উৎপত্তি হয়।

(খ) গুচ্ছিত ফল (Aggregate fruit) ঃ

এইরূপে ফল একটি ফুলের অনেকগুলি মুক্তগর্ভপত্র হইতে উৎপত্তিলাভ করে। সুতরাং প্রতিটি গর্ভপত্রের ডিম্বাশয় হইতে একটি করিয়া সরল ফলের সৃষ্টি হয়।

সরল ফলগুলি গুচ্ছিতভাবে পুষ্পাধারের উপর থাকে। প্রকৃতপক্ষে গুচ্ছিত ফল কতকগুলি ছোট ছোট সরল ফলের গুচ্ছ মাত্র। এইপ্রকার ফলের গুচ্ছকে **ইটারিও** (*Etaerio*) বলে। নিম্নে কতকগুলি গুচ্ছিত ফলের বিবরণ দেওয়া হইল; যথা—(i) **অ্যাকিনের গুচ্ছ** (*Etaerio of achene*): ইহা একটি ফুল হইতে উৎপত্তি লাভ করে। ছাগলবটি গাছের ফল ইহার আদর্শ উদাহরণ। (ii) **ফলিকলের গুচ্ছ** (*Etaerio of follicle*): ইহাও একটি ফুলের অনেকগুলি মুক্ত গর্ভপত্র হইতে উৎপত্তিলাভ করে। চাঁপা, নয়ন-তারা, স্টারকুলিয়া প্রভৃতি গাছের ফল ইহার উদাহরণ। **বেরির গুচ্ছ** (*Etaerio of berries*)। এইরূপ গুচ্ছিত ফলের প্রতিটি ফল প্রকৃতপক্ষে সরল বেরি-জাতীয়। কাঁটালিচাপা গাছের ফল ইহার উদাহরণ।

৫৩নং চিত্র
উদ্ভিদের গুচ্ছিত ফল দেখানো হইতেছে।
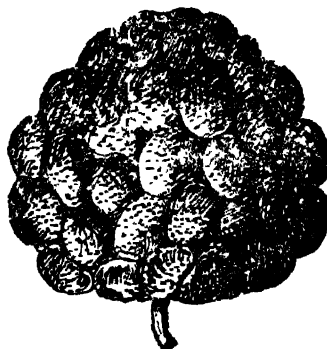
৫৪নং চিত্র
উদ্ভিদের বিশেষ গুচ্ছিত ফল দেখানো হইতেছে।
ক. আতার লম্বচ্ছেদ; সম্পূর্ণ আতা।

আতা একপ্রকার বিশেষ গুচ্ছিত ফল। ইহা একটি ফুলের কতকগুলি মুক্তগর্ভপত্র হইতে জন্মায়। গর্ভপত্রের অগ্রভাগ পরস্পর পরস্পরের সহিত

সংযুক্ত থাকে এবং ইহা দ্বারা একটি গুচ্ছিত ফলত্বক্ আতার চারিপাশে দেখা যায়। পুষ্পদণ্ডটিও পুষ্ট হইয়া আতার মধ্যস্থলে লম্বালম্বিভাবে থাকে।

(গ) **যৌগিক ফল (Multiple fruit) :**

সমগ্র ফুলের পুষ্পবিন্যাসটি যখন পরিপক্ক হইয়া একটি ফলে পরিণত হয়, তখন এইরূপ ফলকে যৌগিক ফল বলা হয়। যৌগিক ফল দুই প্রকারের ; যথা— (i) **সোরোসিস** (*Sorosis*) **:** এইরূপ ফল প্রচুর স্ত্রী-পুষ্প সন্নিবেশিত পুষ্পবিন্যাস হইতে সৃষ্ট হয়। স্ত্রী-পুষ্পগুলি মঞ্জরীসমেত বৃত্তাকারে ঘন-সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। মঞ্জরীদণ্ডসমেত সমস্ত ফুল একত্রে একটিমাত্র ফলের সৃষ্টি করে। আনারস ও কাঁটাল সোরোসিস ফলের উদাহরণ। আনারসের 'চোখ" একটি ফুলের পুষ্পপুটের চিহ্ন। সুতরাং কত ফুলের দ্বারা আনারস ফলটি সৃষ্ট হইয়াছে,
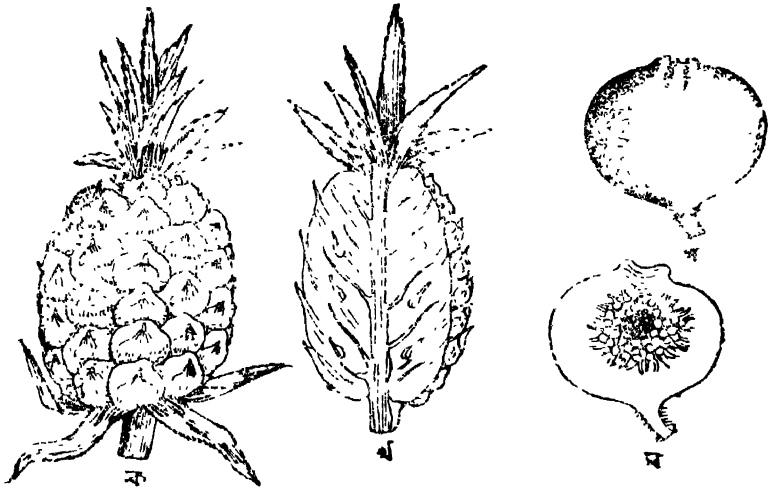
৫৫নং চিত্র

উদ্ভিদের যৌগিক ফল।

ক, সোরোসিস (আনারস) ; খ, আনারসের লম্বচ্ছেদ ;
গ, সাইকোনাস (ডুমুর) ; ঘ, ডুমুরের লম্বচ্ছেদ।

তাহা গণনা করিয়া জানা যায়। কোয়াগুলি পুষ্পপুট হইতেই জন্মায় এবং প্রত্যেকটি কোয়ার মধ্যে একটি করিয়া বীজ থাকে। (ii) **সাইকোনাস** (*Syconus*)—ইহা উদুম্বর পুষ্পবিন্যাস হইতে উৎপত্তিলাভ করে। আগেই বলা হইয়াছে যে, উদুম্বর পুষ্পবিন্যাস পেয়ালার মত এবং পেয়ালার ভিতরকার

গাছে প্রচুর স্ত্রী-পুষ্প ও পুং-পুষ্প জন্মায়। প্রতিটি পুষ্প ফলে পরিণত হয় এবং পেয়ারার মত পুষ্পাধারটি পুষ্ট হইয়া যৌগিক ফলের সৃষ্টি করে। ডুমুর, বট, অশ্বত্থ গাছের ফলগুলি সাইকোনাস-জাতীয়। নিম্নে উপরি-উক্ত বিবিধ ফলের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী উদাহরণসহ একটি ছক দেওয়া হইল :
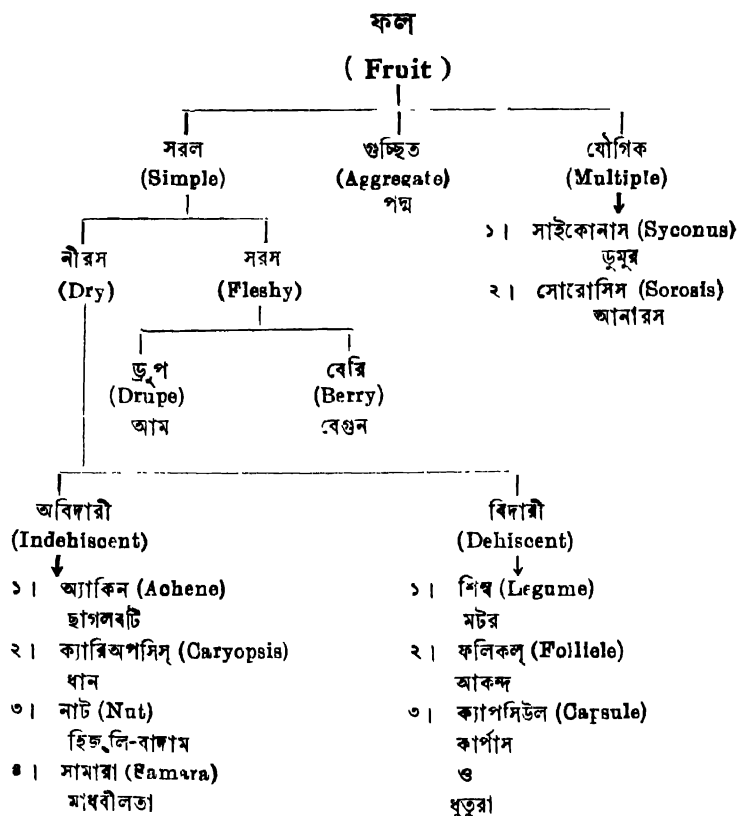
ফল ও বীজের বিস্তার
(Dispersal of fruits and seeds)

ফল ও বীজ বিস্তারের কারণঃ গাছ আপন ফল বা বীজ বিস্তার করিতে পারে না, অর্থাৎ দূরে ছড়াইতে পারে না। সুতরাং বীজগুলি ফল-সমেত গাছের তলায় পতিত হয়। গাছের তলাকার মাটিতে সার বা জল অপেক্ষাকৃত কম

থাকে। কারণ মূল গাছ প্রধানতঃ তলাকার মাটি হইতে সার ও জল শোষণ করিয়া লয়। বীজগুলি সেইজন্য গাছের মূলে পতিত হইলে জল বা সারের অভাবে অঙ্কুরিত হইলেও উহারা বেশীদিন বাঁচিতে পারে না এবং বাঁচিলেও ভালোভাবে ফুল বা ফল ধারণ করিতে পারে না। আবার মূল গাছের নিম্নে অঙ্কুরিত হওয়ায় উহারা উপযুক্ত আলোক ও বাতাস পায় না। সুতরাং বীজের বিস্তার অত্যন্ত আবশ্যক। যাহারা আতা-বাগান দেখিয়াছ, তাহারা বীজ ও ফল বিস্তারের তাৎপর্য ভালোভাবে বুঝিতে পারিবে। আতা পাকিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় বা পাখীরা আতাফল খাইবার পর বীজগুলি মাটিতে ফেলিয়া দেয়। মূল আতাগাছের তলায় এইভাবে অসংখ্য চারা আতাগাছ জন্মায়। পরবর্তী বৎসরে মূল গাছে ফল পাইলেও উহার আকার ছোট হয় এবং সংখ্যায়ও কম হয়। পরবর্তী দ্বিতীয় বৎসরে চারাগাছগুলিও বড় হইয়া যায় এবং মূল গাছের মত ইহারাও ফুল দেয়। কিন্তু মাটিতে সার না থাকায় অধিকাংশ ফুল ঝরিয়া পড়ে এবং সামান্য ফুল ছোট ছোট ছোট ফলে পরিণত হয়। পরবর্তী তৃতীয় বৎসরে আতা-বাগানের আতাগাছই থাকে কিন্তু ফল হয় না। তোমরা জান, গাছের চলনশক্তি হাতিয়ারের সাহায্যে গ্রহণ করে। সাধারণতঃ বায়ু, জল, জীবজন্তুর দ্বারা ফল ও বীজের বিস্তার হয়। নিম্নে উহারা কি-ভাবে বিস্তারলাভ করে তাহা বর্ণনা করা হইতেছে।

১। বাতাসের দ্বারা বিস্তার (Dispersal by wind) :

যে-সকল ফল বা বীজ বায়ু বা বাতাসের সাহায্যে বিস্তারলাভ করে, সাধারণতঃ ইহারা খুবই হাল্কা হয়। কতকগুলি ফলের বীজের নানাপ্রকারের উপাঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং ইহার দ্বারাই ফল বা বীজ বাতাসে উড়িয়া বেশ কিছুদূর বিস্তারলাভ করে। নিম্নে এইরূপ ফল ও বীজের কিছু উদাহরণ সবিস্তারে বর্ণনা করা হইল ; যথা—(i) অর্কিড গাছের বীজগুলি বাতাসে উড়িয়া যায়। কতকগুলি ঘাসের বীজ ও ফল বাতাসে উড়িয়া বিস্তার লাভ করে। বাতাসে এইরূপ বীজ উড়িয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারিত হয়। এক আউন্স সিনকোনা বীজের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ হাজার বীজ থাকে। (ii) ক্যাপসিউল ও ফলিকল-জাতীয় ফল পাকিলে উহার ত্বক্ পাটে পাটে খসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় বীজগুলি অনাবৃত থাকে এবং বাতাসের আঘাতে মাটিতে পড়ে। যদিও এইরূপ ফলের বীজ মূল গাছের (Parent Plant) বিশেষ দূরে যায় না, তবুও গাছের

ঠিক মূলে পতিত হয় না। ধুতুরা, ঢেঁড়স, শিয়ালকাঁটা, হাসনালতা (*Aristolochia*) প্রভৃতি গাছের বীজ উপরিউক্ত উপায়ে বিস্তারিত হয়। (iii) অনেক ফলের বা বীজের চারিপাশে সূক্ষ্ম চুলের মত গোছা গোছা শুঁয়া থাকে। ইহাদের সাহায্যে বীজ বা ফলগুলি বাতাসে বেশ কিছুদূর উড়িয়া
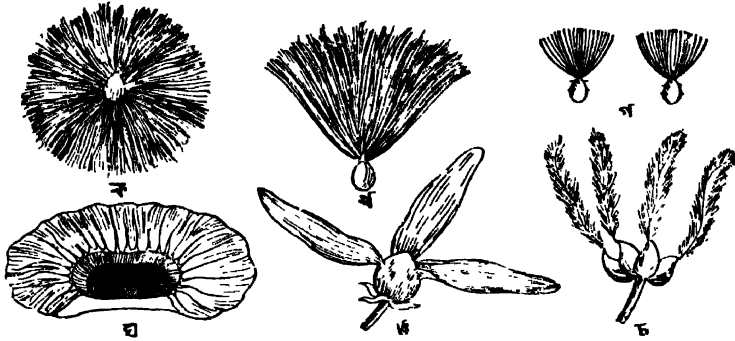
৫৬নং চিত্র

ফল ও বীজের বাতাসের দ্বারা বিস্তার।

ক, কার্পাসের বীজ; খ, আকন্দের বীজ; গ, সূর্যমুখীর বীজ; ঘ, বিস্তারিত ডানাবিশিষ্ট ওরোজাইলনের (Oroxylon) বীজ; ঙ, সজিনার বীজ; চ, ছাগলবটির বীজ।

বিস্তারিত হয়। শিমূল ও কার্পাস বীজের চারিপাশে এইরূপ শুঁয়া থাকে। আকন্দ, কুরচি প্রভৃতি বীজের একধারে শুঁয়ার গোছা থাকে। আবার কাশ-গাছের ফলেও শুঁয়া থাকে। (iv) কুক্‌শিমা, সূর্যমুখী গাছের বীজের একধারে খোলা ছাতার মত শুঁয়া দেখা যায়। শুঁয়াগুলি ফুলের বৃত্যংশের পরিবর্তিত রূপ এবং ইহাদের প্যাপস্ (*Pappus*) বলা হয়। বীজগুলিকে বাতাসে উড়িবার সময় প্যারাস্যুটের মত দেখা যায়। বহুদূর পর্যন্ত এইভাবে প্যাপস্-ধারী বীজগুলি বিস্তারিত হয়। (v) অনেক গাছের বীজে বীজত্বক চ্যাপটা, হালকা পাখনার মত হয়। শালগাছের ফুলের বৃত্যংশ শুকাইয়া ফলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বৃত্যংশগুলি পাখনায় পরিণত হয় এবং ইহার দ্বারা ফলগুলি বাতাসে উড়িয়া যায়। মাধবীলতা, কনকচাঁপা, তুঁত, মেহগনি, হাসনালতা প্রভৃতি গাছের বীজে এইরূপ পাখনার মত ফলত্বক বিদ্যমান।

২। জলের দ্বারা বিস্তার (Dispersal by water):

সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদের বীজ ও ফল জলের সাহায্যে বিস্তারিত হয়। নদী বা সমুদ্রের ধারে যে-সকল উদ্ভিদ্ জন্মায়, তাহাদের কিছু কিছু ফল জলের সাহায্যে বিস্তারলাভ করে। সুপারি, নারিকেল, গোলপাতা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলের ত্বকের ভিতর দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না এবং উহারা আকারে বেশ বড় হয়। ফলের ভিতর প্রচুর বাতাবকাশ থাকে এবং সেইজন্য উহারা জলে ভাসিতে ভাসিতে বহুদূর চলিয়া যায়। ফলত্বক্ জলরোধক হওয়ায় উহার মধ্যস্থ বীজটিও পচিয়া যায় না। সেইরূপ শালুক, শাপলা, অ্যালিস্‌মা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের বীজের ত্বকে বাতাবকাশ থাকে। পদ্মের ফলগুলি পুষ্পাক্ষের মধ্যে এবং পুষ্পাক্ষ জলরোধক হওয়ায় ফলগুলি নষ্ট হয় না। সুতরাং ইহারাও জলের স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়।
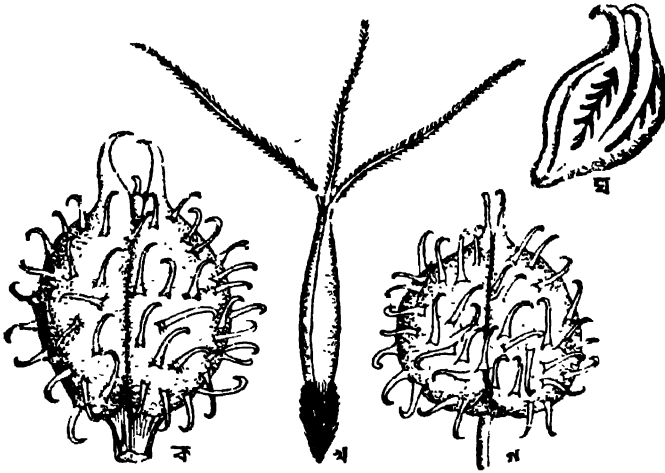
৫৭নং চিত্র

ফল ও বীজ প্রাণীর দ্বারা বিস্তার।

ক, ওকড়া গাছের ফল ; খ, চোরকাঁটা গাছের ফল ; গ, বনওকড়া গাছের ফল ; ঘ, বাঘনখের ফল।

৩। জীবজন্তুর দ্বারা বিস্তার (Dispersal by animals):

রসাল ও কণ্টকপরিবেষ্টিত ফলগুলিই জীবজন্তুর দ্বারা বিস্তারলাভ করে। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ প্রকারের ফলের বীজের উদাহরণ দেওয়া হইল। (i) বীজ বা ফলে কাঁটা, অঙ্কুশ বা আঠালো গ্রন্থি থাকায় শাকাশী প্রাণীদের পদে বা মুখে

আটকাইয়া যায়। প্রাণীগুলি পরে চলিতে চলিতে বীজগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়। এমনকি মানুষের দেহ-বস্ত্রেও বহুপ্রকার উদ্ভিদের বীজ আটকাইয়া যায়। এইভাবে ফল ও বীজগুলি বহুদূরে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। আপাং, চোরকাঁটা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলে কাঁটা থাকে। হুডহুডি, পুনর্নভা প্রভৃতি গাছের ফলে আঠালো গ্রন্থি বিদ্যমান। প্লাণ্টাগোর উদ্ভিদের বীজও আঠালো। (ii) রসাল ফলগুলি পাকিয়া গেলে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে এবং সুমিষ্ট হয়। পাখীরা সাধারণতঃ এইরূপ ফল ভক্ষণে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা রসাল ফলগুলিকে ঠোঁটের সাহায্যে নিরাপদ স্থানে লইয়া যায় এবং শাস বা রসাল বস্তুসকল ভক্ষণ করিয়া কঠিন বীজটিকে মাটিতে নিক্ষেপ করে। এইরূপে বহু ফলের বিস্তার হয়। টিয়া, ময়না, হলুদ-বসন্ত, কাক, পায়রা প্রভৃতি পাখীরা বট, অশ্বথ, জাম প্রভৃতি গাছের ফল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। বীজগুলি উহাদের পাকস্থলীর ভিতর হজম হয় না এবং উহাদের মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া মাটিতে পতিত হয়। এইভাবে পাখীদের দ্বারা বহুদূর পর্যন্ত বীজ বা ফলের বিস্তার হয়। (iii) কাঠবিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি বীজ-ভক্ষণকারী প্রাণীরা বাদাম, গম, ধান প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ মুখে করিয়া নানাস্থানে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখে। এইপ্রকার সঞ্চারের জন্য বীজের বিস্তার সম্ভবপর হয়। (iv) শৃগাল, বানর প্রভৃতি প্রাণীরা খেজুর, কুল, জাম প্রভৃতি ফল খাইয়া পাখীদের মত যেখানে-সেখানে বীজগুলিকে মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায় ত্যাগ করে। (v) কুচ, নটকন প্রভৃতি অতি সুন্দর অথচ অখাদ্য ফলগুলিকে পাখীরা খাদ্য মনে করিয়া ঠোঁটের সাহায্যে বহুদূর বহন করে। ভক্ষণের সময় ভুল বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মাটিতে নিক্ষেপ করে। (vi) বাঘনখ, বনওকড়া ইত্যাদি ফলের গর্ভমুণ্ডটি অঙ্কুশে পরিণত হয়। অঙ্কুশ (*claw*) সাধারণতঃ শাকাশী প্রাণীদের দেহে আটকাইয়া যায় এবং এইভাবে দূরে দূরে বিস্তারলাভ করে। (vii) জলচর প্রাণীগুলি অর্থাৎ বক, হাঁস ইত্যাদি পাখীগুলি ঠোঁটের সাহায্যে এবং পদের দ্বারাও বহু জলজ উদ্ভিদের বীজ বহন করে। ইহার দ্বারা বীজ ও ফলের বিস্তার বিভিন্ন জলাশয়ে হয়। (viii) মানুষ নিজ বুদ্ধির দ্বারা বীজ ও ফলের বিস্তার সুপরিকল্পিতভাবে করে। সুন্দর সুন্দর ফুল ও উপকারী ফলের বীজ আমরা দেশ-বিদেশ হইতে আমদানি ও রপ্তানি করি এবং নানা স্থানে বীজ বপন করিয়া উদ্ভিদের বংশবিস্তারে সাহায্য করিয়া থাকি। শুধু ইহাই নহে, কোন্ মৃত্তিকা কিরূপ উদ্ভিদের উপযুক্ত এবং কোন্

উদ্ভিদের কিরূপ সার দরকার, তাহাও গবেষণার দ্বারা আমরা অবগত হই। ইহার দ্বারা আমরা উপযুক্ত ক্ষেতে সঠিকভাবে উদ্ভিদের বীজ বপন করিয়া থাকি। এইরূপে বীজের বিস্তার ব্যতীত উহাদের শক্তিও বাড়িয়া যায়। পানিফল, বড়-পানা, চা, সিনকোনা, ট্যাপিওকা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ মানুষই বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনিয়া বপন করিয়াছে।

৪। বিদারী ফলের দ্বারা বিস্তার (Dispersal by explosive fruits) ঃ

কতকগুলি ফল পাকিবার পর উহার ফলত্বক্ সজোরে ফাটিয়া উহার মধ্যস্থ বীজগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু বীজগুলি বিশেষ দূরে নিক্ষিপ্ত হয় না। দোপাটি, হাজরামূল, আমরুল প্রভৃতির উদ্ভিদের ফল স্পর্শ করিলেই হঠাৎ ফাটিয়া যায় এবং উহার ভিতরকার বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। চটপটে, কুলেখাড়া বা কোকিলাক্ষ, কালমেঘ প্রভৃতি ফল জলের সংস্পর্শে ফাটিয়া যায় এবং ভিতরকার বীজ বাহিরে নিক্ষেপ করে। মটর, অপরাজিতা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলগুলি পাকিয়া গেলে উহা দুই সন্ধি দিয়া ফাটিয়া যায় এবং ফলত্বকের দুই ভাগ পাকাইয়া যায়। ইহাতে ফলের ভিতরকার বীজগুলি নিক্ষিপ্ত হয়। ধুন্দুলের ফল পাকিয়া গাছ হইতে মাটিতে পড়িবার পর উহার শীর্ষস্থ ছিদ্র হইতে বীজগুলি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। লতা-কাঞ্চন গাছের এক ফুট লম্বা শিম্ব-জাতীয় ফলটি পাকিয়া গেলে পর হঠাৎ সজোরে ফাটিয়া গিয়া উহার ভিতরকার বীজগুলিকে নিক্ষেপ করে।

অনুশীলনী

১। ফল কাহাকে বলে? ফলের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ের সংক্ষেপে বিবরণ দাও। (What is a fruit ? Give a short account for the classification of fruits.)

২। ফল ও বীজের বিস্তার-পদ্ধতির কারণ কি? ফল ও বীজগুলি কি-ভাবে বিস্তারিত হয়, তাহা চিত্র ও উদাহরণসহ বর্ণনা কর। (What are the significance of the dispersal of fruits and seeds. Describe the process of the dispersal of fruits and seeds with sketches and examples.)

৩। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ :

(i) ক্যারিঅপ্‌সিস্, (ii) সামারা, (iii) ক্যাপসিউল, (iv) তন্তুময় ড্রুপ, (v) সোরোসিস। [Write short notes on :—(i) Caryopsis, (ii) Samara, (iii) Capsule, (iv) Fibrous drupe, (v) Sorosis.]

বীজ

(Seed)

বীজপত্র অনুযায়ী বীজ দুই প্রকারের। বীজে যখন একটিমাত্র বীজপত্র থাকে, তখন তাহাকে **একবীজপত্রী** (*Monocotyledonous*) বলা হয় এবং বীজে যখন দুইটি বীজপত্র থাকে, তখন তাহাকে **দ্বিবীজপত্রী** (*Dicotyledonous*) বলে। মটর, ছোলা, তেঁতুল, রেড়ি, কুমড়া ইত্যাদি দ্বিবীজপত্রী; আবার ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি উদ্ভিদের দানাগুলি একবীজপত্রী; দ্বিবীজপত্রীর অন্তর্ভুক্ত মটরবীজের গঠন নিম্নে দেওয়া হইল :

মটরবীজের গঠন (Structure of a Pea seed) :

দ্বিবীজপত্রী বীজে সাধারণতঃ দুইটি বীজত্বক্ (seed coat) থাকে। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত স্থূল হয় এবং বাহিরে বীজত্বক্‌কে **বীজবহিস্ত্বক্** (*testa*) বলে।
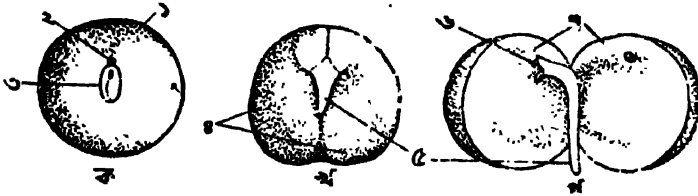
৫৮নং চিত্র

বীজ ও বীজের অন্তর্গঠন।

মটরবীজের বিভিন্ন অংশ দেখানো হইতেছে। ক, মটরবীজ ; ১, বীজবহিস্ত্বক্ ; ২, ডিম্বক-রন্ধ্র ; ৩, ডিম্বক-নাভি। খ, ত্বকহীন মটরবীজ ; ৪, বীজপত্র ; ৫, ভ্রূণমূল। গ, মটরবীজের বীজপত্র দুইটিকে পৃথক্ করিয়া উহার ভ্রূণ দেখানো হইতেছে ; ৬, ভ্রূণমুকুল ; ৭, বীজপত্র।

বহিস্ত্বকের ভিতরে অন্তস্ত্বক্ বিদ্যমান ; এই অন্তস্ত্বক্‌টি খুবই পাতলা ঝিল্লীর মত। ইহা হাল্কাভাবে বীজের ভিতরকার অংশটিকে বা ভ্রূণটিকে (*Embryo*) পরিবেষ্টিত করে। ইহাকে বীজের **বীজ-অন্তস্ত্বক্** (*Tegmen*) বলা হয়। সরল দ্বিবীজপত্রী বীজে বহিস্ত্বক সর্বদাই থাকে, কিন্তু কোন কোন বীজে অন্তস্ত্বক্ থাকে না। বহিস্ত্বকের উপর একটি সূক্ষ্ম গোলাকার চাপা ক্ষত দেখা যায়। এই চাপা ক্ষত অংশটিকে **ডিম্বক-নাভি** (*hilum*) বলে। ডিম্বক-নাভির উপরভাগে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখা যায়। বীজটিকে একদিন

জলে ভিজাইয়া রাখার পর উহাকে দুই অঙ্গুলী দিয়া চাপ দিলে ডিম্বক-নাভির মধ্যস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া জল বাহির হইতে দেখা যায়। এই ছিদ্রটিকে **ডিম্বক-রন্ধ্র** (*Micropyle*) বলে। এখন বীজত্বক্ দুইটি অপসারিত করিলে অন্তর্বীজটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তর্বীজটিকে চাপ দিলে উহা দুইটি পুরু ও শাঁসালো খণ্ডে বিভক্ত হয়। এই খণ্ড দুইটিকে **বীজপত্র** (*Cotyledon*) বলে। ধীরে ধীরে খণ্ড দুইটি খুলিলে উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাঁকা দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এই দণ্ডটি দুইটি বীজপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। এই বক্র দণ্ডটিকে **ভ্রূণাক্ষ** (*Axis*) বলা হয়। বীজের বীজপত্র এবং ভ্রূণাক্ষটিকে একত্রে **ভ্রূণ** (*Embryo*) বলা হয়। ভ্রূণাক্ষের যে প্রান্তটি বীজপত্র দুইটিকে অতিক্রম করিয়া ডিম্বক-রন্ধ্রের দিকে থাকে, তাহাকে **ভ্রূণমূল** (*Radicle*) বলা হয়। ভ্রূণের বিপরীত প্রান্তটি বীজপত্রের মধ্যে বিদ্যমান। এই প্রান্তটিকে ভ্রূণাক্ষের **ভ্রূণমুকুল** (*Plumule*) বলা হয়। ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুল হইতে যথাক্রমে উদ্ভিদের মূল ও বিটপের উৎপত্তি হয়। ভ্রূণাক্ষের সহিত বীজপত্রের সংযোগস্থানটিকে **পর্বস্থান** (*Nodal zone*) বলে। ভ্রূণমুকুল হইতে ভ্রূণাক্ষের পর্বস্থান পর্যন্ত অংশকে **বীজপত্রাধিকাণ্ড** (*Epicotyle*) বলে এবং ভ্রূণাক্ষের পর্বস্থান হইতে ভ্রূণমূল পর্যন্ত অপর অংশটিকে **বীজ-পত্রাবকাণ্ড** (*Hypocotyle*) বলা হয়।

বীজপত্রগুলি মটরবীজের ন্যায় স্থূল হয় এবং ইহার ভিতর খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এই খাদ্যের সাহায্যেই ভ্রূণ বড় হয় এবং চারা উদ্ভিদে পরিণত হয়। মটরবীজে **সস্য** (*Endosperm*) থাকে না। সুতরাং বীজকে **অসস্যল** (*Exalbuminous* or *Nonendospermic*) বীজ বলা হয়। রেড়ি উদ্ভিদের বীজ দ্বিপত্রবীজভুক্ত হইলেও ইহার ভিতরে সস্য থাকে। নিম্নে রেড়িবীজের গঠন বর্ণনা করা হইয়াছে।

রেড়িবীজের গঠন (Structure of a Castor seed) :

রেড়িবীজের বহির্গঠন **আয়ত** (*oblong*)। ইহার বহিস্ত্বক চিত্রবিচিত্র ও ক্ষণভঙ্গুর। বীজের একদিক চওড়া এবং উহার বিপরীত দিক অপেক্ষাকৃত সরু। অপেক্ষাকৃত সরু অংশের অগ্রভাগ সাদা স্পঞ্জের মত বস্তু দেখা যায়। বীজটিকে জলে ভিজাইয়া রাখিলে এই বস্তুটি ফুলিয়া উঠে। ইহাকে **ক্যারাঙ্কল** (*Caruncle*) বলা হয়। ক্যারাঙ্কলটিকে অপসারণ করিলে বীজের ডিম্বক-রন্ধ্র

দেখিতে পাওয়া যায়। জলসিক্ত বীজটিকে দুই পাশ দিয়া চাপ দিলে সহজেই ডিমের খোলার মত ভাঙ্গিয়া যায় এবং বীজের অন্তস্ত্বক্ দেখা যায়। বীজের

৫৯নং চিত্র
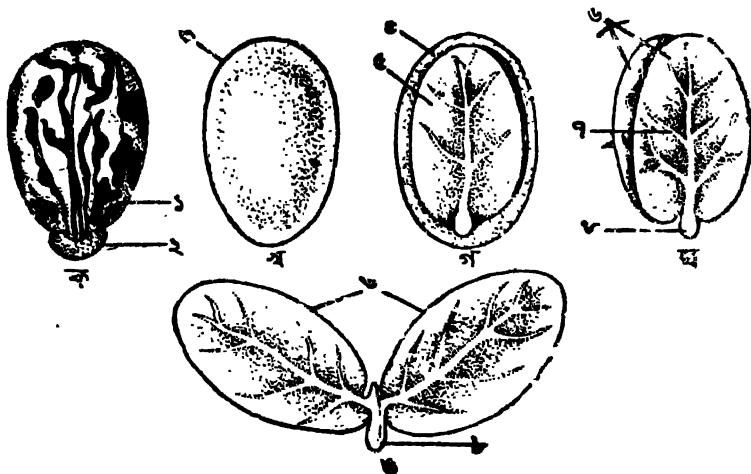
বীজ ও বীজের বিভিন্ন অংশ।

ক, একটি সম্পূর্ণ রেড়িবীজ দেখানো হইতেছে; ১, বীজত্বক; ২, ক্যারঙ্কল।
খ, বীজত্বকহীন রেড়িবীজের সস্যাবরণী (Perisperm) দেখানো হইতেছে;
৩, সস্যাবরণী; গ, রেড়িবীজের সস্যের ভিতরে ভ্রূণ দেখানো হইতেছে;
৪, সস্য; ৫, বীজপত্র। ঘ, রেড়িবীজের কেবলমাত্র বীজপত্রসহ ভ্রূণটি
দেখানো হইতেছে; ৬, বীজপত্র; ৭, বীজপত্রের শিরা; ৮, ভ্রূণমূল;
ঙ, বীজপত্র দুইটি পৃথক করিয়া উহার ভ্রূণটিকে দেখানো হইতেছে।

অন্তস্ত্বক্‌টি খুবই পাতলা এবং ইহা বীজের অন্তর্বীজকে (Kernal সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে। রেড়িবীজের অন্তস্ত্বক্‌কে সস্যাবরণী (Perisperm) বলা হয়। ইহা ডিম্বকের নিউসেলাসের অবশিষ্ট অংশ এবং ডিম্বকের দ্বিতীয় আবরণী নহে। অন্তস্ত্বক্ সাবধানে অপসারিত করিবার পর বীজের অন্তর্বীজ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তর্বীজ অংশ বীজের সস্য ও ভ্রূণ লইয়া গঠিত। দুইটি স্থূল সস্যখণ্ডের মধ্যে দুইটি সাদা পাতার মত বীজপত্র থাকে। সূচ দিয়া অতি সাবধানে সস্য দুইটিকে লম্বালম্বিভাবে উন্মুক্ত করিলে বীজপত্র দুইটি পরিষ্কার দেখা যায়। ইহাই বীজপত্রের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা, অর্থাৎ উদ্ভিদের প্রথম পাতা। বীজপত্র দুইটি উহার একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র দণ্ডের মত ভ্রূণাক্ষ দিয়া সংযুক্ত। ভ্রূণাক্ষ অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় ইহাতে কেবলমাত্র ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুল

থাকে। সস্য দুইটিতে সঞ্চিত তৈল থাকায় উহা বেশ স্থূল। রেড়ীবীজ সসস্যদল (Albuminous or *Endospermic*) বীজের অন্তর্গত।

নিম্নে দুইটি ছক দেওয়া হইল। প্রথমটিতে বীজের গঠন অনুসারে সাধারণ ছক এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন অনুযায়ী একটি বিস্তারিত ছক দেওয়া হইয়াছে।

(১) বীজের গঠন অনুসারে :
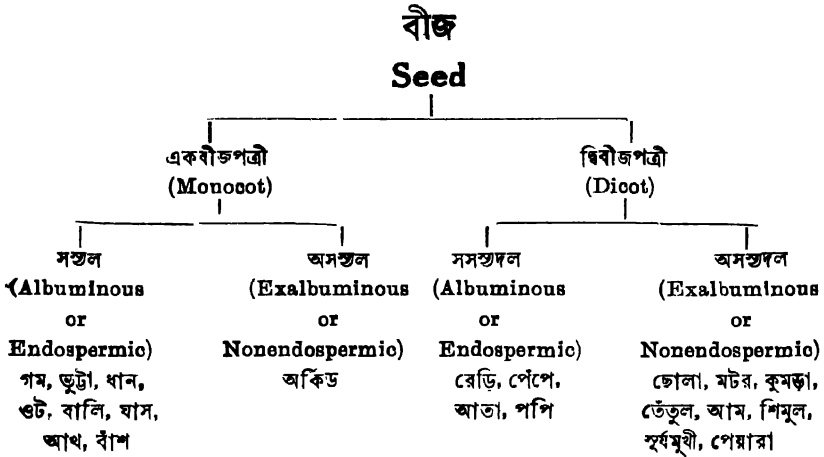
(২) দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন অনুসারে :
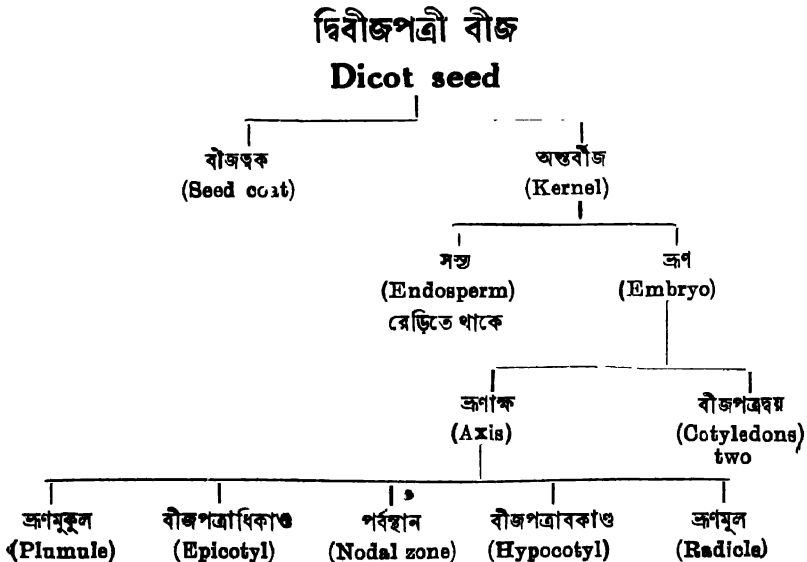
এখন ভুট্টা ও ধানবীজের অন্তর্গঠন বর্ণনা করা হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভুট্টা, ধান, গম প্রভৃতির দানা একবীজের অন্তর্গত।

ভুট্টাদানার গঠন (Structure of a Maize grain) :

ভুট্টাদানা প্রকৃতপক্ষে একটি আস্ত ক্যারিওপ্‌সিস্ ফল। মোটেই বীজ নহে। প্রত্যেকটি দানা আকারে চ্যাপটা এবং স্থূল। দানার বাহিরের ত্বকটি সোনালী বা উজ্জ্বল হলদে রঙের হয়। ইহা অর্ধস্বচ্ছ (semi-transparent)। ত্বকটি ফলত্বক্ এবং বীজত্বক্ দুইটি একত্রিত হইয়া গঠিত হয়। ভুট্টাদানাটিকে ভালভাবে
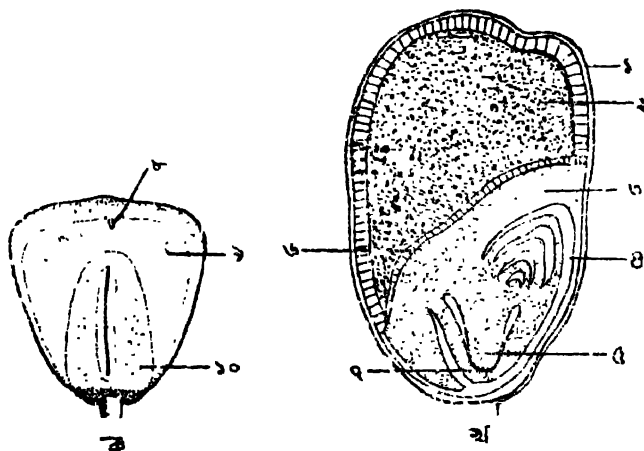
৬০নং চিত্র
বীজ ও বীজের বিভিন্ন অংশ।
ক, ভুট্টাদানার সম্মুখভাবে দেখানো হইতেছে ; ৮-৯, ফল ও বীজসংযুক্ত ত্বক্ ; ১০, ত্রিকোণাকৃতি স্ফীত স্থান (deltoid area)। খ, ভুট্টাবীজের ভ্রূণের উপর দিয়া লম্বচ্ছেদ ; ১, ত্বক্ ; ২, সস্য ; ৩, ভ্রূণ ; ৪, ভ্রূণমুকুলের ভ্রূণমুকুলত্ব বা কলিওপটাইল ; ৫, ভ্রূণমূল ; ৬, স্কুটেলাম্ বা বীজপত্র ; ৭, ভ্রূণমূলত্বক্ বা কলিওরহিজা।

পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার একদিকে আয়তাকারে একটি শ্বেতবর্ণের স্থান বিদ্যমান। এই অস্বচ্ছ স্থানটিকে **আয়তাকার স্থান** (*Deltoid area*) বলে। ইহার উপর লম্বালম্বিভাবে একটি দণ্ডের অবস্থিতি বাহির হইতেই দেখা যায়। এই দণ্ডটির উপর দিয়া লম্বালম্বিভাবে ছুরি দ্বারা কাটিলে (দানাটিকে নরম করিবার জন্য প্রায় একদিন সামান্য গরম জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়) দানাটি সমদ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এখন যে-কোন একটি খণ্ডকে লেনস্ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহার ভিতর-অংশ দুইটি অসমান অঞ্চলে বিভক্ত।

এই দুইটি অসমান অঞ্চলের মাঝে একটি পাতলা পর্দার অস্তিত্ব দেখা যায়। এই ঝিল্লির মত পর্দাটিকে দানার বীজপত্র বা **স্কুটেলাম** (*Scutellum*) বলে। প্রকৃতপক্ষে স্কুটেলাম-ই দানাটিকে দুইটি অসমান অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছে। বৃহৎ ও স্থূল অঞ্চলটি দানার সস্য। সস্যের সহিত স্কুটেলাম সংযুক্ত থাকে। সূক্ষ্ম ও দণ্ডাকার অংশটি খণ্ডের একধারে বিদ্যমান। ইহা ভ্রূণ অংশ। অতি মৃদু আইওডিন দ্রবণ খণ্ডিত অংশের উপর প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, শ্বেতসারপূর্ণ সস্য অঞ্চলটি নীলাভ রঙে পরিণত হয় এবং ভ্রূণ অঞ্চলটি আইওডিনের রঙ বা হরিদ্রাভ রঙে রূপান্তরিত হয়। ইহা অতি সহজেই পরিলক্ষিত হয় যে, বীজপত্র বা স্কুটেলাম ও ভ্রূণাক্ষ একত্রিত অংশকে লইয়া ভুট্টার ভ্রূণ অংশ গঠিত। ভ্রূণের ভ্রূণাক্ষটি অতি ক্ষুদ্র। ইহার শীর্ষাগ্রে কচি পাতার সূচনা দেখা যায়। এই প্রান্তটিকেই **ভ্রূণমুকুল** (*Plumule*) বলা হয়। ভ্রূণমুকুলটি একটি পাতলা পর্দা দিয়া আবৃত থাকে। এই পর্দাটিকে **কলিওপটাইল** (*Coleoptile*) বলা হয়। ভ্রূণমুকুলের বিপরীত প্রান্তটিকে **ভ্রূণমূল** (*Radicle*) বলা হয় এবং ইহাও একটি অতি সূক্ষ্ম পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। ভ্রূণমূলের এই পর্দাটিকে **কলিপরহিজা** (*Coleorhiza*) বলা হয়। স্কুটেলামের একদিক সস্যের সহিত সংযুক্ত এবং উহার অন্য দিকটি ভ্রূণকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহা ধীরে ধীরে সস্যের ভিতর হইতে খাদ্যরস ব্যপন প্রণালীর দ্বারা শোষণ করে এবং ভ্রূণাক্ষের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য যোগায়।

ধানের গঠন (Structure of Paddy grain) :

ভুট্টার মত ধানও ক্যারিঅপ্‌সিস্ ফল। ধান তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহার দুই পাশে দুইটি মঞ্জরীপত্র উহাকে বেষ্টন করিয়া রাখে। বড় মঞ্জরীপত্রটিকে **পুষ্পধর মঞ্জরীপত্র** (*Flowering glume*) এবং ছোটটিকে **পেলিয়া** (*Palea*) বলে। ইহাদের ভিতরেও দুইটি আঁশের মত শল্কপত্র থাকে। পুষ্পধর, মঞ্জরীপত্র, পেলিয়া, শল্কপত্রকে একত্রে আমরা এক কথায় ধানের **তুষ** (*Husk*) বলি। তুষ দেখিতে হরিদ্রাভ। তুষ ব্যতীত ধানকে চাল (rice) বলা হয়। চালের উপরকার লাল আবরণটি ফলত্বক্ ও বীজত্বকের সংযুক্তিতে গঠিত। ইহা পাতলা পর্দার মত। বীজত্বকের ভিতরেও অন্তর্বীজ বিদ্যমান। ভুট্টার মত এখন ধানের অন্তর্বীজের একটি লম্বচ্ছেদ কর্তিত করিলে এবং সেই লম্বচ্ছেদের একখণ্ডকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে উহার ভিতরে ভুট্টাদানার মত সস্য,

স্কুটেলাম, ভ্রূণমূল, কলিওরহিজা, ভ্রূণমুকুল, কলিওপটাইল প্রভৃতি অংশ দেখা যায়
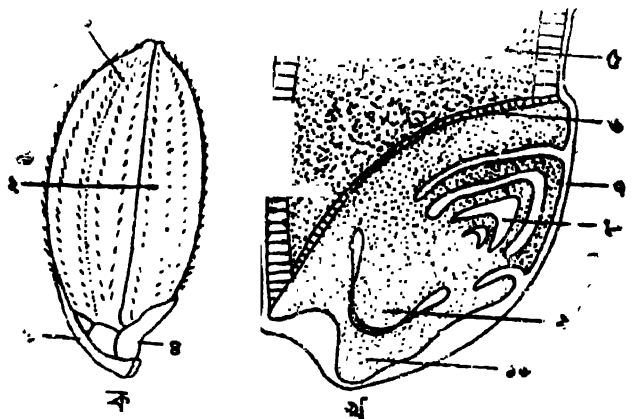
৬১নং চিত্র

বীজ ও বীজের বিভিন্ন অংশ।

ক, একটি ধানদানা ; ১, সপুষ্পক বর্ণপত্র ; ২, শিরাবর্ম বা পেলিয়া ; ৩-৪, অপুষ্পক বর্মপত্র। খ, ধানের বীজের ভ্রূণের উপর দিয়া লম্বচ্ছেদ ; ৫, সস্য ; ৬, স্কুটেলাম বা বীজপত্র ; ৭, কলিওপটাইল ; ৮, ভ্রূণমুকুল ; ৯, ভ্রূণমূল ; ১০, কলিওরহিজা।

নিম্নে একবীজপত্রী বীজের গঠন অনুসারে একটি ছক দেওয়া হইল :

একবীজপত্রী

(Monocot seed)
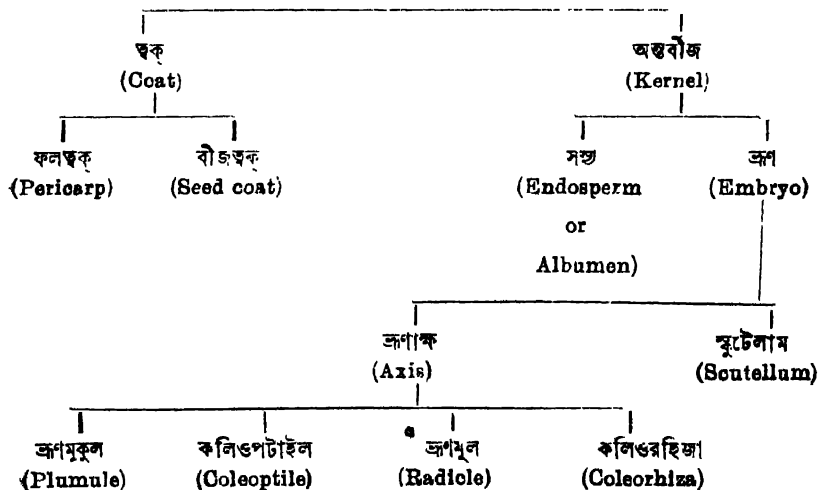
অঙ্কুরোদ্গম

(Germination)

বীজের মধ্যে ভ্রূণ **সুপ্ত** (*Dormant*) অবস্থায় থাকে ; সেইজন্য সহজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। ভ্রূণের ভিতরকার কোষের প্রোটোপ্লাজমে উপযুক্ত পরিমাণে জল থাকে না। সেইজন্য উহা অক্সিজেন ও তাপ শোষণ করিতে পারে না। সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণে জল, বাতাস ও তাপ পাইলে যে-কোন সাধারণ বীজের ভ্রূণ জাগিয়া উঠে এবং ভ্রূণের জাগরণ বা বৃদ্ধিকে উহার **অঙ্কুরোদ্গম** (*Germination*) বলা হয়।

অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বিবিধ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা (Condition necessary for germination) :

১। **জল (Water)** : জল অঙ্কুরোদ্গমের প্রধান সহায়। কারণ বীজ সুপ্ত অবস্থায় শুষ্ক হইয়া থাকে। জল সমগ্র বীজটিকে নরম করে এবং বীজত্বক্ নরম হওয়ায় ভ্রূণমুকুল চাপে সহজে ফাটিয়া যায়। সস্যের ভিতরকার কঠিন খাদ্যগুলি তরল হয় এবং ভ্রূণের কোষগুলি জল শোষণ করিয়া স্ফীত হয়। কোষের প্রোটোপ্লাজমের জলের হার স্বাভাবিক হওয়ার পর উহা পুনরায় যাবতীয় বিপাকীয় কার্য করে এবং বীজত্বক্ স্ফীত হওয়ায় বাতাসের অক্সিজেন কোষের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। অর্ধতরল প্রোটোপ্লাজম ভ্রূণ-জাগরণের জন্য শক্তি বা খাদ্য সরবরাহ করে। সেইহেতু বীজপত্রের বা সস্যের সঞ্চিত খাদ্য জলে দ্রবীভূত হয় এবং ভ্রূণের কোষগুলি ধীরে ধীরে অভিস্রবণ প্রণালীর দ্বারা উহা শোষণ করে।

২। **তাপ (Temperature)** : যে-কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া কার্যকরী করিতে হইলে তাপের প্রয়োজন অনিবার্য। তাপই রাসায়নিক সংকেতের সূচনা করে ; সেইজন্য কঠিন সঞ্চিত খাদ্যগুলি জলের তাপের সাহায্যেই দ্রবীভূত হয়। শুধু তাহাই নহে, কোষের প্রোটোপ্লাজম তাপ শোষণ না করিলে সাধারণ বিপাকীয় কার্যগুলি করিতে পারে না। কিন্তু তাপের মাত্রা বেশী হইলে অঙ্কুরোদ্গম দ্রুত হয় এবং তাপের মাত্রা কম হইলে অঙ্কুরোদ্গম অতি ধীরে ধীরে হয়। সাধারণতঃ 5°C তাপে বীজের অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হয়। 45°C হইতে 48°C তাপে বীজের অঙ্কুরোদ্গম খুববেশী মাত্রায় হয়। 45°C হইতে 30°C তাপে সাধারণ অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে।

৩। বাতাস (Air): বাতাসের বিবিধ গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেন জীবের প্রাণস্বরূপ। ইহা বীজ-জাগরণ প্রক্রিয়ায় শ্বসন-কার্যের জন্য দরকার হয়। সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য হইতে শক্তি নির্গত করিতে হইলে উহাকে দহন করা প্রয়োজন।
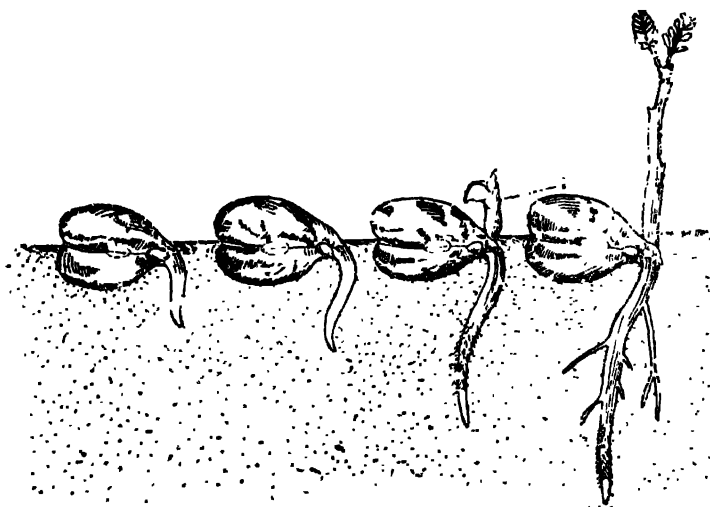
৬২নং চিত্র
অঙ্কুরোদ্গম।
ছোলাবীজের মৃদ্‌বর্তী (hypogeal) অঙ্কুরোদ্গম দেখানো হইতেছে। ১, বিটপ অঞ্চল।

কোষের মধ্যে খাদ্যরসকে অক্সিজেনই কেবল দহন করিতে পারে। সুতরাং শক্তিবিকাশের জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যক। কারণ শক্তি না পাইলে ভ্রূণের কোষগুলির বৃদ্ধি হয় না এবং ইহাতে ভ্রূণের জাগরণও বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোন বীজ মৃত্তিকার গভীর স্তরে বপন করিলে উহা সহজে অঙ্কুরিত হয় না। কারণ মৃত্তিকার গভীর স্তরে বাতাস প্রবেশ করে না। বীজ সহজে অক্সিজেন পায় না এবং সেইজন্য বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না।

অঙ্কুরোদ্গমের প্রকারভেদ (Types of germination):

বীজের অঙ্কুরোদ্গম প্রধানতঃ তিন প্রকারের হয়; যথা—

১। মৃদ্‌বর্তী (Hypogeal; Hypo = below; ge = earth): বীজের এইপ্রকার অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজপত্র বীজত্বকের মধ্যেই থাকে এবং কখনও মাটির উপর বাহির হইয়া আসে না।* কারণ বীজের ভ্রূণাক্ষের বীজপত্রাধিকাণ্ড অঞ্চল (ভ্রূণমুকুল হইতে ভ্রূণাক্ষ পর্যন্ত) কেবলমাত্র বৃদ্ধিলাভ করে। সুতরাং

বীজপত্রের অবস্থান কোনও আলোড়ন বা বিঘ্ন হয় না। বীজপত্রগুলি মাটির ভিতর থাকায় উহা সবুজবর্ণের হয় না। উহা ধীরে ধীরে শুষ্ক হইয়া গিয়া ঝরিয়া যায় বা মাটির সহিত মিশিয়া যায়। একবীজপত্রী বীজগুলি মৃদ্‌বর্তীভাবে
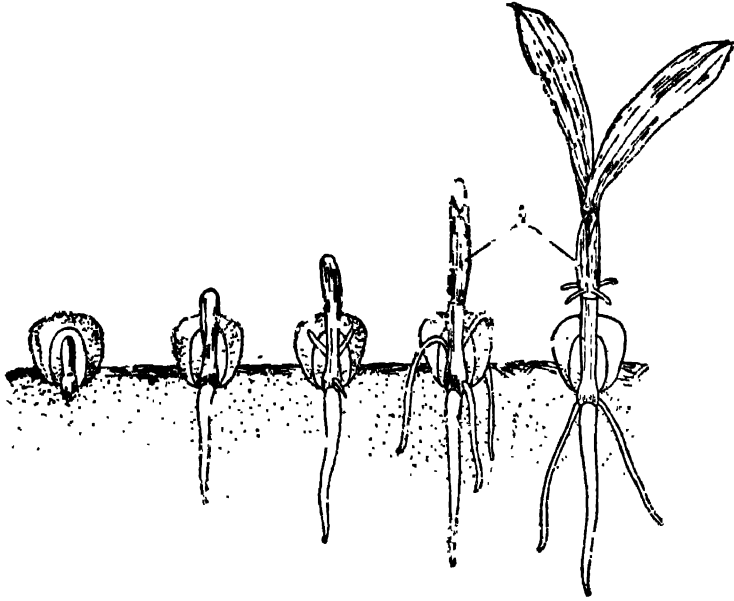
৬৩নং চিত্র

অঙ্কুরোদ্গম।

ভুট্টাদানার মৃদ্‌বর্তী (Hypogeal) অঙ্কুরোদ্গম দেখানো হইতেছে। ১, বিটপ অঞ্চল।

অঙ্কুরোদ্গম করে। ইহাদের ভ্রূণমুকুলটি কলিওপটাইল ও পর্দা ভেদ করিয়া বীজের একদিক দিয়া বাহির হইয়া আসে এবং ভ্রূণমুকুলটি অন্যদিকে কলিওরহিজা ভেদ করিয়া বাহির হয়। কিন্তু বীজ স্কুটেলামটি কখনও মাটির উপর বাহির হয় না। মটর, ছোলা, ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ বা দানাগুলির মৃদ্‌বর্তীভাবে অঙ্কুরোদ্গম করিতে দেখা যায়।

২। **মৃদ্‌ভেদী** (Epigeal ; epi = upon ; ge = earth) : বীজের এই প্রকার অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজপত্র বীজত্বকের ভিতর থাকে না এবং ইহা বীজত্বক্ ভেদ করিয়া মাটির উপর উঠিয়া আসে। কারণ এইরূপ অঙ্কুরোদ্গমে ভ্রূণাক্ষের বীজপত্রাবকাণ্ড অঞ্চল (ভ্রূণমূল প্রান্ত হইতে ভ্রূণাক্ষের পর্বস্থান পর্যন্ত)

কেবল বৃদ্ধিলাভ করে। বীজপত্র দুইটি ভ্রূণাক্ষের পর্বস্থানে যুক্ত থাকায় বীজত্বক্ ভেদ করিয়া বাহিরে (মাটির উপর) আসে। বীজপত্রগুলি মাটির উপর আসিলে আলোকে সবুজবর্ণে রূপান্তরিত হয়। তেঁতুল, কুমড়া প্রভৃতি বীজের বীজপত্রগুলি বেশ স্থূল হয় এবং বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর মাটির উপর বহুদিন সজীবভাবে
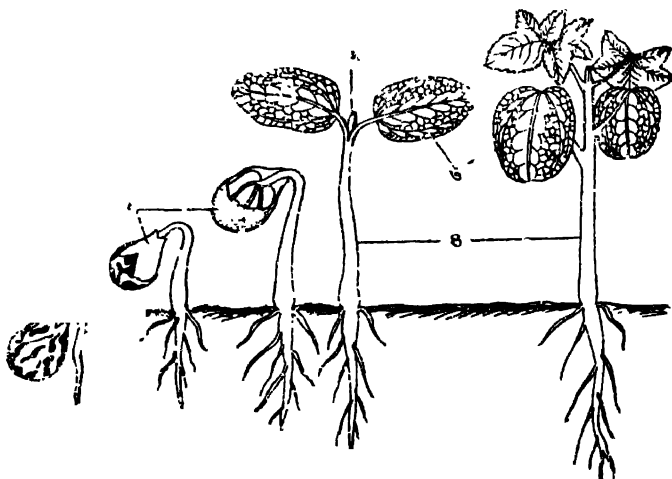
৩৪নং চিত্র

অঙ্কুরোদ্গম।

রেড়িবীজের মৃদ্‌ভেদী (epigeal) অঙ্কুরোদ্গম দেখানো হইতেছে।

১, সস্যাবরণী; ২, ভ্রূণমুকুল; ৩, বীজপত্রাবকাণ্ড (hypoootyl)।

থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের বীজপত্রগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ঝরিয়া পড়ে। শিম, রেড়ি প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ এইরূপ অঙ্কুরোদ্গমের উদাহরণ।

৩। জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম (Vivipary):

সমুদ্রোপকূলবর্তী এবং লবণাক্ত মাটিতে কতকগুলি বিশেষ প্রকার উদ্ভিদের বীজ জরায়ুর প্রণালী অনুসারে অঙ্কুরোদ্গম করে। সুতরাং ইহা একপ্রকার বিশেষ ধরনের অঙ্কুরোদ্গম প্রণালী। ফলের ভিতরে থাকা অবস্থায় বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। ফলটি তখনও মূল উদ্ভিদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত থাকে। শুধু ইহাই নহে, মূল উদ্ভিদ্ বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য যোগায়। বীজ হইতে প্রথম ভ্রূণমুকুলটি বাহির হইয়া আসে। ইহা

ধীরে ধীরে বড় ও স্থূল হইতে থাকে। বেশী পরিমাণে স্থূল হইবার পর বীজটি ভারী হইয়া যায় এবং সোজাভাবে মাটিতে পতিত হয়। মাটিতে পতিত হইবার পর ভ্রূণমুকুল হইতে শাখা-প্রশাখা বাহির হয় এবং চারাগাছটি
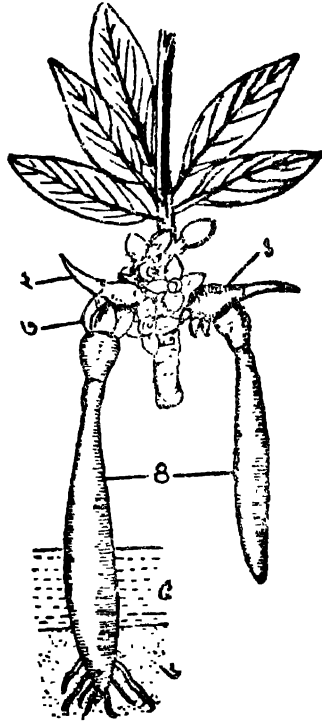
৬৫নং চিত্র

অঙ্কুরোদ্গম।

রাইজোফারের জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখানো হইতেছে।

১, ফল; ২, ভ্রূণমুকুল; ৩, বৃতি; ৪, বীজপত্রাবকাণ্ড; ৫, জলের ভিতরকার অঞ্চল; ৬, মাটির ভিতরকার অঞ্চল।

সোজাসুজিভাবে দাঁড়াইতে পারে। সুঁদুরী, বীণা প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ভিভিপেরী বা জরায়ুজ প্রণালীর দ্বারা অঙ্কুরোদ্গম করে।

প্রদর্শন ও পরীক্ষা

(Demonstration and Experiment)

জল, বাতাস ও তাপ বীজের অঙ্কুরোদ্গম পদ্ধতির জন্য যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করা যায়। এইরূপ পরীক্ষাকে "তিনটি মটরের সাহায্যে পরীক্ষা" (The Beam Experiment) বলা হয়। পরীক্ষাগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (Materials for experiment): একটি বড় বিকার, কিছু মোম, একটি 3″ ইঞ্চি চওড়া এবং 5″ ইঞ্চি লম্বা কাঠের টুকরা এবং কিছুসংখ্যক মটরবীজ।
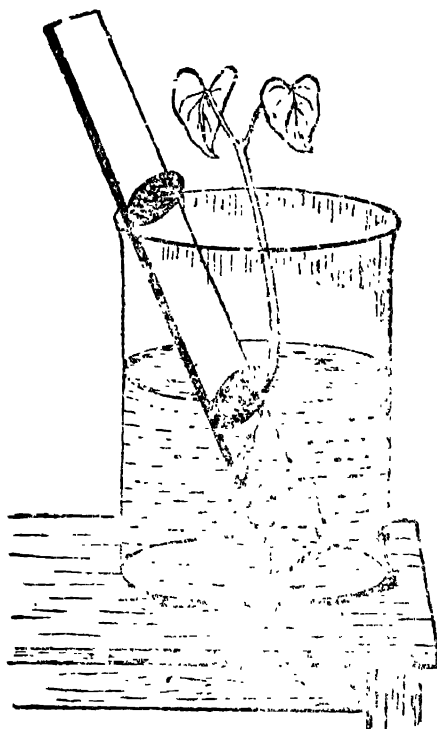
৬৬নং চিত্র

অঙ্কুরোদ্গম পরীক্ষা দেখানো হইতেছে।

পরীক্ষা (Experiment): টেবিলের উপর রাখা একটি বড় বিকারে কাঠের টুকরাটিকে গলন মোমে ডুবাইয়া রাখ। মোম ঠাণ্ডা হইলে কাঠের টুকরার দুইপাশে জমা হইতে থাকিতে দেখা যাইবে। এখন টুকরার অগ্রভাগে পশ্চাদ্ভাগে এবং মধ্যভাগে যথাক্রমে তিনটি শুষ্ক মটর আলপিন দিয়া আটকাইয়া দাও। কাঠের টুকরাটিকে এখন বিকারের ভিতর হেলানোভাবে লম্বালম্বি রাখ। অন্য একটি বিকারে কিছু জল উত্তপ্ত কর। জল উত্তপ্ত হইলে উহার দ্রবীভূত অক্সিজেন দূরীভূত হয়। এখন এই উত্তপ্ত জলকে শীতল করিয়া বিকারের ভিতর এমনভাবে ঢাল, যাহাতে মধ্যবর্তী বীজের মাঝামাঝি জলরেখা স্থিতিলাভ করে, অর্থাৎ মাঝের বীজটি অর্ধেক জলের ভিতর থাকে। এখন বিকারটিকে এইভাবে দিন-দুই টেবিলের উপর রাখ।

নিরীক্ষা (Observation): দিন-দুই পরে দেখা যায় যে, কাঠের পশ্চাদ্ভাগের বীজটি অঙ্কুরিত হয় নাই, এমনকি কাঠের অগ্রভাগের বীজটিও অঙ্কুরিত হয় নাই এবং কেবলমাত্র মাঝের বীজটি অঙ্কুরিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত (Conclusion): কাঠের অগ্রভাগের বীজ ও বাতাস ও সাধারণ তাপ অবশ্য পায়, কিন্তু জল মোটেই পায় না। সুতরাং জলের অভাবে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। সেইরূপ কাঠের পশ্চাদ্ভাগের বীজটি জল পায় এবং তাপও পায়, কিন্তু জলমগ্ন থাকায় বাতাসের অভাবে ইহার অঙ্কুরোদ্গম হয় না। মাঝের বীজটি জল, বাতাস এবং তাপ সবই পায়। সেইজন্য এই বীজটি স্বাভাবিকভাবে অঙ্কুরিত হয়।

এখন উপরি-উক্ত পরীক্ষাটি দুইটি বিকারে পৃথকভাবে আরম্ভ কর। প্রথম বিকারে উত্তপ্ত জল এমনভাবে ঢাল যাহাতে মাঝের বীজটি অর্ধেক জলের ভিতর থাকে। জলের উত্তাপ যেন সর্বক্ষণের জন্য 50°C-এর চেয়েও বেশী থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। দ্বিতীয় বিকারের ভিতর বরফ-জল ঠিক মাঝের বীজের অর্ধেক পর্যন্ত ঢাল। বিকারের চারিপাশে কঠিন বরফ গুঁড়া করিয়া ঢাকিয়া রাখ। ইহার দ্বারা বিকারের জলের তাপ সর্বদাই কম থাকে। দিন-দুই পরে দেখা যায় যে, দুইটি বিকারের কোন বীজই অঙ্কুরিত হয় নাই। কারণ, প্রথম বিকারের জলের তাপ অত্যধিক বেশী হওয়ায়, মাঝের বীজটি অঙ্কুরিত হয় নাই। সেইরূপ দ্বিতীয় বিকারের জলের তাপ অত্যধিক কম হওয়ায় উহার মধ্যস্থ বীজটিও অঙ্কুরিত হয় নাই। সুতরাং কেবলমাত্র 25°C হইতে 48°C পর্যন্ত তাপ অর্থাৎ সাধারণ উত্তাপে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং 50C° এর অধিক উত্তাপে বা 50°C-এর চেয়ে কম উত্তাপে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না; সুতরাং তিনটি বিকারের মটরবীজ লইয়া যে পরীক্ষা করা হইল, তাহাতে তাপের বিভিন্ন মাত্রা বীজের অঙ্কুরোদ্গম প্রণালীকে কি-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাই প্রমাণিত হইল।

উদ্ভিদ্-দেহের খাদ্য

(Food in the Plant body)

উদ্ভিদের নানা অঙ্গে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। খাদ্য সাধারণতঃ দুই অবস্থায় উদ্ভিদের মধ্যে থাকে। প্রথম অবস্থায় খাদ্য সরলভাবে উদ্ভিদের ভিতর থাকে। তরল খাদ্য সহজেই উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় খাদ্য কঠিনভাবে উদ্ভিদের বিবিধ কলায় ও কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। এইরূপে কঠিন খাদ্যদ্রব্যগুলি উদ্ভিদের ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে। প্রয়োজনমত উদ্ভিদ্ নানাবিধ উৎসেচসক দ্বারা এইরূপ কঠিন খাদ্যগুলিকে তরল করে এবং নিজ বিপকীয় কার্যে ব্যবহার করে। উদ্ভিদের বীজের সস্যে ও বীজপত্রে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। বীজ এইরূপ সঞ্চিত খাদ্যগুলিকে বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা তরল করে এবং অঙ্কুরোদ্গমের সময় খরচ করে। ফলে, বীজপত্রগুলি পাতলা এবং শুষ্ক হইয়া যায় এবং ভ্রূণাক্ষটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করে। কতকগুলি বিশেষ প্রকারের মূলে, যথা শালগম, শতমূলী, মূলা, গাজর, বীট প্রভৃতিতে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। সেইরূপ ভূমিম্নস্থ আদা, আলু, ওল প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ডে প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত থাকে। অনেক উদ্ভিদের পাতা, শাখা, বৃন্ত প্রভৃতি স্থূল ও রসাল হয়। ইহাদের স্থূলতা খাদ্য-সঞ্চয়ের জন্য হয়। পাথরকুচি, ঘৃতকুমারী, পুঁই ও বাঁধাকপি গাছের পাতা, ওলকপি, কপিগাছের শাখা ও মঞ্জরীদণ্ডে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদের প্রত্যেকটি অঙ্গের ভিতর অল্প-বিস্তর খাদ্য জমা থাকে। প্যারেনকাইমা কোষের ভিতর কিংবা উহার কোষ-প্রাচীরের উপর প্রধানতঃ অন্তস্ত্বকে, সাধারণ মজ্জা ও মজ্জাংশুতে খাদ্য জমা থাকে। শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগে, পাতার ক্লোরোপ্লাস্টে, ফুলের গর্ভদণ্ডে ও পুষ্পাক্ষেও খাদ্য জমা থাকিতে দেখা যায়।

এইরূপ খাদ্য নানা ভাবে এবং নানা অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। কখনও ইহাদের আকার দানাদার, কখনও বা ইহাদের আকার বড় বড় এককেন্দ্রীয় বৃত্তের মত। সাধারণতঃ তিনপ্রকার খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে দেখা যায়; যথা—

(ক) জল-অঙ্গার (Carbohydrate), (খ) প্রোটিন (Protein) এবং (গ) স্নেহ-পদার্থ (Fats and oils)। নিম্নে একে একে ইহাদের বিবরণ দেওয়া হইল :

(ক) জল-অঙ্গার (Carbohydrate) :

সালোকসংশ্লেষের দ্বারা সবুজ উদ্ভিদ্ জল-অঙ্গার খাদ্য প্রস্তুত করে। জীববিজ্ঞান-প্রবেশের প্রথমভাগে, জল-অঙ্গার খাদ্যের উৎপাদন অনুপাতের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। নানাপ্রকার জল-অঙ্গার খাদ্যের মধ্যে কতকগুলি জলে দ্রবণীয় এবং আবার কতকগুলি অদ্রবণীয়।

নিম্নে বিবিধ প্রকারের জল-অঙ্গারের বর্ণনা করা হইল ; যথা :

(i) **শ্বেতসার** (*Starch*) : ছত্রাক (*Fungi*) ব্যতীত প্রায় সকল উদ্ভিদে শ্বেতসার খাদ্য থাকে। ইহা কোহলে ও জলে অদ্রবণীয়। পাতায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈয়ারী হইবার পর ইহা শ্বেতসার খাদ্যে পরিণত হয়। এইরূপ কণাগুলির আকার নানা রকমের হয়। সাধারণতঃ ইহারা ক্ষুদ্র কণার মত সমগ্র-কোষে জমা থাকে। রাত্রে যখন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তখন এই শ্বেতসার কণাগুলি পুনরায় শর্করায় রূপান্তরিত হয় এবং উদ্ভিদ্-দেহের সর্বত্র, প্রধানতঃ উদ্ভিদের ভাণ্ডার-অঙ্গে ইহাদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। আগেই বলা হইয়াছে যে, **অবর্ণপ্লাস্ট** (*Leucoplast*)-এর মধ্যে একপ্রকার বড় আকারের এ্যামাইলোপ্লাস্ট নামক প্লাসটিডস্ থাকে। ইহারাই শর্করাকে শ্বেতসার এবং প্রয়োজনমত শ্বেতসারকে আবার শর্করায় রূপান্তরিত করিতে পারে। এইরূপ **এ্যামাইলোপ্লাস্টের** (*Amyloplast*) দ্বারা রূপান্তরিত শ্বেতসার-কণার আকার নানা প্রকারের হয়। গমে ইহাদের আকার গোলাকার বা বিস্তারিত, ভুট্টায় বহুক্ষেত্রবিশিষ্ট, মটরে বৃত্তাকার এবং আলুতে ডিম্বাকৃতি হয়। সাধারণতঃ ভূমিস্থ ভাণ্ডার-কাণ্ডে ইহাদের অস্তিত্ব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। কলাবতীর গ্রন্থিকাণ্ডে, স্থূলকেন্দ্রে, গুঁড়িকেন্দ্রে, মূলাকার মূলায়, শাকবে শালগমাকারে শ্বেতসার-কণা জমা থাকে। সাধারণতঃ চালে 70—80%, গমে 70—75%, ভুট্টায় 65—68%, বার্লিতে 60—65% শ্বেতসার-কণা জমা থাকে। শ্বেতসার-কণার বিবিধ গঠন ও আকৃতি জীববিজ্ঞান-প্রবেশের প্রথমভাগে বর্ণনা করা করা হইয়াছে।

শ্বেতসার পরীক্ষা : শ্বেতসারকণাপূর্ণ স্লাইডের আবরণী কাচের ধারে

এক ফোঁটা অতি মৃদু জলীয় আইওডিন, ড্রপারের সাহায্যে প্রয়োগ করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করিলে উহার কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিবে প্রথমে শ্বেতসার-কণাগুলির রঙ বেগুনী হইয়া যাইবে; পরে বেশী পরিমাণে আইওডিন শোষণ করিয়া উহা ধীরে ধীরে কালো রঙে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

(ii) **সেলুলোজ** (*Cellulose*) : সেলুলোজের রাসায়নিক সংকেত শ্বেতসারের মত এবং ইহাও শ্বেতসারের মতই জলে ও কোহলে অদ্রবণীয়।
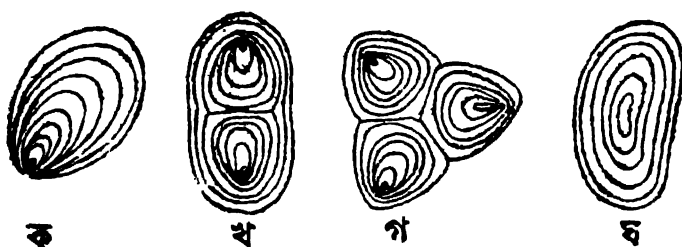
৬৭নং চিত্র

মটরবীজ এবং আলুর কোষের বিভিন্ন শ্বেতসার-কণিকা দেখানো হইতেছে।
ক, সরল উৎকেন্দ্রীয় শ্বেতসার-কণা ; খ, অর্ধযৌগিক উৎকেন্দ্রীয় শ্বেতসার-কণা ;
গ, যৌগিক উৎকেন্দ্রীয় শ্বেতসার-কণা ; ঘ, সরল এককেন্দ্রীয় শ্বেতসার-কণা।

সাধারণতঃ আমরা জানি যে, কোষের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা নিয়মিত হয়। খেজুর, নারিকেল, তাল প্রভৃতি বীজের শস্যকোষ ও কোষ-প্রাচীরে অতিরিক্ত পরিমাণে সেলুলোজ জমা থাকে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় সেলুলোজ স্যাইটেজ (Cytage) নামক একপ্রকার রাসায়নিক উৎসেচকের দ্বারা শর্করায় রূপান্তরিত হয়, এবং এই শর্করার সাহায্যেই ভ্রূণাক্ষটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করে। বীজে বীজপত্রই স্যাইটোসিস্ উৎসেচক নির্গত করে। সুতরাং সেলুলোজ শুধু যে কোষের কোষ-প্রাচীর নির্মাণ করে তাহা নহে, ইহা ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যসঞ্চিত খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

সেলুলোজের পরীক্ষা : পিঁয়াজের একটি রসাল শল্কপত্রে সূক্ষ্মচ্ছেদ লও। এই সূক্ষ্মচ্ছেদ লইয়া যথারীতি একটি স্লাইড তৈয়ারী কর। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, কোষগুলি আয়তাকার এবং কোষ-প্রাচীরগুলি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। এখন স্লাইডের আবরণী কাচের

পাশে ড্রপারের সাহায্যে এক ফোঁটা আয়োডিন প্রয়োগ করিবার দুই মিনিট পরে আবার 50% সালফুরিক অ্যাসিড (sulphuric acid) ড্রপারের সাহায্যে আবরণী কাচের পাশে প্রয়োগ কর। উপরি-উক্ত দুইটি রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কোষ-প্রাচীরের সেলুলোজ নীল বা বেগুনী রঙ ধারণ করে, তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিষ্কার দেখা যায়।

(iii) **শর্করা** (*Sugar*) **:** ইহা একপ্রকার সরল দ্রবণীয় জল-অঙ্গার খাদ্য ; সাধারণতঃ ফলে এবং কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড বা মূলে দেখা যায়। আমরা আগেই জানি ইহা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পাতার কোষের মধ্যে নির্মিত হয়। সাধারণতঃ আঙুর, আম, আপেল, কমলালেবু, আতা ইত্যাদি ফলে প্রচুর পরিমাণে শর্করার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিবিধ শর্করার মধ্যে দ্রাক্ষাশর্করা (Glucose or Fructose or Grape Sugar) সর্বপ্রথম সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা পাতার কোষের মধ্যে নির্মিত হয়। পরে দ্রাক্ষাশর্করা হইতে ইক্ষুশর্করা ও শ্বেতসার নানা রাসায়নিক উপায়ে উদ্ভিদের কোষের মধ্যে নির্মিত হয়। সাধারণতঃ দ্রাক্ষাশর্করা দ্রাক্ষা, কমলালেবু, আম, আপেল প্রভৃতি ফলে পাওয়া যায় এবং ইক্ষুশর্করা (Sucrose or Cane Sugar) ইক্ষুকাণ্ডে, বীটমূলে ও মিষ্টি আলুতে পাওয়া যায়। দ্রাক্ষাফলে 12—15% দ্রাক্ষাশর্করা, ইক্ষুতে 15—20% ইক্ষুশর্করা এবং বীটমূলে 10—20% ইক্ষুশর্করা থাকে।

শর্করার পরীক্ষা : একটা টেস্টটিউবে কিছু ইক্ষুরস লও। ইহাতে তিন বা চার ফোঁটা জলীয় কপার সালফেট মিশাও এবং রাসায়নিক মিশ্রণটির সহিত এখন সামান্য পরিমাণে কষ্টিক পটাস মিশাইয়া সমস্ত রাসায়নিক মিশ্রণটিকে উত্তপ্ত কর। রাসায়নিক মিশ্রণটিকে উত্তপ্ত করিবার পূর্বে উহার রঙ নীলাভ থাকে কিন্তু উত্তপ্ত করিবার পর নীলাভ রঙ ধীরে ধীরে প্রথমে হরিদ্রাবর্ণে, পরে আবার নীলাভ রঙে রূপান্তরিত হয়। অপরপক্ষে দ্রাক্ষাশর্করা লইয়া উপরি-উক্ত পরীক্ষা করিলে উহা লোহিত বর্ণে রূপান্তরিত হইবে।

(iv) **ইনুলিন** (*Inulin*) **:** ইহাও একপ্রকার উদ্ভিদের দ্রবণীয় জল-অঙ্গার খাদ্য। ইহা সাধারণতঃ কোষের কোষগহ্বরে দ্রবণীয় অবস্থায় পাওয়া যায়। ইনুলিনকে ইনুলেশ (Inulase) নামক একপ্রকার রাসায়নিক উৎসেচকের সাহায্যে শর্করায় রূপান্তরিত করা যায়। উদ্ভিদ্ প্রয়োজনমত ইনুলেজের সাহায্যে শর্করাকে ইনুলিনে এবং ইনুলিনকে শর্করায় পরিবর্তিত করিয়া ব্যবহার

করে। ইহা সাধারণতঃ ডালিয়া, হাতিচোখ প্রভৃতি সূর্যমুখী-জাতীয় উদ্ভিদের কন্দমূলে (*tuberous root*) পাওয়া যায়। ইহাদের আকার, অবস্থান জীববিজ্ঞান-প্রবেশের প্রথমভাগে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপরি-উক্ত

৬৮নং চিত্র

ইনুলিন।
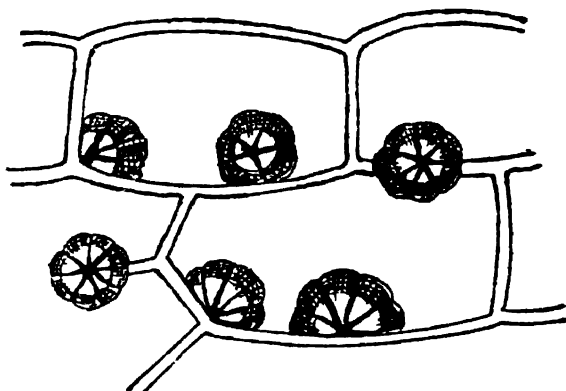
ডালিয়ার মূল কোষের মধ্যে ইনুলিন দেখানো হইতেছে।

মূলের একটি প্রস্থচ্ছেদ লইয়া 90% কোহলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে কোষ-প্রাচীরের কোণে ইহা কঠিন হাত-পাখার মতন আকার ধারণ করে। এইরূপ হাত-পাখার মত কেলাসে কয়েক বিন্দু ফ্লোরোগ্লুসিন দ্রবণ মিশ্রিত করিলে সাদা কেলাসগুলি হরিদ্রাভ খয়েরী রঙে রূপান্তরিত হয়। ইনুলিনের রাসায়নিক সংকেত শ্বেতসারের মত $(C_6H_{10}O_5)n$।

(v) **গ্লাইকোজেন** (*Glycogen*): ইহা শ্বেতসারের মত একপ্রকারের জল-অঙ্গার খাদ্য এবং ইহা কেবলমাত্র ছত্রাক গোত্রের (Fungi) কোষে দেখা যায়। ইহার অস্তিত্ব ঈস্ট উদ্ভিদে দেখা যায়। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নাই এবং ছত্রাকের অনুসূত্রের (hyphae) মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থরূপে দেখা যায়। শর্করা ও শ্বেতসারের মত উদ্ভিদের জননক্রিয়া বা বৃদ্ধির সময় শক্তি সংবহন করাই ইহাদের কার্য। উদ্ভিদ্ প্রয়োজনমত রাসায়নিক উৎসেচকের সাহায্যে গ্লাইকোজেন কণাকে শর্করায় এবং শর্করাকে গ্লাইকোজেন কণায় রূপান্তরিত করিতে পারে।

শ্বেতসারের মত গ্লাইকোজেন কণায় মৃদু আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগ করিলে উহা লোহিত বাদামী (Reddish brown) রঙে রূপান্তরিত হয়।

(খ) **প্রোটিন (Protein) ঃ**

ইহা নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যপদার্থ (Nitrogenous food material) এবং সাধারণতঃ ইহাতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ব্যতীত, মাঝে মাঝে গন্ধক ও ফসফরাসও থাকে। ইহা অত্যন্ত জটিল জৈব পদার্থ এবং উদ্ভিদের বিপাকীয় কার্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ ইহা দুই রকমের ; যথা—**প্রোটিড** (Proteid) এবং অ্যামাইনো-ঘটিত জৈব পদার্থ (Amino organic compound)। প্রোটিড নানা অবস্থায় উদ্ভিদের কোষে বিদ্যমান। কোন কোন প্রোটিড দ্রবণীয়, আবার কোন কোন প্রোটিড অদ্রবণীয় কঠিন কণারূপে
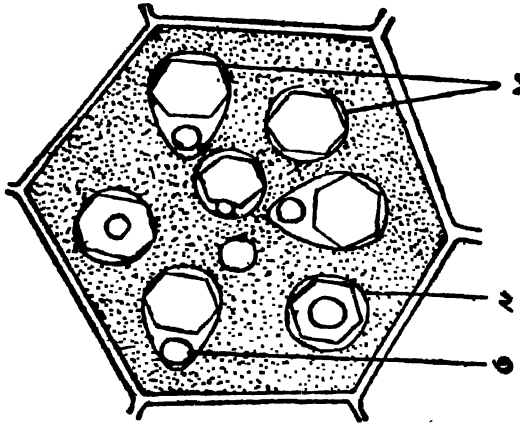
৬৯নং চিত্র

রেড়িবীজে অ্যালিউরোন কণা দেখানো হইতেছে।

১, অ্যালিউরোন কণা ; ২, ক্রিস্টালয়েড ; ৩, গ্লোবয়েড।

কোষের ভিতর কোষগহ্বরের মধ্যে থাকে। সাধারণতঃ ইহা **সঞ্চয়-কলায়** (*storage tissue*) পাওয়া যায় ; কিন্তু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বীজে ইহাদের অস্তিত্ব সহজেই পাওয়া যায়। যে-সমস্ত বীজে জল-অঙ্গারের পদার্থ-কম থাকে, অথচ তৈল পরিমাণে বেশী থাকে, সেইরূপ বীজে প্রোটিড পাওয়া যায়। রেড়ি-বীজের প্রোটিডকে **অ্যালিউরোন দানা** (*Aleurone grain*) বলা হয়। ইহা রেড়িবীজের সস্যে বিদ্যমান। সস্য-কোষের গহ্বরের মধ্যে অ্যালিউরোন

দানার দুইটি অংশ থাকে। কেলাসিত প্রোটিন পদার্থটিকে **ক্রিস্টালয়েড** (*crystalloid*) বলে এবং ইহার সহিত যুক্ত দ্বিতীয় অংশটিকে গ্লোবয়েড বলে। এই অংশটি ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট দ্বারা নির্মিত। অ্যালিউরোন দানা মটরবীজপত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাকারে বিদ্যমান। ভুট্টা, গম, যব ইত্যাদি বীজের সস্যের উপরি-অংশের অর্থাৎ বীজত্বকের নিম্নস্তরের কোষে ইহা পাওয়া যায়। আগেই বলা হইয়াছে যে, যেসকল বীজে জল-অঙ্গার খাদ্য বেশী থাকে, উহাদের বীজে প্রোটিডের অংশ কম থাকে এবং তৈল-পরিমাণ যেসকল বীজে বেশী থাকে, সেইসকল বীজে প্রোটিডের অংশও বেশী থাকে। গমের প্রোটিডের রাসায়নিক সংকেত অত্যন্ত জটিল। ইহাকে গ্লিয়াডিন বলে। বাজরার প্রোটিডকে **জিইন** (*Zein*) বলা হয়। নিম্নে উহাদের সংকেতগুলি দেওয়া হইল :

$$\text{Gliadin—}C_{685}H_{1068}N_{196}O_{211}S_5$$
$$\text{Zein—}C_{736}H_{1161}N_{174}O_{208}S_3$$
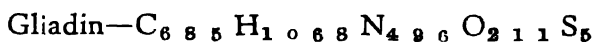
প্রোটিডের পরিমাণ চালে 7%, গমে 12%, সূর্যমুখী বীজে 30% এবং ছোলার ডালে প্রায় 25%। ডাল-জাতীয় বীজে জল-অঙ্গার খাদ্য থাকিলেও প্রোটিডের অংশও বেশী পরিমাণে থাকে। ডাল-জাতীয় বীজের ইহাই বৈশিষ্ট্য; প্রোটিড প্রোটোপ্লাজমের একটি প্রধান উপাদান। ইহা জটিল হওয়ায় ইহার অণুগুলি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হয়। সাধারণভাবে উদ্ভিদ্‌ প্রোটিডে 15% কার্বন, 25% অক্সিজেন, 7% হাইড্রোজেন 16% নাইট্রোজেন, 0·4% গন্ধক ও 0·5% ফসফরাস পাওয়া যায়।

প্রোটিড-জাতীয় **অ্যামাইনো জৈব পদার্থ** (*Amino compounds*) এক-প্রকার তরল ও সরল খাদ্য। ইহা সাধারণতঃ বর্ধনশীল শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগের কোষের মধ্যে পাওয়া যায়। সংবহনের সময় ইহা **অ্যামাইড্‌স্‌** (*Amides*) এবং **অ্যামাইনো অ্যাসিডে** (*Amino acid*) রূপান্তরিত হইয়া যায়। অ্যামাইড্‌স্‌ এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড বর্ধনশীল শাখার অগ্রভাগের কোষের প্রোটোপ্লাজমের সঙ্গে মিলিয়া গিয়া উহার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

প্রোটিনের পরীক্ষা : একটি ছোলা-বীজের দুই দিক জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর উহার একটি সূক্ষ্মচ্ছেদ লইয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা **নাইট্রিক অ্যাসিড** (*Nitric acid*) প্রয়োগ করিলে সূক্ষ্মচ্ছেদের ভিতরকার প্রোটিড

কণাগুলি হরিদ্রাভ রঙে রূপান্তরিত হয়। এখন ইহার পর একই সূক্ষ্মচ্ছেদে ঘন **অ্যামোনিয়ম হাইড্রকসাইড** (*Ammonium hydroxide*) প্রয়োগ করিলে হরিদ্রাভ প্রোটিড কণাগুলি ধীরে ধীরে কমলা-বর্ণ ধারণ করে। এই পরীক্ষাকে **জেনথোপ্রোটিন** (*Xanthoprotein test*) বলা হয়। রেড়ি-সস্যের সূক্ষ্মচ্ছেদে মৃদুজলীয় **এ্যাসেটিক অ্যাসিড** (*acetic acid*) প্রয়োগ করিলে গ্লোবয়েড ধাতব পদার্থটি দ্রবীভূত হইয়া যায়, অথচ ক্রিস্টালয়েড যেমনটি ছিল তেমনটি থাকে। আবার অন্য একটি রেড়ি-সস্যের সূক্ষ্মচ্ছেদে 2% জলীয় কস্টিক পটাস প্রয়োগ করিলে ক্রিস্টালয়েড প্রোটিড পদার্থটি দ্রবীভূত হয়, অথচ গ্লোবয়েড যেমনটি ছিল তেমনটি থাকে।

(গ) **স্নেহপদার্থ ও তৈল** (**Fats and oils**)ঃ

অধিকাংশ উদ্ভিদে অল্পবিস্তর স্নেহপদার্থ ও তৈল থাকে। গুপ্তবীজী উদ্ভিদে প্রধানতঃ ফল বীজে স্নেহপদার্থ ও তৈলের আধিক্য দেখা যায়। উদ্ভিদের যে-সমস্ত অঙ্গে জল-অঙ্গার খাদ্য বেশী থাকে, তথায় স্নেহপদার্থ ও তৈলের পরিমাণ কম। কিন্তু অ্যালিউরোন দানার সহিত রেড়িবীজের স্নেহপদার্থ ও তৈল পাওয়া যায়। সাধারণ উষ্ণতায় স্নেহপদার্থ কঠিন অবস্থায় এবং তৈল তরল অবস্থায় উদ্ভিদের অঙ্গে দেখা যায়। ইহা জলে বা কোহলে দ্রবণীয় নহে (রেড়ির তৈল ব্যতীত)। কিন্তু ইথার, পেট্রোলিয়াম ও ক্লোরোফর্মে ইহারা দ্রবণীয়। স্নেহপদার্থ ও তৈল একই প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ। ইহারা একপ্রকার কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ঘটিত এস্টার (Easter) পদার্থ। ইহারা **স্নেহ-অম্ল** (*Fatty acid*) এবং **গ্লিসারল** (*glycerol*) হইতেই নির্মিত হয়। **লাইপেস** (*Lipase*) নামক একপ্রকার রাসায়নিক উৎসেচক, স্নেহপদার্থ ও তৈলকে যথাক্রমে স্নেহ-অম্ল ও গ্লিসারলে পরিণত করিতে পারে। এইরূপ পরিবর্তনের সময় প্রচুর তাপ নিঃসৃত হয়। উদ্ভিদ্-শারীরবিদ্‌গণের মতে এই দুই রাসায়নিক পদার্থ জল-অঙ্গার খাদ্য হইতে উদ্ভিদের **ইল্যাওপ্লাস্ট** (*Elaioplast*) নামক একপ্রকার প্লাসটিডের সাহায্যে তৈয়ারী হয়। তৈলপূর্ণ বীজগুলি অঙ্কুরিত হইবার সময় স্নেহপদার্থ ও তৈল ইল্যাওপ্লাস্টের দ্বারা শর্করায় রূপান্তরিত হয় এবং ভ্রূণের বৃদ্ধিতে গতিশক্তি যোগায়। স্নেহপদার্থ ও তৈলের রাসায়নিক সংকেতে অক্সিজেনের অনুপাত খুবই কম থাকে এবং কার্বন ও হাইড্রোজেনের অনুপাত অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। সেইজন্য খাদ্য অপেক্ষা ইহারা উদ্ভিদ্-দেহে অধিক পরিমাণে শক্তি যোগাইতে পারে। পূর্ণাঙ্গ তৈলবীজে

স্নেহপদার্থ ও তৈলের পরিমাণ অধিক থাকে, কিন্তু বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় হইতে তৈল ও স্নেহপদার্থ ধীরে ধীরে জল-অঙ্গারে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে স্নেহপদার্থের তরল অবস্থাকে তৈল বলা হয়। কারণ রাসায়নিক সংকেত অনুসারে ইহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। বাষ্পীয় তৈল (Volatile oil) এবং অবাষ্পীয় তৈল (Non-volatile oil) দুই অবস্থায় উদ্ভিদের অঙ্গে দেখা যায়। নারিকেল তৈল, রেড়ি তৈল, বাদাম, সরিষা, লবঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার তৈল আজ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি।

স্নেহপদার্থ ও তৈলের পরীক্ষা: কয়েক বিন্দু অস্‌মিক অ্যাসিড (Osmic acid) স্নেহপদার্থ বা তৈলে প্রয়োগ করিলে উহা পিঙ্গল হইতে কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। সুডান চার (Sudan 4) নামক রাসায়নিক দ্রব্য স্নেহপদার্থ বা তৈলে প্রয়োগ করিলে উহা লোহিত বর্ণে পরিণত হয়। স্নেহপদার্থ ও তৈল কাগজের উপর রাখিলে উহার দ্বারা কাগজের উপর দাগ দেখা দেয় এবং দাগের স্থানটি স্বচ্ছ হইয়া যায়।

নিম্নে উদ্ভিদ্-খাদ্যের একটি উদাহরণ ছক-সহ দেওয়া হইল।
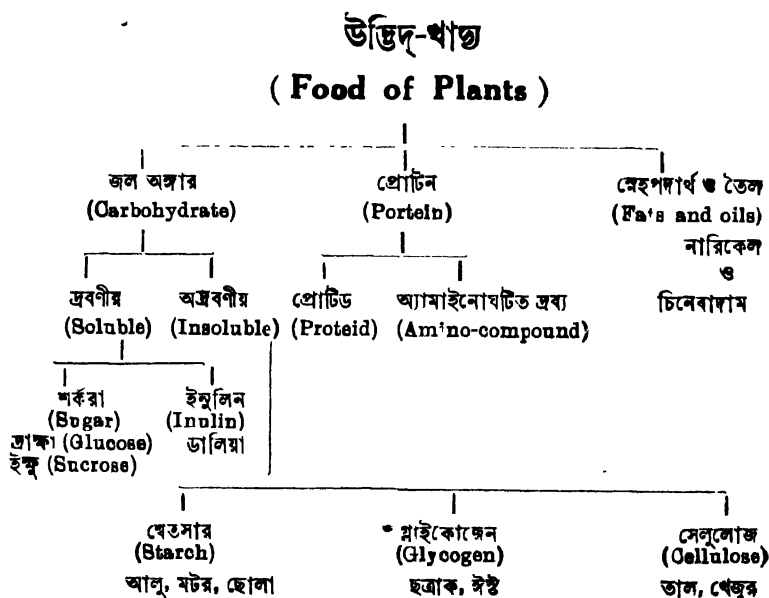
উদ্ভিদ্-খাদ্যের প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান

(Essentials food elements in plant)

উদ্ভিদের খাদ্য এবং ইহার বিভিন্ন অঙ্গে নানাপ্রকার খাদ্যের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিবার পর স্বভাবতঃ মনে প্রশ্ন জাগে যে উদ্ভিদ্ কি উপায়ে এইরূপ জটিল জৈব খাদ্য নিজ দেহের ভিতর সঞ্চয় করে এবং এইরূপ খাদ্যের মৌলিক উপাদানগুলি বা কি কি? আমরা জানি—জল-অঙ্গার, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও তৈল—এই চারিপ্রকার খাদ্য উদ্ভিদের দেহে পাওয়া যায়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ্ জল-অঙ্গার খাদ্য প্রস্তুত করে এবং এই জল-অঙ্গার খাদ্য হইতেই নানাবিধ রাসায়নিক উপায়ে উদ্ভিদ্ অন্যান্য খাদ্যগুলি প্রস্তুত করে। এইসমস্ত খাদ্য বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে, ইহারা **অক্সিজেন** (*O*), **হাইড্রোজেন** (*H*), **কার্বন** (*C*), **নাইট্রোজেন** *N*), **গন্ধক** (*S*), **ফস্‌ফরাস** (*P*)—এই ছয়প্রকার **মৌলিক উপাদানে** (*essential elements*) প্রস্তুত। কিন্তু ইহা ব্যতীত **সোডিয়ম** (*Na*), **ক্যালসিয়ম** (*Ca*), **পটাসিয়ম** (*K*), **ম্যাগনেসিয়ম** (*Mg*), **লৌহ** (*Fe*), এমনকি **ক্লোরিন** (*Cl*), **ব্রোমিন** (*Br*), **সিলিকন** (*Si*) এবং **মলিবডেনাম** (*Molybdenum*) প্রভৃতি অধাতব ও ধাতব মৌলিক পদার্থ উদ্ভিদের দেহে পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত চারিপ্রকার খাদ্য বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির অস্তিত্ব পাওয়া যায়; যথা—

খাদ্য	খাদ্যের উপাদান
(i) জল-অঙ্গার	C. H. O.
(ii) স্নেহপদার্থ ও তৈল	C. H. O.
(iii) প্রোটিন	C. H. O., N. S. P.

সুতরাং উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা হইতে জলশোষণের সময় উহার সহিত শুধু যে অজৈব লবণ শোষণ করে তাহা নহে, এই অজৈব লবণগুলিকে জটিল জৈব খাদ্যে পরিণত করে। সাধারণতঃ মৃত্তিকায় ধাতব পদার্থ (mineral) এবং ধাতব লবণ (mineral salts) দুই-ই থাকে এবং উদ্ভিদ্ প্রয়োজন অনুযায়ী বিবিধ অনুপাতে উহা শোষণ করে। উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ মৃত্তিকা হইতে নাইট্রেট (Nitrate), অ্যামোনিয়াম (Ammonium) এবং নাইট্রাইট (Nitrite) অবস্থায়

নাইট্রোজেন শোষণ করে। নাইট্রেট ও নাইট্রাইট জলে সহজেই দ্রবণীয়। সুতরাং উদ্ভিদের পক্ষে উহা শোষণ করা খুবই সহজ। অধাতব এবং ধাতব উপাদানগুলি নাইট্রাইট এবং নাইট্রেটের সহিত দ্রবণীয় এবং উদ্ভিদ্ উহাদের শোষণ করে। **রাসায়নিক** বিশ্লেষণের (Chemical Analysis) দ্বারা উদ্ভিদ্-খাদ্যের মৌলিক উপাদানগুলি সহজেই জানা যায়। যে-কোন উদ্ভিদ্ বা উহার অঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার পর ভালভাবে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। খণ্ডগুলিকে ব্লটিং কাগজে উহার বাহিরের জল শোষণ করিয়া লওয়ার পর উহাদের ওজন করিয়া লইতে হইবে। এখন উদ্ভিদ্খণ্ড-গুলিকে 110°C তাপে শুকাইয়া লওয়ার পর দ্বিতীয়বার ওজন করিলে উহার ওজন প্রথম ওজনের পরিমাণের চেয়ে যথেষ্ট কম হইবে। দেখা গিয়াছে যে, কাষ্ঠল উদ্ভিদে 45—50% জল থাকে। সেইরূপ, গুল্মতে 75—80%, রসাল উদ্ভিদে 85—95% ও জলজ উদ্ভিদে ·95—98% জল থাকে। সুতরাং এই সামান্য পরীক্ষার দ্বারা জানা যায় যে "জলই উদ্ভিদের জীবন" কথাটি কত খাঁটি। এখন উপরি-উক্ত শুষ্ক উদ্ভিদ্খণ্ডগুলিকে কাচের রিটর্টের ভিতর পোড়াইয়া ফেলিলে জল-অঙ্গার, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও তৈল প্রভৃতি খাদ্যগুলি বাষ্পীয় উপাদানে, যথা—কার্বন-ডাইকসাইড, সালফার-ডাইকসাইড ও অ্যামোনিয়ায় পরিণত হইয়া বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। কাচের রিটর্টের তলায় কেবলমাত্র ছাই বা ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। ভস্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার অধিকাংশই কার্বন। সুতরাং এইভাবে আমরা যে-কোন গাছের মধ্যে কত পরিমাণে কি কি উপাদান শতকরা হিসাবে থাকে, তাহার একটি সাধারণ ছক মোটামুটি-ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারি।

কার্বন	···	··· 45 হইতে 48%
অক্সিজেন	···	··· 45 হইতে 47·5%
হাইড্রোজেন	···	··· 6 হইতে 6·5%
নাইট্রোজেন	···	··· 1·5%
ভস্ম	···	... ·50%
		100% (আনুমানিক ভাবে)

এই ভস্মেই নানাবিধ জারিত মৌলিক ধাতব পদার্থের (Oxide to metals) অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এখন সমস্ত মৌলিক উপাদানগুলিকে দুই

ভাগে বিভক্ত করা হয় ; যথা—উদ্ভিদের মূল উপাদান (essential elements) এবং অনাবশ্যক উপাদান (non-essential elements)। দশটি মূল উপাদানের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল এবং বাকি নয়টি অনাবশ্যক উপাদানের নামও উল্লেখ করা হইল :

I. **ধাতব মূল উপাদান (metal essential)** — পটাসিয়ম (K) ; ক্যালসিয়াম (Ca) ; ম্যাগনেসিয়ম (Mg) ; এবং লৌহ (Fe)

II. **অবধাতব মূল উপাদান (Non-metal essential)** — কার্বন (C) ; হাইড্রোজেন (H) ; নাইট্রোজেন (N) ; অক্সিজেন (O) ; গন্ধক (S) ; এবং ফস্‌ফরাস (P)

III. **অনাবশ্যক উপাদান—অধাতব** (Non-metal—non-essential) : বালুকা বা সিলিকন্ (Si) ; ক্লোরিন (Cl) ; বোরোন (B)।

IV. **অনাবশ্যক উপাদান—ধাতব** (Metal—non-essential) : জিঙ্ক বা দস্তা (Zn) ; তাম্র (Cu) ; অ্যালুমিনিয়ম (Al) ; সোডিয়াম (Na) ; কোবাল্ট (Co) এবং মলিবডেনাম (Mo)।

উপরি-উক্ত মৌলিক উপাদানগুলি উদ্ভিদ্ কি-ভাবে ও কোথা হইতে গ্রহণ করে এবং উদ্ভিদের বিপাকীয় কার্যে উহারা কি-ভাবে অংশ গ্রহণ করে, নিম্নে এক-একটি করিয়া প্রত্যেকটি উপাদানের বিবরণ দেওয়া হইল ; যথা—

(১) **অক্সিজেন** (Oxygen) : উদ্ভিদ্ বাতাস হইতে শ্বসন-প্রক্রিয়ার দ্বারা অক্সিজেন শোষণ করে এবং সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির সময় নির্গত অক্সিজেনও উদ্ভিদ্ পুনরায় শ্বসন-প্রক্রিয়ার সময় শোষণ করিয়া লয়। জল-অঙ্গার, প্রোটিন, তৈল, স্নেহপদার্থ প্রভৃতি খাদ্যে অক্সিজেন একটি প্রধান উপাদান। ইহা ব্যতীত অক্সিজেন খাদ্য হইতে কেবলমাত্র শক্তি নির্গত হয় ; অক্সিজেন খাদ্যদ্রব্য দাহ করিয়া উহার ভিতরের স্থিতি-শক্তিকে গতি শক্তিরূপে নির্গত করে। এই গতি-শক্তিই উদ্ভিদের সকল কার্য সম্পন্ন করিতে শক্তি যোগায়।

(২) **হাইড্রোজেন** (Hydrogen) : মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ্ জল শোষণ করে। জলকণাগুলি উদ্ভিদের পাতার কোষের ভিতর প্রধানতঃ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন অণুতে বিভক্ত হইয়া যায় ও হাইড্রোজেন কোষের সাইটোপ্লাজম নির্মাণে এবং বিবিধ খাদ্য প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করে।

(৩) **কার্বন (Carbon) :** উদ্ভিদ্ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডায়কসাইড শোষণ করে এবং শ্বসন-ক্রিয়ায় উদ্ভিদ্ কার্বন-ডায়কসাইড নির্গমন করে। উদ্ভিদের পাতার কোষের ভিতর কার্বন ডায়কসাইড গ্যাস কার্বন ও অক্সিজেন অণুতে বিভক্ত হইয়া যায় এবং কার্বন উদ্ভিদের সাইটোপ্লাজম নির্মাণে এবং বিবিধ খাদ্য প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করে।

(৪) **নাইট্রোজেন (Nitrogen) :** মৃত্তিকার ভিতর যে-সমস্ত ধাতব লবণ থাকে তাহাদের মধ্যে নাইট্রাইট, নাইট্রেট এবং অ্যামোনিয়ম লবণ প্রধান। লবণ সহজেই জলে দ্রবণীয় এবং সেইজন্য জলের সহিত লবণ অনায়াসে মূলরোমের ভিতর দিয়া উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করিতে পারে। নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়াম লবণের মধ্যে নাইট্রোজেন অণুগুলি সাইটোপ্লাজম গঠনে অংশ গ্রহণ করে এবং বিবিধ খাদ্যপ্রস্তুতিতেও অংশ গ্রহণ করে। প্রোটিন খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে। কতকগুলি উদ্ভিদ্ আবার নানা উপায়ে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। ছোলা বা মটর গাছের মূলের শাখা-প্রশাখায় নোডিউলের (Nodule) সৃষ্টি হয়। ইহার ভিতরে নাইট্রোজেন-স্থিতিকারক বীজাণু (Nitrogen fixing bacteria) থাকে এবং ইহারা নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া নাইট্রাইট নির্মাণ করে এবং উদ্ভিদ্‌কে কোষের সাইটোপ্লাজম ও খাদ্য-গঠনের জন্য উহা সরবরাহ করে। পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদেরা পতঙ্গদেহ হইতে প্রোটিন-ঘটিত খাদ্য শোষণ করে এবং প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকায় পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ্ নিজেদের নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটায়। ক্লোরোফিল গঠনে নাইট্রোজেনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

(৫) **ফসফরাস (Phosphorus) :** মৃত্তিকায় ফস্‌ফেট (Calcium Phosphate) লবণে ফস্‌ফরাস বিদ্যমান। উদ্ভিদ্ জলের সহিত দ্রবীভূত ফস্‌ফেট শোষণ করে। ফস্‌ফরাস উদ্ভিদের কোষস্থ নিউক্লিয়সের একটি বিশিষ্ট উপাদান। ফস্‌ফরাসের অভাব হইলে কোষগুলি সহজে বিভক্ত হইতে পারে না। ফস্‌ফরাস প্রোটিন-ঘটিত খাদ্যনির্মাণে সাহায্য করে এবং ফল ও বীজের পুষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে। উদ্ভিদ্-শারীরবিদ্‌গণ বলেন যে, মূলতন্ত্রের গঠনে এবং বৃদ্ধিতে ফস্‌ফরাসের সহযোগিতা পরোক্ষভাবে দরকার হয়।

(৬) **গন্ধক (Sulphur) :** ফস্‌ফরাসের মত উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা হইতে ম্যাগনেসিয়াম সাল্‌ফেট্ (magnesium sulphate) রূপে গন্ধক শোষণ

করে। প্রোটিন খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান হইল গন্ধক এবং সজীব প্রোটোপ্লাজমের ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, শ্বসন-কার্য সহায়ক এবং বৃদ্ধির জন্য গ্লুটাথিয়ন (glutathione) উৎসেচকে গন্ধক পাওয়া যায়। সরিষার তৈল এবং রসুনে গন্ধকের অংশ থাকে।

(৭) **পটাসিয়াম (Potassium) :** পটাসিয়াম, কোষের সাইটোপ্লাজমের একটি বিশিষ্ট উপাদান। ইহা উৎসেচকগুলিকে কার্যকরী করিতে শক্তি যোগায়। উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গে ইহার অস্তিত্ব প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। জল-অঙ্গার, প্রোটিন বা স্নেহপদার্থ খাদ্যগুলি পটাসিয়ামের সহযোগিতা না পাইলে নির্মিত হইতে পারে না। ফস্‌ফরাসের মত পটাসিয়াম উদ্ভিদ্‌কে পুষ্ট ও সবল করিতে এবং ফুল-বীজ ধারণ করিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। মৃত্তিকায় পটাসিয়াম নাইট্রেট (Potassium nitrate) ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড (Potassium chloride) হইতেই উদ্ভিদ্ পটাসিয়াম গ্রহণ করে। পটাসিয়াম-বিহীন উদ্ভিদ্-গুলির পাতা বিবর্ণ হয় এবং ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারাইয়া ফেলে ও ঝরিয়া পড়ে। বড পানার পাতায় 12% পটাসিয়াম পাওয়া যায় এবং সেইজন্য ইহাকে একটি মূল্যবান সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(৮) **ক্যালসিয়াম (Calcium) :** ক্যালসিয়াম ব্যতিরেকে কোন উদ্ভিদ্ বাঁচিতে পারে না। ইহা উদ্ভিদের কোষ-জাত অ্যাসিড অতি সহজেই ধ্বংস করে। কোষের কোষ-প্রাচীরে এবং মধ্যচ্ছদায় ক্যালসিয়াম পেক্‌টেট (Calcium Pectate) রূপে ক্যালসিয়াম জমা থাকে। কোষস্থ সাইটোপ্লাজমের ভেদ্যতা (Semi-permeability) ক্যালসিয়াম দ্বারা রক্ষা পায়। মূলের বৃদ্ধিতে ইহার সাহায্য প্রত্যক্ষভাবে দরকার। লেবু, কমলালেবু প্রভৃতি ফল ক্যালসিয়ামপূর্ণ মৃত্তিকায় ভালোভাবে উৎপন্ন হয়; শুধু ইহাই নহে, ফলের শক্ত আঁটিগুলি ক্যালসিয়ামের দ্বারা নির্মিত হয়।

(৯) **ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) :** ক্লোরোফিল এবং সাইটো-প্লাজমের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হইল ধাতব ম্যাগনেসিয়াম। ক্লোরোফিলে 56% ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায়। সুতরাং ক্লোরোফিল বিনা ম্যাগনেসিয়ামে নির্মিত হয় না। বিবিধ উদ্ভিদ্-উৎসেচকে ম্যাগনেসিয়াম প্রায়ই দেখা যায়। ইহা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য-প্রস্তুতিতে সাহায্য করে।

(১০) **লৌহ (Iron) :** উদ্ভিদের কোষের নিউক্লিয়সে লৌহ পাওয়া

যায়। ইহা নিউক্লিয়সের ক্রোমাটিনের একটি বিশেষ উপাদান। ক্লোরোফিলে লৌহের কোন অংশ নাই বটে, তবে সামান্যতম লৌহ আয়নের (ions) উপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফিল নির্মিত হয়। ক্লোরোফিল-নির্মাণে লৌহ উৎসেচক-রূপে কার্য করে। লৌহ ব্যতীত উদ্ভিদের পাতা হরিদ্রাভ বর্ণ ধারণ করে।

উদ্ভিদের অনাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান
(Non-essential trace elements)

(১১) **সিলিকা বা বালুকা** (Silicon): সোডিয়াম সিলিকেট (Sodium silicate)-রূপে ইহা মৃত্তিকা হইতে শোষিত হয়, বালুকা-কোষের কোষ-প্রাচীরে জমা হয় এবং তদ্দ্বারা কোষগুলিকে রক্ষা করে। ইহা ফস্‌ফরাস-জাতীয় জটিল দ্রব্যগুলির পরিপাকের সময় সাহায্য করে।

(১২) **ক্লোরিন** (Chlorine): ক্লোরাইড-রূপে বহু লবণ মৃত্তিকায় থাকে; যেমন, সোডিয়াম বা পটাসিয়াম ক্লোরাইড (Sodium or Potassium Chloride) ইত্যাদি। সোডিয়ামের সহিত ক্লোরিনও উদ্ভিদ্‌-দেহে প্রবেশ করে। ক্লোরিনের সঠিক কার্যকারিতা এখনও জানা যায় নাই। ইহা পরোক্ষ-ভাবে ধাতব মৌলিক পদার্থগুলিকে উদ্ভিদ্‌-দেহে প্রবেশ করায়।

(১৩) **বোরোন** (Boron): মৃত্তিকায় বোরেটস্‌ (Borates)-রূপে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহা জলে দ্রবণীয় হওয়ায় উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত হয়। দেখা গিয়াছে, সামান্যতম বোরোন প্রয়োগে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বাড়ানো যায়। মটর, ছোলা প্রভৃতি ডাল-জাতীয় উদ্ভিদের মূলে নডিউল (Nodiule) সৃষ্টির সময় বোরোনের সহযোগিতা অপরিহার্য। প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য-প্রস্তুতির সময় বোরোনের সাহায্য দরকার। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদ্‌ উপযুক্ত পরিমাণে বোরোন শোষণ না করিলে উহার শাখা, বৃন্ত, এমনকি ভিতরকার কলাসমষ্টিগুলি ক্ষণভঙ্গুর হইয়া যায় এবং উদ্ভিদের মূলতন্ত্র অতি দুর্বলভাবে বৃদ্ধি পায়।

(১৪) **জিঙ্ক বা দস্তা** (Zinc): রাই, মটর, পিঁয়াজ প্রভৃতি উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য দস্তা আবশ্যক। কতকগুলি রাসায়নিক উৎসেচকের ইহা একটি উপাদান। দেখা গিয়াছে, লেবুর পাতা দস্তার অভাবে অতি ক্ষুদ্র হইয়া যায়।

(১৫) **কপার বা তাম্র** (Copper): তাম্র উদ্ভিদের শ্বসন-ক্রিয়ার

সময় সামান্য পরিমাণে দরকার হয় এবং সেই প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণকারী বহু উৎসেচকে তাম্র একটি উপাদানরূপে দেখা যায়।

(১৬) **অ্যালুমিনিয়াম** (**Aluminium**) **:** অ্যালুমিনিয়াম উদ্ভিদের সাধারণ বৃদ্ধি বর্ধন করে; ফুল ও বীজের পুষ্টিতে ইহা যথেষ্ট সাহায্য করে। কোষগুলি অ্যালুমিনিয়ামের আস্বাদ পাইলে উহাদের কার্যকারিতা বাড়িয়া যায়। শ্বেতসার নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম বিবিধ উৎসেচকের মত কার্য করে এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে ইহা দ্রুত আগাইয়া দেয়। ডালিয়া, সূর্যমুখী প্রভৃতি উদ্ভিদে অ্যালুমিনিয়াম প্রয়োগ করিলে উহাদের দ্রুত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় এবং ফুলের আকার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

(১৭) **সোডিয়াম** (**Scdium**) **:** সোডিয়াম ক্লোরাইড (Sodium Chloride) বা সাধারণ লবণ হিসাবে ইহা প্রত্যেক প্রকার মাটিতে থাকে। যদিও ইহার বিশেষ কোন কার্যকারিতা জানা নাই, তথাপি ইহাকে প্রত্যেকটি উদ্ভিদ্ অল্পবিস্তর শোষণ করে।

(১৮) **কোবাল্ট** (**Cobalt**) **:** উদ্ভিদের সাধারণ বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি উৎসেচক সর্বদাই কার্যে রত থাকে। কোবাল্ট এইরূপ উৎসেচকের একটি মৌলিক উপাদান।

(১৯) **মলিবডেনাম** (**Molybdenum**) **:** নাইট্রোজেনকে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যে পরিণত করিতে হইলে মলিবডেনামের সাহায্য অনিবার্য। তাই গম, ধান ইত্যাদি প্রোটিন-জাতীয় উদ্ভিদে অতি সামান্য পরিমাণে মলিবডেনাম প্রয়োগ করিলে প্রচুর ফসল পাওয়া যায়।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা

(Demonstration and Experiment)

প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদের মৌলিক উপাদানগুলি (essential elements) যে-কোন উদ্ভিদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহা বিবিধ প্রকার পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে যে-কোন উদ্ভিদের মৌলিক উপাদান-গুলি সহজেই বাহির করা যায় এবং এইজন্য উদ্ভিদ্-শারীরবিদ্‌গণ বিবিধ দ্রবণীয় রাসায়নিকের সাহায্যে **কৃষ্টি-জল** (*Water culture solution*) তৈয়ারী করিয়াছেন। এই কৃষ্টি-জলের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলির, উদ্ভিদ্ বৃদ্ধিকালে উহাদের প্রভাব সহজেই নির্ণয় করা যায়।

বহু বৈজ্ঞানিক **কৃষ্টি-জল** (*Culture solution*) আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপ কৃষ্টি-জল উদ্ভিদের মৌলিক উপাদানের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে পাতিত জল মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়। নানাবিধ কৃষ্টি-জলের মধ্যে নপের (*Knop*) কৃষ্টি-জল সর্বজনবিদিত। ইহাতে নিম্নলিখিত দ্রবণগুলি থাকে ; যথা—

রাসায়নিক দ্রবণ	দ্রবণের পরিমাণ
পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3)	এক গ্রাম
পটাসিয়াম ফস্‌ফেট (KH_2PO_4)	এক গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4$)	এক গ্রাম
ক্যালসিয়াম নাইট্রেট [$Ca(NO_3)_2$]	এক গ্রাম
ফেরিক ক্লোরাইড ($FeCl_3$)	অতি সামান্য
পাতিত জল	হাজার সি. সি.

কিন্তু বর্তমানে ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত দ্রবণগুলি লইয়া কৃষ্টি-জল তৈয়ারী করা হয় ; যথা—

এক মোলার ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4$)	2·3 c.c.
এক মোলার ক্যালসিয়াম নাইট্রেট [$Ca(NO_3)_2$]	4·5 c.c.
এক মোলার পটাসিয়াম ফস্‌ফেট (KH_2PO_4)	2·4 c.c.
এক মোলার ফেরিক ক্লোরাইড ($FeCl_3$)	5 gms.
টার্টারিক অ্যাসিড (পরীক্ষার সময় মাঝে মাঝে প্রয়োগ করা দরকার)	5 gms.
পাতিত জল	1,000 c.c.

(কোন লবণের এক গ্রাম মলিকিউল (1 gm. molecule) পরিমাণ ওজন করিয়া উহার সহিত হাজার সি.সি. পাতিত জল মিশ্রিত করতঃ যে দ্রবণটি প্রস্তুত হয়, উহাকেই এক মোলার ওজনের লবণ বলা হয়।)

এখন কতকগুলি সমান আকারের উদ্ভিদ্‌বীজ একটি চিনামাটির পাত্রে পাতিত জলে ভিজাইয়া রাখ। কিন্তু কাঠের গুঁড়া নির্বীজিত (sterilized) করিবার পর নরম বীজগুলিকে উহার মধ্যে অঙ্কুরিত কর। এখন আটটি সমান আকারের বড় বোতল বা জার লও। উহাদের কর্কগুলিতে দুইটি ছিদ্র কর। একটি ছিদ্র কর্কের মধ্যস্থলে, অপরটি কর্কের পাশে এমনভাবে কর যাহাতে মধ্যছিদ্র দিয়া মূলসমেত চারা-উদ্ভিদ্ প্রবেশ করিতে পারে।

এখন প্রত্যেকটি বোতলের পার্শ্ব দিয়া একটি বক্র কাঁচের নল এমনভাবে প্রবেশ করাও যাহাতে নলের এক মুখ বোতলের ভিতরে অর্ধেক পর্যন্ত থাকে। প্রথম বোতলে 'নপ'-এর কৃষ্টি-জল বোতলের গলা পর্যন্ত ঢালিয়া দাও। দ্বিতীয় বোতলে 'নপ'-এর কৃষ্টি-জল হইতে পটাসিয়াম বাদ দিয়া বাকি লবণ-দ্রবণ-সমষ্টি
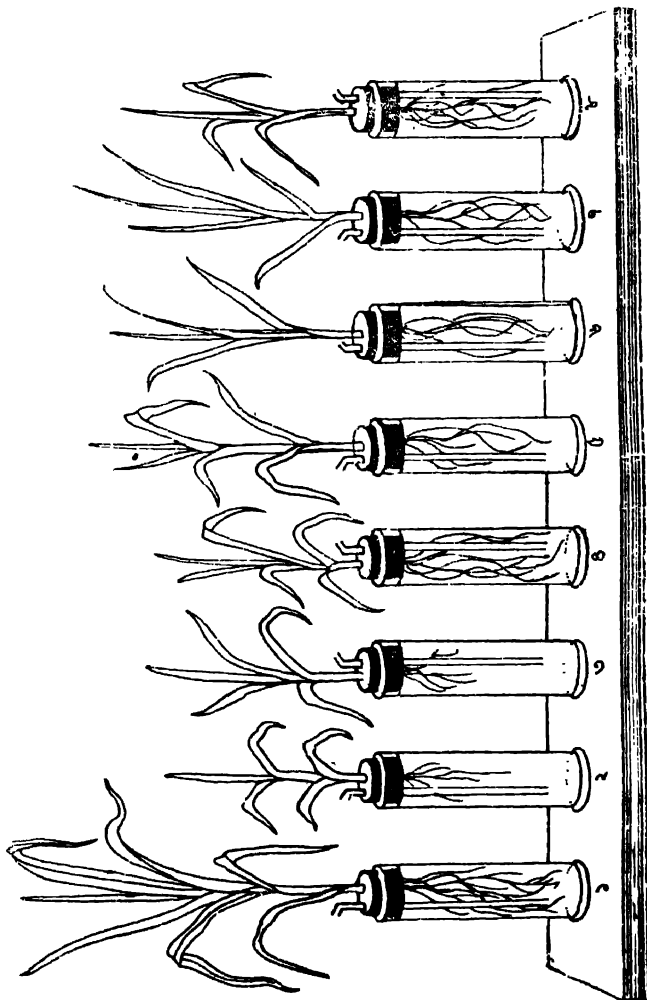
৭০নং চিত্র

কৃষ্টি-জলে উদ্ভিদের পরীক্ষা।

১, কৃষ্টি-জলে সব উপাদান বিদ্যমান থাকায় গাছের সাধারণ বৃদ্ধি দেখানো হইতেছে ; ২, পটাসিয়াম নাই ; ৩, ক্যালসিয়াম নাই ; ৪, ম্যাগনেসিয়াম নাই ; ৫, লৌহ নাই ; ৬, ফস্ফরাস নাই ; ৭, গন্ধক নাই ; ৮, নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ নাই।

ঢালিয়া দাও। তৃতীয় বোতলে সেইরূপ ক্যালসিয়াম বাদ দিয়া বাকি লবণ-দ্রবণ-সমষ্টি ঢালিয়া দাও। সেইরূপ চতুর্থ বোতলে ম্যাগনেসিয়াম, পঞ্চম বোতলে লৌহ, ষষ্ঠ বোতলে ফস্ফরাস, সপ্তম বোতলে গন্ধক এবং অষ্টম বোতলে

নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ বাদ দিয়া বাকি কৃষ্টি-জল পাতিত জলের সহিত বিবিধ বোতলে ঢালিয়া দাও।

এখন সমান আকারের অঙ্কুরিত চারাগাছগুলিকে পাতিত জলে ভালোভাবে ধুইয়া প্রত্যেকটি বোতলের মধ্যছিদ্র একে একে এমনভাবে প্রবেশ করাও যাহাতে উহাদের মূলগুলি কৃষ্টি-জলের ভিতরে থাকে। কর্কের চারি পাশে নির্বীজিত তুলা দিয়া চারাগাছগুলিকে খাড়াভাবে রাখ। কর্ক ও তুলা যেন শুষ্ক থাকে সে-বিষয়ে নজর রাখা দরকার। প্রত্যেকটি বোতলের চারিপাশ কালো পর্দা বা কালো কাগজে আবৃত কর। কারণ, আলোকে মূল স্বাভাবিকভাবে কাজ করিতে পারে না। এখন বোতলের ভিতরকার চারাগুলির বৃদ্ধি লক্ষ্য কর এবং ন্যারের মধ্যে প্রায় পনর মিনিট পর্যন্ত বায়ু প্রবেশ করাও। সর্বদাই যেন কৃষ্টি-জল সামান্য অম্লযুক্ত (acidic) হয় এবং সেইজন্য প্রতিটি বোতলে 5% টার্টারিক অ্যাসিডের কয়েক ফোঁটা করিয়া ঢালিয়া দেওয়া দরকার। এমন প্রত্যেকটি বোতল আলোকপূর্ণ স্থানে রাখ। কৃষ্টি-জল প্রতি সপ্তাহে বদলাইতে হয়। প্রতিটি বোতলে নম্বর দিয়া, উহার কৃষ্টি-জলে যে দ্রবণটি বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা লিখিয়া রাখ। সপ্তাহ দুই পর প্রথম বোতলের চারাটি সাধারণ গাছের মত বৃদ্ধিলাভ করিবে। দ্বিতীয় বোতলের চারাগাছটির বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে। উহার পাতার রঙ হালকা সবুজ বর্ণের হইবে। বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় চারাগাছটি খর্বাকার দেখা যাইবে। তৃতীয় বোতলের চারাগাছটির মূলের বৃদ্ধি ভালো হইবে না। পাতাগুলিতে দাগ দেখা দিবে এবং ইহা গুটাইয়া যাইবে। চতুর্থ বোতলের চারাগাছটির পাতাগুলির রঙ হালকা হরিদ্রাভ রূপে দেখা যাইবে। পঞ্চম বোতলের চারাগাছটির পাতাও সবুজ রঙের পরিবর্তে হরিদ্রাভ বা পাণ্ডুবর্ণের হইবে। ষষ্ঠ বোতলের চারাগাছটি প্রথম প্রথম বেশী বৃদ্ধি পাইবে, পরে উহার বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়া গাছটি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে দেখা যাইবে। সপ্তম ও অষ্টম বোতলের চারাগাছ দুইটির প্রথম হইতেই বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে এবং পাতাগুলি হরিদ্রাভ বর্ণে রূপান্তরিত হইবে।

এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (i) কৃষ্টি-জলে সকল মৌলিক উপাদানগুলি বর্তমান থাকিলে গাছের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়; (ii) ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম গাছের সাধারণ বৃদ্ধিকে সাহায্য করে এবং মূলের শোষণ-ক্ষমতা বা দক্ষতা বৃদ্ধি করে; (iii) লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম পাতায় ক্লোরোফিল উৎপাদন

করে; (iv) গন্ধক, ফস্‌ফরাস ও নাইট্রোজেন গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

উদ্ভিদের মূলের অবস্থান স্বাভাবিক রাখার জন্য **বালুকা** (*Sand*) বা **কাঠকয়লা** (*Charcoal*) কৃষ্টি-জলের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। বলা বাহুল্য যে, বালুকা বা কাঠকয়লা ব্যবহার করার আগে উহাদের ভালোভাবে নির্বীজিত করিয়া লইতে হয়। বালুকা বা নুড়ি দিয়া উপরি-উক্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করিলে উহাদের যথাক্রমে **বালুকা-কৃষ্টি পরীক্ষা** (*Sand culture experiment*) বা **নুড়ি-কৃষ্টি পরীক্ষা** (*Gravel culture experiment*) বলা হয়। কাঠকয়লা দ্বারা পরীক্ষা সম্পন্ন করিলে, উহাকে **কাঠকয়লা-কৃষ্টি পরীক্ষা** (*Charcoal culture experiment*) বলা হয়। বালুকা, নুড়ি বা কাঠকয়লা-কৃষ্টি পরীক্ষার সময় উদ্ভিদের মূলগুলি শ্বাসগ্রহণের সময় সহজেই অক্সিজেন শোষণ করিতে পারে।

অনুশীলনী

১। একটি দ্বিবীজপত্রী বীজের বিবিধ অংশ চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe the internal structure of a dicot seed with sketches.)

২। একটি সস্যল দ্বিবীজপত্রী বীজের বিভিন্ন অংশের চিত্রসহ বিবরণ দাও। (Give an account of the structure of a dicot albuminous seed. Leave labelled sketches.) [C. U. 1961]

৩। যে-কোন একটি একবীজপত্রী বীজের বিবিধ অংশ বর্ণনা করিয়া উহার লম্বচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাও। (Describe the structure of a monocot seed. Draw a longitudinal section of the seed and label its parts.)

৪। একটি একবীজপত্রী বীজের বিভিন্ন অংশের সহিত একটি দ্বিবীজপত্রী বীজের বিভিন্ন অংশের তুলনা কর। (Compare the internal structure of a monocot seed with that of dicot seed.)

৫। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য কি কি প্রয়োজন? একটি পরীক্ষার দ্বারা উহাদের সার্থকতা প্রমাণ কর। (What are the conditions necessary for germination? Prove these factors by means of an experiment.)

৬। বীজের অঙ্কুরোদ্গম কয়প্রকার? প্রত্যেকটি প্রকারভেদের বিবরণ উদাহরণসহ দাও। (What are the types of germination? Describe each type of germination with examples.)

৭। উদ্ভিদের বিবিধ অঙ্গে কি কি প্রকারের খাদ্য পাওয়া যায়? প্রতিটি খাদ্যের সূক্ষ্ম রাসায়নিক পরীক্ষা লিপিবদ্ধ কর। (What are the types of food present in the various organs of a plant? Give microscopical test for each food.)

৮। উদ্ভিদ্-খাদ্যের প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেকটির বর্ণনা দাও। (What do you mean by the essential food element of a plant? Give an account of each.)

৯। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলি কোথায় পাওয়া যায়? উহাদের কার্যকারিতা বর্ণনা কর। (Describe the importance and the sources of the essential elements of a plant.)

১০। কৃষ্টি-জল পরীক্ষার দ্বারা উদ্ভিদ্-খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কার্যকারিতা বর্ণনা কর। 'নপ'-এর কৃষ্টি-জল দ্রবণের বিবিধ লবণগুলির পরিমাণ লিপিবদ্ধ কর। (Show the importance of the essential food elements of a plant by a water culture experiment. Write the formulae of Knop's Water Culture Solution.)

১১। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান, লিখ:

(i) কাঠকয়লা-কৃষ্টি পরীক্ষা, (ii) ইল্যাওপ্লাষ্ট, (iii) অ্যালিউরোন কণিকা, (iv) গ্লাইকোজেন, (v) ইনুলিন, (vi) ইক্ষুশর্করা, (vii) জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম, (viii) সস্যাবরণী, (ix) বীজপত্রাধিকাণ্ড, (x) ভ্রূণাক্ষের কক্ষ, (xi) অসমগ্ন বীজ।

[Write short notes on: (i) Charcoal culture experiment, (ii) Elaioplast, (iii) Aleurone grain, (iv) Glycogen, (v) Inuline, (vi) Cane sugar, (vii) Vivipary, (viii) Perisperm, (ix) Epicotyle, (x) Axis, (xi) Nodal zone.]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৃত্তিকার প্রকারভেদ

(Types of soil)

মৃত্তিকা (Soil) ঃ

উদ্ভিদ্ মূলের সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি বিবিধ মৌলিক উপাদান গ্রহণ করিয়া কি-ভাবে খাদ্য-প্রস্তুত ও পুষ্টিলাভ করে, তাহা বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং উদ্ভিদ্ এবং উদ্ভিদ্-নির্ভরশীল প্রাণীদের প্রতি মৃত্তিকার দান অপরিহার্য।

সাধারণতঃ ভূত্বকের কিছু অংশ কঠিন এবং কিছু অংশ নরম দেখা যায়। ভূত্বকের উপরিভাগ সর্বদাই যে নরম হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। পর্বতময় স্থানের প্রতিটি স্তরই কঠিন। সুতরাং কঠিন স্তরটিকে আমরা প্রস্তর (rock) বলিয়া থাকি এবং যখন ভূত্বকের উপরিভাগ নরম থাকে, তখন এই নরম স্তরটিকে মৃত্তিকা (soil) বলি। প্রকৃতপক্ষে ভূত্বকের কঠিন স্তরগুলি প্রকৃতির নানা কার্যকলাপের দ্বারা ধীরে ধীরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। সুতরাং এক কথায় মৃত্তিকা হইতেছে প্রস্তরের পরিবর্তিত রূপ। বাতাস, তাপ, চাপ, জল, ঝড, শীত ইত্যাদি যেসকল প্রকৃতির হাতিয়ার আছে, ইহারাই প্রস্তর বা শিলাগুলিকে চূর্ণ করে। সূর্যের তাপে শিলা ফাটিয়া যায়। এই ফাটলের মধ্যে জল প্রবেশ করে এবং পরে শীতকালে জল বরফে পরিণত হইয়া উহার আয়তন বৃদ্ধিলাভ করিলে শিলাখণ্ডটিকে বহু ভাগে ভাগ করিয়া দেয়। ঝড ও বাতাসের সময় ছোট ছোট শিলাখণ্ডগুলি স্থানান্তরিত হয় এবং এই সময়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘর্ষণের ফলে শিলাচূর্ণের উৎপত্তি ঘটে। যুগ-যুগান্তর হইতে প্রকৃতির এই হাতিয়ারগুলি এইভাবে শিলাচূর্ণের সৃষ্টি করিতেছে এবং জলের সহিত সংমিশ্রণের সময় রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শিলাচূর্ণগুলি নরম হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছে। মহানদী, নদী ও উপনদীগুলি পর্বতময় স্থান হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া নিম্নগামী হইবার সময় ইহাদের স্রোতের টানে পাহাড বা পর্বত হইতে বহু শিলাখণ্ড বিচ্যুত হইয়া আসে। জলের স্রোতের সহিত ধাবিত হইবার সময় ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘর্ষিত হয়,

ফলে ক্রমশঃ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নুড়ি, বালি ও শেষে কাদায় পরিণত হয়। এইরূপে নদী, উপনদী ও বড বড় হ্রদের মোহনায় কাদার মত পলিমাটি জমা হয়, তোমরা জান; হিমালয় হইতে সিন্ধু ও গঙ্গানদী বাহির হইয়াছে এবং ইহারা যুগ যুগ ধরিয়া উপরি-উক্ত উপায়ে পলি জমাইয়া আজিকার উত্তর ভারত বা সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা নির্মাণ করিয়াছে। পলি বৎসরের পর বৎসর স্তরে স্তরে জমা হয় এবং সেইজন্য পলিমাটির দ্বারা নির্মিত মৃত্তিকাকে **পালল-মৃত্তিকা** (*Sedimentary soil*) বলে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া স্তরের উপর স্তর পলি জমিয়া থাকায় নিম্নস্তরগুলির উপর প্রচুর চাপ পড়ে এবং ইহাতে মাটি জমাট বাঁধিয়া শিলায় পরিণত হয়। এইরূপ শিলা-স্তরকে **পালল শিলাস্তর** (*Sedimentary rock*) বলা হয়। এইভাবে প্রকৃতি একদিকে শিলাখণ্ডটিকে মাটিতে পরিণত করে এবং অন্যদিকে মাটিকে আবার চাপের জোরে শিলায় পরিণত করে এবং প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে নানাবিধ জৈবপদার্থ, জীবাণু ও প্রাণী মৃত্তিকা-নির্মাণে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, এক স্থানের মাটি প্রাকৃতির শক্তির দ্বারা অপর স্থানে জমা হয় এবং তখন এইরূপ মাটিকে **স্থানান্তরিত মাটি** (*Transported soil*) বলা হয়। পালল-মাটি যে স্থানে জমা হয়, সেই স্থানে যদি স্থিতিলাভ করে, তাহা হইলে এইরূপ মাটিকে **স্থানীয় মাটি** (*Local soil*) বলে। আবার, উদ্ভিদের পাতা, শাখা, মূল ইত্যাদি ও প্রাণীদের মৃতদেহ মাটির উপর পতিত হইলে, পচিয়া জৈব মৃত্তিকা বা **হিউমস** (*Humus*) সৃষ্টি করে। একটি সাধারণ বাগানের উপযোগী মৃত্তিকায় শিলা-কণিকা, জল, বাতাস ও জৈব-মৃত্তিকার হার নিম্নে মোটামুটি দেওয়া হইল :

শিলাকণিকা	40% (আয়তনের)
জল	25% („)
বাতাস	25% („)
হিউমস	10% („)

প্রত্যেক মৃত্তিকার জল ধরিয়া রাখার ক্ষমতা আছে। বন্যার জলে যখন মৃত্তিকা ডুবিয়া যায় এবং বন্যার পর মৃত্তিকার উপরকার জল মাধ্যাকর্ষণের জন্য মৃত্তিকার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন উপরকার মাটি রৌদ্রে শুকাইয়া যায়। কিন্তু প্রতিটি মৃত্তিকা-কণাকে বেষ্টন করিয়া একটি পাতলা স্তরের জল সর্বদাই জমা থাকে। এই পাতলা স্তরের জলকে **ক্যাপিলারি জল** (*Capillary water*) বলা হয়। দেখা গিয়াছে যে, মৃত্তিকার কণাগুলি আয়তনে যতই ক্ষুদ্র

ও সূক্ষ্ম হইবে, ইহাদের জল ধারণ করিবার ক্ষমতা ততই বেশী হইবে। কোন মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমে উহার ভিতরকার **পাথর ও কাঁকর** (*Gravel*) চালুনি দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে এবং পরে মৃত্তিকাটি কোন পাত্রে জলে ভিজাইলে পাত্রের তলায় মাটি স্থিতিলাভ করিবে ও জলটুকু উহার উপর থাকিতে দেখা যাইবে। উপরকার জলটুকু দ্বিতীয় পাত্রে ধীরে ধীরে ঢালিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, উহার ভিতরকার কঠিন মাটি পাত্রের তলায় স্থিতিলাভ করিয়াছে। এইভাবে তৃতীয় পাত্রের তলায়ও মাটির স্তর দেখা যাইবে। এখন মাটির স্তরগুলি প্রত্যেক পাত্রস্থিত দানাযুক্ত বালি দ্বারা গঠিত। ইহাদের ব্যাস সাধারণতঃ 0·1—0·2 মিলিমিটার হয়। তৃতীয় পাত্রের মাটির বড় **কণাগুলির** (*Silt*) ব্যাস 0·002—0·02 মিলিমিটার এবং চতুর্থ পাত্রের **কাদা-কণাগুলির** (*Clay*) ব্যাস সাধারণতঃ 0·002 মিলিমিটারের চেয়েও কম হয়। মৃত্তিকার আকার গঠন ও রঙ অনুযায়ী নিম্নে উহাদের প্রকার-ভেদের একটি বিবরণ দেওয়া হইল :

(১) **এঁটেল মাটি** (**Clay soil**) : এইপ্রকারের মৃত্তিকাকে এঁটেল বা কাদামাটিও বলে। এই মাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে শতকরা 70—80 ভাগ কাদা ও অজৈব পদার্থ, 10—12 ভাগ বালি ও বাকি অংশ জল থাকে। কাদা-কণার ব্যাস খুবই সূক্ষ্ম হওয়াতে ইহারা প্রচুর জল ধারণ করিতে পারে। কণাগুলি পরস্পরের সহিত এমনভাবে আটকাইয়া থাকে যাহাতে ইহাদের ভিতর কোন বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। জলে-ভরা প্রতিটি কণা ভারি হওয়াতে ইহাদের ভিতর হইতে সহজে জল বাহির করিতে পারা যায় না। সুতরাং এইপ্রকার মৃত্তিকায় উদ্ভিদ্-মূলের বৃদ্ধি হয় না। অক্সিজেনের অভাবে এবং অত্যধিক জলের জন্য উদ্ভিদ শিকড় পচিয়া যায়। সাধারণতঃ এইরূপ মাটি কৃষিকার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত। এই মাটির সঙ্গে সার মিশাইয়া আলগা করিয়া চাষ করিলে ইহা চাষের উপযোগী হয়। আর এঁটেল মাটির উপর পলিমাটির স্তর জমিয়া গেলে উহাতে ধান, গম ইত্যাদি শস্যের চাষ খুব ভালো হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বন্যার দ্বারা পলিমাটি এঁটেল মাটির উপর স্তরে স্তরে জমা হয়।

(২) **দো-আঁশ মাটি** (**Loamy soil**) : এইপ্রকার মৃত্তিকায় বালির ভাগ ও কাদার ভাগ প্রায় সমান সমান হয়। ইহার ফলে মাটি জমাট বাঁধিতে

পারে না এবং সেইজন্য মাটির ভিতরকার জল মাধ্যাকর্ষণের জন্য মাটির আরও নিম্নস্তরে প্রবাহিত হইতে পারে। ইহার দ্বারা মাটির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সেইজন্যই দো-আঁশ মাটি প্রচুর জল ধারণ করিতে পারে। মাটিতে বালিকণা থাকায় বাতাস ও আলোক অনায়াসে মাটির ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহার দ্বারা মাটির ভিতরকার শিকড় প্রচুর বাতাস পায়। আলোক উদ্ভিদ্-ধ্বংসকারী জীবাণুগুলিকে মারিয়া ফেলে। এইপ্রকারের মাটিতে লৌহ, ক্যালসিয়ম ও অন্য অজৈব ধাতব লবণ থাকে। ক্রমাগত মাটির ভিতর জলের চলাচলের জন্য ধাতব লবণগুলি ভালোভাবে জলের সহিত দ্রবীভূত হয় এবং মাটি জল ঘনত্বে লঘু (*less concentration*) হয়। অপর্যাপ্ত অক্সিজেন মাটির ভিতর প্রবেশ করায় এইরূপ মাটি চাষের পক্ষে আদর্শস্বরূপ এবং উদ্ভিদের মূলরোম এইরকমে মাটির ভিতর অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। ইহারা সহজেই ব্যপণ-ক্রিয়ার দ্বারা মাটির লঘু ঘনত্বযুক্ত জল শোষণ করিতে পারে। সাধারণতঃ দো-আঁশ মাটিতে ধান, যব, ভুট্টা ইত্যাদি শস্যের চাষ হয় এবং প্রচুর তরিতরকারী এইরূপ মাটিতে ফলন করা হয়।

(৩) **বালি-মাটি (Sandy soil) :** এইরূপ মাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে প্রায় 70 ভাগ বালি এবং 10 ভাগ কাদা থাকে এবং জল সহজেই মাটির ভিতরকার স্তরে প্রবাহিত হয়। বালিকণা আকারে বড় হওয়ায় সামান্য জল ধারণ করিতে পারে। সেইজন্য এইরূপ মাটি সর্বদাই শুষ্ক থাকিতে দেখা যায় এবং রৌদ্রের তাপে সহজেই গরম হইয়া উঠে। বালি-মাটির মধ্যে সামান্য পরিমাণে কাদা থাকায় কিছু কিছু উদ্ভিদ্ এইরূপ মাটিতে জন্মাইতে পারে। পটল, ফুটি, তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি উদ্ভিদ্ এইরূপ মাটিতে জন্মায়। ধান, গম ইত্যাদি বালি-মাটিতে জন্মায় না।

(৪) **কাঁকর-মাটি (Rock soil or Gravel soil) :** পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় এইরূপ কাঁকর-মাটি দেখা যায়। ইহাতে কাঁকরের ভাগ অর্ধেক থাকে এবং বাকি অর্ধেক ভাগ বড় দানাযুক্ত বালি, পাথরকুচি, পাথর-চূর্ণ ইত্যাদির সহিত সামান্য কাদা-মাটি মিশ্রিত থাকে। সুতরাং কাঁকর-মাটি মোটেই জল ধারণ করিতে পারে না। এইরূপ মাটি সহজেই শুকাইয়া যায় এবং রৌদ্রে গরম হইয়া উঠে। সুতরাং চাষীরা এইরকমের

মাটির জলকে বর্ষার সময় বাঁধ দিয়া আটকাইয়া রাখে এবং সেই অবস্থায় কিছু ধান ও আখের চাষ করে।

(৫) **চুনা-মাটি (Lime-soil) :** এই মাটিতে শতকরা 10 ভাগ চুন থাকে এবং বাকি অংশে এঁটেল মাটি এবং বালিমাটি প্রায় সমানভাগে বিদ্যমান। এই ধরনের মাটিতে এঁটেল মাটির জল-ধারণের ক্ষমতার সঙ্গে বালি-মাটির শিথিলতা একত্রিত হওয়ায় চুনা-মাটি খুবই উর্বর হয়। ইহা ব্যতীত ক্যালসিয়াম কারবোনেট সহজেই জল শোষণ করিয়া দ্রবীভূত হয় এবং এঁটেল বা বালি-মাটির মিশ্রণ ঘটায়। চুনা-মাটি রাসায়নিক ক্রিয়ার দিক হইতে **ক্ষারধর্মী** বা **ক্ষারকীয়** (*alkaline*). সুতরাং যেসকল চুনা-মাটিতে 10—20% চুন থাকে, তাহা বিশেষ উর্বর হয় না। এরূপ মাটি সহজেই শুকাইয়া গরম হইয়া যায়। মোট কথা, অতিরিক্ত চুন নিষ্কাশন করিয়া এই ধরনের মাটিতে চাষ সম্ভবপর হয় এবং ইহার জন্য প্রচুর জল-সেচনের প্রয়োজন।

(৬) **লালমাটি (Red soil) :** এইপ্রকার মাটিতে লৌহ থাকায় মাটি লাল রঙের হয়। সাধারণতঃ লাল মাটিতে কাদার অংশ বেশী পরিমাণে থাকে। মধ্যভারতের কালো মাটিতেও লৌহের পরিমাণ বেশী থাকে। এইরূপ মাটি বেশ কঠিন হয়। এই ধরনের মাটিতে কার্পাস, চিনাবাদাম ইত্যাদির চাষ ভালো হয়।

(৭) **লোনা মাটি (Saline soil) :** সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থান, হ্রদের নিকটস্থ ভূমি লবণাক্ত হয়। এইরকমের মাটিতে অতিরিক্ত লবণের জন্য দো-আঁশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মাটি লোনা মাটিতে পরিণত হয়; লোনা মাটিতে ধাতব লবণ বেশী পরিমাণে থাকে। জিপসাম্‌, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি ধাতব লবণ প্রায়ই লোনা মাটিতে দেখা যায়। লোনা মাটির জল-কণাগুলির-মধ্যে অতিরিক্ত ধাতব লবণ দ্রবীভূত হওয়ায় উহা জটিল বা স্থূল হয়, অর্থাৎ জলকণার **ঘনত্ব বেশী** (*higher concentration*) থাকে। সুতরাং এইরূপ জলকণা মূলরোমের দ্বারা শোষিত হয়; লোনা মাটিতে প্রচুর জল থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ্‌ উহা গ্রহণ করিতে পারে না। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এইরূপ মাটিকে **ঊষর মৃত্তিকা** (*Physiological dry soil*) বলে। এইরূপ মাটি হইতে লবণের ভাগ কমাইতে পারিলে, উহা চাষের উপযোগী হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানের মাটি লোনা। অতিরিক্ত লবণাক্ত মাটিতে সুঁদরী, গরাণ, বীণা ইত্যাদি শ্বসনমূলধারী উদ্ভিদ্ জন্মায়। এইসব স্থানে ঝাউগাছও প্রচুর দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত কম লবণযুক্ত মাটিতে তাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি গাছ ভালোভাবেই বৃদ্ধিলাভ করে। ইহাদের মূল অত্যধিক লম্বা হয় এবং শিকড়গুলি মাটির গভীরতর স্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অতি কম লবণযুক্ত জলকণা শোষণ করে।

(৮) **পীট বা পচা মাটি (Peat soil or Humus soil):** ইহাকে জৈব-মৃত্তিকাও বলা হয়। ভূত্বকের উপরে উদ্ভিদের পাতা, শাখা-প্রশাখা ও প্রাণীদের মৃতদেহ পতিত হইলে উহা ধীরে ধীরে পচিয়া মাটিতে পরিণত হয়। এই পচন সাধারণতঃ অক্সিজেন অভাবে এবং এককোষ-বিশিষ্ট প্রাণী ও ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা সাধিত হয়। এইভাবে উপরি উক্ত পদার্থগুলির মধ্যে নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া কার্যকরী হওয়ার পর উহা জৈব-মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা **অম্লধর্মী** (*acidic*) এবং প্রথম অবস্থায় এই ধরনের মাটি হইতে পচা গন্ধ বাহির হয় এবং ইহার রঙ কালো বা গাঢ় খয়েরী রঙের হয়। সাধারণতঃ জৈব-মৃত্তিকাকে হিউমস মাটিরূপে অভিহিত করা হয়। হিউমস মাটি নানা প্রকারের হয়; যথা—(i) সাধারণ বা **মৃদু হিউমস** (*Mild humus*): এই ধরনের মাটি উদ্ভিদের পাতা, শাখা-প্রশাখার সম্পূর্ণভাবে পচনের দ্বারা তৈয়ারী হয়। ইহার সহিত বালি-মাটি ও এঁটেল-মাটিও মেশানো থাকে। কেঁচো, ছোট ছোট কীট ও **নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া** (*Nitrifying Bacteria*) মৃদু হিউমস মৃত্তিকায় প্রচুর দেখা যায়। ইহারা মাটির ভিতরকার বিবিধ স্তরগুলিকে হালকা করে এবং সেইজন্য মাটির ভিতরে অক্সিজেন সহজেই প্রবেশ করিতে পারে। কেঁচোকে প্রকৃতির লাঙ্গল এবং সার-উৎপাদনের কারখানা বলা হয়। মৃত্তিকা-গঠনে ইহাদের দান কতখানি তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এঁটেল ও বালি-মাটির সংমিশ্রণ হওয়ায় মৃদু হিউমস মাটি প্রচুর জল-ধারণের ক্ষমতা রাখে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা কখনও **ক্ষারধর্মী** (*Alkaline*), আবার কখনও নিরপেক্ষ (*Neutral*) হয়। এইরূপ মৃত্তিকার তাপ সর্বদা সাধারণ ও স্বাভাবিক তাপের চেয়ে সামান্য বেশী হওয়ায় এই ধরনের মাটিতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়। (ii) **কাঁচা হিউমস** (*Raw humus or Mor*): উদ্ভিদের পাতা,

শাখা-প্রশাখা, ভূনিম্নস্থ মূল ও শাখা, ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ্‌গুলির অর্ধপচনের ফলে এইরূপ মাটির সৃষ্টি হয়। এই ধরনের মাটিতে কেঁচো কিংবা নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া থাকে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা অম্লধর্মী। মাটি জমাট হওয়ায় ইহার ভিতরে অক্সিজেন প্রবেশ করিতে পারে না; এইরূপ মাটি চাষের পক্ষে উপযুক্ত নহে। ইহাতে বালি-মাটি মিশাইয়া হালকা করিলে চাষের উপযোগী হয়। (iii) **পীট হিউমস** (*Peat humus*) : উদ্ভিদের পাতা, শাখা-প্রশাখা ব্যতীত প্রাণীদের মল ও মৃতদেহ পচিয়া পীট হিউমস মাটি তৈয়ারী হয়। এই ধরনের মাটিতে গলিত জীবদেহ প্রায় 50—80% থাকে। তাই ইহার রঙ কালো বা খয়েরি হয়। চুনের ভাগ পীট হিউমসে প্রায় 5% থাকে এবং অঙ্গারও প্রায় 3% থাকে। বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই মাটি নির্মিত হওয়াতে মাটির কণাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়। সুতরাং পীট হিউমস প্রচুর পরিমাণে জল ধারণ করিতে পারে। কিন্তু নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে মাটি জমাট বাঁধিয়া যায় এবং মাটির ভিতর অক্সিজেন প্রবেশ করিতে পারে না। পীট-মাটি তাড়াতাড়ি শুষ্ক হয় এবং তাড়াতাড়ি গরম হইয়া ফাটিয়া যায়। মাটি শুষ্ক হইলে ধূলায় পরিণত হয়। পীট-মাটির সহিত প্রায় 60% বালি-মাটি মিশ্রণ করিয়া উহাকে চাষের উপযোগী করা হয়।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা

(Demonstration and Experiment)

মৃত্তিকার সাধারণ বিশ্লেষণ প্রণালী (Physical analysis of soil) :

যে-কোন মৃত্তিকাকে সাধারণভাবে সহজেই বিশ্লেষণ করা যায়। এখন যে-ধরনের মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিতে হইবে, তাহার সামান্য অংশ ওজন করিয়া লইতে হইবে। মাটির ওজন নিম্নলিখিতভাবে করিতে হয়। প্রথমে একটি ফ্লাস্ক ওজন

কর এবং ওজনটি লিপিবদ্ধ কর। এখন সেই ফ্লাস্কে কিছুটা মৃত্তিকা লইয়া আবার ওজন কর এবং ওজনের পরিমাণ লিপিবদ্ধ কর। দ্বিতীয় ওজনের পরিমাণ হইতে প্রথম ওজনের পরিমাণ বিয়োগ করিলে মাটির সঠিক ওজনের পরিমাণ জানা যায়। ফ্লাস্কের মুখের কর্কে একটি ছিদ্র কর এবং ছিদ্রের ভিতর একটি বক্র কাঁচের নল প্রবেশ করাও। এই কাঁচের নলটির বাহিরের মুখে একটি শুষ্ক ক্যালসিয়াম বাল্‌ব (যাহার ওজন আগে নেওয়া হইয়াছে) সংযোগ কর; ক্যালসিয়াম বাল্‌বের বিপরীত মুখে আর একটি বাঁকানো সরু নল লাগাও। নিম্নমুখী বাঁকানো নলের সরু মুখটি একটি জল-ভরা কাঁচের পাত্রের মধ্যে মুক্ত হইবে।
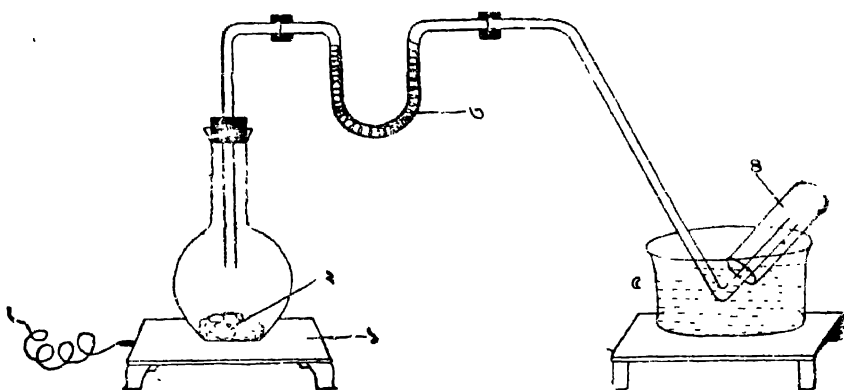
৭১নং চিত্র

মৃত্তিকার সাধারণ বিশ্লেষণের পরীক্ষা।

১, বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন গরম প্লেট ; ২, মাটি , ৩, ক্যালসিয়াম বাল্‌ব ;
৪, গ্যাস ধরার জন্য টেস্ট-টিউব ; ৫, জল-ভরা কাঁচের পাত্র।

নলের সরু মুখটিকে একটি জল-ভরা টেস্ট-টিউব দিয়া ঢাকিয়া রাখ। এখন ফ্লাস্কটিকে ধীরে ধীরে একটি বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন গরম প্লেটের (*Electrically operated hot plate*) উপর রাখ। গরম প্লেটটিকে 100°C পর্যন্ত তাপ দিয়া উহাকে সংযত কর। গরম প্লেটের উত্তাপ পাইয়া ফ্লাস্কের ভিতরকার মাটি ধীরে ধীরে গরম হইতে থাকিবে এবং মাটির ভিতরকার জল বাষ্পাকারে বাহির হইতে দেখা যাইবে। জল-বাষ্পের সঙ্গে নানাবিধ গ্যাসও নির্গত হইবে। ক্যালসিয়াম বাল্‌ব জল-বাষ্প শোষণ করিয়া লইবে এবং বিবিধ গ্যাসগুলি নিম্নমুখী বাঁকানো কাঁচের নলের ভিতর দিয়া জল-ভরা কাঁচের পাত্রের দিকে ধাবিত

হইবে এবং ধীরে ধীরে টেস্ট-টিউবে জমা হইবে। দুই ঘণ্টা পর টেস্ট-টিউবে কোন গ্যাস-বুদ্‌বুদের গতি দেখা যাইবে না। সুতরাং মাটি সম্পূর্ণ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। ক্যালসিয়াম বাল্বটি আবার ওজন করিলে দেখা যাইবে যে উহার ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যালসিয়াম বাল্বের দ্বিতীয় ওজন হইতে প্রথম ওজনের পরিমাণ বাদ দিলে মাটির ভিতরকার জলের পরিমাণ জানা যাইবে। শুষ্ক মাটি সমেত ফ্লাস্কটি আবার ওজন করিলে এবং ইহার ওজন হইতে দ্বিতীয় ওজনের পরিমাণ বাদ দিলে মাটির জলবাষ্প এবং গ্যাসের একত্রিত ওজন পাওয়া যায়। টেস্ট-টিউবের ভিতরকার গ্যাসগুলিকে রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে বিবিধ গ্যাসের পরিমাণ জানা যায়। সেইরূপ অবশিষ্ট ছাই-মাটি লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে বিবিধ ধাতব লবণের পরিমাণ পাওয়া যায়।

সার (Fertilizers)

মানবজাতি উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল। বিবিধ উদ্ভিদ্ আমাদের আহার্য যোগায় এবং বহু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উদ্ভিদের দেহ হইতেই আমরা নির্মাণ করি। সুতরাং উদ্ভিদের উন্নতিসাধন ও বংশবৃদ্ধি মানবজাতির প্রধান লক্ষ্য এবং ইহাই কৃষিকার্যের প্রধান উদ্দেশ্য। মাটি জমাট বাঁধিয়া গেলে উহার ভিতরে অক্সিজেন প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া আমরা নানাবিধ যন্ত্রের দ্বারা হালচাষ করি এবং রৌদ্রে শুকাইয়া উহাকে গুঁড়া করিয়া ফেলি। এইরূপ হালকা ও ফাঁপা মাটিতে উদ্ভিদের নরম শিকড় সহজেই প্রবেশ করিতে পারে এবং মাটি আঁকড়াইয়া চারাগাছগুলি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিলাভ করে। মাটির সঞ্চিত জৈব ও অজৈব পদার্থগুলি চারাগাছগুলিকে খাদ্য যোগায় এবং ধীরে ধীরে গাছটি বড় হইলে ফল ধারণ করে। উদ্ভিদের ফল ও বীজই আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত ফসল। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর একই মাটি হইতে আমরা প্রচুর ফসল আদায় করি। কিন্তু এমন সময় আসে যখন মাটির ভিতরে কোনও জৈব বা অজৈব উদ্ভিদ্-খাদ্য আর সঞ্চিত থাকে না। বৎসরের পর বৎসর চাষের ফলে উহা সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হইয়া যায়। আমরা তখন বলি, মাটির উৎপাদিকা-শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এই উৎপাদিকা-শক্তিবিহীন মাটি হইতে ফসল পাইতে হইলে বা মাটির উৎপাদিকাশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে

হইলে বাহির হইতে নানাবিধ উদ্ভিদের খাদ্য মাটির ভিতর সরবরাহ করিতে হয়। অতএব উদ্ভিদের ফলনের বৃদ্ধির জন্য এবং মাটির উৎপাদিকা-শক্তি পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বাহির হইতে কৃত্রিম উপায়ে যে-সকল উদ্ভিদ্‌-খাদ্য মাটির ভিতরে সরবরাহ করা হয়, তাহাকেই **সার** (*Fertilizers* or *manure*) বলে। সুতরাং চাষ করিবার আগে ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়া দরকার। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রে সার না দিলে যেমন মাটির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পায় না, তেমনি অতিরিক্ত সার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে সময় সময় উদ্ভিদের সমূহ ক্ষতি হয়। সার সাধারণতঃ তিন প্রকারের ; যথা—(১) **রাসায়নিক সার** (*Chemical manure*), (২) **উদ্ভিদ্‌প্রদেয় সার** (*Vegetable manure*) এবং (৩) **প্রাণিজ সার** (*Animal manure*)।

(১) **রাসায়নিক সার** (**Chemical manure**)ঃ উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহচূর্ণ ইত্যাদি সাধারণতঃ ক্ষেত্রে সার হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌-খাদ্যের মৌলিক উপাদানগুলির বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং পুনরায় উহাদের উপকারিতা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি নূতন করিয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। রাসায়নিক সারকে **কৃত্রিম সার** (*Artificial manure*) বলা হয়।

(২) **উদ্ভিদ্‌প্রদেয় সার** (**Vegetable manure**)ঃ মটর, ছোলা, ধঞ্চে প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌গুলিকে ফসল দিবার পর খণ্ড খণ্ড করিয়া মাটির ভিতর পুঁতিয়া ফেলিলে উহা পচিয়া সারে পরিণত হয়। এইপ্রকার উদ্ভিদের শিকড়ে **নডিউল** (*Nodule*) থাকায় ইহা নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য সঞ্চয় করিতে পারে। উদ্ভিদ্‌টি মাটির ভিতর পচিয়া গেলে সঞ্চিত খাদ্যগুলি মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং মাটির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়ায়। সাধারণতঃ এই ধরনের সারকে **সবুজ সার** (*Green manure*) বলা হয়। কেহ কেহ এইরূপ সারকে **স্বাভাবিক সার** (*Natural manure*) বলে, যেহেতু উদ্ভিদের দেহ হইতেই উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত করা হয় এবং বাহির হইতে কোনও প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ইহার সহিত মিশ্রিত করা হয় না। রেড়ি বা সরিষা **বীজের খোল** (*Seed coat*), পচা পাতা,

কচুরিপানা বা উহার ভস্ম পুকুরের মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়াও সার তৈয়ারি করা হয়। এই ধরনের সারের সঙ্গে মাঝে মাঝে **হাড়গুঁড়া** (*Bone meal*) মিশ্রিত করা হয়। এইরূপ সারকে **কৃত্রিম কঠিন সার** (*Artificial hard manure*) বলা হয়। তরিতরকারি, লেবু, আম প্রভৃতি গাছে এইরূপ সার প্রয়োগ করা হয়। আম বা লেবু গাছের গোড়ার চারিপাশ খুঁড়িয়া সার দিবার পর আবার পূর্ববৎ মাটি দিয়া ভরাট করিয়া দিতে হয়। আবার নানাপ্রকার ফুলগাছে এই ধরনের কঠিন সার প্রয়োগ করা হয়।

(৩) **প্রাণিজ সার (Animal manure) :** মানুষ, গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীদের মলমূত্র উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহার করা হয়। গোবরের সহিত হাড়ের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার সার প্রস্তুত করা হয়, যাহা যে-কোন উদ্ভিদের খাদ্যরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মানুষের মলমূত্র মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া, ক্ষেতে গর্ত করিয়া ঢাকিয়া দিলে উহা উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়। ধাপার ফুলকপি, বেগুন ইত্যাদি ফসলের সময় উপরি-উক্ত সার ব্যবহার করা হয়। প্রাণিজ সারকে **ক্ষেতের সার** (*Farmyard manure*) বলা হয়। ইদানীং পচা মাছ ও প্রাণিদেহও মাটিতে পুঁতিয়া সারে পরিণত করা হয়। আবার উদ্ভিদ্‌প্রদেয় সার এবং প্রাণিজ সার একত্রিত করিয়া একপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। মানুষ, গরু-মহিষের মলমূত্র, উদ্ভিদের পাতা, শুষ্ক খড়, আগাছা, শেকড প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ সার প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের সার প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ উচ্চ ছায়াশীতল জমি লইয়া উহার চারিপাশে চিহ্ন দিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ চিহ্নিত জমি হইতে মাটি প্রায় চার ফুট পর্যন্ত তুলিয়া একটি বড় ক্ষেত্রাকার গর্ত করিতে হয়। গর্তের ভিতরে প্রথমে গাছের পাতা, আগাছা, শেকড় প্রভৃতি দিয়া উহার এক ফুট ভরাট করিয়া দিতে হয়। ইহার পর দ্বিতীয় স্তরে মানুষের বা গরু-মহিষের মলমূত্র দিয়া গর্তের আরও এক ফুট ভরাট করিয়া দিতে হয়। সেইরূপ তৃতীয় স্তরে টুকরা টুকরা খড় দিয়া গর্তের আরও এক ফুট ভরাট করার পর সামান্য জল ছিটাইয়া মাটি দিয়া সমগ্র গর্তটিকে ভরাট করিয়া দিতে হয়। অন্ততঃ দুই মাস পরে উপরি-উক্ত তিনটি স্তরকে ভালোভাবে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। এইভাবে চারি মাস পরে বহুদিন মাটির ভিতর থাকার ফলে উহাদের ভিতর প্রচুর সংখ্যায় ব্যাকটিরিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তাহাদেরই রাসায়নিক কার্যকলাপের ফলে, গাছের পচা পাতা, আগাছা, শিকড়, মলমূত্র ও খড় মাটি হইয়া সারে পরিণত হয়। ইহার রঙ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের

হয়। এইপ্রকার সারকে **কম্পোস্ট সার** (*Compost manure*) বলা হয়। এই সারই ক্ষেতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

মিথোজীবিতা (**Symbiosis**): উদ্ভিদের জীবন বৈচিত্র্যময়। সময় সময় এইরূপ দেখা যায় যে, দুইটি শ্রেণীর উদ্ভিদ্ বা প্রাণী একসঙ্গে বসবাস করিয়া পরস্পরের সাহচর্যে বাঁচিয়া আছে। এইপ্রকার একত্র বসবাস ও একের অপরকে সাহায্য করা (close association and mutual benefit) এবং এইপ্রকারের নির্ভরতাকে **মিথোজীবিতা** বা **অন্যোন্যজীবিত্ব** (*Symbiosis*) বলে। এইসকল উদ্ভিদ্‌কে **অন্যোন্যজীবী** বা **মিথোজীবী** (*Symbiont*) বলা হয়। শিম্ব-জাতীয় উদ্ভিদ্‌গুলি মিথোজীবীতার একটি আদর্শ উদাহরণ। তোমরা জান যে ছোলা, মটর, শিম ইত্যাদি উদ্ভিদের মূলে অর্বুদ বা **নডিউল** (*Nodule*) নামক গোলাকার অঙ্গ জন্মায়। এই অর্বুদের মধ্যে **রাইজোবিয়ম লেগু-মিনোসেরিয়ম** (*Rhizobium leguminosarium*) নামক একপ্রকার কোষ-বিশিষ্ট ব্যাকটিরিয়া বাস করে। এই ব্যাকটিরিয়াগুলি মৌলিক নাইট্রোজেন বাতাস হইতে শোষণ করিয়া উহাকে অ্যামোনিয়া অ্যাসিডে বা নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত করে। মাটির যাবতীয় ধাতব লবণের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়া অ্যাসিড ও নাইট্রিক অক্সাইড কণাগুলি নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে পরিণত হয়। এই নাইট্রেট খাদ্য উদ্ভিদ্ নডিউল হইতে শোষণ করে। নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন খাদ্য এইভাবে উদ্ভিদ্‌গুলি ব্যাকটিরিয়ার মারফতে পাইয়া থাকে। প্রোটিন উদ্ভিদের, বিশেষতঃ প্রোটোপ্লাজমের, অপরিহার্য উপাদান হওয়াতে এইসকল উদ্ভিদ্ নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন খাদ্য রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে পায়। অপরপক্ষে উদ্ভিদ্‌ও রাইজোবিয়মের এই ঋণ শোধ করে। উদ্ভিদ্ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির দ্বারা প্রচুর জল-অঙ্গার খাদ্য তৈয়ারি করে। জল-অঙ্গার রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়ার প্রিয় খাদ্য এবং তাহা ইহারা উদ্ভিদ্ হইতে শোষণ করে। সুতরাং উদ্ভিদ্ ও রাইজোবিয়ম এই দুইটি জীব পরস্পর পরস্পরের জীবন-যাত্রাকে অতি সুন্দরভাবে পরিচালিত করে। উদ্ভিদ্ রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়ার জীবনযাত্রার অংশীদার এবং রাইজোবিয়মও উদ্ভিদ্-জীবনযাত্রার অংশীদার। আবার নডিউল-যুক্ত উদ্ভিদ্ পরোক্ষভাবে ক্ষেতের নাইট্রেটের মাত্রা বৃদ্ধি করে। কারণ নডিউলের ভিতরকার ব্যাকটিরিয়াগুলি উদ্ভিদের জীবন-চক্র শেষ হইবার পর, উদ্ভিদের জল-অঙ্গার খাদ্য সরবরাহ-ক্ষমতা লুপ্ত হইবার পর, উহা নডিউল হইতে মাটিতে মিশিয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে, শিম্ব-জাতীয় উদ্ভিদ্ চাষ করিলে

ক্ষেতের নাইট্রেটের মাত্রা এত বাড়িয়া যায় যে, আগামী বৎসরে নূতন করিয়া আর নাইট্রেটের জন্য বাহির হইতে সার প্রয়োগের দরকার হয় না। এইভাবে শিম্ব-জাতীয় উদ্ভিদ্ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সার প্রদান করে।
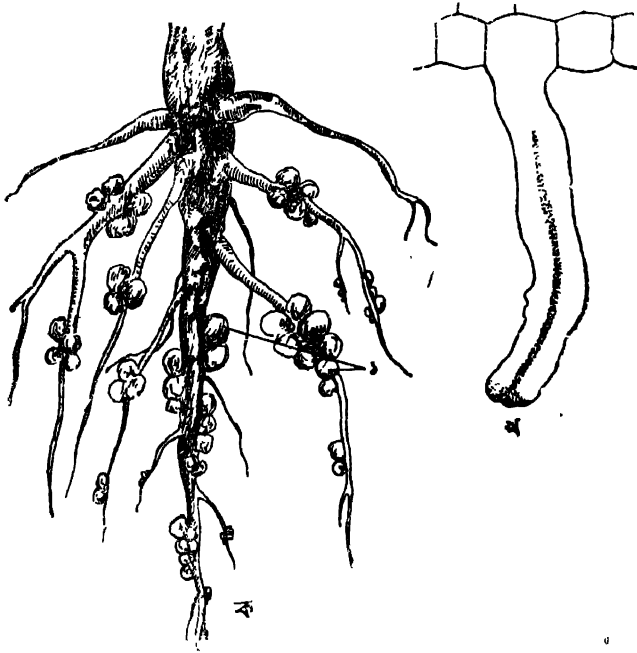
৭৯নং চিত্র
নাইট্রোজেনের আত্তীকরণ।
ক, ছোলামূলের অর্বুদ (nodule) ; ১। অর্বুদ। খ, মূলরোমের রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধি দেখানো হইতেছে।

লাইকেন (*Lichen*) নামক একপ্রকার উদ্ভিদের দেহ শ্যাওলা ও ছত্রাক —দুই শ্রেণীর উদ্ভিদ্ সমন্বয়ে গঠিত। শ্যাওলার কোষের মধ্যে ক্লোরোফিল থাকায় উহারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া কার্যকরী করিতে পারে এবং কোষের মধ্যে শর্করা বা শ্বেতসার কণা সঞ্চয় করে। শ্বেতসার কণাই লাইকেনের অপর অংশীদার ছত্রাক খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। আবার ছত্রাক সমগ্র শ্যাওলার দেহকে আবৃত করিয়া রাখে এবং এতদ্দ্বারা শ্যাওলাকে বিরূপ আবহাওয়া ও শত্রু হইতে রক্ষা করে। সুতরাং লাইকেনে উদ্ভিদ্ও মিথোজীবিতার একটি উদাহরণ।

শস্য-বিবর্তন (Rotation of crops) :

কোন ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর একই প্রকার শস্য চাষ করিলে সেই ক্ষেতের উৎপাদিকা-ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় অর্থাৎ ক্ষেতের ধাতব লবণসমূহ ধীরে ধীরে এইপ্রকার শস্য উৎপাদনের জন্য শোষিত হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় আমরা ক্ষেতে বাহির হইতে সার হিসাবে ধাতব লবণপদার্থসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু বাহির হইতে সার প্রয়োগ না করিয়াও ক্ষেতের সার বৎসরের পর বৎসর অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, যদি প্রতিটি প্রকার শস্যের চাহিদা অনুযায়ী আমরা শস্যের প্রকার বদলাইয়া যাই। মনে কর, কোন একটি ক্ষেতে প্রথম বৎসর ধান বা ভুট্টা চাষ করা হইল ; দ্বিতীয় বৎসরে সেই ক্ষেতে ছোলা বা মটর চাষ করা হইল। ক্ষেতে প্রথম বৎসরের চাষের দরুন যত পরিমাণ নাইট্রেট খরচা করা হইয়াছে, তাহা ছোলা বা মটর গাছের মূল আবার পূরণ করিয়া দিবে। শুধু তাহা নয়, ইহার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া দিবে। সুতরাং একই ক্ষেতে তৃতীয় বৎসরে গম ও ইক্ষু বাহির হইতে সার প্রয়োগ না করিয়া অনায়াসে চাষ করা যায় এবং ইহাতে ফসলও ভাল হয়। চতুর্থ বৎসরে আবার কিছু শিম্ব-জাতীয় গাছ চাষ করিবার পর অন্যপ্রকার ফসল ফলানো যায়। এইভাবে একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর শস্যের চাহিদা অনুযায়ী চাষ করিলে ক্ষেতের উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হয় না। চাষের এই পদ্ধতিকে **শস্যবিবর্তন** (*Rotation of crops*) বলা হয়। শস্য-বিবর্তন পদ্ধতিতে ক্ষেতের আর একটি উপকার হয়। একই প্রকার শস্য বার বার চাষ করিলে সেই শস্যের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় বা জীবাণু ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষেতের উৎপাদিকা-শক্তি থাকিলেও ফসল অনেক হ্রাস পায়।

নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র

(Nitrogen Cycle)

সবুজ উদ্ভিদ্ বাতাস হইতে অতি সহজেই অক্সিজেন ও কার্বন ডায়কসাইড গ্রহণ করিতে পারে। কার্বন ডায়কসাইডের দ্বারা ইহারা শ্বেতসার প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন দ্বারা ইহারা শ্বেতসার খাদ্যকে দহন করিয়া শক্তি নির্গত করে।

আবার বিবিধ সঞ্চিত খাদ্য ইহা অক্সিজেন ও কার্বন ডায়কসাইড দ্বারা প্রস্তুত করে; যেমন—বিভিন্ন শর্করা, গ্লাইকোজেন, ইনুলিন ইত্যাদি। কিন্তু নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যও ইহাদের অত্যাবশ্যক। কিন্তু বাতাসে এত বেশী নাইট্রোজেন থাকিলেও উদ্ভিদ্ ইহার এক অণুও শোষণ করিতে পারে না। অথচ বাতাসে শতকরা আশি হইতে পঁচাশি ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। তবে কি আমরা মনে করিব যে উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্রের (*Stomata*) ভিতর দিয়া কেবলমাত্র অক্সিজেন ও কার্বন ডায়কসাইড প্রবেশ করিতে পারে? নাইট্রোজেন কি প্রবেশ করিতে পারে না? বাতাসে এত কম পরিমাণে অক্সিজেন ও কার্বন ডায়কসাইড থাকিলেও তাহা যখন অনায়াসে উদ্ভিদের দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, তখন নাইট্রোজেনও পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়া নিশ্চয় প্রবেশ করে। কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উদ্ভিদ্ কার্বন ডায়কসাইড এবং অক্সিজেন নানা উপায়ে শোষণ ও ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু প্রতিটি কোষে বাতাসের নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিলেও উদ্ভিদ্ উহা শোষণ বা ব্যবহার করিতে পারে না। নাইট্রোজেন উদ্ভিদের ভিতর প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহির হইয়া আসে। অথচ কোষের প্রোটোপ্লাজম প্রধানতঃ নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন-জাতীয় পদার্থের দ্বারা নির্মিত। উদ্ভিদের কোষগুলি কি কারণে বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। সুতরাং মাটির ভিতরে জল-মিশ্রিত যে-সমস্ত ধাতব নাইট্রেট পাওয়া যায়, তাহা উদ্ভিদ্ মূলরোমের সাহায্যে শোষণ করে এবং নিজদেহের নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটায়। যুগ যুগ ধরিয়া উদ্ভিদ্ এইভাবে মাটি হইতে নাইট্রেট আকারে নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া আসিতেছে এবং নিজদেহের পুষ্টিসাধন করিতেছে। কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত নাইট্রেট জমি হইতে শোষণ করিবার ফলে জমিতে নাইট্রেটের পরিমাণ কমিয়া, পরে জমি নাইট্রেট-বিহীন হইয়া পড়ে। সেই জন্য বায়ু হইতে নানা উপায়ে জমিতে নাইট্রেট জমা হয় এবং সেইরূপ বিভিন্ন উপায়ে নাইট্রেট ও প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য হইতে নাইট্রোজেন নির্গত হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। নাইট্রোজেনের এইরূপ বিবর্তনের ফলে বাতাসে ইহার পরিমাণ প্রায় একই থাকে। নাইট্রোজেন বাতাস হইতে মাটিতে এবং মাটি হইতে জীবদেহে ও জীবদেহ হইতে পুনরায় বাতাসে ফিরিয়া যায়। ইহাকেই **নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র** (*Nitrogen cycle*) বলে। নিম্নে উদ্ভিদের নাইট্রোজেন গ্রহণ-প্রণালী-সহ

নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্রের প্রধানতঃ তিনটি উপায়ের বিবরণ দেওয়া হইতেছে :

(১) **বিদ্যুৎক্ষরণে নাইট্রোজেনের স্থিতি** (*Nintrogen fixation by electric discharge*) : আকাশে বিদ্যুৎক্ষরণের সময় বা বজ্রপাতের সময় বাতাসের নাইট্রোজেন কণাগুলি অক্সিজেন কণার সহিত মিলিত হইয়া নাইট্রিক অক্সাইডে (Nitric oxide) পরিণত হয়।

$$N_2 + O_2 = 2NO \text{ (Nitric oxide)}$$
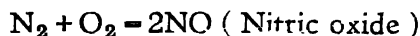
নাইট্রিক অক্সাইড পুনরায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিলে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডে (Nitrogen peroxide) পরিণত হয়।

$$2NO + O_2 = 2NO_2 \text{ (Nitrogen peroxide)}$$
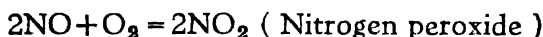
বিদ্যুৎক্ষরণের সময় বৃষ্টির জলে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড সহজেই দ্রবীভূত হইয়া নাইট্রাস অ্যাসিডে (HNO_2) ও নাইট্রিক অ্যাসিডে (HNO_3) পরিণত হয়।

$$2NO_2 + H_2O = HNN_2HNO_3$$

↓ Nitrous acid ↓ Nitric acid
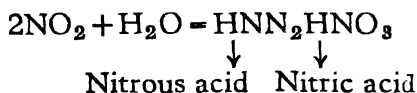
মৃত্তিকায় বিবিধ ধাতব লবণ থাকে। সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম লবণের সহিত নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড মিলিত হইয়া ক্যালসিয়াম ও
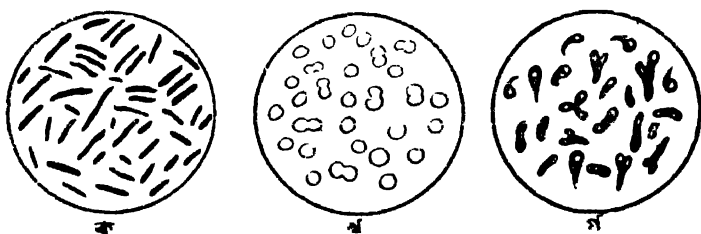
৭৩নং চিত্র

বিবিধ নাইট্রোজেন আত্তীকরণ ব্যাকটিরিয়া।

ক, ক্লোসট্রিডিয়ম পাসটুরিএনম ; খ, অ্যাজেটোব্যাকটার ক্রোকোকাম ;

গ, রাইজোবিয়ম লেগুমিনোসেরিয়ম।

পটাসিয়াম নাইট্রেটে পরিণত হয়। উদ্ভিদের উপাদেয় খাদ্য এই দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ও নাইট্রেট এবং উদ্ভিদ্-মূলরোমের সাহায্যে ইহা শোষিত হয়।

রসায়নবিদ্‌গণের মতে, প্রতিদিন প্রায় 2,50 000 টন নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড পৃথিবীতে বজ্রপাতের সময় বিদ্যুৎক্ষরণের দ্বারা সৃষ্টি হয়। আবার, নাইট্রাস লবণগুলি ব্যাকটিরিয়ার কার্যকলাপের দ্বারা নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়। দেখা গিয়াছে যে, গড়ে প্রতিবৎসরে প্রতি একর জমিতে বৃষ্টির জলের দ্বারা প্রায় চার পাউণ্ড নাইট্রোজেন জমা হয়।

(২) মৃত্তিকার স্বাধীন ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা নাইট্রোজেনের স্থিতি (Nitrogen fixation by free-living Bacteria in the soil):

আমরা জানি, মাটির ভিতর বাতাস সহজেই প্রবেশ করিতে পারে। অক্সিজেন এইভাবে মূলতন্ত্রের শ্বাসকার্য পরিচালনা করে। মৃত্তিকার ভিতর নানাবিধ স্বাধীন ব্যাকটিরিয়া জন্মায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালনা করে, আবার কেহ কেহ বিনা অক্সিজেনে শ্বাসকার্য পরিচালনা করিতে পারে। **অ্যাজোটোব্যাকটার ক্রোকোকাম** (*Azotobacter chrococcum*) নামক ব্যাকটিরিয়া অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালনা করে এবং মাটির জল-অঙ্গার পদার্থ হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জীবনধারণ করে। ইহারা এই শক্তি-প্রয়োগে বাতাসের নাইট্রোজেন কণাগুলিকে অ্যামোনিয়া ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। সেইরূপে **ক্লোসট্রিডিয়ম পাসটুরিএনম** (*Clostridium pasterianum*) নামক ব্যাকটিরিয়াও বাতাসের নাইট্রোজেন কণাগুলিকে অ্যামোনিয়া ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। কিন্তু ইহাদের শ্বাসকার্য অক্সিজেনের দ্বারা পরিচালিত হয় না। মাটির ভিতরকার জল-অঙ্গার পদার্থগুলিকে ইহারা নিজ দেহ হইতে উৎসেচক রস (enzyme) নির্গত করিয়া বিশ্লেষণ করে এবং এতদ্দ্বারা গতিশক্তি সঞ্চয় করে। ব্যাকটিরিয়াগুলির দেহ হইতে জীবিত অবস্থায় অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নিঃসৃত হয় কিংবা মৃত অবস্থায় ইহাদের দেহে জমা থাকে। **নাইট্রোসোমোনাস** (*Nitrosomonas*) নামক একপ্রকার ব্যাকটিরিয়া মৃত্তিকায় প্রচুর জন্মায়। ইহারা অ্যামোনিয়াকে অক্সিজেনের দ্বারা নাইট্রাস অ্যাসিডে পরিণত করিয়া গতিশক্তি সঞ্চয় করে। উপরি-উক্ত রাসায়নিক সংকেতের ইঙ্গিত নিম্নে দেওয়া হইল :

$$2NH_3+3O_2+\text{Nitrosomonas}-2HNO_2+2H_2N+179\ \text{Cal.}$$
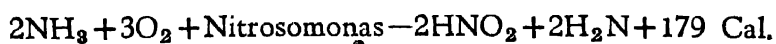
নাইট্রাস অ্যাসিড আবার **নাইট্রোব্যাকটার** (*Nitrobacter*) নামক

একপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে আরও অক্সিজেন শোষণ করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয় ; যথা—

$$2HNO_2 + O_2 \text{ (Nitrobacter)—} 2HNO_3 + 18 \text{ Cal.}$$
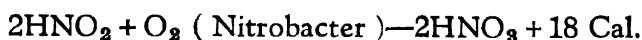
নাইট্রোব্যাকটার ব্যাকটিরিয়াও এইভাবে অল্প পরিমাণে শক্তি শোষণ করিতে পারে। সুতরাং নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড মাটির ভিতরকার বিবিধ ধাতব লবণের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যথাক্রমে নাইট্রাইট (Nitrite) এবং নাইট্রেট তৈরী করে। নাইট্রাইট লবণগুলিকে পুনরায় নাইট্রোব্যাকটিরিয়া ব্যাকটর নাইট্রেটে পরিণত করিয়া ক্ষান্ত হয়। এইভাবে মাটির ভিতরকার স্বাধীন ব্যাকটিরিয়া দ্বারা বাতাসের নাইট্রোজেনের অণুগুলি নাইট্রেটে স্থিতিলাভ করে এবং উদ্ভিদ্-ভোগ্য হয়। নাইট্রোসোমোনাস ও নাইট্রোব্যাকটার ব্যাকটিরিয়াকে নাইট্রো জেন গ্রহণের জন্য উহাদের **নাইট্রোজেন আত্তীকরণ ব্যাকটিরিয়া—নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া** (*Nitrifying bacteria*) বলা হয়।

(৩) মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা নাইট্রোজেনের স্থিতি (Nitrogen fixation by symbiotic bacteria) :

আমরা জানি যে, ছোলা, মটর প্রভৃতি শিম্ব-জাতীয় উদ্ভিদের মূলে অর্বুদ (*Nodule*) জন্মায় এবং আমরা ইহাও জানি যে, অর্বুদের ভিতরে একপ্রকার **রাইজোবিয়ম** (*Rhizobium*) নামক ব্যাকটিরিয়া বাস করে। ইহারা শিম্ব-জাতীয় উদ্ভিদের দ্বারা নির্মিত জল-অঙ্গার খাদ্য দহন করিয়া শক্তি শোষণ করে এবং ইহার দ্বারা বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া ইহাকে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যে পরিণত করে। এই নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য বা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য উদ্ভিদ্ গ্রহণ করিয়া উহার নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাইজোবিয়ম অন্যপ্রকার উদ্ভিদের মূলের সংস্পর্শে আসিলেও অর্বুদ নির্মাণ করিতে পারে না বা বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া উহা প্রোটিন-খাদ্যে পরিণত করিতে পারে না। সেইরূপ ছোলা বা মটর প্রভৃতি শিম্ব-জাতীয় উদ্ভিদ্ও রাইজোবিয়ম ব্যতীত অন্য কোন ব্যাকটিরিয়ার সহিত জীবনধারণ করিতে পারে না। রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়ার শ্বাসকার্য অক্সিজেনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহাদের অক্সিজেন সরবরাহ করিবার জন্য উদ্ভিদের মূলকোষে প্রাণীদের রক্তকণার মত লাল হিমোগ্লোবিন কণার সৃষ্টি হয়। কণাগুলি

অক্সিজেন শোষণ করিয়া রাইজোবিয়মকে শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য তাহা সরবরাহ করে। রাইজোবিয়ম অক্সিজেনের সাহায্যে উদ্ভিদের জল-অঙ্গার খাদ্য-গুলিকে দহন করিয়া সঞ্চয় করে। এই শক্তি দ্বারাই রাইজোবিয়ম বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন-খাদ্য প্রস্তুত করে এবং উহা অংশীদার উদ্ভিদকে দান করে। বোধ হয় রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়ার দেহ হইতে নিঃসৃত রাসায়নিক উৎসেচকের দ্বারাই নাইট্রোজেন শোষিত হয়।

রাইজোবিয়ম সজীব অবস্থাতেই নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ নির্গত করে। উদ্ভিদটি মৃত হইলে রাইজোবিয়ম জল-অঙ্গার খাদ্য পায় না; তখন অর্বুদটি নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যসহ মাটিতে খসিয়া পড়ে। ইহাদ্বারা মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদ্ দুর্বল হইলে রাইজোবিয়ম বাতাস হইতে নাইট্রোজেন শোষণ করিতে পারে না। কারণ, দুর্বল উদ্ভিদের মূলকোষের লোহিত বর্ণের **লেগ্‌হিমোগ্লোবিন** *Leghoemoglobin*)-এর উৎপত্তি হয় না এবং রাইজোবিয়ম শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন না পাওয়ায় নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না।

রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়া প্রথমে উদ্ভিদের এককোষী মূলরোমকে আক্রমণ করে। ইহার দ্রুত কোষ-বিভাগের ফলে রাইজোবিয়মগুলি পরস্পর এক সারিতে থাকে এবং সেইজন্য পাতলা সূতার ন্যায় দৃষ্ট হয়। ইহাদের দেহ একটি সূক্ষ্মতম পিচ্ছিল পর্দা দিয়া বেষ্টিত থাকে। রাইজোবিয়ম-নির্মিত সূতাটি ধীরে ধীরে কোষপ্রাচীর ভেদ করিয়া মূলের অন্তস্ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করে। অন্তস্ত্বকের জল-অঙ্গার পদার্থগুলিকে রাইজোবিয়ম ধ্বংস করিতে আরম্ভ করে এবং তৎপরিবর্তে দেহ হইতে একপ্রকার রাসায়নিক উৎসেচক নিঃসৃত করে। এই রাসায়নিক উৎসেচক অন্তস্ত্বকের কোষগুলিকে বিভাজনের জন্য উত্তেজিত করিয়া তোলে এবং অন্তস্ত্বকের কোষগুলি হঠাৎ পর পর বিভক্ত হইতে দেখা যায়। এই বিভাজনের শেষ পরিণতি বা পরিণাম হয় একটি গোলাকার অর্বুদের সৃষ্টি।

উদ্ভিদ্‌দেহ বা প্রাণিদেহ পচিয়া গেলে উহা হইতে নানাবিধ ব্যাকটিরিয়া-ক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়া নির্গত হয়। ইহা গ্যাসীয় হওয়ায় বাতাসের সহিত মিলিত হয়। আবার, মাটির ভিতর প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকারের ব্যাকটিরিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে **ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া** (*Denitrifying bacteria*) গোষ্ঠী প্রধান। ইহারা মাটির ভিতরকার নাইট্রেট ও নাইট্রাইট

ধাতব লবণগুলিকে অনায়াসে অ্যামোনিয়া গ্যাসে বা এমন কি মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত করিতে পারে। এইভাবে নাইট্রেট হইতে প্রচুর নাইট্রোজেন নির্গত
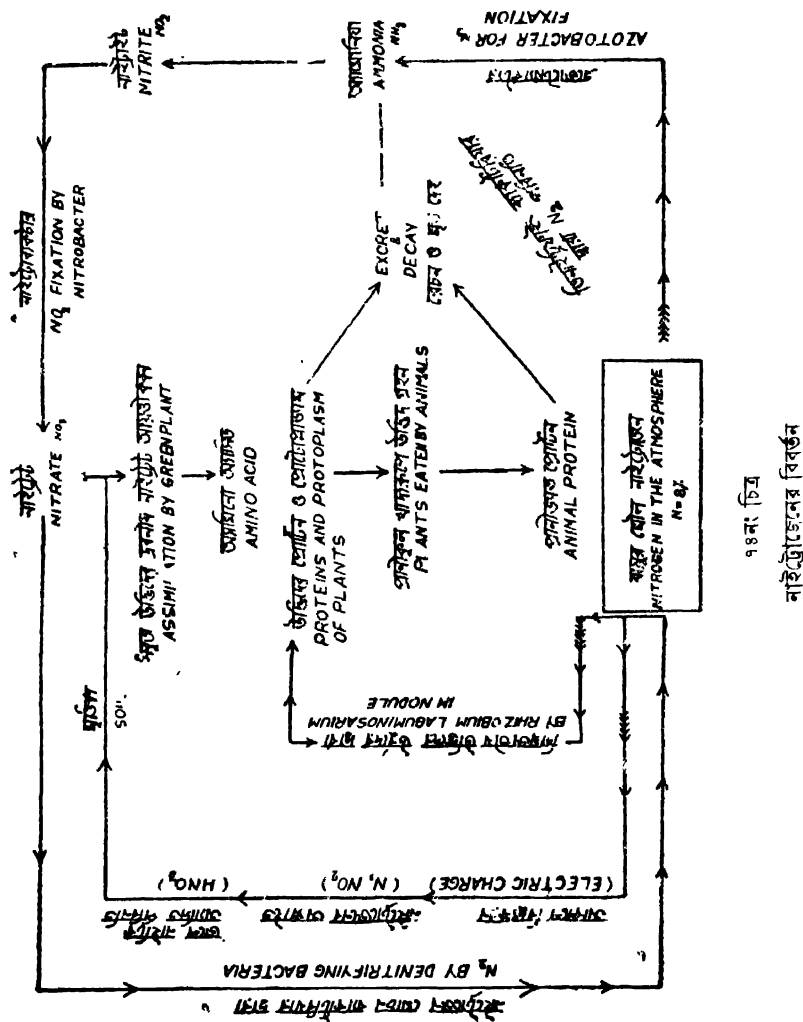
৭৪নং চিত্র
নাইট্রোজেনের বিবর্তন

হইয়া বাতাসের সহিত পুনরায় মিলিয়া যায়। সুতরাং বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সব সময় সমান থাকে। ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে **সিউডোমোনাস ফ্লুরেসেন্স্** (*Pesudomonas fluorescence*) এবং **ব্যাসিলস্ সবটিলিস্** (*Bacillus subtilis*) প্রধান।

কার্বনের বিবর্তন-চক্র
(Carbon cycle)

উদ্ভিদের প্রধান ও প্রথম খাদ্য হইতেছে জল-অঙ্গার। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ্ বাতাস হইতে কার্বন ডায়কসাইড শোষণ করিয়া জল-অঙ্গার খাদ্য প্রস্তুত করে। এই জল-অঙ্গার খাদ্যই অন্যান্য জৈব-অজৈব উপাদানের সংমিশ্রণে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, তৈল ইত্যাদি খাদ্য প্রস্তুত করে। কোষের সাইটোপ্লাজমের বহুবিধ উপাদানের মধ্যে কার্বন একটি। একদিকে উদ্ভিদ্ যেমন কার্বন ডায়কসাইড শোষণ করে, তেমনি শ্বসন-ক্রিয়ার দ্বারা দেহ হইতে উহারা কার্বন ডায়কসাইড নির্গত করে। সুতরাং লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কার্বন ডায়কসাইড নানা উপায়ে পুনরায় দেহে প্রবেশ করে, কিন্তু পুনরায় তাহা বাতাসে ফিরিয়া আসে। কার্বন ডায়কসাইডের জীবদেহে প্রবেশ এবং জীবদেহ হইতে পুনরায় বাহির হইয়া বাতাসের সহিত মিলিত হওয়াকেই কার্বনের বিবর্তন-চক্র বলা হয়। এই বিবর্তন-চক্রে বহু উপায়ে পৃথিবীর সজীব ও নির্জীব বস্তু হইতে কার্বন ডায়কসাইড নির্গত হয় এবং বাতাসের সহিত মিলিত হয়।

সবুজ উদ্ভিদ্ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বাতাসের কার্বন ডায়কসাইড গ্যাস দেহের ভিতরে প্রবেশ করায় এবং ইহার সহিত জলের সংমিশ্রণে জল-অঙ্গার খাদ্য প্রস্তুত হয়। উদ্ভিদ্ দিবাকালে সূর্যের আলোকের সাহায্যে উক্ত খাদ্য তৈয়ারী করে এবং এই প্রণালী রাত্রিকালে কার্যকরী হয় না। উদ্ভিদের শ্বসন-ক্রিয়ায় জল-অঙ্গার খাদ্যগুলি অক্সিজেনের দ্বারা দাহ্য হয় এবং ইহাতে কার্বন ডায়কসাইড পুনরায় নির্গত হইয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়। বহু ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া জল-অঙ্গার খাদ্য তৈয়ারী না করিলেও তৈল, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ প্রভৃতি খাদ্যকে শ্বসন-ক্রিয়ায় দাহ করে এবং এতদ্দ্বারা কার্বন ডায়কসাইড নির্গত হয়। শাকাশী প্রাণিগণ প্রধানতঃ উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। উদ্ভিদের দেহজাত জল-অঙ্গার ইত্যাদি ইহাদের একমাত্র খাদ্য। শাকাশী প্রাণীদের মৃত্যুর পর মৃতদেহ হইতে কার্বন ডায়কসাইড নির্গত হয়। বীজাণুর দ্বারা পচনের ফলে দেহের সমস্ত জল-অঙ্গার জাতীয় বস্তু হইতে উৎসেচকের ক্রিয়ার ফলেও কার্বন ডায়কসাইড নির্গত হয়। সেইরূপ শাকাশী প্রাণীদের ভক্ষণকারী মাংসাশী প্রাণীগুলিও মৃত্যু ও পচনের ফলে কার্বন ডায়কসাইড নিঃসৃত করে। কাঠ, চর্বি, জ্বালানি তৈল (যেমন—কেরোসিন, গ্যাসোলিন,

পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি), বনজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি বস্তুগুলিকে আমরা নিজ স্বার্থে প্রতিদিন জ্বালাইয়া থাকি। উহাদের জ্বলনের সময় নানা গ্যাসের সহিত নির্গত কার্বন ডায়কসাইডও নির্গত হয়। পৃথিবীর নানা আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে নানাপ্রকার ধাতব পদার্থ তরল অবস্থায় নির্গত হইতে দেখা
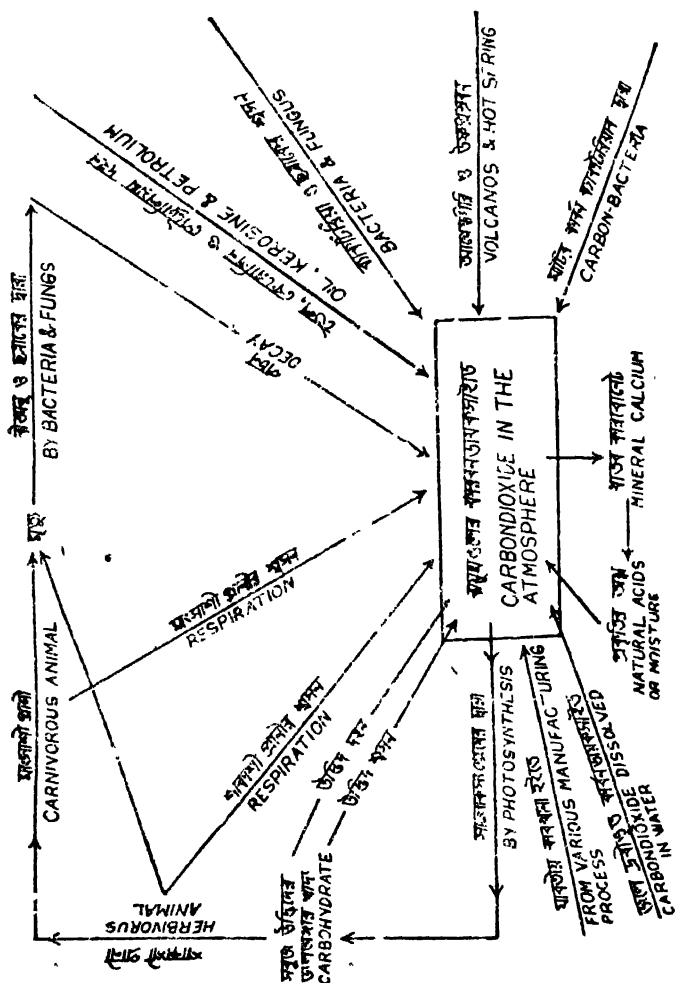
৭০নং চিত্র
কার্বনের বিবর্তন-চক্র

যায়। ইহাদের সহিত কার্বন ডায়কসাইড গ্যাস সর্বদাই নির্গত হইয়া বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। কার্বন-ব্যাকটিরিয়াগুলি মাটির ভিতরের কার্বনকে প্রথমে **কার্বন মনকসাইডে** (*Carbon monoxide*) পরিণত করে এবং পরে কার্বন

মনকসাইড গ্যাস কার্বন ডায়কসাইডে পরিণত হয়। কার্বন ডায়কসাইড জলে দ্রবীভূত হয় এবং ক্যালসিয়াম-জাতীয় ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে কার্বোনেটের সৃষ্টি করে। কার্বোনেট মৃত্তিকার চাপে কঠিন চুনাপাথরে পরিণত হয়। এইরূপ চুনাপাথর জলের বা অম্লের সংস্পর্শে আসিলে কার্বন ডায়কসাইড নির্গত হয়। পুষ্করিণী বা নদী ও সমুদ্রের জলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডায়কসাইড থাকে। জলজ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী ইহা ব্যবহার করিয়া জীবনধারণ করে। জলজ প্রাণীগুলি কার্বন ডায়কসাইড কার্বোনেট-রূপে পরিণত করিতে পারে। ঝিনুক, শামুক, প্রবাল ইত্যাদি প্রচুর জলজ প্রাণীর বহিরাবরণী বা খোলস এই কার্বোনেটের দ্বারাই নির্মিত। খোলসগুলিকে দহন করিলে কার্বন ডায়কসাইড নির্গত হয় এবং জলজ প্রাণীর মৃত্যু হইলে খোলসগুলি নানারূপ রাসায়নিক-ক্রিয়ার ফলে পুনরায় কার্বন ডায়কসাইডে পরিণত হয়।

পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কারখানায় চিমনি হইতে এবং প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্যের নির্মাণকার্যে কার্বন ডায়কসাইড নির্গত হয়। কার্বন ডায়কসাইড গ্যাস নির্গত হইয়া বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। সাধারণভাবে কার্বন-বিবর্তন-চক্র পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, কার্বন ডায়কসাইডের চেয়েও উহার নির্গমই বেশী। সমগ্র সবুজ উদ্ভিদ্, বেশ কিছু-সংখ্যক ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া কার্বন ডায়কসাইড শোষণ করিয়া যথাক্রমে কঠিন কার্বোনেট ও জল-অঙ্গার খাদ্য প্রস্তুত করে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে বা জলে গড়ে কার্বন ডায়কসাইডের পরিমাণ প্রায়ই সমান থাকে।

অনুশীলনী

১। মৃত্তিকার সৃষ্টি ও উহার উপাদানগুলির বিষয় যাহা জান লিখ। (Give an account of the soil formation and its composition.)

২। সাধারণভাবে বিবিধ মৃত্তিকার বিষয় যাহা জান লিখ। (Describe the various types of soil in general.)

৩। হিউমস্ কাহাকে বলে? বিবিধ প্রকারের হিউমস্ মৃত্তিকার বিষয় যাহা জান লিখ। (What is Humus? Give an account of the various types of Humus soil.)

৪। মৃত্তিকার বিবিধ উপাদানগুলি দহন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত কর। (Explain how you will quantitatively analyse the composition of soil by ignition method.)

৫। সার কাহাকে বলে? কম্পোস্ট সারের বিষয় যাহা জান লিখ। (Define fertilizer. Give an account of the compost manure.)

৬। মিথোজীবী ও মিথোজীবিতা কাহাকে বলে? মটর গাছের অর্বুদের বিষয়ে একটি পরিষ্কার বিবরণী দাও। (Define symbiosis and symbiont. Give an account of the nodules of pea plant in detail.)

৭। স্বাভাবিক সার কাহাকে বলে? শস্য আবর্তনের সহিত ইহার কি যোগ আছে তাহা বর্ণনা কর। (What do you mean by natural manure? Describe how the theory of rotation of crops is connected with natural manure.)

৮। ব্যাকটিরিয়া কি-ভাবে নাইট্রোজেনের অণু, মৃত্তিকায় স্থিতিলাভ করাইয়া পুনরায় উহাকে বায়ুমণ্ডলে মিলিত করায়, তাহা বর্ণনা কর। (Describe how bacteria fix the atmospheric nitrogen in the soil and again emit the same from it.)

৯। রাইজোবিয়ম লেগুমিনোসেরিয়ম কি-ভাবে নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দাও। (Give an account of the role of Rhizobium leguminosarium in nitrogen fixation in detail.)

১০। কার্বন ডায়কসাইডের একটি বিবর্তন-চক্র অঙ্কন করিয়া, কিভাবে এই চক্রের পরিসমাপ্তি ঘটে, তাহা বর্ণনা কর। (Draw a sketch of carbon-cycle of nature and explain how the cycle is completed.)

১১। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ:

(i) দো-আঁশ মাটি, (ii) কাঁচা হিউমস্, (iii) লাইকেন, (iv) অ্যাজোটোব্যাকটার (v) নাইট্রোসোমোনস্, (vi) লেগহিমোগ্লোবিন, (vii) ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া।

[Write short notes on :—(i) Loamy soil, (ii) Raw humus, (iii) Lichen, (iv) Azotobacter, (v) Nitrosomonas, (vi) Leghoemoglobin, (vii) Denitrifying bacteria.]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধি

(Growth)

বৃদ্ধি সজীব পদার্থের লক্ষণ। নির্জীব পদার্থ, যথা পাথর, জল বা পাহাড় ধীরে ধীরে বাহির হইতে পদার্থের মিশ্রণে বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মের সময় নদীর জল কমিয়া যায়; আবার বর্ষায় উহারা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তেমনি পাথর জমা হইয়া ধীরে ধীরে পাহাড়ে পরিণত হয় এবং প্রবল ঝড়ে আবার পাহাড়ের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়া ছোট ছোট পাথরে পরিণত হয়। কিন্তু সজীব পদার্থের বৃদ্ধি বাহির হইতে নদী বা পাহাড়ের মত নয়। ইহাদের দেহের ভিতরকার কোষগুলির বিভাজনের দ্বারা একটি সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ বৃদ্ধির জন্য সজীব পদার্থের প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্য। প্রত্যেকটি সজীব বস্তুর **বিপাকীয় কার্য** (*metabolic activities*) প্রধানতঃ দুই প্রকারের। ইহারা কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা খাদ্য সঞ্চয় করে, যেমন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া। ইহার দ্বারা উদ্ভিদের দেহে ধীরে ধীরে খাদ্য সঞ্চিত হয় এবং উদ্ভিদের ওজন বাড়িয়া যায়। সুতরাং এই প্রক্রিয়াগুলিকে উদ্ভিদের **বৃদ্ধিকারী বিপাকীয় কার্য** (*Anabolic activities of metabolic process*) বলা হয়। আবার শ্বসন-পদ্ধতির দ্বারা উদ্ভিদ্ সঞ্চিত খাদ্যগুলিকে দগ্ধ করিয়া উহা হইতে শক্তি নির্গত করে। এই গতি-শক্তির দ্বারাই উদ্ভিদের কোষের বিভাগ হয়। সুতরাং এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদ্ সঞ্চিত খাদ্য ক্ষয় করে এবং উদ্ভিদের ওজন কমিয়া যায়। সুতরাং এই পদ্ধতিকে উদ্ভিদের **ধ্বংসকারী বিপাকীয় কার্য** (*Katabolic activities of metabolic process*) বলা হয়।

বৃদ্ধিকারী এবং ধ্বংসকারী বিপাকীয় কার্য উদ্ভিদের দেহের ভিতর সর্বদাই সম্পাদিত হইতেছে। সাধারণতঃ উদ্ভিদ্ ধ্বংসকারী প্রক্রিয়াগুলির চেয়ে বৃদ্ধিকরী প্রক্রিয়াগুলির কার্য বেশী সম্পাদন করে অর্থাৎ উদ্ভিদের দেহের ভিতর খাদ্যের দ্বারাই উদ্ভিদ্ নিজ নিজ কোষগুলির সাইটোপ্লাজম বৃদ্ধি করে এবং পরে ঐ কোষগুলি বিভাগের দ্বারা উদ্ভিদ্ নিজের বৃদ্ধি ঘটায়, সুতরাং

কোন সজীব বস্তুর আয়তনের স্থায়ী প্রসারণ এবং তদ্দ্বারা আকৃতি বা গঠনের পরিবর্তনকেই **বৃদ্ধি** (*Growth*) বলা হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি হইলে উহার ওজন বাড়িয়া যায় এবং বৃদ্ধির ফলে আকারের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় উহার আয়তন স্থায়িভাবে বৃদ্ধি পাইলেও উহার ওজন ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। সেইরূপ আলুর মুকুলগুলি গজাইবার সময়ও উহার ওজন হ্রাস পায়। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। বীজ বা আলুর ভিতরে যে সঞ্চিত খাদ্যবস্তু থাকে, তাহা বীজ বা আলু অক্সিজেনের দ্বারা দাহ করিয়া যে গতিশক্তি উদ্ধার করে, তাহার দ্বারাই উহাদের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং সঞ্চিত ভারী খাদ্যগুলি ক্ষয় হইলে স্বভাবতঃই বীজের বা আলুর ওজন কম হয়। এককোষী উদ্ভিদ্গুলির কোষবৃদ্ধিতেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি। কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধির দ্বারা ইহাদের দেহে নূতন নূতন কোষের সৃষ্টি হয় এবং এই নূতন কোষগুলি পুষ্ট হইলে পুনরায় বিভাজনের দ্বারা আবার নূতন কোষের সৃষ্টি করে। একটি কোষের সূচনা, সৃষ্টি ও পুষ্টি একত্রিত করিলে উহার বৃদ্ধি বোঝায়। সুতরাং বৃদ্ধির তিনটি দশা বা অবস্থা আছে ; যথা—

(ক) কোষ-বিভাগ দশা (Phase of cell-division or formative phase) :

এই দশায় কোষগুলির মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত বিভাগের দ্বারা বহু নূতন কোষের সূচনা হয়। সাধারণতঃ উদ্ভিদের ভাজক-কলা অঞ্চলের (meristematic regions) কোষগুলি ক্রমাগত বিভক্ত হয়। উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের অগ্রাংশের ভাজক-কলার কোষগুলি বিভাগ ও বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ্ আকারে লম্বা হয়। আবার উদ্ভিদের ব্যাস উহার পার্শ্বস্থ ও নিবেশিত ভাজক কলার কোষগুলি বিভাগের ফলে বৃদ্ধি পায়।

(খ) দীর্ঘকরণ দশা (Phase of elongation) :

এই দশায় কোষগুলি ধীরে ধীরে আয়তনে বড় হয় এবং এতদ্দ্বারা প্রচুর কোষগহ্বরের সৃষ্টি হয়। কোষ-প্রাচীরের প্রসারণে যখন উহার পরিধি বৃদ্ধি পায়, তখন সমস্ত কোষগহ্বরগুলি একত্রিত হইয়া কোষের মধ্যস্থলে অবস্থান করে এবং কোষের সাইটোপ্লাজম কোষ-প্রাচীরের নিম্নে প্রাইমোরডিয়েল ইউট্রিকলে (Primordial utricle) পরিণত হয়। জাইলেম ও ফ্লোয়েম অঞ্চলে এইরূপ দশা দেখা যায়।

(গ) **বিভেদ দশা** (**Phase of differentiation or phase of matu·ation**) **:**

কোষগুলির বৃদ্ধি যখন সমাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহাদের আকার ও গঠনের আর কোন পরিবর্তন হয় না, তখন কোষের কোন-প্রাচীরের নানাপ্রকার বৃদ্ধির দ্বারা বিবিধ কোষকলার বৈশিষ্ট্যের সূচনা করে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার (Rate of Growth) ঃ

উদ্ভিদের যে-কোন অঙ্গের বৃদ্ধির হার খুব ধীরে হয় এবং উহা উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারাই কেবল পরিমাপ করা যায়। কিন্তু কুমড়া গাছের কর্ষিকা বা বাঁশ গাছের অগ্রভাগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইহা লক্ষ্য করিলে সহজেই দেখা যায়, বৃদ্ধি সর্বদা সমানভাবে হয় না।

বৃদ্ধির হার প্রথমে অতি ধীরে আরম্ভ হয় এবং পরে বৃদ্ধির গতি বাড়িতে বাড়িতে উহার হার সর্বাপেক্ষা অধিক হয় ও শেষে বৃদ্ধি আবার হ্রাস পাইতে পাইতে একেবারে স্থির হইয়া যায়। বৃদ্ধি স্থিতিলাভ করিলে অঙ্গের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি হয়। বৃদ্ধির প্রথম শুরু হইতে শেষে পর্যন্ত সময়টুকুকে অঙ্গের **মুখ্য বৃদ্ধিকাল** (*General period of Growth*) বলা হয়। উদ্ভিদের যে-কোন অঙ্গ, যথা—পাতা, কাণ্ড, কর্ষিকা ইত্যাদি সমান-ভাবে বৃদ্ধি পায় না। সেইজন্যই কর্ষিকা বা পাতাগুলির বৃদ্ধিকালীন অবস্থায় যথাক্রমে পেঁচানো বা গুটানো আকারে দেখা যায়। যে-কোন বর্ধনশীল গাছের অঙ্গ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাপিয়া দেখিলে মুখ্যবৃদ্ধিকালের বৃদ্ধির হার জানিতে পারা যায়। সাধারণতঃ বৃদ্ধি দিনের চেয়ে রাত্রে বেশী হয়।
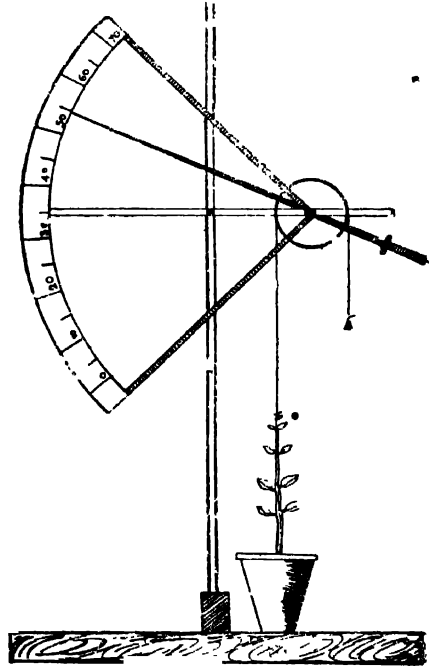
৭৬নং চিত্র
দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির পরিমাপের জন্য আর্ক-ইণ্ডিকেটর যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের পরীক্ষা দেখান হইতেছে

আবার কোন কোন উদ্ভিদের বৃদ্ধি গ্রীষ্মের সময় বেশী এবং শীতকালে কম হয়। ইহার বিপরীত অবস্থাও কোন কোন উদ্ভিদে দেখা যায়। উদ্ভিদের **লম্বভাবে বৃদ্ধি** (*Growth in length*) নানা যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। সাধারণতঃ ল্যাবরেটরিতে **আর্ক-ইণ্ডিকেটর** (*Arc indicator*) বা **অক্সানোমিটার** (*Auxanometer*) দ্বারা ছোট ছোট বর্ধনশীল উদ্ভিদের দৈর্ঘ্য সময়ের ব্যবধান রাখিয়া মাপা হইয়া থাকে। যন্ত্রটি একটি **অংশাঙ্কিত** (*Graduated*) বৃত্তের চতুর্থাংশ মাত্র। ইহার কেন্দ্রে একটি কপিকল বা হুইল থাকে এবং হুইলের সহিত একটি **দৈর্ঘ্য-নির্দেশক** (*Pointer*) সংযুক্ত থাকে। হুইলটি ঘুরিলে নির্দেশকটিও হুইলের দ্বারা আর্কের পরিধি রেখার উপর উঠা-নামা করে। এখন হুইলের ফাঁকের ভিতর দিয়া একটি সরু সুতা প্রবেশ করাও। সুতার একদিক যে-কোন বর্ধনশীল গাছের অগ্রভাগের সহিত বাঁধিয়া উহার অপর দিকটিতে একটি ছোট ভার বা ওজন বাঁধিয়া রাখ। ভারটি এমনভাবে বাঁধিতে হইবে যাহাতে সুতাটি প্রসারিত থাকে, অথচ কাণ্ডের আগা বিচ্ছিন্ন না হয়। বাঁধা সম্পূর্ণ হইলে নির্দেশকের অবস্থান লক্ষ্য কর। এখন কাণ্ডের অগ্রভাগের বৃদ্ধি হইতে সুতা হালকা হইয়া যায় এবং উহার নিম্নের ভারের জন্য হুইলটি ঘুরিতে আরম্ভ করে। হুইলের সহিত নির্দেশকও আর্কের পরিধির উপরিভাগে উঠিতে দেখা যাইবে। নির্দেশকের প্রথম অবস্থান ও দ্বিতীয় অবস্থানের পার্থক্যেই উদ্ভিদ্-কাণ্ডের বৃদ্ধি কতখানি হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়। এই পরীক্ষায় বৃদ্ধির হার খুব বড় করিয়া দেখান হইলেও ইহার দ্বারা সহজে উদ্ভিদের **সরল বৃদ্ধি** (*Linear growth*) প্রমাণ করা যায়। যদি দিবা-রাত্র এইরূপ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, বৃদ্ধি সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়, রাত্রিকালে ধীরে ধীরে বাড়ে এবং ভোরে সর্বাপেক্ষা বেশী হয় ও দিনের বেলায় বৃদ্ধির হার খুবই কম থাকে। প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টায় বৃদ্ধির বিকাশকে **দৈনিক বৃদ্ধি** (*Daily period of growth*) বলা হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কাণ্ড বা মূলের অগ্রভাগের বৃদ্ধি বেশী হয়। কিন্তু বৃদ্ধি মূলের অগ্রভাগের প্রতিটি অঞ্চলে সমানভাবে হয় না। সাধারণ পরীক্ষার দ্বারা ইহাও সহজে প্রমাণ করা যায়। কতকগুলি ছোলার বীজের অঙ্কুরোদ্গম কর। বীজের মূলগুলি যখন এক-ইঞ্চি পরিমাণ অঙ্কুরিত হইবে, তখন স্পেশ-মার্কারের (space-marker) সাহায্যে এক

মিলিমিটার ব্যবধান রাখিয়া কালি দিয়া মূলের দেহে দাগ দাও। এখন দুইটি বড় মুখ-বিশিষ্ট কাচের জার লও। মুখের কর্কগুলিকে ছিদ্র করিয়া প্রত্যেক জারে উহার ভিতরে একটি করিয়া লম্বা কাচের নল প্রবেশ করাও। জারের অর্ধেকের চেয়েও বেশী জলে পূর্ণ কর এবং প্রত্যেকটি জারে একটি করিয়া অংশাঙ্কিত ছোলার বীজ আলপিনের সাহায্যে কর্কের তলায় লাগাইয়া রাখ। কিছুদিন এইভাবে রাখিবার পর লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মূলের
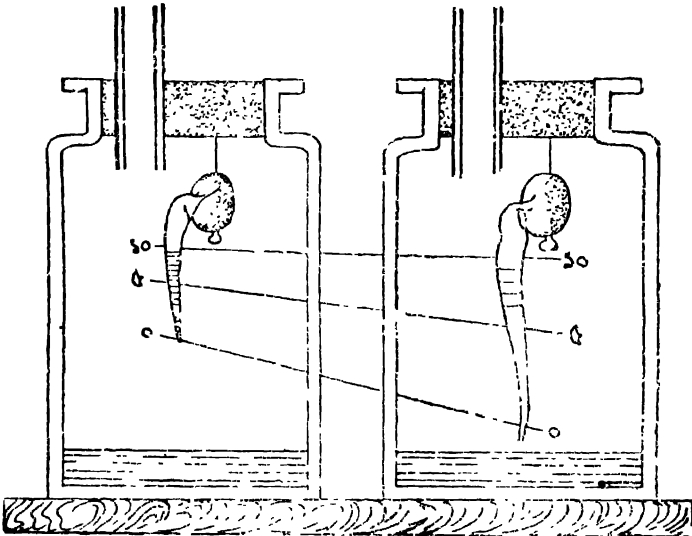
৭৭নং চিত্র

মূল অঞ্চলের বিবিধ অংশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ঠিক অগ্রাংশের পিছন অঞ্চলে (behind the root-tip) বৃদ্ধি বেশী হয়। এই অঞ্চলের দাগের মধ্যস্থলের স্থান বেশী লম্বা হয়, অথচ উহার উপরের অঞ্চল ও মূলের ঠিক অগ্রাংশে সেইরূপ বৃদ্ধি হয় না।

বায়ুমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুত হয় বা হ্রাস পায়। নিম্নে উহাদের বিষয়ে একে একে আলোচনা করা হইতেছে ; যথা—

(১) **আলোক (Light)ঃ** আলোকেরও বিভিন্ন রূপ আছে। কখনও আলোক তীব্র হয়, আবার কখনও উহা বহুক্ষণ ধরিয়া স্থিতিলাভ করে। আবার ম্লান আলোকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি অন্যপ্রকার হয়। সুতরাং আলোকের বিবিধ অবস্থা উদ্ভিদের বৃদ্ধি-পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে, যথা—(i) **আলোকের**

উগ্রতা (*Intensity of light*): কোন কোন উদ্ভিদ্-শারীরবিদ্‌গণের (Sachs) মতে ম্লান আলোকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুত হয়; আবার কেহ কেহ বলেন যে, আলোকের উগ্রতার সহিত বৃদ্ধির হারের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে, আলোকের উগ্রতা সামান্য বাড়িলে কোষ-বিভাগ দ্রুত হইয়া থাকে। সুতরাং পরোক্ষভাবে বৃদ্ধির হার দ্রুত হয়। (ii) **আলোকের প্রকারভেদ** (*Quality of light*): আলোকের বিশ্লেষণ করিলে সাতটি রঙ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে লাল ও নীল রঙ উদ্ভিদের কোষ-বিভাগের হার বৃদ্ধি করে, অথচ কোষের আয়তন বৃদ্ধি করে না। আবার কেবলমাত্র আলোকের লাল রঙ উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করিলে ইহা কোষের আয়তন বৃদ্ধি করে, অথচ কোষ-বিভাগ প্রণালীতে বাধা দেয়। নীল রঙ উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করিলে উহার কোষগুলি আয়তনে বৃদ্ধি পায় না বটে, কিন্তু কোষ-বিভাগের হার দ্রুত হয়। (iii) **আলোকের স্থিতিকাল** (*Duration of light*): আলোকের স্থিতিকাল উদ্ভিদের পুষ্পগঠনে সাহায্য করে। গম-উদ্ভিদ্‌কে ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা ক্রমাগত আলোকে রাখিলে সাধারণ সময়ের চেয়ে উদ্ভিদ্ বহু পূর্বেই ফুল ধারণ করে। আবার ডালিয়', কসমস প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা বিলম্বে ফুল ধারণ করে। কিন্তু ১০।১২ ঘণ্টা উপরোক্ত গাছগুলি আলোকে থাকিলে সাধারণ সময়ের চেয়ে পূর্বে ফুল ধারণ করে। সুতরাং উদ্ভিদের ফুলধারণের সময় নির্ভর করে আলোকের স্থিতির উপর এবং প্রতিটি উদ্ভিদে এইরূপ স্থিতিকালের পার্থক্য দেখা যায়। উদ্ভিদের উপর আলোকের স্থিতিকালের প্রতিক্রিয়াকে **ফোটোপেরিওডিসম্** (*Photoperiodism*) বলা হয়। প্রমাণিত হইয়াছে যে, আলোকের মধ্যে লম্বা লম্বা লাল রঙের রশ্মির দ্বারাই পাতার মধ্যে **ফ্লোরিজেন** (*florigen*) নামক একপ্রকার **উদ্বোধকের** (*hormone*) সৃষ্টি হয়। এই উদ্বোধক কাণ্ডের শীর্ষাগ্রে বা কক্ষে ফুল প্রস্ফুটিত করিবার জন্য নূতন নূতন কোষের সূচনা করে। **গ্রেগরী** (*Gregory*) সাহেব বলিয়াছেন যে, উদ্ভিদে ফুল যাহাতে দ্রুত প্রস্ফুটিত হইতে পারে, ফ্লোরিজেন তাহার সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর করিয়া অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে, কিন্তু ফ্লোরিজেন প্রত্যক্ষ ফুল গঠন করে না। (iv) **আলোকের গতি** (*Direction of light*): আলোকের দিকে সাধারণতঃ উদ্ভিদের বিটপ অংশ ধাবিত হয় এবং মূল অংশ আলোকের

গতির বিপরীত দিকে অর্থাৎ অন্ধকারের দিকে ধাবিত হয়। উদ্ভিদের চলন-প্রক্রিয়ায় আলোকের গতির প্রভাব পরের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইবে। আলোক হইতেই উদ্ভিদ্ শক্তি আহরণ করিয়া সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রধানত: এই খাদ্য খরচ করিয়াই উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পরিবর্তন এবং পূর্ণতা লাভ হয়। আলোকের অভাবে উদ্ভিদের কাণ্ড নরম ও লম্বা হয় এবং পাতাগুলি **পাণ্ডুর** (*etiolated*) হইয়া যায়। কারণ আলোকই প্রত্যক্ষভাবে পাতায় ক্লোরোফিল বৃদ্ধির সহায়তা করে; এবং ক্লোরোফিলই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় আলোক হইতে শক্তি শোষণ করিয়া জল-অঙ্গার খাদ্যগঠনে সাহায্য করে। আলোকের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অনুসারে উদ্ভিদ্‌কে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। সূর্যমুখী, বেগুন, আখ ইত্যাদি উদ্ভিদ্ প্রত্যক্ষভাবে প্রখর সূর্যালোকে উত্তমভাবে বৃদ্ধিলাভ করে। ইহাদের **আলোকবিলাসী** (*Photophilic*) উদ্ভিদ্ বলা হয়। আবার ফার্ণ, ছত্রাক, শৈবাল প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ছায়ায় ভালোভাবে বৃদ্ধিলাভ করে। সেইজন্য এই উদ্ভিদ্‌গুলিকে **ছায়াশীতল** বা **আলোকবিমুখ** (*Photophobic*) উদ্ভিদ্ বলা হয়। গোলাপ, হুড়হুড়ে প্রভৃতি উদ্ভিদ্ আলোকের প্রভাবকে উপেক্ষা করে। সেইজন্য এইরূপ উদ্ভিদ্‌গুলিকে **আলোক-নিরপেক্ষ** (*photo indifferent*) উদ্ভিদ্ বলা হয়। আগেই বলা হইয়াছে যে, সূর্যালোকের নানারঙের রশ্মির মধ্যে লাল-রশ্মির দ্বারাই কোষের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং সূর্যালোকের নীল-রশ্মি কোষ-বিভাগ করায়। যদি কোন উদ্ভিদ্‌কে হঠাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থান হইতে আলোকে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন দেখা যাইবে যে উক্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধি হঠাৎ কমিয়া যায় এবং পরে আবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধির হার বাড়িতে থাকে ও শেষে ইহার হার সাধারণ হয়। ইহাকে **আলোক-বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়া** (*Lightgrowth reaction*) বলা হয়। উদ্ভিদ্‌কে হঠাৎ আলোকে স্থানান্তরিত করিলে উহার কোষগুলি আঘাত পায় এবং উদ্ভিদের এইরূপ অনুভূতিকে *Light energetic shock* বলা হয়। আলোকের তারতম্যই ইহার কারণ।

(২) তাপ (Temperature) :

তাপ উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত: 4°C হইতে 40°C পর্যন্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার উর্ধ্বমুখী হয়। কিন্তু উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা 25°C হইতে 30°C এবং দুইটি তাপমাত্রার

ভিতরেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়। প্রমাণিত হইয়াছে যে 29°C তাপে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। সুতরাং ইহাই বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। কিন্তু 29°C তাপে উদ্ভিদ্ বেশীক্ষণ বৃদ্ধির হার সমানভাবে চালাইয়া যাইতে পারে না এবং কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হইয়া যায়। আলোকের মত হঠাৎ কোন উদ্ভিদ্‌কে নিম্নতাপ হইতে উচ্চতাপের পরিবেশে স্থানান্তরিত করিলে বা উচ্চতাপ হইতে নিম্নতাপের পরিবেশে স্থানান্তরিত করিলে বৃদ্ধির হার হঠাৎ দ্রুত হয় এবং পরে আবার স্বাভাবিক হইয়া যায়। ইহাকে **তাপবৃদ্ধি প্রতিক্রিয়া** (*Thermo-growth reaction*) বলে।

(৩) **অক্সিজেন (Oxygen)**: জল-অঙ্গার ইত্যাদি খাদ্যগুলি অক্সিজেনের দ্বারা দাহ হয়। দহনের ফলে গতি-শক্তি নির্গত হয়। ইহাকেই শ্বসন-প্রক্রিয়া বলা হয়। শ্বসনের দ্বারা নির্গত শক্তির সহায়তায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি অর্থাৎ কোষ-বিভাগ হয়।

জল (Water): জলই উদ্ভিদের প্রাণ। প্রতিটি শারীরবৃত্তির ক্রিয়ার জন্য জল অত্যাবশ্যক। বাষ্পমোচন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ফলেই বৃদ্ধি হয় এবং উক্ত প্রক্রিয়াগুলি জলের মাধ্যমে হয়। ইহা ব্যতীত মৃত্তিকার জলধারণের ক্ষমতা, উদ্ভিদের বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদের দেহের ভিতরেও নানারকমের রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহাদের দ্বারাও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়। নিম্নে উহাদের বিবরণ দেওয়া হইল:

উদ্বোধক (Hormone)ঃ উদ্ভিদের যে সকল স্থানে বৃদ্ধির দরকার বা প্রয়োজন হয়, সেই সকল স্থানের কোষস্থ সাইটোপ্লাজম হইতে একপ্রকার জৈব রাসায়নিক তরল পদার্থ নির্গত হয়। ইহাদের বৃদ্ধি-উদ্বোধক (*Growth hormone*) বা **অক্‌সিন** (*Auxin*) বলা হয়। উদ্বোধকের দ্বারা বৃদ্ধির সূচনা হয়। বৃদ্ধি যতই বাড়িতে থাকে বা যতদিন গতিশীল থাকে, ততদিন উদ্ভিদের উদ্বোধক রসের খরচ হয়। উদ্বোধক নিঃশেষ হইলে বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। প্রদীপের তৈল ফুরাইলে যেমন ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া যায়, তেমনি উদ্বোধক শেষ হইলে বৃদ্ধিরও পরিসমাপ্তি ঘটে। সাধারণতঃ কাণ্ডের অগ্রাংশ, মূলের অগ্রভাগ ও মুকুল বা পাতায় এই উদ্বোধকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বহুপ্রকার অক্‌সিনের মধ্যে **অক্‌সিন 'এ'** (*Axin 'a'*), **অক্‌সিন 'বি'** (*Auxin 'b'*) এবং

ইনডো লয়াসেটিক অ্যাসিড (*Indoleacetic acid*) প্রধান। এভেনা (*Avena*) উদ্ভিদের কলিওপটাইলের অগ্রভাগে উদ্বোধকের সৃষ্টি হয় এবং পরে উহা ধীরে ধীরে মূলের ভিতরকার কোষে ছড়াইয়া পড়ে। কলিওপটাইলের অগ্রভাগ কাটিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে মূলের অগ্রাংশের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আবার কাটা অংশটি ঠিকভাবে পূর্বস্থানে বসাইয়া দিলে পুনরায় কলিওপটাইলের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। কোষের আয়তনে প্রসারণই অক্সিনে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ কাণ্ডের অগ্রভাগের অক্সিন ধীরে ধীরে কাণ্ডের ভিতরকার কোষের দ্বারা উদ্ভিদের সমগ্র বিটপ অংশে ছড়াইয়া পড়ে এবং কোষের আয়তন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ইহা কোষ-প্রাচীরের সম্প্রসারণতা (*elasticity*) বৃদ্ধি করে। কিন্তু কাণ্ডের অক্সিন মূলে প্রবেশ করিলে উহা বিপরীত কার্য করে। কাণ্ডজ অক্সিনে মূলের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। সকল উদ্ভিদের অক্সিন রাসায়নিক সংকেত অনুযায়ী সমান হয়। সুতরাং এক গাছের অক্সিন অন্য গাছে প্রয়োগ করিলে ফল আশানুরূপ পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে, অতি কম ঘনত্বযুক্ত কোষে অক্সিনের কাজ ভালো হয়। সুতরাং কোষ-রসের ঘনত্বযুক্ত কোষে কলার উপর অক্সিনের কার্যকারিতা নির্ভর করে।

(২) **উৎসেচক (Enzymes) :** বিবিধ উৎসেচকও কোষের সাইটোপ্লাজম হইতে নির্গত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ইহা বৃদ্ধিকে সাহায্য করে না। বিবিধ প্রকারের খাদ্য-প্রস্তুতি এবং জটিল খাদ্যকে সময় অনুসারে সরল ও তরল করা উৎসেচকের কার্য। সরল ও তরল খাদ্যই কোষের সাইটোপ্লাজমে মিশিয়া গিয়া সাইটোপ্লাজমে পরিণত হয়। উদ্বোধকের মত ইহা ব্যবহারে লাগে না বা খরচ হইয়া নিঃশেষ হয় না। সকল উৎসেচক একপ্রকার কার্য করিতে পারে না। শর্করাকে শ্বেতসার খাদ্যে পরিণত করিতে উৎসেচকের দরকার, কিন্তু এই রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিই শর্করাকে শ্বেতসার খাদ্যে রূপান্তরিত করে। সুতরাং উৎসেচক একপ্রকার অনুঘটক (*Catalyst*)। আবার যে উৎসেচক শর্করাকে শ্বেতসারে রূপান্তরিত করে, তাহা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যকে তরল ও সরল পেপ্‌টোন খাদ্যে পরিণত করিতে পারে না। শর্করার উৎসেচক প্রোটিনের প্রতিক্রিয়াহীন। প্রোটিনের জন্য অন্য উৎসেচক দরকার। সুতরাং উৎসেচক শুধু যে অনুঘটক নয় তাহা নয়, ইহা কার্যানুযায়ী নির্দিষ্ট (*specific in*

action) বৃদ্ধির গতি অসমান। মূলের অগ্রভাগের বামদিকে বৃদ্ধির গতি হইলে ডানদিকে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। যখন কচিপাতার উপরের দিকে বৃদ্ধি হয়, তখন উহার তলার দিকে বৃদ্ধি হয় না। ইহার দ্বারা কচিপাতা বাঁকিয়া যায়। সুতরাং অসমান বৃদ্ধির জন্য বৃদ্ধিকালে অঙ্গের আকার সরল না হইয়া বাঁকানো ও পেঁচালো হয়।

সঞ্চালন

(Movement)

চলন-প্রক্রিয়া সজীবের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদের চলন আছে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। কারণ আমরা সাধারণতঃ চলন-ক্রিয়া বলিতে এদিক-ওদিক চলাফেরাকেই বুঝি; যেমন কুকুর, গরু, ছাগল ইত্যাদি চলাফেরা করে। গাছের এরূপ দেখা যায় না। ইহার কারণ গাছ মাটির উপর মূলের সাহায্যে খাড়াভাবে স্থিতিলাভ করিয়া জীবনধারণ করে এবং মাটি হইতে খাদ্য শোষণ ও বাতাস হইতে মৌল গ্যাস শোষণ করিয়া যাবতীয় বিপাকীয় কার্যসাধন করে। সুতরাং কুকুর বা বেড়ালের মত খাদ্যের জন্য বা আশ্রয়ের জন্য উদ্ভিদের চলাফেরার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গাছ কি সত্যই চলে না? কতকগুলি উদ্ভিদ্, সমগ্র দেহ লইয়াই চলিতে পারে। ইহারা অতি ক্ষুদ্র এবং সাধারণ মানুষের নজর এড়াইয়া যায় এবং সেইজন্য সাধারণ লোকে উদ্ভিদের চলন-প্রক্রিয়াকে বিশ্বাস করে না। বহু এককোষবিশিষ্ট নিম্নস্তরের উদ্ভিদ্ যথা—**ভলভক্স** (*Volvox*), **ক্লামাইডোমোনাস** (*Chlamydomonas*), **নসটক্** (*Nostac*), ফার্ন ও মসজাতীয় উদ্ভিদের পুং-জননকোষ প্রভৃতি হাজার হাজার উদ্ভিদ্ জলে সাঁতার কাটিয়া চলাফেরা করে। এই সকল উদ্ভিদের দেহে সিলিয়া বা ফ্যাজিলা থাকায় উহাদের দ্বারাই চলন-প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়। কিন্তু উচ্চস্তরের উদ্ভিদে এরূপ চলন দেখা যায় না। ইহারা সমস্ত দেহ লইয়া চলিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহাদের বহুবিধ অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। আমরা দেখিয়াছি কুঁড়ি হইতে ধীরে ধীরে ফুল প্রস্ফুটিত হয়। রাত্রিকালের ফুল দিবাকালে প্রস্ফুটিত হয় না। কুমড়ার আকর্ষ কিভাবে আশ্রয়দাতাকে ধীরে ধীরে বেষ্টন করিয়া উপরে উঠে, তাহা দেখিয়াছি। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, লজ্জাবতী লতা গাছের

খোলা যৌগিক পাতা স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের অদ্ভুত সঞ্চালন-প্রক্রিয়াই উহাদের খাদ্য যোগাইতে সাহায্য করে। ইহা ব্যতীত আলোক, অভিকর্ষ ও জলের আকর্ষণে বা সংস্পর্শে উদ্ভিদ্-অঙ্গের বিবিধ সঞ্চালন বা গতি এতই সুস্পষ্ট যে, তাহা সামান্য লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। উদ্ভিদের অঙ্গগুলি আলোক, অভিকর্ষ, জল ও অন্যান্য উদ্দীপকদের আকর্ষণে উত্তেজিত হইয়া যখন সঞ্চালিত হয়, তখন উদ্ভিদের সঞ্চালন-প্রক্রিয়াকে আমরা **আবিষ্ট সঞ্চালন** (*Induced movement*) বলিয়া থাকি। আবার উদ্ভিদ্-অঙ্গের আবিষ্ট সঞ্চালন যখন উদ্দীপকের গতিপথের দিকে সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ উত্তেজনার গতিপথ অনুসরণ করে, তখন আমরা এইপ্রকার আবিষ্ট সঞ্চালনকে **উত্তেজনা-দিকবর্তী সঞ্চালন** (*Tropic movement*) বলিয়া থাকি। পাঠ্যসূচী অনুসারে এইপ্রকার উত্তেজনা-দিকবর্তী সঞ্চালনের তিনটি উত্তেজনাকারী বস্তুর উল্লেখ করা হইতেছে; যথা—

(ক) **আলোকের দ্বারা সঞ্চালন (Movement by light) :**

আলোকের জন্য উদ্ভিদের অঙ্গ-সঞ্চালনকে **আলোকবৃত্তি** (*Phototropism* বা *heliotropism*) বলা হয়। আলোকের উত্তেজনায় উদ্ভিদের অঙ্গগুলি সঞ্চালিত হওয়াতে এই ক্ষেত্রে আলোকই **উদ্দীপক** (*stimulus*) এবং উদ্ভিদ্ উহার জন্য যেভাবে সঞ্চালিত হয়, তাহাকে উদ্ভিদের **স্ফুরণ** (*response*) বলা হইয়া থাকে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পর আলোকের আকর্ষণে বা উত্তেজনায় উহার বিটপ অংশটি মাটি ভেদ করিয়া আলোকময় স্থানে অবস্থান করে। সেইরূপ বীজের মূল অংশটি আলোকের গতিকে উপেক্ষা করিয়া মাটির ভিতরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। সুতরাং উদ্ভিদের বিটপ অংশকে আলোকবৃত্তি অনুযায়ী **আলোক-অনুকূলবর্তী** (*Positively phototropic*) বলা হয়। সেইরূপ মূল অংশ আলোকের গতির দিককে উপেক্ষা করিয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করে, সেইজন্য মূল অংশকে আলোকবৃত্তি অনুযায়ী **আলোক-প্রতিকূলবর্তী** (*Negatively phototropic*) বলা হয়। বিটপের পাতা গজাইলে উহারা আলোকরশ্মির সহিত সমকোণ করিয়া কাণ্ডের উপর অবস্থান করে। কারণ এইভাবেই পাতাগুলি সূর্য-শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী শোষণ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থানের জন্য পাতাগুলিকে আলোকবৃত্তি অনুসারে **প্রস্থভাবে**

আলোকবৃত্তি (*Transversely phototropic*) বা ডায়াফটোট্রাপিক (*diaphototropic*) বলা হয়। সূর্যমুখী ফুল সর্বদা সূর্যের দিকে সঞ্চালন করে বলিয়াই ইহার নাম সূর্যমুখী দেওয়া হইয়াছে। আলোকবর্তী বক্রসঞ্চালনের পরীক্ষা সহজেই করা যায়।

পরীক্ষা (**Experiments**): একটি বড় জার লও। উহার মুখের কর্কে দুইটি গোলাকার ছিদ্র কর এবং একটির ভিতর বক্র কাচের নল
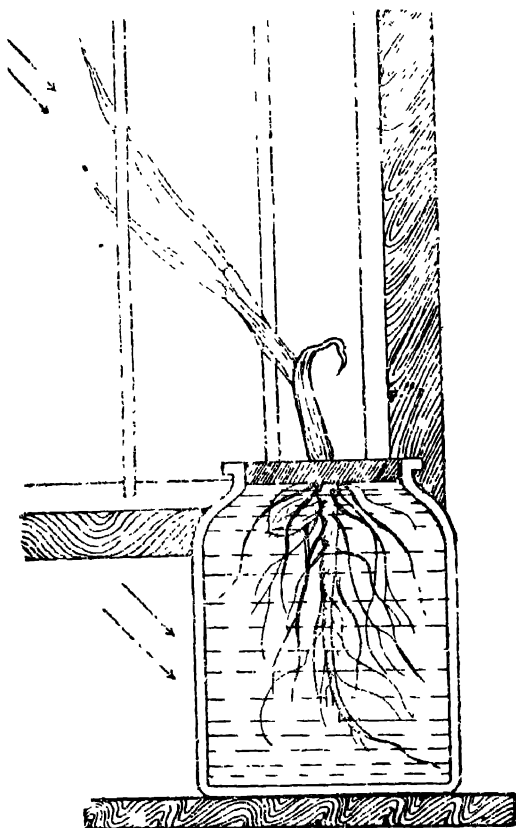
৭৮নং চিত্র

আলোকবৃত্তির পরীক্ষা দেখান হইতেছে।

প্রবেশ করাও। জারের ভিতর রাসায়নিক কৃষ্টি-জল প্রবেশ করাও এবং দ্বিতীয় ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটি ধানগাছের চারা প্রবেশ করাও। চারাগাছটিকে এমনভাবে প্রবেশ করাও যাহাতে চারাগাছের মূল অংশটি

কৃষ্টি-জলের মধ্যে থাকে। চারাগাছটিকে কর্কের ছিদ্রতে মোম দিয়া খাড়াভাবে রাখ। এখন জানালার ধারে একটি টেবিলের উপর জারটিকে রাখ। কিছুদিন পরে দেখা যাইবে যে, চারাগাছের পাতাসমেত প্রধান কাণ্ডটি জানালার ফাঁক দিয়া মুক্ত বাতাসে বিদ্যমান এবং পাতাগুলি আলোকরশ্মির সহিত সমকোণাকারে অবস্থিত। মূল অংশটিকে ধীরে ধীরে জারের তলদেশ স্পর্শ করিতে দেখা যায়। আলোকবৃত্তির জন্য উদ্ভিদের কাণ্ডটি আলোকের দিকে এবং মূল অংশটি আলোর গতিকে উপেক্ষা করিয়া উহার বিপরীত দিকে সঞ্চালিত হয়।

(খ) **অভিকর্ষের দ্বারা সঞ্চালন** (**Movement by gravity**): আলোকের ন্যায় অভিকর্ষও উদ্ভিদের বিবিধ অঙ্গের একটি উদ্দীপক। উদ্ভিদ্ যখন অভিকর্ষের দ্বারা সঞ্চালিত হয়, তখন এইরূপ সঞ্চালনকে **অভিকর্ষবৃত্তি** (*Geotropism*) বলে। উদ্ভিদের মূল, বীজটির অঙ্কুরিত
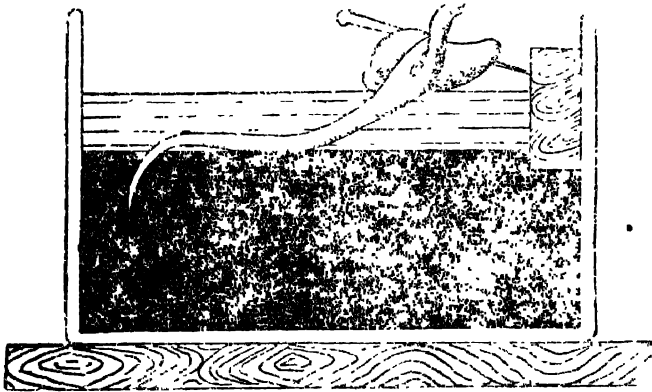
৭৯নং চিত্র
অভিকর্ষবৃত্তির পরীক্ষা দেখান হইতেছে।

হইবার পরই মাটির ভিতর প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে উহা বৃদ্ধিলাভ করিয়া মাটির গভীর অংশে ধাবিত হয়। সুতরাং উদ্ভিদের মূল, উদ্দীপকের গতিপথ লক্ষ্য করিয়া সেইদিকেই সঞ্চালিত হয়। গাছের অভিকর্ষবৃত্তি অনুসারে এইরূপ উদ্ভিদের মূলকে **অনুকূল-অভিকর্ষী** (*Positively geotropic*) বলা হয়। উদ্ভিদের বিটপ অংশ কিন্তু ইহার বিপরীত দিকে সঞ্চালিত হয়, অর্থাৎ অভিকর্ষের গতিপথ অনুসরণ না করিয়া উহার

বিপরীত দিকে বা আলোকের দিকে সঞ্চালিত হয়। সুতরাং অভিকর্ষ-বৃত্তি অনুযায়ী বিটপ অংশকে **প্রতিকূল-অভিকর্ষী** (*Negatively geotropic*) বলা হয়। সেইরূপ প্রধান মূলের শাখা-প্রশাখাগুলি মাটির ভিতর অভিকর্ষ-শক্তির সহিত তির্যক্‌ভাবে বা প্রস্থভাবে থাকে বলিয়া উহাদের **প্রস্থভাবে অভিকর্ষ** (*Transversely geotropic*) বলা হয়। অভিকর্ষ-বৃত্তির পরীক্ষা নিম্নে দেওয়া হইল :

পরীক্ষা: একটি ছোট কাঁচের বিকারে কিছু পারদ ঢাল। পারদের উপর এক স্তর জল দাও। এখন একটি ছোলা বীজের অঙ্কুরোদ্গম কর এবং অঙ্কুরিত ছোলাবীজটিকে পিন দিয়া একটি কর্কের সঙ্গে আটকাইয়া রাখ। কর্কসমেত ছোলা বীজটিকে এখন বিকারের জলের উপর রাখ। কিছুদিন পরে দেখিবে যে, বীজের মূল অংশটি জল-স্তর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে পারদের ভিতর প্রবেশ করিতেছে এবং ভারী ধাতব পারদ ইহার অভিকর্ষ-বৃত্তিকে রোধ করিতে অক্ষম। বিটপ অংশটিকে জল-স্তর ভেদ করিয়া খাড়াভাবে বাতাসে দেখা যায়। মূলের শেষাগ্রের ঠিক পিছন অংশ বাঁকিয়া পারদের নিম্নস্তরে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। অভিকর্ষের আকর্ষণে মূল নীচের দিকে বা অভিকর্ষের গতিপথের দিকে ধাবিত হইতেছে এবং বিটপ অংশ প্রতিকূল-অভিকর্ষ হওয়াতে অভিকর্ষের শক্তিকে পরাস্ত করিয়া সোজাভাবে উপরের দিকে সঞ্চালন করে।

যে-কোন একটি চারাগাছ টবে লাগাইয়া, কিছুদিন পরে টবটিকে শোয়াইয়া বা মাটির সহিত সমান্তরাল করিয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে, চারাগাছটি প্রস্থভাবে কিছুদিন থাকিবার পর আবার লম্বভাবে বা খাড়াভাবে অবস্থান করিতেছে। চারাগাছের কাণ্ডটি প্রতিকূল-অভিকর্ষী হওয়ায় উহা খাড়াভাবে সর্বদাই থাকিতে দেখা যাইবে।

(গ) জলের জন্য সঞ্চালন (Movement by water):

আলোক এবং বাতাসের মতন জলও একপ্রকার উদ্দীপক। উদ্ভিদের প্রধান মূল সর্বদাই জলের আকর্ষণে মাটির ভিতর সঞ্চালিত হইতে হইতে যেস্থানে জল থাকে, সেইদিকে আগাইয়া যায়। নারিকেল গাছের মূল

মাটির নীচে গভীর নিম্নস্তর পর্যন্ত জলের আকর্ষণে প্রবেশ করে। জলের জন্য উদ্ভিদ্‌-মূলের এই স্ফূর্তিকে জলবৃত্তি (*Hydrotropism*) বলা হয়। উদ্ভিদ্‌-মূল জলের দিকে আবিষ্ট হইয়া আগাইয়া যায় বলিয়া জলবৃত্তি অনুসারে মূলগুলিকে জল অনুকূলবর্তী (*Positively hydrotropic*) বলা হয়।

সেইরূপ উদ্ভিদের কাণ্ড অংশ জলের সংস্পর্শকে উপেক্ষা করে এবং আলোকের দিকে সঞ্চলিত হয়, সেইজন্য জলবৃত্তি অনুযায়ী কাণ্ড অংশ-গুলিতে জল-প্রতিকূলবর্তী (*Negatively hydrotropic*) বলা হয়। কিছু অর্কিডের মূল সর্বদাই জল বা অভিকর্ষ শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া আলোক সঞ্চালিত হয় বলিয়া, অর্কিডের মূলগুলিকে অভিকর্ষ-প্রতিকূলবর্তী এবং জল-প্রতিকূলবর্তীও বলা হয়। নিম্নে জলবৃত্তির একটি সাধারণ পরীক্ষার বিবরণী দেওয়া হইল :

পরীক্ষা : একটি চালনী কাঠের গুঁড়া দিয়া ভর্তি কর। কাঠের গুঁড়ায় এমনভাবে জল ঢাল যাহাতে গুঁড়াগুলি সিক্ত হইয়া যায়। এইরূপ গুঁড়ায় ছোলা বীজ বপন কর। চালনীটির দুইদিকে সুতা দিয়া হেলান অবস্থায় একটি হুকে (*Hook*) ঝুলাইয়া রাখ। কিছুদিন পরে বীজগুলি কাঠের গুঁড়ার উপর অঙ্কুরিত হইলে উহাদের মূলের অগ্রভাগ ধীরে ধীরে গুঁড়ার ভিতর জলের অন্বেষণে প্রবেশ করিবে এবং পরে চালনীর তলাকার ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইতে দেখা যাইবে। কিন্তু মূলগুলির অগ্রভাগ ছিদ্রপথে বাহির হইবার পর পুনরায় ছিদ্র দিয়া চালনীর নিম্নদেশে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। মূলের অগ্রভাগ চালানীর ছিদ্রপথে বাহির হইবার পর জল পায় না। তখন উহা পুনরায় জলের অন্বেষণে ছিদ্রপথ দিয়া চালনীর মধ্যে প্রবেশ করে। ইহার দ্বারা মূলের অনুকূল-জলবৃত্তি প্রণালী প্রমাণিত হয়।
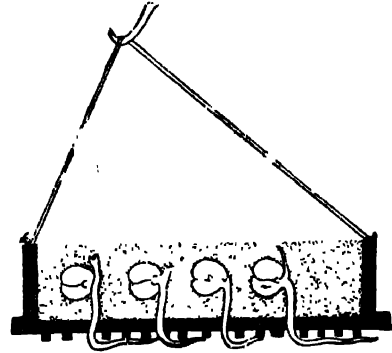
৮০নং চিত্র
জলবৃত্তির পরীক্ষা দেখান হইতেছে।

অনুশীলনী

১। বৃদ্ধি কাহাকে বলে? উহার প্রকৃত অর্থ কি? বৃদ্ধির বিভিন্ন দশাগুলির বর্ণনা কর। (Define growth. Explain the significence of the term and describe different phases of growth.)

২। বৃদ্ধির হার কাহাকে বলে? মুখ্যবৃদ্ধিকাল ও দৈনিক-বৃদ্ধিকালের বিষয় যাহা জান লিখ)। (What do you mean by the rate of growth? Write a short account about "grand period of growth" and "daily period of growth.")

৩। আলোক ও তাপ কিভাবে বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা বুঝাইয়া লিখ। (Explain how light and temperature influence the growth.)

৪। উদ্বোধক এবং উৎসেচকের মধ্যে প্রভেদ কি? ইহারা কিভাবে বৃদ্ধির সূচনা করে সে বিষয়ে যাহা জান লিখ। (How hormone differs from enzyme? Explain how these accelerate the growth)

৫। উদ্ভিদের সঞ্চালন বলিলে কি বুঝায়? আলোক, অভিকর্ষ ও জল কিভাবে উদ্ভিদের সঞ্চালন-প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে? (What do you mean by the term 'movement of plants'? How light, gravity and water play their part in the process of movement?)

প্রাণিতত্ত্ব

প্রাণিতত্ত্ব

পারিভাষিক শব্দ

(ইংরেজী-বাংলা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

Amœboid movement— অ্যামিবার মত চলন
Amino acid—অ্যামিনো বা অ্যামাইনো এসিড
Asexual—অযৌন
Anaerobic—অবাত শ্বাসক্রিয়া
Binary fission—যুগ্ম-বিভাজন
Contractile vacuole— সংকোচনশীল গহ্বর
Change of viscosity— সান্দ্রতার পরিবর্তন
Cyst – আবরণী
Cuticle—কিউটিকল
Cœlome—দেহ-গহ্বর
Daughter amœba—অ্যামিবা-সন্তান
Ectoderm—বহিঃপ্লাজম
Endoderm —অন্তঃপ্লাজম
Excretion– রেচন-প্রক্রিয়া
Epicyst – বহিঃআবরণ
Endocyst—অন্তঃআবরণ
Ectoparasite—বহিঃপরজীবী
Ectoplasm—বহিঃপ্লাজম
Food-vacuole– খাদ্য-গহ্বর
Food-cup—খাদ্য-আধার
Foam-like - ফেনার মত
Gametocyte—গ্যামেটোসাইট
Gamonts—গ্যামন্টস্
Gametocyst—গ্যামেটোসিস্ট
Hyaline Cap—হ্যালাইন ক্যাপ
Invertebrata—অমেরুদণ্ডী
Isogameta—সমাকৃতি গ্যামেট
Locomotion— চলন-প্রক্রিয়া
Multiple fission—বহু-বিভাজন
Mesocyst—মধ্য-আবরণ
Myoneme fibril— মায়ওনিম সুতা
Nucleus—নিউক্লিয়স
Nuclear membrane— নিউক্লিয়-পর্দা
Nuclear sap—নিউক্লিয়-রস
Nutrition— পুষ্টি-ক্রিয়া
Osmo-regulation—অভিস্রবণ-নিয়ন্ত্রণ
Plasmagel— প্লাজমাজেল
Plasmasol—প্লাজমাসোল
Partition wall— বিভেদ-প্রাচীর
Pseudopodia—ক্ষণপদ
Pepsin—পেপসিন
Peptone—পেপটোন
Pseudopodiospore—সিউডোপোডিওস্পোর
Pseudonavicella—ভ্রান্ত-নেভিসেলা
Respiration—শ্বসন-প্রক্রিয়া
Sporocyst—স্পোরোসিস্ট
Sporozoite—স্পোরোজয়েট
Surface-tension—পৃষ্ঠ-টান
Sperm-mother cell—মাতৃ-শুক্রকীট
Trypsin—ট্রাইপসিন
Total parasite—পূর্ণ-পরজীবী
Trophozoite—ট্রোফোজয়েট
Water-vacuole—জল-গহ্বর
Zygote—জাইগোট

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

Amœboid-nutritive muscular cell—অ্যামিবাকৃতি নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ
Basal disc—বেসাল ডিস্ক
Batteries of nematocysts—নিমাটোসিস্টের ব্যাটারী
Bud—কুঁড়ি
Barb—বার্ব
Coelanterata—একনালীদেহী বা সিলেনটেরাটা
Coelenteron—সিলেনটেরন
Cnidoblast—নিডোব্লাস্ট
Cnidocil—নিডোসিল
Cellular differentiation—কোষ-বৈশিষ্ট্য
Cross-fertilization—ইতর-গর্ভাধান
Diploblastic—দুইস্তরবিশিষ্ট কোষ
Digestion—পরিপাক
Daughter Hydra—হাইড্রা-সন্তান
Ectoderm—এক্টোডার্ম
Endoderm—এনডোডার্ম
Epidermis—বহিস্ত্বক
Epithelio muscular Cell—এপিথিলিও মাসকিউলার কোষ
Endodermal cells—এনডোডার্মের কোষসমূহ
Extra Cellular digestion—বহিঃকোষীয়-পরিপাক
Formative cell—ভিত্তিকোষ
Flagellated nutritive muscular cell—ফ্ল্যাজিলাযুক্ত নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ
Gastrovascular cavity—গ্যাস্ট্রোভাসকিউলার নালী
Glutinant—গ্লুটিন্যান্ট
Gland cell—গ্রন্থিকোষ
Hermaphrodite—উভলিঙ্গ
Hypnotoxin—হিপনোটক্সিন
Hunger movement—ক্ষুধাজনিত সঞ্চলন
Hypostome—হাইপোস্টোম
Interstitial Cell—ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ
Intercellular digestion—অন্তঃকোষীয় পরিপাক
Looping movement—হামাগুঁড়ি দিয়া চলা
Mesogleasa—মেসোগ্লিসা
Nerve cell—নার্ভকোষ বা স্নায়ুকোষ
Nutritive muscular cell—নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ
Negatively thermotropic—বিপরীতবর্তী থার্মোট্রোপিক
Ovary—ডিম্বাশয়
Oocyte—ওসাইট
Oosperm or Zygote—উস্পার্ম বা জাইগোট
Operculum—ঢাকনা বা অপারকুলাম
Penetrant—পেনিট্র্যাণ্ট
Physiological divisi›n of labour—জৈবনিক শ্রম বিভাজন
Positively thigmotropic—অনুকূলবর্তী থিগমোট্রপিক
Phototropic—আলোক উদ্দীপকের অনুভূতি বা ফটোট্রপিক
Positively phototropic—অনুকূলবর্তী ফটোট্রপিক
Polar-body—পোলার-বডি
Radially symmetrical—অরীয়রূপে প্রতিসম
Reproduction cell—জনন কোষ
Regeneration—পুনরুৎপাদন
Stinging cell—দংশনশীল কোষ
Sensory-cell—সংবেদনশীল কোষ
Somersaulting movement—ডিগবাজী দিয়া চলা

Spermatocytc—স্পার্মাটোসাইট
Sperm—শুক্রকীট
Self-fertilization—স্ব-গর্ভাধান
Tentac'e—কর্ষিকা
Testes—শুক্রাশয়
Thigmotropism—থিগমোট্রপিজম
Thermotropism—তাপ-উদ্দীপকের অনুভূতি বা থার্মোট্রপিজম
Volvent—ভলভেণ্ট

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

Annuli—অ্যানুলি
Anterior sucker—অগ্র-প্রান্তের সাকার
Anus—পায়ু-ছিদ্র
Alimentary canal—পৌষ্টিক-নালী
Alimentary system—পৌষ্টিক প্রণালী
Anterior lobe—অগ্রখণ্ড
Apical—শীর্ষখণ্ড
Atrium—অ্যাট্রিয়ম
Albumen gland—এলবুমেন গ্রন্থি
Botryodial tissue—বট্রায়োডিএল কলা
Cœlomic fluid—দেহ-গহ্বরের রস
Cerebral ganglia—মস্তিষ্কের স্নায়ুগ্রন্থি
Common oviduct—সাধারণ ডিম্বনালী
Crop—ক্রপ
Coeca—সিকা
Dorsal vessel—পৃষ্ঠদেশীয় বাহিকা
Epididymis—এপিডিডাইমিস
Ezaculatory duct—ক্ষেপণ নালী
Eye—চক্ষু
Oesophagus—গ্রাসনালী
Female gonopore—স্ত্রী-জননছিদ্র
Hirudinaria—হিরুডিনেরিয়া
Hirudinea—হিরুডিনিয়া
Hæmocœlomic—রক্তমিশ্রিত দেহরস
Intestine—অন্ত্র
Initial lobe—প্রারম্ভিক খণ্ড
Inner lobe—অন্তঃখণ্ড
Jaw—চোয়াল
Lateral vessel—পার্শ্ব-বাহিকা
Limbs—বাহু
Main lobe—মধ্যখণ্ড
Metamere—অঙ্গুরী খণ্ড
Mouth—মুখছিদ্র
Male-gonopore—পুং-জননছিদ্র
Nephridia—নেফ্রিডিয়া
Ovisacs—ডিম্বথলি
Oviduct—ডিম্বনালী
Posterior sucker—পশ্চাদ্ভাগের সাকার
Penis—পুংলিঙ্গ
Pharynx—গলবিল
Rectum—মলাশয়
Reproductive system—জননতন্ত্র
Sucker—সাকার
Skin—চর্ম বা চামড়া
Septum—প্রস্থ-প্রাচীর
Segmental receptor organ—অঙ্গুরীখণ্ডীয় সংবেদনশীল যন্ত্র
Salivary gland—লালাগ্রন্থি
Salivary papillae—লালা-প্যাপিলা
Sub-pharyngeal ganglia—নিম্নস্থ গলবিলের স্নায়ুগ্রন্থি
Testis-sac—শুক্রথলি
Vagina—বহিঃ-স্ত্রীজননযন্ত্র
Valve—কপাটিকা
Vasa-efferentia—শুক্রনালী
Vasa-defferentia—যুক্ত শুক্রনালী
Vesicle duct—ভেসিকল্ ডাক্ট্
Vasicle—থলি
Ventral nerve cord—অঙ্কদেশীয় স্নায়ুসূত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

Anus—পায়ুছিদ্র
Arthrobranch—আর্থ্রোব্রাঙ্ক
Arteries—ধমনীসমূহ
Anterior arteries—অগ্রভাগের ধমনী
Antennary—অ্যানটিনারী
Antennular artery—অ্যানটিনিউলার ধমনী
Antennal artery—অ্যানটিন্যাল ধমনী
Afferent branchial channels—অন্তর্মুখী ব্রাঙ্কিয়াল নালী
Antennular—অ্যানটিনিউলার স্নায়ু
Antennary nerve—অ্যানটিনারী স্নায়ু
Afferent—অন্তর্মুখী
Antennary gland—রেচনগ্রন্থি বা শুঁড়সংলগ্ন গ্রন্থি
Appendix masculina—এ্যাপেনডিক্স্ ম্যাসকিউলিনা
Apposition—এ্যাপোজিসন প্রতিবিম্ব
Bristle—কূর্চ বা ব্রিষ্টিল্স্
Bulb—কন্দ
Book-gill—বই-ফুলকা
Blood-capillary—রক্ত-জালিকা
Blood sinuses or Lacunae—রক্তবাহী নালী
Brain—মস্তিষ্ক
Bladder—থলি
Cephalothorax—শিরোবক্ষ
Cuticle—কৃত্তিকা
Circular plate—কৃত্তিকা-প্লেট
Comb-plate—চিরুনি প্লেট
Circulatory system—সংবহন-তন্ত্র
Coelome—দেহগহ্বর
Cardio-Pyloric—কার্ডিও-পাইলোরিক
Circulus Cephalicus—সারকুলাস সেফালিকাস
Central nervous system—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র
Circum-Œsophageal Commissures—গ্রাসনালী পরিবেষ্টিত সংযোগকারী স্নায়ু
Compound eye—যৌগিক চক্ষু
Convex—উত্তল
Corneagen—করনিয়াজেন
Cone-cell—কোন-কোষ
Epipodite—এপিপোডাইট
Efferent branchial channel—বহির্মুখী ব্রাঙ্কিয়াল নালী
Efferent—বহির্মুখী
End-sac—শেষ থলি
Excretory organ—রেচন-যন্ত্র
Excretory tubles—পাকানো রেচন নালী
Feeding and digestion—পরিপাক প্রক্রিয়া
Female gonopore—স্ত্রী-জনন ছিদ্র
Filtering chamber—ছাঁকনী যন্ত্র
Guiding ridge—পরিচালন প্লেট
Gill—ফুলকা
Gill chamber—ফুলকা প্রকোষ্ঠ
Gastric artery—পাকস্থলীর ধমনী বা গ্যাষ্ট্রিক ধমনী
Hindgut or proctodoeum—পশ্চাৎ পৌষ্টিক নালী
Hastate plate—হ্যাসটেট প্লেট
Hepatopancreatic gland—হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থি
Hepatic—যকৃৎ
Hœmocyanin—হেমোসিয়ানিন
Hœmocœl—রক্তমিশ্রিত দেহ-গহ্বর
Heart—হৃদ্‌যন্ত্র
Hepatopancreatic artery—হিপাটো-প্যানক্রিয়েটিক ধমনী
Intestine—অন্ত্র

Involuntary—অনৈচ্ছিক
Iris-sheath—আইরিস-আবরণী
Lanceolate plate—ল্যানসিওলেট প্লেট
Labyrinth—ল্যাবাইরিন্থ
Lateral duct—পার্শ্বনালী
Mesodermal growth—মধ্যত্বক্-কোষ
Median ophthalmic—মিডিয়ান অপথ্যালমিক
Mandibular—চোয়াল ধমনী
Mandibular nerve—চোয়াল স্নায়ু
Motor nerve—চেষ্টীয় স্নায়ু
Mixed nerve—মিশ্রস্নায়ু
Male gonopore—পুং-জননছিদ্র
Mosaic—মোজাইক
Nervous system—স্নায়ুতন্ত্র
Nerve ganglion—স্নায়ুগ্রন্থি
Ostia—অসটিয়া
Oesophagus—গ্রাসনালী
Optic nerve—চক্ষু স্নায়ু
Ovaries—ডিম্বাশয়
Oviduct—ডিম্বাশয় নালী
Ova—ডিম্ব
Ocelli or Ommatidia—অসিলি বা ওমাটিডিয়া
Pyloric stomach—পাইলরিক পাকস্থলী
Pyloric ceacum—পাইলোরিক সিকম
Podobranch—পোডোব্রাঙ্ক
Pleurobranch—প্লুরোব্রাঙ্ক
Plasma—রক্তরস
Pericardial sinus—পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস
Pericardium—পেরিকার্ডিয়াম
Posterior arteries—পশ্চাদ্ভাগের ধমনী
Pericardial artery—পেরিকার্ডিয়াল ধমনী
Peripheral nervous system—দেহ-পার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্র
Rectum-bulb—মলাশয়কন্দ
Rectum—মলাশয়
Renal aperture—রেচনছিদ্র
Rhabdome—র‍্যাবডোম
Retinal sheath—রেটিনাল আবরণী
Rostral artery—রসট্রাল ধমনী
System—তন্ত্র
Storage organ—সঞ্চয় যন্ত্র
Scaphognathite—স্ক্যাফোগ্নাথাইট
Section—ছেদ
Supra-intestinal artery—অন্ত্র-উপরিস্থিত ধমনী
Sternal—স্টারনাল ধমনী
Supra osophageal ganglia—উপরিস্থিত স্নায়ুগ্রন্থি
Sensory nerve—সংবেদ স্নায়ু
Sympathetic nervous system—সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র
Seminal vesicle—শুক্রসঞ্চয়ী থলি
Spermatozoa—শুক্রকীট
Spermatophores—শুক্রকীট থলি
Statocyst—ষ্টাটোসিষ্ট বা ভারসাম্য যন্ত্র
Sita—সিটা
Superposition—সুপারপোজিসন প্রতিবিম্ব
Thoracic nerve ganglia—বক্ষসংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি
Thoracic ganglionic mass—বক্ষসংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি
Transverse commissure or Post oesophageal loop—গ্রাসনালীর পশ্চাদ্দেশীয় ফাঁস
Testes—শুক্রাশয়
Ureter—গবিনী
Valve—কপাটিকা
Ventral thoracic artery—অঙ্কদেশীয় বক্ষ-সংলগ্ন ধমনী
Ventral abdominal artery—অন্তর্দেশীয় উদর-সংলগ্ন ধমনী
Ventral sinus—অঙ্কীয় নালী
Ventral nerve cord—অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Alary—অ্যালারী পেশী
Circumoesophageal commissure—
গ্রাসনালী পরিবেষ্টিত সংযোগকারী স্নায়ু
Conglobate gland—কংগ্লোবেট গ্রন্থি
Colleterial gland—কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি
Dorsal aorta—পৃষ্ঠদেশীয় ধমনী
Deutocerebrum—মধ্যমস্তিষ্ক
Ejaculatory duct—ইজাকুলেটরি ডাক্ট বা
ক্ষেপণ-নালী
Egg case—ডিম্বের আধার
Fat body—চর্বি
Genital pouch—জনন-থলি
Gonapophysis—গোনাপোফাইসিস
Leucocytes—শ্বেতকণিকা
Mesothoracic ganglia—মধ্যবক্ষসংলগ্ন
স্নায়ুগ্রন্থি
Metathoracic ganglia—পশ্চাদ্-বক্ষসংলগ্ন
স্নায়ুগ্রন্থি
Mushroom gland—ছাতা-গ্রন্থি
Post-oesophageal commissure—
গ্রাসনালীর উপরিস্থিত সংযোগকারী স্নায়ু
Prothoracic ganglia—অগ্রবক্ষসংলগ্ন
স্নায়ুগ্রন্থি
Sub-oesophageal commissure—
গ্রাসনালী পরিবেষ্টিত সংযোগকারী স্নায়ু
Tritocerebrum—পশ্চাদ্-মস্তিষ্ক
Ventral nerve cord—অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

Alimentary cannal—পৌষ্টিক নালী
Amylolytic—অ্যামাইলোলাইটিক
Amylopsim—অ্যামাইলপ্‌সিন
Anterior abdominal vein—অগ্রস্থ উদর-
দেশীয় শিরা
Auricle—অলিন্দ
Alveoli—এলভিওলাই
Aperture of the common Pulmonary
vein—সাধারণ ফুসফুসীয় শিরাছিদ্র
Auriculo-venticular aperture—
অরিকিউলো-ভেন্ট্রিকিউলার ছিদ্র
Aspiration—বাতাস-প্রবেশ
Autonomic Nervous system—স্বয়ংক্রিয়
স্নায়ুতন্ত্র
Axon—অ্যাক্সন
Anterior choroid plexus—অগ্রভাগের
করোয়েড সংযোগ
Afferent—অন্তর্মুখী
Animal pole—অ্যানিমেল পোল
Aqueous humor—জলীয় পদার্থ
Accommodation—উপযোজন ক্রিয়া
Auditory meatus—কর্ণকুহর
Ampullo—অ্যাম্পিউলো
Axial skeleton—আক্ষিক-কঙ্কাল
Apendicular skeleton—উপাঙ্গিক কঙ্কাল
Anterior Cornu—সম্মুখভাগের করস্থ
Ankle joint—গোড়ালি সন্ধি
Buccal cavity—মুখাবরব
Basophil—বেসোফিল
Brain—মস্তিষ্ক
Bider's organ—বিডার্স যন্ত্র
Blind spot—অন্ধ কেন্দ্র
Binocular vision—দূরবীন-দৃষ্টি
Balancing organ—ভারসাম্য যন্ত্র

Bristle—কূর্চ
Body of hyoid—হাওয়েডের দেহ
Cloaca—অবসারণী
Cloacal aperture—পায়ুছিদ্র
Cardiac end—কার্ডিয়েক প্রান্ত
Common bile duct—সংযুক্ত পিত্তবাহী নালী
Capillary—জালক
Cutaneous artery—চার্ম ধমনী
Conus arteriosus—কোনাস আর্টারিওসাস
Chordae tendinae—কর্ডি টেণ্ডিনি
Cavum aorticum—কেভাম অ্যাওর্টিকাম
Cavum pulmocutaneum—কেভাম পালমোকিউটেনিয়ম্
Carotid arch—ক্যারোটিড্ খিলান ধমনী
Carotid ligament—ক্যারোটিড বন্ধনী
Carotid labyrinth—ক্যারোটিড্ ল্যাবাইরিন্থ
Coeliaco-mesenteric—সিলিয়াকো মেসেণ্টারিক ধমনী
Coeliac artery—সিলিয়াক ধমনী
Central nervous system—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র
Cerebro-spinal fluid—মস্তিষ্ক-সুষুম্নারস
Cerebral hemisphere—গুরুগোলার্ধ বা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার
Corpus striatum—করপাস স্ট্রিয়াটম্
Crura Cerebri—ক্রুরা সেরিব্রি
Cerebellum—সেরিবেলম্
Central cannal or neurocoel—কেন্দ্রগহ্বর বা নিউরোসিল
Cranial nervous—করোটির স্নায়ু
Cloaca—অবসারণী
Collecting tubes—সংগৃহীত নালী
Cornea—করনিয়া
Conjunctiva—নেত্রবর্ত্ম কলা
Choroid layer—করয়েড স্তর
Cone-cell—কোন-কোষ
Converged—অভিস্যৃত
Columella—কলুমিলা
Cartillage—তরুণাস্থি
Cranium—করোটিকা
Clavicle—কণ্ঠা
Carpel—কব্জির হাড
Digestive gland—পুষ্টিগ্রন্থি
Duodenum—ডিওডিনম
Dendron—ডেনড্রন
Dorsal fissure—পৃষ্ঠনালী
Dorsal sensory root—পৃষ্ঠদেশীয় সংবেদ গোড়া
Dorsal nerve—অঙ্কীয় দেশের স্নায়ু
Eustachian aperture—ইউস্টেচিয়ান ছিদ্র
Eustachian tube—ইউস্টেচিয়ান নালী
Enzyme—উৎসেচক
Erepsin—এরিপসিন
Epigastric artery—এপিগ্যাস্ট্রিক ধমনী
External jugular—বহিঃজুগুলার
Expiration—প্রশ্বাস ত্যাগ
Eosinophil—ইওসিনোফিল
External Carotid—বহিঃস্থ ক্যারোটিড
Epiphysis—এপিফাইসিস
Endocranial gland—উদ্বোধক গ্রন্থি
Excretory system—রেচন-তন্ত্র
Excretion—নিষ্কাশন
Eye-socket—চক্ষুখোলক
Endolymph—এণ্ডোলিম্ফ
Exo-keleton—বহিঃঅস্থি
Endoskeleton—অন্তঃঅস্থি
Equilibration of water content—জলের সমতা
Fat bodies—চর্বি-সূতা

Fibrous tissue—আবরণী অন্তঃকলা
Femoral Artery—ফিমোরাল ধমনী
Facio-mandibular vein—মুখমণ্ডলের ম্যানডিবল-অঞ্চলীয় শিরা
Fibrin—ফাইব্রিন
Fibrinogen—ফাইব্রিনোজেন
Forebrain—অগ্রমস্তিষ্ক
Foramen of Monro—মনরো ছিদ্র
Fourth ventricle—চতুর্থ প্রকোষ্ঠ
Foramen magnum—মহাবিবর
Filum terminale—ফিলাম টারমিনালি
Faeces—মল
Female reproductive system—স্ত্রী-জনন-তন্ত্র
Fenestra ovalis—ফেনিস্ট্রা ওভালিস
Fibula—অনুজঙ্ঘাস্থি
Femur—উর্বাস্থি
Fertilization—নিষিক্তকরণ
Glottis—শ্বাসছিদ্র বা গ্লটিস
Gullet—গ্রাসনালী ছিদ্র
Gall-bladder—পিত্তথলি
Glycerine—গ্লিসারিন
Glucose—গ্লুকোজ
Genital artery—জনন-ধমনী
Granular—দানাপূর্ণ
Granulocytes—গ্রানুলোসাইটিস
Grey matter—মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থ অঞ্চল
Glenoid cavity—গ্লিনয়েড গহ্বর
Hepatic duct—যকৃৎনালী
Hepato pancreatic duct—যকৃৎ অগ্ন্যাশয় রসবাহিকা
Heart—হৃদ্‌যন্ত্র
Hœmoglobin—হিমোগ্লোবিন
Hepatic vein—যকৃৎশিরা
Hepatic Portal Vein—যকৃৎ পোর্টাল শিরা
Hyoid cartiliage—হাওয়েড্ তরুণাস্থি
Hibernation—শীতঘুম
Hypophysis—হাইপোফাইসিস্
Hind brain—পশ্চাদ্-মস্তিষ্ক
Humerus—প্রগণ্ডাস্থি বা হিউমারাস
Hammer-shaped—হাতুড়ির মত
Internal nares or Internal nostrill—অন্তঃনাসারন্ধ্র
Impression of the eye—চোখের ছাপ
Ilium—ইলিয়াম
Intercellular space—কোষান্তর-রন্ধ্র
Iliac artery—ইলিয়াক ধমনী
Internal respiration—অন্তঃশ্বসনকার্য
Inter-auricular septum—ইন্টার-অরিকিউলার প্রাচীর
Inspiration—নিশ্বাসগ্রহণ
Impure blood—দূষিত রক্ত
Internal carotid—অন্তঃস্থ ক্যারোটিড্
Infundibulum—ইন্‌ফানডিবুলম
Inter or aqueduct of sylvius—ইন্টার বা একুইডাক্ট অফ্ সিলভিয়াস
Iris—কণীনিকা বা আইরিস
Internal ear—অন্তঃকর্ণ
Knob—মুণ্ডি
Knee—জানুসন্ধি
Large intestine—বৃহৎ অন্ত্র
Lumen—গহ্বর
Liver—যকৃৎ
Lipolytic—লিপোলাইটিক
Lymph—লসিকা
Lymphatics—লসিকা-নালী
Lymphatic system—লসিকা সংবহনতন্ত্র
Left pulmonary vein—বামফুসফুসীয় শিরা
Lingual vein—জিহ্বাদেশীয় শিরা
Left auricle—বাম অলিন্দ

Left aortic arch—বামদিকের প্রধান ধমনী
Laryngeal artery—স্বরযন্ত্রীয় ধমনী
Lateral ventricle—পার্শ্বপ্রকোষ্ঠ
Light sensitive—আলোক সংবেদী
Legina—লেজিনা
Lower jaw—নীচেকার চোয়াল
Larva—লার্ভা
Mucus—মিউকাস
Mechanism of digestion—পরিপাক প্রণালী
Mandibular vein—ম্যানডিবল অঞ্চলীয় শিরা
Musculo-cutaneous vein—পেশী-চার্ম-শিরা
Mesenteric artery—মেসেণ্টারিক ধমনী
Mid-brain—মধ্যমস্তিষ্ক
Medulla—সুষুম্নকাণ্ড বা মেডুলা অবলংগাটা
Mixed nerve—মিশ্রস্নায়ু
Male reproductive system—পুংজননতন্ত্র
Mesorchium—মেসোরকিয়ম
Mesovarium—মেসোভারিয়ম
Monocular vision—একদৃষ্টি
Male gamete—পুং-জনন কোষ
Metamorphosis—রূপান্তর
Neurophil—নিউরোফিল
Neurone—স্নায়ুকোষ
Neurolemma—নিউরোলিমা
Nerve fibre—স্নায়ুতন্তু
Nerve ganglion—স্নায়ুগ্রন্থি
Nasal or Olfactory capsule—নাসিকানালী
Neural arch—নিউরাল খিলান
Neural canal—নিউরাল নালী
Neural spine—নিউরাল কাঁটা
Oxy-hœmoglobin—অক্সিহিমোগ্লোবিন
Occipito-vertebral artery—করোটি মেরুদণ্ডীয় ধমনী
Optic lobes or Corpora bigemina—দৃষ্টিকেন্দ্র অঞ্চল বা করপোরা বাইজিমিনা
Oviduct—ডিম্বাশয় নালী
Otolith—ওটোলিথ
Orbit—চক্ষুকোটর
Oosperm or Zygote—উস্পার্ম বা জাইগোট
Pharynx—গলবিল
Pancreas—অগ্ন্যাশয়
Pancreatic duct—অগ্ন্যাশয় নালী
Proteolytic enzyme—প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক
Pepsin—পেপসিন
Peptone—পেপটোন
Pulmonary artery—ফুসফুসীয় ধমনী
Precaval vein—সম্মুখস্থ মহাশিরা
Post caval vein—পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরা
Pelvic vein—শ্রোণী-শিরা
Pulmonary respiratiom—ফুসফুসীয় শ্বসনকার্য
Pseudopodia—ক্ষণপদ
Pericardium—পেরিকার্ডিয়াম
Parietal—প্যারাইটেল
Pulmonary vein—ফুসফুসীয় শিরা
Pure blood—শুদ্ধ রক্ত
Pulmocutaneous arch—ফুসফুসীয়-চার্ম খিলান ধমনী
Peripheral nervous system—পার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্র
Piamater—পায়ামেটার
Pylangium—পাইল্যানজিয়ম
Pallium—পেলিয়ম
Pineal body—পিনিয়াল বডি
Pitutary body—পিটুইটারী বডি
Posterior choroid plexus—পশ্চাদ্‌ভাগের করোয়েড্‌ সংযোগ

Pelvic region—শ্রোণী অঞ্চল
Pigment—রঞ্জক
Pupil—তারারন্ধ্র বা পিউপিল
Posterior chamber—পশ্চাদ্‌-বক্ষ
Perilymph—পেরিলিম্ফ
Papilla basilaris—প্যাপিলা বেসিলেরিস
Postetior cornu—পশ্চাদ্ভাগের করনু
Pelvic girdle—শ্রোণীচক্র
Phalanges—অঙ্গুলি-নলক
Red blood corpuscles or Erythrocytes—লোহিত রক্তকণিকা
Right pulmonary vein—ডান ফুসফুসীয় শিরা
Renal vein—বৃক্ক শিরা
Renal portal vein—বৃক্ক-পোর্টাল শিরা
Right aortic arch—ডানদিকের প্রধান ধমনী
Renal artery—বৃক্ক ধমনী
Retina—অক্ষিপট
Reproductive system—জননতন্ত্র
Renal opening—রেচন-ছিদ্র
Rod-cell—রক্ত-কোষ
Refracted—প্রতিসৃত
Stomach—পাকস্থলী
Small intestine—ক্ষুদ্র অন্ত্র
Sticky gland—আঠাল-গ্রন্থি
Steapsin—স্টিয়েপসিন
Sciatic artery—স্যায়াটিক ধমনী
Spleen—প্লীহা
Sinu-auricular aperture—সাইনু অরিকিউলার ছিদ্র
Sinu-auricular valve—সাইনু অরিকিউলার কপাটিকা
Synangium—সাইন্‌স্যানজিয়ম
Spiral valve—পাকানো কপাটিকা
Systemic arch—সিস্টেমিক খিলান ধমনী
Spinal cord—সুষুম্নাকাণ্ড
Subclavian artery—সাবক্লেভিয়ান ধমনী
Shoulder—স্কন্ধ
Sensory—সংবেদ স্নায়ু
Sensory fibre—সংবেদতন্ত্র
Secretion—নিঃসরণ
Seminiferous tubules—শুক্র-সৃষ্টিনালী
Sclerototic layer—শ্বেতমণ্ডল বা স্ক্লেরোটিক স্তর
Sclera—স্ক্লেরা
Suspensory ligament—আবদ্ধ তন্তু
Sensitive—সংবেদ কেন্দ্র
Sacculus—স্যাকিউলাস
Semi-circular canal—অর্ধ-বৃত্তাকার নালী
Skeleton system—অস্থি-ব্যবস্থা
Skull—করোটি
Supra-scapula—পুরঃ-অংসফলক
Sternum—উরঃ-ফলক
Shank—জানুতল
Tongue—জিহ্বা
Tunica adventitia—টিউনিকা এ্যাডভেন্টিসিয়া
Tunica-media—টিউনিকা মিডিয়া
Tunica-interna—টিউনিকা ইন্টারনা
Thrombocytes—থ্রম্বোসাইট্‌স
Trancus-arteriosus—ট্রাঙ্কাস-আর্টারিওসাস
Trabeculae—ট্রাবিকিউলি
Thalamus—থ্যালামাস্‌
Third ventricle—তৃতীয় প্রকোষ্ঠ
Testes—শুক্রাশয়
Tympanum—কর্ণপটহ
Thigh—জঙ্ঘা
Tibia fibula—জঙ্ঘাস্থি-অনুজঙ্ঘাস্থি

Tibia—জঙ্ঘাস্থি

Tadpole—ব্যাঙাচি

Urinary bladder—রেচন-থলি বা মূত্রথলি বা মূত্রাশয়

Unstable—অস্থিতিস্থাপক

Urinogenital system—রেচন-জননতন্ত্র

Ureter—গবিনী

Urinogenital duct—রেচন-জনন নালী

Utriculus—ইউট্রিকিউলাস

Upper jaw—উপরের চোয়াল

Urostyle—ইউরোস্টাইল

Viceral—ভিসারাল

Valve—কপাটিকা

Vascular membrane—সংবহন-তন্ত্র

Vertebrae—কশেরুকা

Ventral motor root—অঙ্কীয় দেশের চেষ্টীয় গোড়া

Ventricle—নিলয়

Vasa-efferentia—ভাসা-এফারেনসিয়া

Vasa-defferentia—ভাসা-ডেফারেনসিয়া

Vegetative pole—ভেজিটেটিভ-পোল

Vitellene membrane—ভিটেলিন পর্দা

Vitreous humor—সান্দ্র পদার্থ

Vertically—উল্লম্বভাবে

Water-molecule—জল-অণু

White blood corpuscles or Leucocytes—শ্বেত-রক্তকণিকা

Xiphisternum—জাইফিস্টারনাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

অমেরুদণ্ডী (Invertebrata)

অ্যামিবা প্রোটিয়াস (Amoeba proteus)

আবাস ও স্বভাব (Habit and habitat)

অ্যামিবা এককোষী প্রাণী। জীবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহারাও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পরিপাক করে এবং ইহাদেরও শ্বসন, চলন, রক্ত-সংবহন, এমনকি প্রজনন-প্রক্রিয়াও আছে। আমাদের যেমন প্রতিটি তন্ত্র নিখুঁতভাবে এক একটি নির্দিষ্ট কার্য সমাধা করে এবং যেমন প্রতিটি তন্ত্র পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায় আমাদের দেহের সজীবতা রক্ষা করে, তেমনি অ্যামিবার দেহ এককোষবিশিষ্ট হইলেও এই একটিমাত্র কোষে উহার সজীবতার জন্য প্রতিটি কার্য সম্পাদিত হয়। ইহাই অ্যামিবার জীবন-বৃত্তান্তের বৈশিষ্ট্য এবং ইহা অতীব চমকপ্রদ ও আশ্চর্যজনক।

অ্যামিবা আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া পর্বের অন্তর্ভুক্ত সারকোডিনা শ্রেণীর অন্তর্গত বহুপ্রকার প্রাণীদের মধ্যে একটি। প্রায় সর্বত্রই অ্যামিবার আবাস। পুষ্করিণীর জলে ও উহার তলাকার পাঁকে, নোংরা নর্দমায়, নরম মাটিতে, পচা নরম মাটিতে, ঝরে-পড়া পাতার উপর এবং ইহা ছাড়া খাল, বিল, ডোবা, নালা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর অ্যামিবা দেখা যায়। মাটির সবুজ শ্যাওলার উপর বা জলজ উদ্ভিদের পাতার উপর চলমান অবস্থায়ও ইহাদের দেখা যায়। ইহা অ্যামিবার স্বাভাবিক পরিবেশ। এই পরিবেশে সাধারণতঃ **অ্যামিবা প্রোটিয়াস** (*Amoeba proteus*) নামক জলের অ্যামিবা সহজেই পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে প্রসারিত অবস্থায় প্রাণীটিকে এক ইঞ্চির শতাংশের মত দেখা যায় এবং খালি চোখে প্রাণীটিকে মারিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে খড়ির অতিক্ষুদ্র চূর্ণের মত দেখায়। ইহাদের কোনও নির্দিষ্ট আকার নাই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা একটি জীবিত অ্যামিবা পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার দেহের একদিক হইতে সর্বদাই সূক্ষ্ম অঙ্গুলির মত **ক্ষণপদ** (*Pseudopodia* ; sing = *Pseudopodium*) বাহির হয় এবং দেহের অন্যদিকের ক্ষণপদগুলি দেহের ভিতরে মিলাইয়া যায়। সুতরাং অ্যামিবা কখনই কোন প্রকার স্থায়ী বা নির্দিষ্ট

আকার ধারণ করে না। ইহাদের এইপ্রকার ক্ষণে ক্ষণে রূপ-পরিবর্তনের জন্য গ্রীকদিগের দেবতা "প্রোটিয়সের" নামানুসারে ইহার প্রজাতির নাম প্রোটিয়স দেওয়া হইয়াছে। কথিত আছে, গ্রীকদেবতা প্রোটিয়স নাকি ইচ্ছানুযায়ী নিজ রূপ পরিবর্তন করিতে পারিতেন। নিম্নে অ্যামিবার কোষরূপ দেহের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা করা হইতেছে।

দেহ (Cell-body) :

অ্যামিবার চারিধারে অথবা অ্যামিবাকে বেষ্টন করিয়া এক অতি সূক্ষ্ম, সজীব, ভেদ্য পর্দা থাকে। এই পর্দাটিকে **প্লাজমালিমা** (*Plasmalemma*) বলা হয়। ইহা খুবই সঙ্কোচন-প্রসারণশীল। শুধু ইহাই নহে, পর্দাটি ভেদ্য হওয়ায় কোষের বাহির হইতে ভিতরে এবং কোষের ভিতর হইতে বাহিরে জলমিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা যাতায়াত করিতে পারে। প্লাজমালিমা এই রাসায়নিক পদার্থগুলির যাতায়াতকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা অত্যন্ত নরম এবং চটচটে। প্লাজমালিমার ঠিক নিম্নে সাইটোপ্লাজমের বাহিরের অংশটি স্বচ্ছ এবং এই অঞ্চলের ঘনত্ব বেশী হওয়ায় ইহার মধ্যে কোন প্রকার কঠিন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাইটোপ্লাজমের এই বাহিরের অংশটিকে **বহিঃপ্লাজম** (*Ectoplasm*) বলা হয়। ইহার ভিতরের অংশটিকে **অন্তঃপ্লাজম** (*Endoplasm*) বলা হয় এবং এই অঞ্চলকে আবার সাইটোপ্লাজমের ঘনত্ব অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অন্তঃপ্লাজমের বাহিরের অংশটি অর্ধস্বচ্ছ এবং জেলীর মত থল্‌থলে। এই অংশকে সেইজন্য **প্লাজমাজেল** (*Plasmagel*) বলা হয়। অন্তঃপ্লাজমের ভিতরের অংশটি বেশ তরল এবং প্লাজমাজেলের ঘনত্বের চেয়ে ইহার ঘনত্ব অনেক কম। সেইজন্য এই অঞ্চলে সাইটোপ্লাজমের গতি সুস্পষ্টরূপে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়। এই অঞ্চলকে ইহার তরলতার জন্য **প্লাজমাসোল** (*Plasmasol*) নামে অভিহিত করা হয়। প্লাজমাসোলের মধ্যে নানাপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্লাজমাসোলের ভিতরের প্রধান পদার্থটি হইতেছে কোষের **নিউক্লিয়স** (*Nucleus*)। ইহার আকার কমলালেবুর মত উত্তর ও দক্ষিণে চাপা। চলমান সজীব অ্যামিবার নিউক্লিয়স দেখা অতীব কষ্টকর। কিন্তু রঙ দিয়া অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নিউক্লিয়সটিকে

অতি সূক্ষ্ম নিউক্লিয় পর্দা বেষ্টন করিয়া থাকে। এই অতি সূক্ষ্ম নিউক্লিয় পদার্থটিও (*nuclear membrane*) রঙ ধারণ করে। নিউক্লিয়প্লাজমের
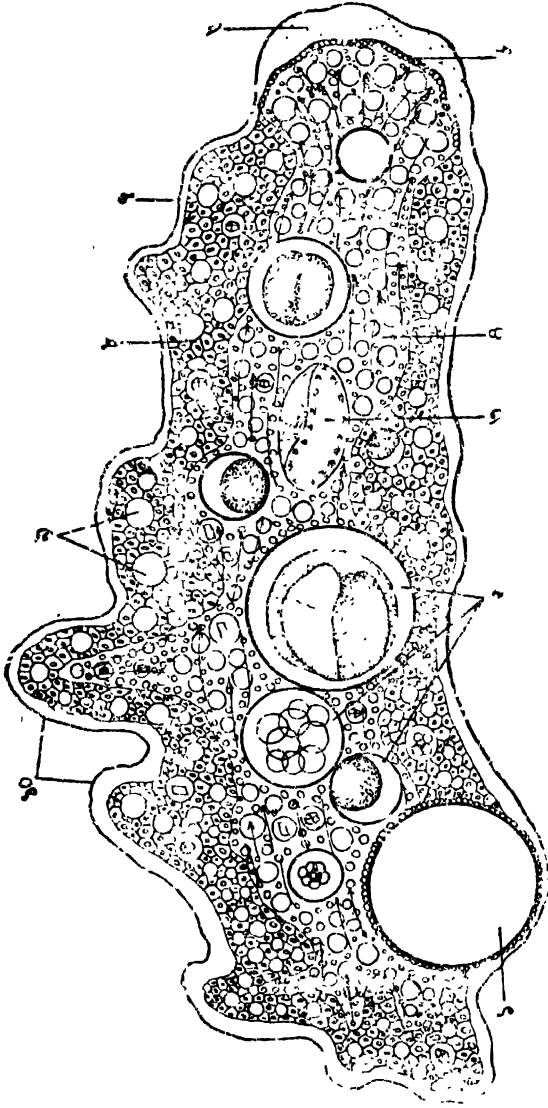
১নং চিত্র

অ্যামিবার দেহের বিবিধ পদার্থ, স্তর ও গহ্বর দেখান হইতেছে।

১, সংকোচনশীল গহ্বর (Contractile vacuole); ২, খাদ্য-গহ্বর (food vacuole); ৩, নিউক্লিয়; ৪, প্লাজমাসোল; ৫, প্লাজমাজেলের স্তর;, ৬, হ্যালাইন ক্যাপ; ৭, প্লাজমালিমা; ৮, প্লাজমাজেল; ৯, জল-গহ্বর (water vacuole); ১০, ক্ষণপদ।

মধ্যে ক্রোমোটিন জালিকার (chromatin network) অস্তিত্ব স্পষ্টভাবেই

দেখা যায়। প্লাজমাসোলের মধ্যে একটি বেশ বড় বুদ্‌বুদের মত গহ্বর দেখা যায়। ইহা আকারে গোলাকার এবং ইহার বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার মত। প্রথমে এই গহ্বরটি অতি ক্ষুদ্ররূপে সৃষ্ট হয় এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সাইটোপ্লাজমের প্রবাহের সহিত ঘুরিতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে নিজ আকারেরও বৃদ্ধি ঘটায়। এই গহ্বরটিকে **সংকোচনশীল গহ্বর** (*Contractile vacuole*) বলা হয়। সংকোচনশীল গহ্বর যখন বৃহৎ আকার ধারণ করে, তখন ইহা ধীরে ধীরে বহিঃপ্লাজমের দিকে সরিয়া যায় এবং কোষের কোষ-প্রাচীর না থাকায় উহা হঠাৎ সংকোচনের ফলে ফাটিয়া যায়। গহ্বরের ভিতরের জলীয় পদার্থগুলি এইরূপ কোষের ভিতর হইতে কোষের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। সংকোচনশীল গহ্বর ব্যতীত আরও দুই প্রকারের গহ্বর প্লাজমাসোলের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি গহ্বরের ভিতর কঠিন পদার্থ থাকে। ইহাদের **খাদ্য-গহ্বর** (*Food-vacuole*) বলা হয়। রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত জলের মধ্যে কঠিন খাদ্যগুলি নিমগ্ন অবস্থায় থাকে। খাদ্য-গহ্বরই অ্যামিবার সমগ্র পৌষ্টিক-তন্ত্র। প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ গহ্বরও অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে থাকে। এইরূপ গহ্বরের মধ্যে কঠিন পদার্থ থাকে না। ইহাদের **জলগহ্বর** (*Water vacuole*) বলা হয়। সংকোচনশীল গহ্বরের মত ইহাদের আকার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় না। ইহা ব্যতীত অন্তঃপ্লাজমে তৈলবিন্দু, ধাতব **কেলাস পদার্থ** প্রভৃতি নানাপ্রকার সঞ্চিত দ্রব্য পাওয়া যায়।

অ্যামিবার দেহের চারিপাশ হইতে সরু সরু অঙ্গুলির মত ক্ষণপদ বাহির হইতে দেখা যায়। ক্ষণপদগুলি দরকার না হইলে ধীরে ধীরে দেহের মধ্যে মিশিয়া যায়। সুতরাং ক্ষণপদগুলি অস্থায়ী অঙ্গ।

অ্যামিবার দেহের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা (Function of the various structures of Amoeba):

(i) প্লাজমালিমা প্রোটোপ্লাজমের চারিপাশ বেষ্টন করিয়া উহাকে রক্ষা করে। ইহা ভেদ্য হওয়ায় অক্সিজেন, জল ও কার্বনডায়কসাইড অনায়াসে অ্যামিবার ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে অ্যামিবার কোষের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। প্লাজমালিমা চটচটে ও সংকোচন-প্রসারণশীল হওয়ায় অ্যামিবার ক্ষণপদ সৃষ্টি-প্রণালীকে সাহায্য করে। (ii) বহিঃপ্লাজম অ্যামিবার ভিতরের অন্তঃপ্লাজমকে রক্ষা করে। (iii) অন্তঃপ্লাজমের ভিতরে অ্যামিবার

প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি থাকে। ইহার মধ্যে নিউক্লিয়স, সংকোচনশীল গহ্বর, খাদ্য-গহ্বর, এবং বিবিধ সঞ্চিত পদার্থ থাকে। অন্তঃপ্লাজম হইতেই অ্যামিবার ক্ষণপদগুলির সৃষ্টি হয়। (iv) নিউক্লিয়স অ্যামিবার সকল ক্রিয়াই নিয়ন্ত্রণ করে। প্রজনন-প্রক্রিয়ায় ইহার বিভাগ ও কার্য অ্যামিবার বংশবৃদ্ধির প্রধান সহায়। (v) সংকোচনশীল গহ্বর শ্বাস-ক্রিয়া এবং প্রধানতঃ অভিস্রবণ ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া অ্যামিবার দেহ হইতে অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন করে। (vi) খাদ্য গহ্বরগুলি খাদ্য পরিপাক করে এবং খাদ্যসার প্রোটোপ্লাজমে পরিণত হয়। (vii) জল-গহ্বরগুলি সংকোচনশীল গহ্বরকে জল-নিষ্কাশনে সাহায্য করে এবং প্লাজেল অংশকে প্লাজমাসোলে পরিণত করিবার সময় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। (viii) প্লাজমাসোলের বিবিধ কোষগুলি অ্যামিবাকে প্রয়োজনমত তরল ও সরল খাদ্যে পরিণত করিয়া উহার সজীবতা রক্ষা করে। (ix) ক্ষণপদ-গুলির দ্বারা অ্যামিবা চলাফেরা করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা খাদ্য সংগ্রহও করিতে পারে। ক্ষণপদগুলি অতিরিক্ত সংবেদনশীল হওয়ায় উহা বিপদ হইতে অ্যামিবাকে রক্ষা করে।

চলন-প্রক্রিয়া
(Locomotion)

অ্যামিবার চলন-প্রক্রিয়া চমকপ্রদ এবং আদিমতম। ইহারা ক্ষণপদের সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলাফেরা করে। এই প্রকার চলন-প্রণালী মানবদেহের শ্বেত-রক্তকণায় দেখা যায়। অ্যামিবার চলন-প্রক্রিয়া এককোষী শৈবালেও দেখা যায়। এই প্রকার চলন-প্রক্রিয়াকে **অ্যামিবার মত চলন** (*Amœboid movement*) বলা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিম্নে অ্যামিবার চলন যেমন সহজ ও সুন্দর দেখায়, প্রকৃতপক্ষে তাহা সেরূপ সহজ মোটেই নয়। ক্ষণপদ দেহের যে কোন স্থান হইতে বাহির হয় এবং সাধারণতঃ ছোট বড় নানা ক্ষণপদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষণপদটি চলনকার্যে ব্যবহৃত হয়। অ্যামিবার যেদিক হইতে ক্ষণপদ বাহির হইতে আরম্ভ করে, উহার ঠিক বিপরীত-দিকের ক্ষণপদগুলি ধীরে ধীরে দেহের সহিত মিশিয়া যায়। বৃহত্তম ক্ষণপদটি যেদিকে ধাবিত হয়, অ্যামিবা সেইদিকেই আগাইয়া যায়। কিন্তু সোজাভাবে অ্যামিবার চলন হয় না। বৃহত্তম ক্ষণপদটি ধাবিত হইবার

পর উহার দুইপাশ হইতে নূতন নূতন ক্ষণপদের সৃষ্টি হয়। নূতন ক্ষণপদগুলি অ্যামিবাকে বাঁকাভাবে আগাইয়া দেয়। আবার অ্যামিবা সামনের দিকে কিছুটা অগ্রসর হইবার পর পুনরায় বাঁকিয়া যায়। কিভাবে ক্ষণপদ অ্যামিবার দেহ হইতে বাহির হয়, সে বিষয়ে বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রাণিবিদ্‌গণ গবেষণা করিয়া বিবিধ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রথম মতবাদটিকে "পৃষ্ঠ-টান" (*Surface tension*) নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের মতে অ্যামিবা প্রকৃতপক্ষে তরল প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ গোলাকার জীব। অ্যামিবা সজীব হওয়ায় ইহার সাইটোপ্লাজমের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন হইলেই উহা বিবিধ ঘনত্বযুক্ত
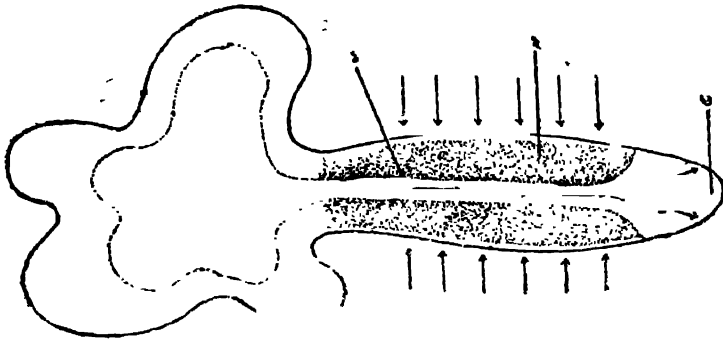
২নং চিত্র

অ্যামিবার রেখাচিত্রের দ্বারা উহার চলন-পদ্ধতির সল-জেল মতবাদ (Sol-Gel theory) ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

১, প্লাজমাসোলের স্রোত; ২, বহিঃস্তরীভূত প্লাজমাজেল; ৩, হ্যালাইন ক্যাপ।

স্তরে বিভেদিত হয়। সুতরাং তখন আর অ্যামিবার আকার গোলাকার থাকে না এবং সাইটোপ্লাজমের কম ঘনত্বযুক্ত স্তরগুলি স্তরের সমতা রক্ষা করিবার জন্য উহাদের মধ্যে একটি টানের সূত্রপাত হয়। তখন স্তরগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ধাবিত হইয়া ক্ষণপদের সৃষ্টি করে। *Berthold, Butschli, Verworn* এবং *Rhumbler* প্রভৃতি প্রাণিবিদ্‌গণ এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এই মতবাদের মূল কথা সপ্রমাণ করেন। কিন্তু অ্যামিবা পারদের মত রাসায়নিক জড় পদার্থ নহে। আবার পৃষ্ঠ-টানে পারদ-বিন্দু যেদিকে গমন করে, তার ঠিক বিপরীত দিকে অ্যামিবার গতিস্রোত দেখা যায়। সর্বোপরি অ্যামিবা তরল নহে।

ইহা থকৃথকে জেলীর মত এবং ইহার শক্তিও বেশী। দেখা গিয়াছে একটি প্যারামিসিয়মকে ইহারা ক্ষণপদের সাহায্যে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারে। সুতরাং "পৃষ্ঠ-টান" মতবাদ অ্যামিবার দেহ হইতে ক্ষণপদ সৃষ্টির কারণ মোটেই নহে।

দ্বিতীয় মতবাদটি সর্বজন-সমর্থিত। ইহাকে **সান্দ্রতার পরিবর্তন** (*Change of viscosity*) বা **সল-জেল** (*Sol Gel*) মতবাদ বলা হয়।

Human, *Patin* এবং *Mast* প্রভৃতি প্রাণিবিদ্‌গণ এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক। ইহারা বলেন, প্রথমে প্লাজমাজেলের (*Plasmagel*) কোন এক বিশেষ স্থানে সাইটোপ্লাজমের বিপাকীয় কার্যের জন্য অ্যাসিড নির্গত হইয়া তথায় জমা হয়। ইহার ফলে বেশী ঘনত্বযুক্ত প্লাজমাজেল স্থানটি তরল হইয়া প্লাজমাসোলে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় জল-গহ্বরের জলও সদ্য পরিবর্তিত প্লাজমাসোল অংশে মিলিত হইয়া উহাকে আরও তরল করে। এই তরল সাইটোপ্লাজমের অংশ ভিতর হইতে প্লাজমালিমা পর্দায় চাপ দেয়। ইহাতে প্লাজমালিমা স্বভাব অনুযায়ী প্রসারিত হয়। প্লাজমালিমা প্রসারিত হইলে তরল সাইটোপ্লাজম অংশটি পথ পাইয়া, প্রসারিত প্লাজমালিমার দিকে ধাবিত হয় এবং একটি ক্ষুদ্র ক্ষণপদের সৃষ্টি করে। তরল সাইটোপ্লাজমের চাপ ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে এবং ক্ষণপদটিও সেইরূপ বৃদ্ধিলাভ করে। অ্যামিবার যেদিকে ক্ষণপদটির সৃষ্টি হইয়াছে, উহার বিপরীত দিকের ক্ষণপদগুলি ধীরে ধীরে দেহের সহিত মিশিয়া যায়। ক্ষণপদের চারিধারে বহিঃপ্লাজম স্বভাবতঃ সংকোচনশীল হওয়ায়, ইহার সংকোচন নলাকার ক্ষণপদটি আরও সরু হইয়া গিয়া লম্বা হইয়া যায়। কিন্তু নলাকার ক্ষণপদের ভিতর দিয়া উপরোক্ত সংকোচনের চাপে তরল সাইটোপ্লাজম (যাহাকে আমরা প্লাজমাসোল বলি) নালিকার ন্যায় আরও প্রবাহিত হইয়া শেষ ক্ষণপদের শীর্ষাগ্রে প্লাজমালিমার সংস্পর্শে আসিয়া ক্ষণপদের মুখের চারিপাশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার দ্বারা ক্ষণপদের মুখের বহিঃপ্লাজমও তরল সাইটোপ্লাজমে বা প্লাজমাসোলে পরিণত হয়। সুতরাং ক্ষণপদের শীর্ষাগ্রে আর থকৃথকে জেলীয় মত পদার্থ থাকে না; ইহা তখন সাইটোপ্লাজমে পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষণপদের শীর্ষাগ্রের নিম্নে, উহার দুইপাশের বহিঃপ্লাজম অংশটি পূর্ব-অবস্থার মত থকৃথকে জেলীতে পরিণত হয়। ক্ষণপদের তরল শীর্ষাগ্রকে **হ্যালাইন ক্যাপ** (*Hyaline cap*) বলা হয়। এইরূপে একটি ক্ষণপদ পূর্ণতা লাভ করে।

প্লাজমাজেলের প্রথমে প্লাজমাসোলে পরিবর্তন এবং পরে ক্ষণপদের পার্শ্বস্থ প্লাজমাসোল-স্তর পুনরায় প্লাজমাজেলে পরিণত করিয়া ক্ষণপদ সৃষ্টির কারণ ঘটায়।

রেচন প্রক্রিয়া

(Excretion)

খাদ্য পরিপাকের পর খাদ্যের কঠিন অংশগুলি অ্যামিবার স্থান ত্যাগ করিবার সময় দেহ হইতে উহার যে-কোন স্থান ভেদ করিয়া বাহিরে অপসারিত হয়। খাদ্য-দহনের সময় কার্বন-ডায়কসাইড এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত যে রাসায়নিক দ্রব্য নির্গত হয়, তাহা অভিস্রবণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা অ্যামিবা দেহ হইতে অপসারিত করে। অ্যামিবার সাইটোপ্লাজমে কার্বন ডায়কসাইডের ভাগ উহার পারিপার্শ্বিক জলে যে পরিমাণে থাকে, তাহার চেয়ে বেশী হওয়ায়, অভিস্রবণ-প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় এবং কার্বন-ডায়কসাইড অ্যামিবার দেহ হইতে অপসারিত হয়। নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থও এইরূপ অভিস্রবণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহ হইতে অপসারিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, সংকোচনশীল গহ্বর কিছু পরিমাণে রেচন পদার্থ অ্যামিবার দেহ হইতে অপসারিত করে।

পুষ্টিক্রিয়া

(Nutrition)

অ্যামিবা খাদ্য হিসাবে এককোষবিশিষ্ট উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে **অসিলেরিয়া** (*Oscillaria*), **ডায়াটম** (*Diatom*) ও **নস্টাক** (*Nostac*) প্রভৃতি শৈবাল অ্যামিবার প্রধান খাদ্য। অ্যামিবা সজীব ও এবং কঠিন খাদ্য গ্রহণ করে বলিয়া ইহার খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতিকে **হলোজোইক** (*Holozoic*) বলা হয়। ইহাদের মুখ বলিয়া কোন অঙ্গ নাই। খাদ্যবস্তুর সন্ধান পাইলে বা উহার সংস্পর্শে আসিলে অ্যামিবা ধীরে ধীরে দুইটি ক্ষণপদ দেহ হইতে খাদ্যবস্তুর দিকে বাহির করে। এই দুইটি ক্ষণপদ খুবই সূক্ষ্ম ও লম্বা হয় এবং ইহারা প্রচুর জলসহ খাদ্যবস্তুটিকে

বেষ্টন করিয়া লয়। ক্ষণপদ দুইটি এমনভাবে খাদ্যের দুই পাশ দিয়া ঘিরিয়া থাকে যাহার দ্বারা একটি **খাদ্যআধারের** (*Food cup*) সৃষ্টি হয়। এখন খাদ্য-আধারের দুই ধার বা ক্ষণপদের অগ্রাংশ দুইটি, পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, প্রচুর জলসহ খাদ্যবস্তুটিকে দেহের ভিতর আবদ্ধ করে। এই সময় অ্যামিবার অন্যান্য ক্ষণপদগুলি প্রায় লুপ্ত হইতে দেখা যায়। এখন খাদ্যবস্তুটি জলে নিমগ্ন হইয়া অ্যামিবার কোষের ভিতর ধীরে ধীরে ক্ষণপদের চাপে প্রবেশ করে এবং জলসহ খাদ্যবস্তুটি একটি
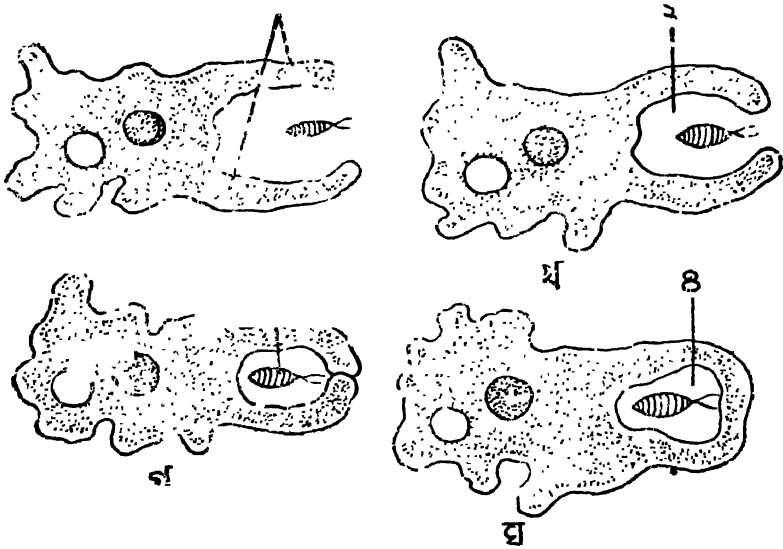
৩নং চিত্র

অ্যামিবার খাদ্য-গ্রহণ পদ্ধতি দেখান হইতেছে।

ক, কীটের দুই পাশ দিয়া সাঁড়াশির মত ক্ষণপদের সৃষ্টি ; খ, ক্ষণপদের অগ্রাংশ দুইটি মিলিত হইবার চেষ্টা ; গ, ক্ষণপদ দুইটি কীটটিকে বেষ্টন করিয়াছে। ঘ, অ্যামিবা খাদ্য-গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে।

১, ক্ষণপদ ; ২, জলমগ্ন কীট ; ৩, কীট ; ৪, খাদ্য-গহ্বরের মধ্যে কীট।

খাদ্যগহ্বরে (*Food vacuole*) পরিণত হয়। ছোট ছোট খাদ্যবস্তু অ্যামিবা দুই বা চারি মিনিটে নিজের দেহের ভিতর প্রবেশ করাইতে পারে, কিন্তু খাদ্য হজম করাইবার জন্য কতটা সময় দরকার, তাহা খাদ্যের আকার ও প্রকারের উপর নির্ভর করে।

ক্ষণপদের সংকোচনের চাপে খাদ্যগহ্বরটি ধীরে ধীরে অ্যামিবার

অন্তঃপ্লাজমের ভিতর প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে। এই অঞ্চলেই খাদ্যটি পরিপাক হয়। প্রথমে অ্যামিবার সাইটোপ্লাজম হইতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নির্গত হয় এবং উহা খাদ্য-গহ্বরে জলের সহিত মিলিত হইয়া উহাকে অম্লজাতীয় করিয়া দেয়। এই অম্লজাতীয় পরিবেশে খাদ্য ধীরে ধীরে পরিপাক হয়।

কিন্তু অম্ল খাদ্যবস্তুকে পরিপাক করে না। সাইটোপ্লাজম হইতে নির্গত অম্ল সজীব খাদ্যবস্তুকে মারিয়া দেয় এবং খাদ্যবস্তুটি অম্লপ্রয়োগে ফুলিয়া উঠে। ইহার পর সাইটোপ্লাজম হইতে প্রোটিন পরিপাকের জন্য **পেপসিন** (*Pepsin*) জাতীয় উৎসেচক নিঃসৃত হইয়া খাদ্য-গহ্বরের জলে মিলিত হয়। পেপসিন উৎসেচক কেবলমাত্র অম্লজাতীয় পরিবেশে সক্রিয় হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে পেপসিন অ্যামিবার খাদ্যবস্তুর প্রোটিন অংশটুকু **আমাইনো অ্যাসিডে** (*Amino acid*) পরিণত করে। অ্যামাইনো অ্যাসিড তরল ও সরল প্রোটিন-জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। খাদ্যবস্তুর স্নেহপদার্থগুলি অ্যাসিড প্রয়োগে গলিয়া যায়। ইহার পর অ্যামিবার সাইটোপ্লাজম হইতে ক্ষার নির্গত হয় এবং উহা খাদ্যগহ্বরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং খাদ্যগহ্বরের জলকে ক্ষারজাতীয় করিয়া দেয়। এখন খাদ্যগহ্বরের নিকটস্থ সাইটোপ্লাজম্ হইতে **ট্রাইপেসিন** (*Trypsin*)-জাতীয় উৎসেচক নির্গত হয় এবং ইহা ক্ষার-জাতীয় পরিবেশে অবশিষ্ট প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যবস্তুকে প্রথমে **পেপটোন** (*Peptone*), পরে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। স্নেহসার পদার্থগুলি **ফ্যাটি অ্যাসিডে** (*Fatty acid*) রূপান্তরিত হয়। প্রাণিবিদগণের মতে অ্যামিবা শর্করা পরিপাক করিতে পারে না। অতি মৃদু "কডলিভার অয়েল" অ্যামিবার দেহে প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা সহজেই পরিপাক হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, খাদ্য-গহ্বরটি অ্যামিবার অন্তঃপ্লাজমের ভিতর ঘুরিতে থাকে। তরল ও সরল খাদ্যরস এখন খাদ্যগহ্বর হইতে ধীরে ধীরে গহ্বরের প্লাজমালিমা পর্দার ভিতর দিয়া সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। ইহাতে খাদ্যগহ্বরের বৃত্তাকার পরিধি-রেখা ধীরে ধীরে অসমান দেখায় এবং আকারে ছোট হইয়া যায়। এইভাবে খাদ্যগহ্বরের তরল খাদ্যসার সম্পূর্ণভাবে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং নূতন সাইটোপ্লাজমে পরিণত হয়। অ্যামিবার দেহের ভিতর সেইজন্য নানা আকারের খাদ্যগহ্বর দেখা যায়। খাদ্যগহ্বর খাদ্যের মধ্যে

যে অংশগুলি কঠিন থাকে, তাহা হয় না; সেগুলি অ্যামিবা রেচন-প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহ হইতে অপসারিত করে। সুতরাং এক-একটি খাদ্য-গহ্বর অ্যামিবার পৌষ্টিক তন্ত্রের কাজ করে।

শ্বাস-প্রক্রিয়া

(Respiration)

অ্যামিবার শ্বাস-প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ কোন যন্ত্র নাই। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন অ্যামিবার দেহের ভিতর প্রবেশ করে। দ্রবীভূত অক্সিজেন অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্লাজমালিমা-ভেদ্য পর্দার ভিতর দিয়া প্রবেশ করে। দ্রবীভূত অক্সিজেন অ্যামিবার সাইটোপ্লাজমে খুবই কম থাকে এবং অ্যামিবার দেহের বাহিরে জলের ভিতর দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকায়, উপরোক্ত অন্তঃঅভিস্রবণ কার্যকরী হয়। দ্রবীভূত অক্সিজেন পুষ্টি-ক্রিয়ার দ্বারা অর্জিত খাদ্যরসকে দহন করিয়া উহার ভিতর হইতে স্থিরশক্তিকে গতিশক্তিরূপে নির্গত করে। ইহাই প্রকৃত শ্বাস-ক্রিয়া। খাদ্যসার হইতে শক্তি নির্গত করিবার সময় দ্রবীভূত কার্বন-ডায়ক্সাইড এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থও নির্গত হয়। দ্রবীভূত কার্বন-ডাইক্সাইডের পরিমাণ অ্যামিবার সাইটোপ্লাজমে বেশী হইয়া যায় এবং অ্যামিবার দেহের বাহিরের জলে উহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, প্লাজমালিমা-ভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়া বহিঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইহার দ্বারা ধীরে ধীরে অ্যামিবার দেহ হইতে দ্রবীভূত কার্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাস বাহির হইয়া যায়। দেখা গিয়াছে সংকোচনশীল গহ্বর দ্রবীভূত কার্বন-ডাইক্সাইড নিষ্কাশনে অংশ গ্রহণ করে না, কেবলমাত্র নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থগুলি ইহার সাহায্যে বোধ হয় নিষ্কাশিত হয়।

অভিস্রবণ-নিয়ন্ত্রণ

(Osmo Regulation)

সংকোচনশীল গহ্বরের সৃষ্টি ও ধ্বংসের উপর অ্যামিবার সজীবতা সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভর করে। প্রথমে অ্যামিবার সাইটোপ্লাজমে বিন্দু বিন্দু স্বচ্ছ জলীয় পদার্থপূর্ণ গহ্বর দেখা যায়। পরে গহ্বরগুলি একত্রিত হইয়া একটি অপেক্ষাকৃত বড় গহ্বরে পরিণত হয়। এই স্বচ্ছ জলপূর্ণ গহ্বরটি ধীরে ধীরে ছোট

ছোট জলবিন্দু সহযোগে আকারে বড় হইতে থাকে। যখন উহা বেশ বড় হইয়া যায় তখন গহ্বরটি ধীরে ধীরে অ্যামিবার বহিঃপ্লাজমের দিকে ধাবিত হয়। বহিঃপ্লাজমের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর উহা হঠাৎ-সংকোচনের দ্বারা ধ্বংস হইয়া যায় এবং উহার ভিতরকার জল অ্যামিবার দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই জলপূর্ণ বৃহৎ গহ্বরটিকে **সংকোচনশীল গহ্বর** (*Contractile vacuole*) বলে। একটি সংকোচনশীল গহ্বর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেই অ্যামিবার দেহের ভিতর দ্বিতীয় সংকোচনশীল গহ্বর উপরোক্ত প্রণালীতে সৃষ্টি হয়। সর্ব অবস্থায় অ্যামিবার দেহের ভিতর একটিমাত্র সংকোচনশীল গহ্বর দেখা যায়। প্রমাণিত হইয়াছে যে, অ্যামিবার সংকোচনশীল গহ্বরের জলে কোন রেচন পদার্থ মিশ্রিত থাকে না। সুতরাং ইহা অ্যামিবার দেহ হইতে অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেয়। এখন অ্যামিবার দেহের ভিতর কি কি উপায়ে জল প্রবেশ করে, তাহার একটি মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ শ্বাস-ক্রিয়ার দ্বারা অ্যামিবার দেহের ভিতর জলের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, অ্যামিবার সজীব-খাদ্য গ্রহণের সময় প্রচুর জল উহার দেহে খাদ্যকে নিমগ্ন করিয়া প্রবেশ করে। তৃতীয়তঃ, অন্তঃঅভিস্রবণ-প্রক্রিয়ার সময় দ্রবীভূত অক্সিজেনের সহিত প্লাজমালিমা-ভেদ্য পর্দা দিয়া জল প্রবেশ করে। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে, অ্যামিবার দেহে প্রচুর জল অনাবশ্যকভাবে প্রবেশ করে এবং ইহাও সত্য যে, এই অতিরিক্ত জল অ্যামিবার দেহ হইতে নিষ্কাশিত না হইলে জলের চাপে ফাটিয়া অ্যামিবার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যাহাতে অ্যামিবার দেহে উপযুক্ত পরিমাণে সর্বদা জল থাকে এবং অতিরিক্ত জল যাহাতে উহার দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়, তাহার জন্যই সংকোচনশীল গহ্বরের সৃষ্টি। ইহা অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ার হারের সহিত সমানভাবে সৃষ্ট হয় এবং অতিরিক্ত জল অ্যামিবার দেহের ভিতর রাখিতে দেয় না। ইহাই সংকোচনশীল গহ্বরের কার্য এবং ইহাকে অভিস্রবণ-নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

বিবিধ উদ্দীপকের প্রতি অ্যামিবার প্রতিক্রিয়া (Response to Stimuli):

যে-কোন প্রকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তনই অ্যামিবার উদ্দীপকের কারণস্বরূপ হয়। প্রখর আলোকে বা তীব্র রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে অ্যামিবা সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়া তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্ধাবন করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় সজীব অ্যামিবাকে ছুঁচ দিয়া খোঁচা দিলে উহা সঙ্গে

সঙ্গে উক্ত স্থান হইতে সরিয়া যায়। জলের তাপমাত্রা বর্ধিত করিলে অ্যামিবা ধীরে ধীরে শীতল জলের দিকে সরিয়া যায়। মৃদু আলোকে অ্যামিবা আনন্দিত হইয়া আলোকের দিকে আগাইয়া যায়। সেইরূপ খাদ্যবস্তুর সন্ধান পাইলে বা সংস্পর্শে আসিলে অ্যামিবা উহাকে ক্ষণপদ দিয়া তৎক্ষণাৎ জড়াইয়া ধরে। 30°C তাপমাত্রায় অ্যামিবা সাধারণভাবে জীবনযাপন করিতে পারে কিন্তু 33°C এর বেশী তাপ বাড়াইয়া দিলে অ্যামিবা অস্বস্তিবোধ করে এবং উক্ত স্থান হইতে পলায়ন করে। অধ্যাপক জেনিংস (*Jennings*) সারা জীবন অ্যামিবা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অ্যামিবা সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি অনুভূতি, নানাবিধ ভাব ও ভঙ্গীর দ্বারা যে-কোন উচ্চস্তরের প্রাণীদের মত প্রকাশ করিতে পারে।

অ্যামিবার নিউক্লিয়সের সহিত সাইটোপ্লাজমের সম্বন্ধ (The relation between the nucleus and the cyt plasm):

অ্যামিবার নিউক্লিয়সের সহিত সাইটোপ্লাজমের সম্বন্ধ লইয়া বহু প্রাণিবিদ্ গবেষণা করিয়াছেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিম্নে সজীব অ্যামিবার দেহ হইতে নিউক্লিয়সটি ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, নিউক্লিয়স এবং সাইটোপ্লাজম অংশ উভয়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার নিউক্লিয়সের সহিত কিছু অংশ সাইটোপ্লাজম ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, সাইটোপ্লাজম-সহ নিউক্লিয়স অংশটি সজীব থাকে এবং কেবল সাইটোপ্লাজম অংটি নষ্ট হইয়া যায়। নিউক্লিয়স-সহ সাইটোপ্লাজম অংশটি ধীরে ধীরে বড় হয়, এবং পরে একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যামিবায় পরিণত হয়। সুতরাং উপরোক্ত পরীক্ষাগুলিতে বোঝা যায় যে, নিউক্লিয়স যদিও অ্যামিবার সমস্ত কোষের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করে, তথাপি সাইটোপ্লাজমের সহযোগিতা না পাইলে উহা কোন কাজই করিতে পারে না।

জনন-প্রক্রিয়া
(Reproduction)

জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু জীবনের বৈশিষ্ট্য। অ্যামিবার জীবনেও এই তিনটি দশা দ্বারাই ইহার জীবনচক্র সমাপ্ত হইয়াছে। অ্যামিবার মৃত্যু লইয়া প্রাণিবিদ্গণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কেহ বলেন, অ্যামিবা অমর;

আবার কেহ বলেন, অ্যামিবার মৃত্যু স্পষ্ট। কিন্তু অ্যামিবার মৃত্যু-রহস্য জানিতে হইলে উহার বিবিধ বংশবৃদ্ধি প্রণালী প্রথমে জানা প্রয়োজন এবং তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইতেছে :
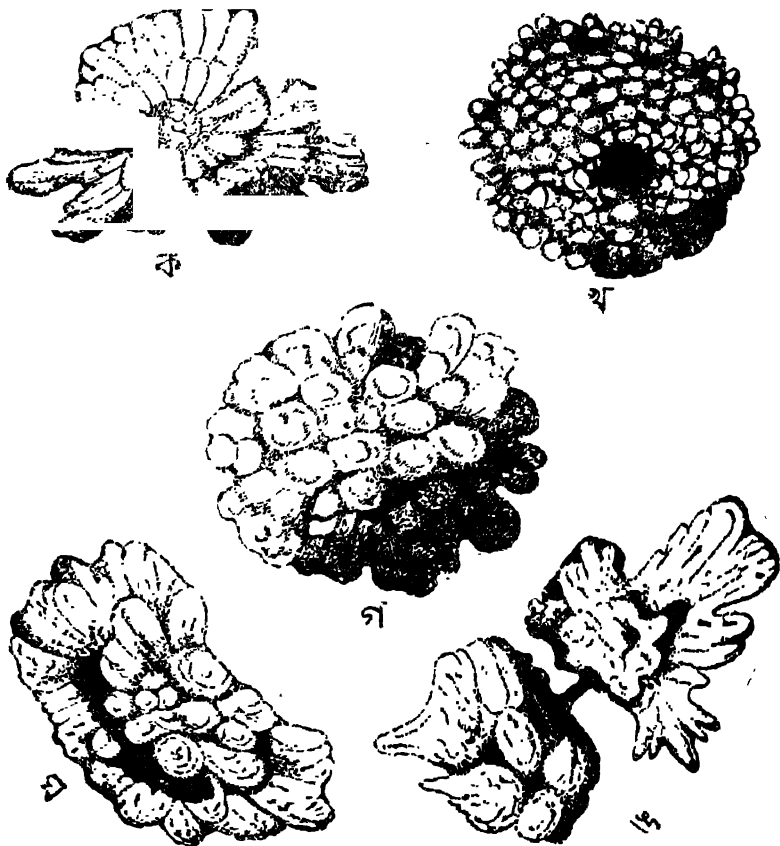
৪নং চিত্র

যুগ্ম-বিভাজনের সময় অ্যামিবার বহিরাকৃতি দেখান হইতেছে।

ক—ঙ, যুগ্ম-বিভাজনের দশা।

অ্যামিবার বংশবৃদ্ধি-প্রণালী অতি সাধারণ। ইহাদের এই প্রণালীতে যৌনত্বের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সুতরাং বংশবৃদ্ধি-প্রণালী স্বভাবতঃ **অযৌন** (*asexual*)। অযৌন বংশবৃদ্ধি-প্রণালী দুই প্রকারের, যথা—(ক) **যুগ্ম-বিভাজন** (**Binary fission**) এবং **বহু-বিভাজন** (**Multiple fission**)।

(ক) যুগ্ম-বিভাজন (Binary fission): এই বিভাজন-প্রণালী পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। যখন খাল, বিল, নালা ও মৃত্তিকায় প্রচুর জল থাকে এবং অ্যামিবা যখন অতি সহজেই খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে—তখনই যুগ্ম-বিভাজন প্রণালীর দ্বারা ইহারা বংশ-বিস্তার করে। মোট কথা, অ্যামিবার সুসময়ে বংশবৃদ্ধি প্রণালী হইতেছে যুগ্ম-বিভাজন পদ্ধতি। এই সময় প্রচুর খাদ্য পাইয়া অ্যামিবা নিজের দেহের আকার বৃদ্ধি করে। উহার
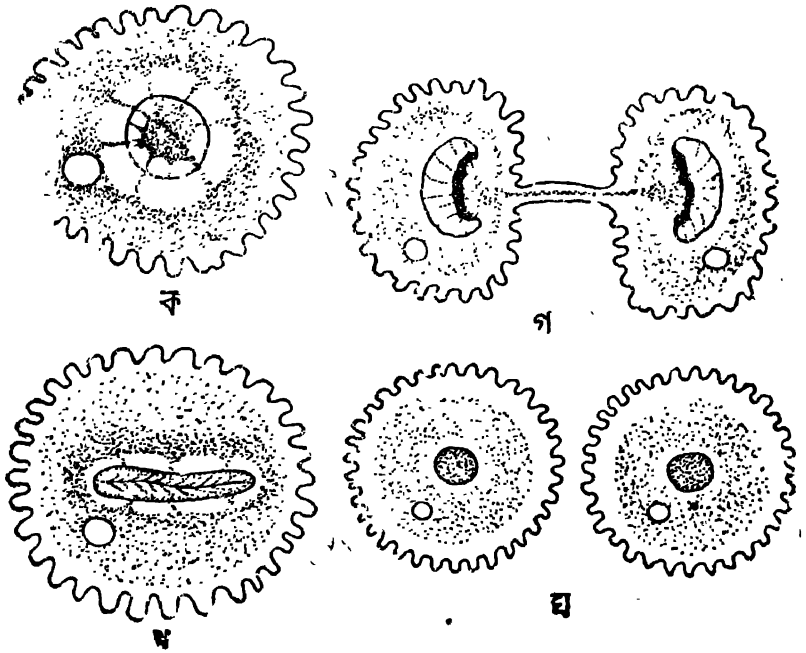
৫নং চিত্র
রেখা-চিত্রের দ্বারা অ্যামিবার যুগ্ম-বিভাজন পদ্ধতির বিবিধ দশা
(ক –ঘ) দেখান হইতেছে

দেহের সাইটোপ্লাজম বাড়িতে বাড়িতে এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়, যখন আর অ্যামিবা সুষ্ঠুভাবে দেহের বিপাকীয়-কার্য সম্পন্ন করিতে পারে না। ফলে যুগ্ম-বিভাজনের সৃষ্টি হয়। যুগ্ম-বিভাজনের পূর্বে অ্যামিবা ধীরে ধীরে দেহের আয়তন হ্রাস করিতে অ্যামিবা তখন আপ্রাণ চেষ্টা করে। ইহারই দেহের চারিপাশ হইতে ক্ষণপদগুলিকে দেহের ভিতর লুপ্ত করিয়া লয়। দেহের আকার প্রায় এককথায় তখন গোল বলা হয়। কিন্তু ভালভাবে নিরীক্ষণ

করিলে ক্ষণপদের যুগ্মগুলি উহার দেহের চারিপাশে দেখা যায়। এই সময় অ্যামিবার নিউক্লিয়সটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং স্পষ্ট হয়। ধীরে ধীরে নিউক্লিয়সটি আড়াআড়িভাবে বাড়িতে থাকে এবং মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমে নিউক্লিয়স বেশ লম্বা হইবার পর উহার মধ্যবর্তী অঞ্চল সরু হইতে আরম্ভ করে এবং উহার দুইদিক স্থূল হইয়া গোলাকারে পরিণত হয়। এই অবস্থায় নিউক্লিয়সকে ডম্বরুর মত দেখায়। নিউক্লিয়সের মত অ্যামিবার দেহও আড়াআড়িভাবে দৈর্ঘ্যে বাড়িতে থাকে এবং দেহের মধ্যবর্তী অঞ্চলের দুই পাশ হইতে খাঁজ দেখা যায়। নিউক্লিয়সটি যতই লম্বা হইতে থাকে, উহার মধ্যবর্তী অঞ্চল ততই সরু হয়। অ্যামিবার দেহও সেই অনুপাতে লম্বা হয় এবং উহার মধ্যবর্তী অঞ্চলের খাঁজও গভীর হইতে থাকে। নিউক্লিয়সের মধ্যস্থল অতি সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং দুইটি অপত্য-নিউক্লিয়সে পরিণত হয়। ইহার পরই অ্যামিবার সাইটোপ্লাজমও মধ্যস্থল হইতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার ফলে একটি অ্যামিবা দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অ্যামিবায় পরিণত হয়। এখন এই দুইটি কোষকে নবজাতক অ্যামিবা বা অ্যামিবা সন্তান (*daughter amoeba* বলা হয়। নবজাতক অ্যামিবাগুলি মাতা অ্যামিবার মত খাদ্য গ্রহণ করিয়া পৃথকভাবে স্বাধীন জীবনযাপন করে। ইহারা পরিণত হইলে মাতার মত যুগ্মবিভাজনের ফলে আবার নবজাতকের সৃষ্টি করে। সুতরাং মাতার সজীব দেহ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি সজীব স্বাধীন সন্তানে পরিণত হইতেছে। অতএব অ্যামিবার কোথাও মৃত্যু নাই। ইহারা অমর। কিন্তু মাতা দুইভাগে বিভক্ত হইবার পর উহার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং মাতার জীবন, উহার বৈশিষ্ট্য ও সত্তা বিভাজনের পর, শেষ হইয়া যায়। ইহাই এককথায় মাতা-অ্যামিবার

৬নং চিত্র
অ্যামিবার যুগ্ম-বিভাজন বিবিধ দশার সময় উহার নিউক্লিয়সের বিভিন্ন অবস্থা (ক-খ) দেখান হইয়েছে।
১, ডম্বরুর মত আকারপ্রাপ্ত নিউক্লিয়স ;
২, বিভক্ত নিউক্লিয়স।

মৃত্যু। কারণ বিভাজনের পর মাতাকে মাতা বলা হয়, তখন উহার দেহের দ্বারা দুইটি সন্তানের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব অ্যামিবা অমর কিংবা মরণশীল তাহা সহজে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শুধু ইহাই বলা যাইতে পারে যে, মাতা ও সন্তানের মধ্যে অ্যামিবার জীবনচক্র আবর্তিত হয়। সাধারণতঃ বর্ষার সময় যুগ্ম-বিভাজন-প্রণালী অনুসারে অ্যামিবার বংশবৃদ্ধি হয়।

(খ) **বহু-বিভাজন** (**Multiple fission**):

যুগ্ম-বিভাজনে অ্যামিবার পক্ষে যে ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন, বহু-বিভাজনে বংশবৃদ্ধির সময় উহার ঠিক বিপরীত পরিবেশের প্রয়োজন হয়। যখন নালা, খাল ও পুষ্করিণী প্রভৃতি শুকাইয়া যায় বা উহাদের জল পচিয়া দুর্গন্ধপূর্ণ হয় এবং মৃত্তিকায় জল থাকে না, তখন অ্যামিবার বড়ই অসুবিধা হয়। জলই জীবের প্রাণ। জল না থাকায় অ্যামিবা জল পায় না এবং জলজ সজীব খাদ্যও পায় না। ইহার ফলে ধীরে ধীরে অ্যামিবার দেহের বিপাকীয় কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয় না। খাদ্যের অভাবে দেহ জীর্ণ ও পঙ্গু হইয়া যায়। এইরূপ সময় এবং এই ধরনের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় অ্যামিবা বহু-বিভাজন প্রণালীর দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে। এই প্রণালীর দ্বারা অ্যামিবা নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করে এবং এইরূপে জীবন রক্ষার প্রতিকূল পরিবেশকেও কাটাইয়া দেয়। অ্যামিবা প্রথমে উহার দেহের সমগ্র ক্ষণপদগুলি সংকুচিত করিয়া দেহটিকে গোলাকারে পরিণত করে। উহার সাইটোপ্লাজম হইতে এই সময় তরল-রস নিঃসৃত হয় এবং দেহ-রস
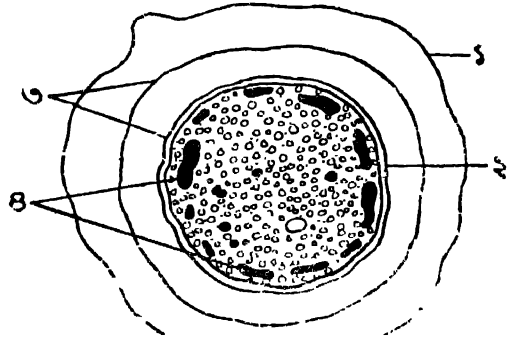
৭ (ক) নং চিত্র
অ্যামিবার বহু-বিভাজন-পদ্ধতির বিবিধ দশা দেখান হইতেছে।
ক, আবরণী-বেষ্টিত অ্যামিবার ভিতরকার নিউক্লিয়সের বিভাজন খণ্ড-খণ্ড ভাবে দেখান হইতেছে।
১, বহিঃআবরণ ; ২, অন্তঃআবরণ ; ৩, মধ্য-আবরণ ; ৪, খণ্ড-খণ্ড নিউক্লিয়সের অংশ।

প্রাজমালিমাকে আবৃত করে। বাতাসের সংস্পর্শে নিঃসৃত রস কঠিন হইয়া যায়। এইভাবে অ্যামিবার দেহের চারিদিকে বা দেহবেষ্টন করিয়া তিনটি পর্যায়ক্রমে **আবরণী** (*cyst*) রচিত হয়। প্রথম আবরণীকে **বহিঃ-আবরণ** (*Epicyst*), দ্বিতীয় আবরণীকে **মধ্য-আবরণ** (*Mesocyst*) এবং তৃতীয় আবরণীকে **অন্তঃ-আবরণ** (*Endocyst*) বলা হয়। এই ভাবে অ্যামিবা নিজ দেহকে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হইতে রক্ষা করে। আবরণী-বেষ্টিত অ্যামিবা-গুলি খুবই হালকা হয় এবং বৈশাখ মাসের ঝড়ে ধূলার সহিত সহজেই উড়িয়া যায়। এখন আব-রণীর ভিতরে অ্যামিবার দেহের আমূল পরিবর্তন হয়। উহার নিউক্লিয়সটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। প্রতিটি নিউক্লিয়স খণ্ড
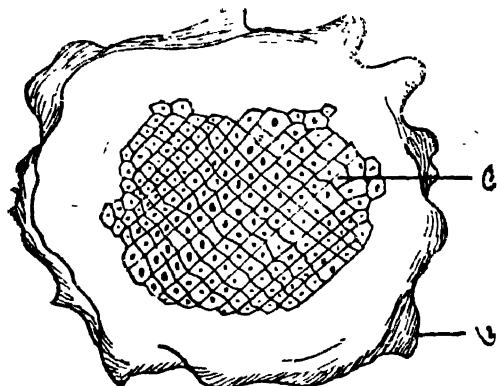
৭ (খ) নং চিত্র
অ্যামিবার বহু বিভাজন পদ্ধতির বিবিধ দশা দেখান হইতেছে।
খ, সিউডোপোডিওস্পোরের (Pseudopodiospore) সৃষ্টি দেখান হইতেছে।
৫, সিউডোপোডিওস্পোর ; ৬, আবরণ।

অ্যামিবার কিছু অংশ সাইটোপ্লাজম গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সৃষ্টি করে। এই কোষগুলিকে **সিউডোপোডিওস্পোর** (*Pseudopodio-spore*) বা ক্ষণপদের বীজ বলা হয়। যতদিন পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অর্থাৎ নালা, ডোবা, খাল, পুষ্করিণী ও মাটি জলপূর্ণ না হয় এবং অ্যামিবার উপযোগী জলজ প্রাণীতে ভরিয়া না ওঠে, ততদিন সিউডোপোডিওস্পোরগুলি আবরণীর ভিতর সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে বহু-বিভাজন প্রণালীর দ্বারা অ্যামিবা বংশবৃদ্ধি করে এবং সিউডোপোডিওস্পোরগুলি গ্রীষ্মকালের পর বর্ষার প্রারম্ভে, আবরণী, জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ফাটিয়া যায় এবং সিউডোপোডিওস্পোরগুলি বাহির হইয়া আসে। বর্ষার নতুন জলে উহারা ক্ষণপদ নিক্ষেপ করিয়া চলাফেরা করে এবং খাদ্য সংগ্রহ করিয়া

স্বাধীনতায় জীবন অতিবাহিত করে। যুগ্ম-বিভাজন প্রণালীর দ্বারা বংশবৃদ্ধিতে একটি অ্যামিবা দুইটি অপত্য অ্যামিবায় পরিণত হয় কিন্তু বহু-বিভাজন প্রণালী দ্বারা বংশবৃদ্ধিতে একটি অ্যামিবা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "ক্ষুদে" অ্যামিবার সৃষ্টি করে। পরে ক্ষুদে অ্যামিবাগুলি পূর্ণাঙ্গ অ্যামিবায় পরিণত হয়।

মনোসিস্‌টিস
(Monocystis)

মনোসিস্‌টিসও আদ্যপ্রাণী। কিন্তু ইহার জীবনধারণ প্রণালী অ্যামিবার মত নহে। মনোসিস্‌টিস, আদ্যপ্রাণী পর্বের বহুবিধ পরজীবীর মধ্যে একটি অতীব সরল পরজীবী। তোমরা জান, পরজীবী দুই প্রকার। একপ্রকার পরজীবী অন্য প্রাণীর দেহের বাহিরের অঙ্গে বাস করে এবং দেহের বাহির হইতে রক্ত বা খাদ্যরস শোষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মানুষের মাথার চুলে যেমন উকুন এবং হাতে ও পায়ের চুলে যেমন চাম। ইহাদের বহিঃপরজীবী (*Ectoparasite*) বলা হয়। কিন্তু মানুষের পেটের ভিতরকার গোল কৃমি, ফিতা কৃমি ও হুক কৃমি ইত্যাদি পাকস্থলীর ভিতর হইতে রক্ত বা খাদ্যরস শোষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহাদের সেইজন্য অন্তঃপরজীবী (*Endoparasite*) বলা হয়। মনোসিস্‌টিসও একটি অন্তঃপরজীবী, কিন্তু ইহা মানুষের নহে, কেঁচোর অন্তঃপরজীবী। কেঁচোর শুক্রসংক্রান্ত থলির ভিতর অপুষ্ট শুক্রকোষগুলিকে শোষণ করিয়া মনোসিস্‌টিস জীবনধারণ করে। ইহার নিজের কোন পুষ্টিতন্ত্র নাই এবং কেঁচোর শুক্রকোষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং মনোসিস্‌টিস একটি পরাধীন এবং পূর্ণপরজীবী (*Total parasite*) প্রাণী এবং ইহা আদ্যপ্রাণী পর্বের অধীনস্থ স্পোরোজোয়া (*Sporozoa*) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

দেহ (Cell-body) :

নানা দশার ভিতর দিয়া মনোসিস্‌টিস নিজ জীবন-চক্র সমাপ্ত করে। এক দশার বহিরাকৃতির সহিত অন্য দশার বহিরাকৃতির কোন মিল নাই। নানা দশার মধ্যে যে-দশায় মনোসিস্‌টিসও সামান্য চলাফেরা করিতে পারে এবং প্রচুর খাদ্যরস শোষণ করিয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়, সাধারণতঃ সেই দশাকেই

মনোসিস্টিসের **পূর্ণাঙ্গ দশা** (*adult stage*) বলা হয়। এই দশাকে **ট্রফোজয়েট** (*Trophozoit*; *trophi*—(efeding দশা বলা হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রফোজয়েট আকারে লম্বা এবং ইহার অগ্রাংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল। অগ্রভাগ হইতে ইহাদের দেহ ধীরে ধীরে সরু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে ইহাদের পশ্চাদ্ভাগ বেশ সরু হইয়া শেষ হয়। মনোসিস্টিসের এককোষী দেহের ভিতর নিউক্লিয়সটি বেশ বড় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করিলে পরিষ্কার দেখা যায়। দেহটি সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। ইহার সমস্ত দেহ একটি পুরু সছিদ্র আবরণী দ্বারা বেষ্টিত থাকে। অ্যামিবার প্লাজমোলিমার মত ইহা সজীব ও সংকোচন-প্রসারণশীল নহে। এই আবরণীটিকে মনো-সিস্টিসের **কিউটিক্‌ল** (*cuticle*) বলা হয়। সাইটোপ্লাজম হইতে নিঃসৃত রেচন পদার্থ দ্বারাই এই কিউটিক্‌লের সৃষ্টি হয়। মনোসিস্টিসের সাইটোপ্লাজমও ঘনত্ব অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত। কিউটি-

৭৮নং চিত্র
মনোসিস্টিসের ট্রফোজয়েট দশা।
১, নিউক্লিয়স; ২, কিউটিক্‌ল;
৩, বহিঃপ্লাজম; ৪, অন্তঃপ্লাজম।

ক্‌লের ভিতরে ও সাইটোপ্লাজমের বাহিরের অংশের প্রোটোপ্লাজমকে **বহিঃপ্লাজম** (*Ectoplasm*) বলা হয়। সাইটোপ্লাজমের এই অংশে জলের ভাগ কম হওয়ায় প্রোটোপ্লাজম ঘন। আবার বহিঃপ্লাজমের বাহিরের অংশ অর্থাৎ কিউটিক্‌লের ঠিক ভিতরকার অংশের প্রোটোপ্লাজম স্তরীভূত হইয়া সরু সরু সূতায় পরিণত হইয়াছে। এই সূতাগুলিকে **মাইওনিম** (*Myoneme fibril*) বলা হয়। ইহা সংকোচন-প্রসারণশীল। ফলে ইহাদের সংকোচন ও প্রসারণ ক্রিয়ার জন্য মনোসিস্টিস্ নিজ দেহ সামান্য নাড়াচড়া করিতে পারে। মনোসিস্টিসের বহিঃপ্লাজমের ভিতর অন্তঃপ্লাজম বিদ্যমান। **অন্তঃপ্লাজমের** (*Endoplasm*) ভিতরে নিউক্লিয়স থাকে। অন্তঃপ্লাজমে প্রোটোপ্লাজমের ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম এবং সেইজন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ

করিলে সাবানের **ফেনার মত** (*Foam-like*) দেখিতে হয়। নিউক্লিয়সটি দেহের অগ্রভাগে বিদ্যমান। ইহাকে একটি পাতলা **নিয়ক্লিয়-পর্দা** (*Nuclear-membrane*) বেষ্টন করিয়া থাকে। নিউক্লিয় জালিকা ও নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয়সের একধারে অবস্থান করিতে দেখা যায় এবং নিউক্লিয়সের ভিতর **নিউক্লিয়-রসে** (*nuclear-sap*) পূর্ণ থাকে। মনোসিস্‌টিস এই দশায় প্রচুর খাদ্য শোষণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইলে প্রজনন-ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। কোষের ভিতর গ্লাইকোজেন, প্যারা-গ্লাইকোজেন এবং বিন্দু বিন্দু স্নেহ-পদার্থও দেখা যায়। কিন্তু গহ্বরের অস্তিত্ব মোটেই দেখা যায় না।

পুষ্টিক্রিয়া (Nutrition) ঃ

খাদ্য-সংগ্রহ ও পরিপাকের জন্য মনোসিস্‌টিসের দেহে কোন যন্ত্র নাই। ইহাকে কেঁচোর শুক্র-সংক্রান্ত থলির ভিতর তরল শুক্র-খাদ্যে নিমগ্ন অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। শুক্রের তরল খাদ্যই মনোসিস্‌টিসের খাদ্য। ইহা মনোসিস্‌টিস, অভিস্রবণ-ক্রিয়ার দ্বারা দেহের ভিতর সর্বাঙ্গ দিয়া শোষণ করে। কিউটিকল সছিদ্র হওয়ায় অভিস্রবণ-প্রক্রিয়া সহজেই কার্যকরী হয়। ইহা মনোসিস্‌টিস কেঁচোর অপুষ্ট শুক্রকোষগুলিকেও খাদ্যরূপে হরণ করে। প্রথমে ইহারা সাইটোপ্লাজম হইতে নানাবিধ রাসায়নিক উৎসেচক নিঃসৃত করে। এই উৎসেচকগুলি অপুষ্ট শুক্রকোষগুলিকে ধীরে ধীরে পরিপাক করিয়া তরল খাদ্যে পরিণত করে এবং তখন মনোসিস্‌টিস তরল খাদ্যরসকে শোষণ করিয়া লয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহাদের খাদ্য-গহ্বর নাই এবং ইহারা খাদ্যের ভিতর থাকে বলিয়া ইহাদের চলা-ফেরা বা চলন-প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। সেইরূপ ক্ষণপদের বা অন্য কোন খাদ্যসংগ্রহের অঙ্গও ইহা সৃষ্টি করে না।

শ্বাসক্রিয়া (Respiration) ঃ

কেঁচোর শুক্র-সংক্রান্ত থলির ভিতর অক্সিজেনের পরিমাণ নাই বলিলেই হয়। সেইজন্য মনোসিস্‌টিসে বিনা অক্সিজেনেও শ্বাসক্রিয়া কার্যকরী হয়। এইরূপ শ্বাসক্রিয়াকে **অবাত শ্বাসক্রিয়া** (*Anaerobic*) বলা হয়। মনোসিস্‌টিসের দেহের ভিতর গ্লাইকোজেন, প্যারাগ্লাইকোজেন ও স্নেহপদার্থ সঞ্চিত খাদ্যরূপে বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত শোধিত খাদ্যরসকে মনোসিস্‌টিস উহার সাইটোপ্লাজম হইতে নানাবিধ উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া দহন করে।

এই দহন-কার্য বিনা-অক্সিজেনেই কার্যকরী হয় বলিয়া খাদ্য হইতে কম পরিমাণে শক্তি নির্গত হয়। গ্লাইকোজেন ও প্যারাগ্লাইকোজেন দহনে সাধারণতঃ কার্বনডায়কসাইড-সহ ল্যাক্‌টিক্ (*Lactic*) অ্যাসিড নির্গত হয়। কার্বনডায়কসাইড অভিস্রবণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। মনোসিস্‌টিসের অতি সামান্য পরিমাণ শক্তির দরকার হয়। কারণ ইহাকে খাদ্য-সংগ্রহ ও চলা-ফেরা ইত্যাদি শক্তি অপচয়কারী ক্রিয়াগুলি করিতে হয় না। কেবলমাত্র প্রজনন-প্রক্রিয়ায় যতটুকু শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা মনোসিস্‌টিস অবাত-শ্বাসক্রিয়ায় নির্গত করিতে পারে।

রেচন ক্রিয়া (Excretion):

কেঁচো উহার হজম-করা খাদ্যরসের দ্বারা অপুষ্ট শুক্রকোষগুলিকে পুষ্ট করে। মনোসিস্‌টিস উপরোক্ত খাদ্যরস শোষণ করে। সুতরাং এইরূপ খাদ্য প্রায়ই মনোসিস্‌টিসের দেহের কাজে বা দেহ-গঠনে ব্যবহৃত হয়। অতি সামান্য রেচন পদার্থ উহার বিপাকীয় কার্যের ফলে উৎপন্ন হয়। এইরূপ রেচন পদার্থ মনোসিস্‌টিসের সছিদ্র কিউটিক্‌লের ভিতর দিয়া ব্যাপন-ক্রিয়ার ফলে দেহের বাহিরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে।

চলন ক্রিয়া (Locomotion):

খাদ্য-সংগ্রহের জন্যই চলন-ক্রিয়ার উৎপত্তি। কিন্তু মনোসিস্‌টিস খাদ্যরসের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। সুতরাং চলন-ক্রিয়া উহাদের পক্ষে অনাবশ্যক। সেইজন্য ক্ষণপদ, সিলিয়া, ফ্যাজিলা প্রভৃতি অঙ্গ ইহাদের দেহে নাই। মনোসিস্‌টিস অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। বহিঃপ্লাজমের মায়ওনিম সূতার সাহায্যে ইহারা সামান্য নড়াচড়া করিতে পারে। সূতাগুলি দেহটিকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া থাকে এবং বৃত্তাকার সূতাসমষ্টি দেহের চারিপাশে লম্বাভাবেও অবস্থান করে। আগেই বলা হইয়াছে যে, মায়ওনিম সূতাগুলি সংকোচন-প্রসারণশীল। বৃত্তাকার সূতাসমষ্টি এবং লম্বাকার সূতাসমষ্টি একান্তভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হওয়ায় মনোসিস্‌টিসের দেহটি দুই দিকেই নড়াচড়া করে। ইহাই মনোসিস্‌টিসের চলন-ক্রিয়া।

জনন-প্রক্রিয়া ও জীবন-বৃত্তান্ত (Reproduction and Life-history):

মনোসিস্‌টিসের জনন-প্রক্রিয়া ও জীবনচক্র জটিল ও সুযোগ সাপেক্ষ। অন্যান্য পরজীবী প্রাণীদের মত ইহার আকার সরল কিন্তু পরজীবিত্বের জন্য

বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইহারা নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে। ইহাদের নানা দশার মধ্যে ট্রফোজয়েট বা পূর্ণাঙ্গ দশাটির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ট্রফোজয়েটগুলি খাদ্যশোষণের পর বৃদ্ধিলাভ করে। ইহাদের দেহে তখন প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত হয়। এইরূপ দুইটি ট্রফোজয়েট পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পাশাপাশি লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে। ইহাদের আকার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া গোলাকারে পরিণত হয় এবং ইহারা পরস্পর লম্বালম্বিভাবে জুড়িয়া যায়। এখন ইহাদের ট্রফোজয়েট না বলিয়া **গ্যামেটোসাইটস্** (*Gametocytes*) বা কেবল **গ্যামণ্টস্** (*Gamonts*) বলা হয়। গ্যামেটোসাইটগুলি সাইটোপ্লাজম হইতে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করিয়া উহাদের চারিপাশে পাতলা, দুই-স্তর-বিশিষ্ট আবরণী সৃষ্টি করে। এই আবরণীগুলিকে **গ্যামেটোসাইটের আবরণী বা গ্যামেটোসিস্ট** (*Gametocyst*) বলা হয়। দুইটি গ্যামেটোসাইটের আকার একই হওয়ায় প্রত্যেকের পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। এখন প্রতিটি গ্যামেটোসাইটের নিউক্লিয়স বহু-বিভাজন প্রণালী অনুসারে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়। নিউক্লিয়সের প্রতিটি খণ্ড গ্যামেটোসাইটের বাহিরের দিকে ধাবিত হয় এবং উহার ধারে এক লাইনে সজ্জিত থাকে। এখন প্রতিটি নিউক্লিয়সের খণ্ড গ্যামেটোসাইটের কিছু অংশ সাইটোপ্লাজম সংগ্রহ করিয়া এক একটি ক্ষুদ্র কোষে পরিণত হয়। এই অবস্থায় দেখা যায় যে, প্রতিটি গ্যামেটোসাইটের ধারে বৃত্তাকারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ থাকে এবং ইহাদের মধ্যস্থলে অবশিষ্ট সাইটোপ্লাজম জমা থাকে। এই কোষগুলিকে **গ্যামেট** (*Gamete*) বা জনন-কোষ বলে। দুইটি গ্যামেটোসাইটের মধ্যস্থ গ্যামেটগুলি আকারে একই রকম হওয়ায় ইহাদের **সমাকৃতি গ্যামেট** (*Isogamete*; *so*—same) বলা হয়। মনোসিস্টিসের জীবনচক্রে গ্যামেটের সৃষ্টির জন্য ইহাদের জনন-ক্রিয়া **যৌন** (*Sexual*)। কিন্তু সমাকৃতি গ্যামেটের উৎপত্তি হওয়ায় যৌনের কোন প্রভেদ দেখা যায় না। গ্যামেটের সৃষ্টির পর গ্যামেটোসাইটের মধ্যস্থ **বিভেদ প্রাচীরটি** (*Partition wall*) লুপ্ত হইয়া যায় এবং এক গ্যামেটোসাইটের গ্যামেট অপর গ্যামেটোসাইটের গ্যামেটের সহিত মিলিত হয়। গ্যামেটের কোষ দুইটি মিলিত হইবার কিছু পরে উহাদের নিউক্লিয়স দুইটি মিলিত হইয়া একটি নিউক্লিয়সে পরিণত হয়। এখন দুই গ্যামেটের মিলিত-কোষটিকে **জাইগোট** (*Zygote*) বলা হয়।

৯নং চিত্র—মনোসিস্‌টিসের জীবন-বৃত্তান্ত।

১, নিউক্লিয়স ; ২, অন্তঃপ্লাজম ; ৩, বহিঃপ্লাজম ; ৪, কিউটিক্‌ল ; ৫, মিলনরত গ্যামেট ; ৬, পরিত্যক্ত সাইটোপ্লাজম ; ৭, গ্যামেটোসিস্ট ; ৮, ভ্রান্ত-নেভিসিলা ; ৯, স্পোরোজয়েট ; ১০, মাতৃ-শুক্রকীটের সাইটোপ্লাজম ; ১১, শিশু-ট্রফোজয়েট ; ১২, গ্যামেটোসিস্ট ; ১৩, গ্যামেটোসাইট ; ১৪, নিউক্লিয়সের খণ্ড খণ্ড অংশ ; ১৫, গ্যামেট।
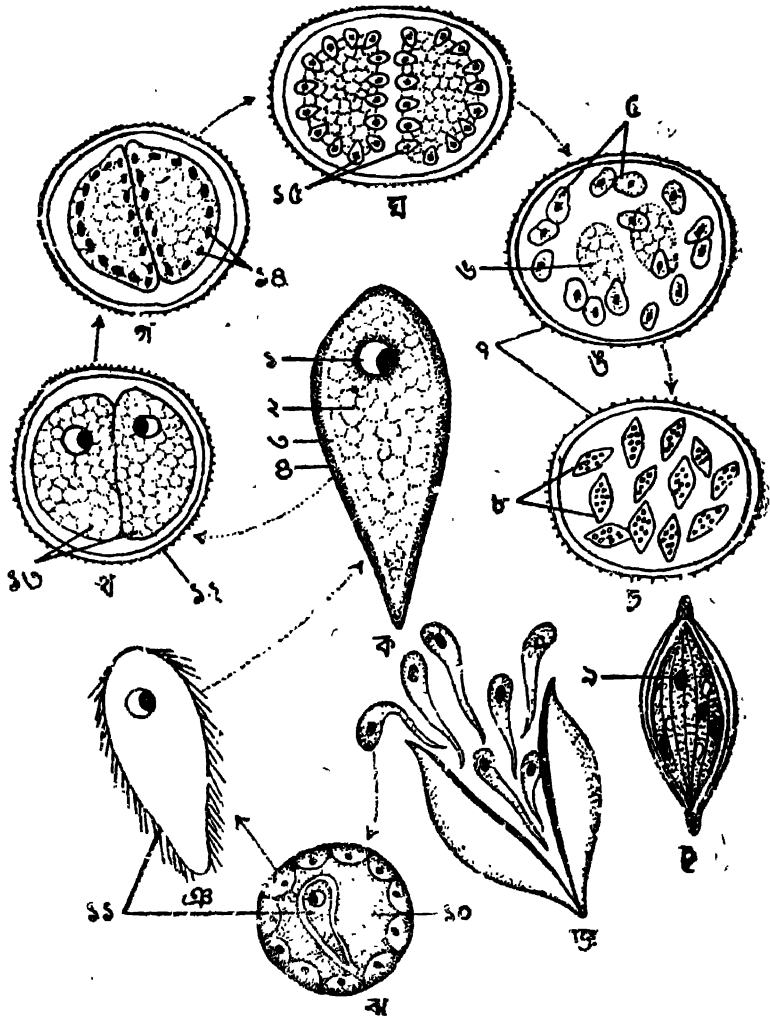
ক, পূর্ণাঙ্গ ট্রফোজয়েট ; খ, গ্যামোটোসিস্টের মধ্যে দুইটি গ্যামেটোসাইট ; গ, গ্যামেটোসাইটের মধ্যে গ্যামেট সৃষ্টির প্রথম অবস্থা ; ঘ, গ্যামেট সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ অবস্থা ; ঙ, দুইটি গ্যামেটোসাইটের গ্যামেটের মিলিত হওয়ার দশা ; চ, জাইগোট অবস্থা ; ছ, ভ্রান্ত-নেভিসিলার মধ্যে স্পোরোজয়েট ; জ, ভ্রান্ত-নেভিসিলাটি ফাটিয়া গিয়া স্পোরোজয়েটগুলি বাহির হইয়া আসিতে দেখা যাইতেছে ; ঝ, কেঁচোর মাতৃ-শুক্রকীটের ভিতর শিশু-ট্রফোজয়েট ; ঞ, কেঁচোর শুক্রকীটের লেজ-পরিবেষ্টিত ট্রফোজয়েট।

জাইগোট আকারে বেশ বড় হয় এবং ইহার চারিপাশে একটি পুরু ও শক্ত আবরণী সৃষ্টি হয়। এই বেষ্টিত আবরণীকে **স্পোরোসিস্ট** (*Sporocyst*) বলা হয়। স্পোরোসিস্ট আকারে নৌকার ন্যায় অর্থাৎ উপর, অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ সূচালো এবং মধ্যভাগ স্থূল। স্পোরোসিস্টের আকৃতি এক-কোষী শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ্ নেভিসিলার মত হওয়ায়, জাইগোটটিকে **ভ্রান্ত-নেভিসিলা** (*Pseudoanavicella*) বলা হয়। এখন জাইগোটের নিউক্লিয়সটি আবরণীর ভিতরে পর পর তিনবার বিভক্ত হয় অর্থাৎ প্রথমে নিউক্লিয়সটি বিভাগের দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হয়। অপত্য-নিউক্লিয়স দুইটি প্রত্যেকে আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া মোট চারিটি নিউক্লিয়সে পরিণত হয়। চারিটি নিউক্লিয়স তৃতীয়বার বিভক্ত হইয়া শেষে আটটি নিউক্লিয়সে পরিণত হয়। এইরূপে একটি জাইগোটের ভিতর আটটি নিউক্লিয়স অবস্থান করে। নিউক্লিয়সগুলি ধীরে ধীরে লম্বা হয় এবং পরে এক একটি সরু কোষে পরিণত হয়। এই কোষগুলিকে **স্পোরোজয়েট** (*Sporozoite*) বলা হয়। সংক্রমিত কেঁচোর শুক্র-সংক্রান্ত থলির ভিতর ভ্রান্ত-নেভিসিলা অর্থাৎ জাইগোট দশা পর্যন্ত মনোসিস্টিস উহার জীবনচক্র অতিবাহিত করে। জাইগোটের পরবর্তী দশা একই কেঁচোর ভিতর আর বৃদ্ধি পায় না। নূতন কেঁচোর দেহে যদি, এইরূপ ভ্রান্ত-নেভিসিলা প্রবেশ করে, তাহা হইলে আবার এই ভ্রান্ত-নেভিসিলা বা জাইগোট দ্রবীভূত হয় এবং উহার ভিতরকার স্পোরোজয়েটগুলি বাহির হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু কেঁচোর দেহের ভিতর মনোসিস্টিসের জীবনচক্র সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হয় না। কেন হয় না, তাহার কারণ প্রাণিবিদ্গণের মতে বিবিধ। কেহ বলেন, সংক্রমিত কেঁচোর দেহের তাপ কমিয়া যাওয়ায় উহা জাইগোটের আবরণীকে দ্রবীভূত করিতে পারে না। কেহ বলেন, সংক্রমিত কেঁচোর দেহে উপযুক্ত উৎসেচকের অভাবের জন্য আবরণীটি দ্রবীভূত হয় না। সুতরাং মনোসিস্টিসের জীবনচক্রের ইহাই নিদারুণ সমস্যা —কিভাবে ভ্রান্ত-নেভিসিলাগুলি এক কেঁচোর দেহ হইতে অপর কেঁচোর দেহে প্রবেশ করে, তাহাও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। কেহ কেহ মনে করেন, পাখী কেঁচো ভক্ষণ করে কিন্তু উহার দেহের ভিতরের ভ্রান্ত-নেভিসিলাগুলি পাখীর পাকস্থলীর ভিতর হজম হয় না। ইহা রেচন পদার্থ হিসাবে পাখীর মলের সহিত বাহির হইয়া আসে এবং মাটিতে জমা হয় ও পরে মাটিতে পরিণত হয়। কেঁচো সেই মাটি খাদ্য হিসাবে ভক্ষণ করে। ফলে ভ্রান্ত-

নেভিসিলাগুলি নূতন কেঁচোর পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে এবং তথায় উহা দ্রবীভূত হইয়া যায় ও স্পোরোজয়েটগুলি বাহির হইয়া আসে। কিন্তু উহা সুযোগসাপেক্ষ। পাখী যে সকল কেঁচো ভক্ষণ করে, তাহাদের দেহের ভিতর ভ্রান্ত-নেভিসিলা নাও থাকিতে পারে। সুতরাং মনোসিস্টিসের বংশবৃদ্ধি উপযুক্ত সুযোগের উপর নির্ভরশীল। আবার সংক্রমিত কেঁচোর স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে উহার দেহ মাটিতে পরিণত হয় এবং পরে সেই মাটি অন্য কেঁচো খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। যে-কোন ভাবেই হোক, ভ্রান্ত-নেভিসিলা নূতন কেঁচোর পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে। তথায় রাসায়নিক উৎসেচকের দ্বারা ভ্রান্ত-নেভিসিলা দ্রবীভূত হইয়া দুইভাগে ফাটিয়া যায় এবং উহার ভিতরকার সরু সরু স্পোরোজয়েটগুলি বাহির হইয়া পড়ে। স্পোরোজয়েট-গুলি পাকস্থলী ভেদ করিয়া কেঁচোর **দেহগহ্বরে** (*Coelome*) প্রবেশ করে এবং দেহরসের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শুক্র-সংক্রান্ত থলির মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুক্র-সংক্রান্ত থলির ভিতর অসংখ্য অপুষ্ট **মাতৃ-শুক্র কোষের** (*Sperm-mother cell*) সংস্পর্শে আসে। স্পোরোজয়েটগুলি দেহ হইতে উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া অপুষ্ট মাতৃ-শুক্রকোষগুলির মাথাগুলি দ্রবীভূত করিয়া দেহের ভিতর শোষণ করিয়া লয়। এইভাবে স্পোরোজয়েট-গুলি খুব শীঘ্রই বৃদ্ধিলাভ করে। মাতৃ-শুক্রকোষের সরু সিলিয়ার মত লেজগুলি স্পোরোজয়েটগুলির দেহের চারিপাশে আটকাইয়া থাকে। পরে ধীরে ধীরে স্পোরোজয়েটগুলি বড় হয় এবং পূর্ণাঙ্গ হইলে ট্রফোজয়েট দশায় পরিণত হয়। মনোসিস্টিসের জীবনচক্রে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। প্রথমটি হইতেছে উহার অতি সরল দেহ এবং দ্বিতীয় হইতেছে উহার জটিল ও সুযোগসাপেক্ষ জীবনচক্র। প্রায় অধিকাংশ পরজীবী প্রাণীদের ইহাই বৈশিষ্ট্য। মনোসিস্টিসের জীবনচক্র সুযোগসাপেক্ষ হওয়ার ইহারা প্রচুর পরিমাণে ভ্রান্ত-নেভিসিলা সৃষ্টি করে। প্রায় অধিকাংশই সুযোগের অভাবে নষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র কিছু-সংখ্যক ভ্রান্ত-নেভিসিলা নূতন কেঁচোর দেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় এবং বংশবৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে।

অনুশীলনী

১। অ্যামিবার দেহের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর এবং প্রতিটি অংশের কার্যকারিতা বুঝাইয়া লিখ। (Describe the internal structure of Amoeba and mention the function of each part.)

২। অ্যামিবা কিভাবে ক্ষণপদের সৃষ্টি করে, তাহা চিত্রসহ বিশেষভাবে বর্ণনা কর। (Explain with sketch how Amoeba produces Pseudopodia.)

৩। অ্যামিবার শ্বাস-ক্রিয়া ও পুষ্টি-ক্রিয়ার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও। (Give a short account of respiration and digestion of Amoeba.)

৪। অ্যামিবার বিবিধ প্রকারের জনন-প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe various types of reproduction of Amoeba. Leave neat sketches.)

৫। পরজীবী প্রাণী কাহাকে বলে? মনসিস্‌টিসের জীবনচক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর। (What do you mean by Parasitic animal? Describe the life-history of Monocystis with suitable sketches.)

৬। পরজীবিত্বের বৈশিষ্ট্য কি? মনোসিস্‌টিসের জীবনচক্রে উহা কিভাবে পরিলক্ষিত হয় তাহা বর্ণনা কর। (What are the characteristics of Parasitic mode of life? Describe how it affects the history of Monocystis.)

৭। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ:

(i) অভিস্রবণ-নিয়ন্ত্রণ (ii) প্লাজমালিমা (iii) খাদ্য-গহ্বর (iv) ভ্রান্ত-নেভিসিলা (v) ট্রফোজয়েট (vi) সমাকৃতি গ্যামেট।

Write short notes :—(i) Osmo-regulation (ii) Plasmalemma (iii) Food-vacuole (iv) Pseudonavicella (v) Trophozoite (vi) Isogamete.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাইড্রা

(Hydra)

হাইড্রা **সিলেনটেরাটো** (*Coelenterata*) পর্বের অন্তর্ভুক্ত এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণী। ইহা সাধারণতঃ পরিষ্কার পুকুরে বাস করে। ইহাদের চলনশক্তি থাকিলেও ইহারা উদ্ভিদের পাতায় কিংবা জলের তলাকার পাথরে আটকাইয়া থাকে। কখন কখন ইহারা স্পঞ্জ বা অন্য জলজ প্রাণীদের দেহেও আটকাইয়া থাকে। গ্রীষ্মের সময় ইহারা গভীর জলে চলিয়া যায়। জল নোংরা বা দূষিত হইলে ইহারা দেহ সঙ্কুচিত করিয়া গোল আকার ধারণ করে এবং পরে ধীরে ধীরে মরিয়া যায়। হাইড্রার দেহে **উভয়-লিঙ্গ** (*Hermaphrodite*) বিদ্যমান।

সাধারণতঃ হাইড্রার দেহটি দশ হইতে ৩০ মিলিমিটার লম্বা এবং একটি সরু ফাঁপা নলের মত হয়। এই নলের মত দেহটির একদিক বন্ধ থাকে এবং এই দিক দিয়াই হাইড্রা জলজ উদ্ভিদের পাতার সঙ্গে আটকাইয়া থাকে। সেইরূপ নলের এই দিকটিকে পদ বা **বেসাল ডিস্ক** (*basal disc*) বলা হয়। হাইড্রার দেহ **অরীয়রূপে প্রতিসম** (*radially symmetrical*) অর্থাৎ ইহার দেহের বিভিন্ন অংশ বৃত্তাকারে কেন্দ্রস্থ মধ্যরেখাকে পরিবেষ্টন করিয়া বিদ্যমান এবং মধ্যরেখা মুখগহ্বরের ভিতর দিয়া লম্বালম্বিভাবে গিয়াছে। পদের বিপরীত দিকে একটি উচ্চ কোণাকৃতি অংশ দেখা যায়। ইহাকে **হাইপোস্টম** (*Hypostome*) বলা হয়। হাইপোস্টমের শীর্ষাগ্রে মুখগহ্বরটি বিদ্যমান। মুখগহ্বরের নিম্নদেশ হইতে বৃত্তাকারে উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চারিটি বা ছয়টি বা আটটি পাতলা সূতার মত **কর্ষিকা** (*tentacle*) থাকে। কর্ষিকাগুলি নানা দিকে প্রসারিত হইতে পারে এবং ইহারা অত্যন্ত সংকোচনশীল। কর্ষিকার ধারে ধারে বহু কোণাকৃতি উচ্চ-স্থান দেখা যায়। এই উচ্চ-স্থানগুলিকে **নিমাটোসিস্টের ব্যাটারী** (*batteries of nematocysts*) বলে এবং ইহারাই হাইড্রার **রক্ষাকর** (*defensive*)। হাইপোস্টমের নিম্নে দেহের ধারে সাধারণতঃ একাধিক ছোট ছোট কোণাকৃতি উচ্চস্থান দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহাদের **শুক্রাশয়** (*tastes*) বলে। পদের উপরের দিকে দেহের ধারে শুক্রাশয়ের চেয়েও বড় একটিমাত্র কোণাকৃতি উচ্চস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে **অণ্ডাশয়** (*ovary*) বলে। সাধারণতঃ হাইড্রা **কুঁড়ি** (*bud*) উৎপন্ন করে। প্রথমে কুঁড়িটি উচ্চ কোণাকৃতি হয়, পরে লম্বা লইয়া যায় এবং নলের মত হয়। ইহার অগ্রভাগে **মুখছিদ্র** (*mouth*)
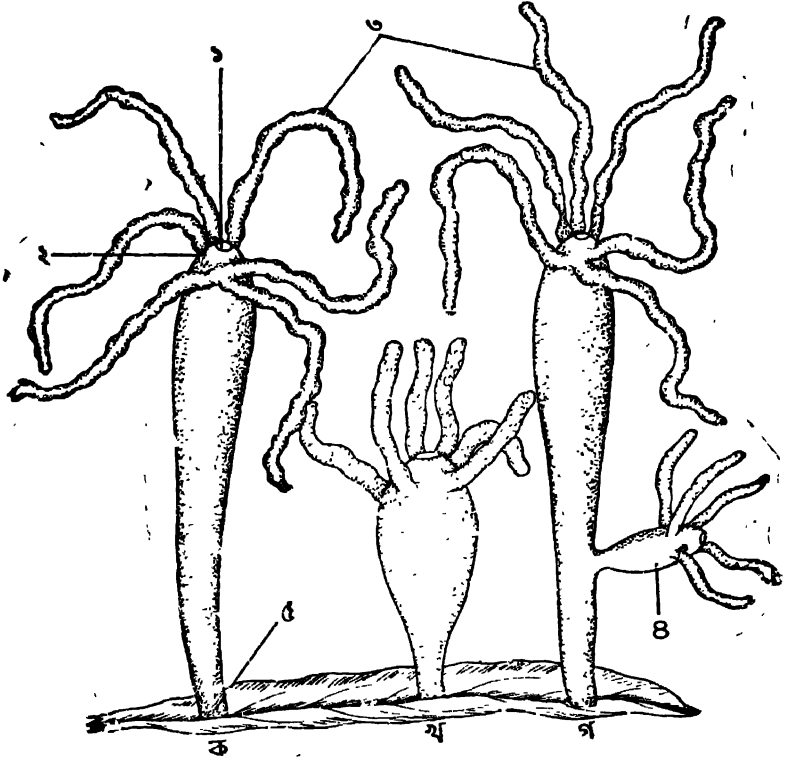
১০নং চিত্র

হাইড্রার বিবিধ আকৃতি দেখান হইতেছে।

ক, প্রসারিত হাইড্রা ; খ, সংকুচিত হাইড্রা ; গ, কুঁড়িসমেত প্রসারিত হাইড্রা।

১, মুখছিদ্র ; ২, হাইপোষ্টম ; ৩, কর্ষিকা ; ৪, কুঁড়ি ; ৫, বেসাল-ডিস্ক (basal disk)।

উৎপন্ন হয়। মুখছিদ্রের চারিপাশে উহাকে বেষ্টন করিয়া কর্ষিকাগুলি গজাইবার পর কুঁড়িটি শিশু হাইড্রাতে রূপান্তরিত হয়। শিশু হাইড্রাটি পরে জনিতৃ (parent) হাইড্রা হইতে পৃথক হইয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে।

সাধারণতঃ ধূসর বাদামী রঙের **হাইড্রা ভুলগারিস** (*Hydra vulgaris*) এবং সাদা **পেলমাটোহাইড্রা অলিগাক্‌টিস্‌** (*Palmatohydra oligactis*) নামক দুই প্রকারের হাইড্রা ভারতে পাওয়া যায়। অলিগাকৃটিস্‌ হাইড্রার কর্ষিকাগুলি ভুলগারিস হাইড্রার কর্ষিকার চেয়েও বড় হয়। সবুজ রঙের **ক্লোরোহাইড্রো ভিরিডিসিমা** (*Chlorohydra viridissima*) ভারতে পাওয়া যায় না।

হাইড্রার নলাকার দেহের অন্তর্গঠন

(Histology of the body-wall of Hydra)

হাইড্রা বহুকোষী। অ্যামিবা বা মনসিস্‌টিসের মত এককোষবিশিষ্ট নহে। ইহার নলাকার দেহটি দুইটি স্তর-কোষের দ্বারা গঠিত। দেহের বাহিরের কোষস্তরটিকে বহিঃকোষস্তর বা **এক্টোডার্ম** (*Ectoderm*) বলা হয় এবং ভিতরের দিকে, পরবর্তী কোষস্তরটিকে অন্তঃকোষস্তর বা **এনডোডার্ম** (*Endoderm*) বলা হয়। এই দুইটি স্তর লম্বালম্বিভাবে বিদ্যমান। এনডোডার্ম স্তরটি এক্টোডার্ম স্তরের চেয়ে দুই বা তিন গুণ পুরু। এই দুইটি স্তরের মাঝে একটি পাতলা জেলীর মত কোষবিহীন স্তর দেখা যায়। এই স্তরটি এক্টোডার্ম ও এনডোডার্ম, স্তর দুইটির ব্যবধান-প্রাচীররূপে বিদ্যমান। ইহাকে **মেসোগ্লিয়া** (*Mosoglea*) বলা হয়। হাইড্রার দেহ উপরোক্ত কোষবিশিষ্ট দুইটি স্তরে মিলিত হওয়াতে ইহাকে **দুইস্তর-কোষবিশিষ্ট** (*Diploblastic. diplo*=two; *blastic*=layer) প্রাণী বলা হয়। উপরোক্ত দুইটি স্তর, হাইড্রার কোষের ভিতরকার নালীটিকে বেষ্টন করিয়া রাখে। এই অন্তঃনালীটিকে সিলেনটেরন বা **গ্যাসস্ট্রোভ্যাসকিউলার নালী** (*Coelenteron or gastrovascular cavity*) বলে। এক্টোডার্ম হাইড্রার বহিরাবরণ হওয়ায় ইহাকে উহার **বহিত্বক**ও (*epidermis*) বলা হয়। বিবিধ স্তরের কার্যকারিতা বিবিধ। এক্টোডার্মের কোষগুলি হাইড্রাকে উহাদের সংবেদনশীলতার দ্বারা সর্বদা সজাগ করিয়া দেয়। এই স্তরের বিবিধ কোষগুলি নানা উপায়ে হাইড্রাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে এবং সজীব খাদ্য-সংগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। এনডোডার্মের কোষগুলি প্রধানতঃ পুষ্টিক্রিয়ার কাজ করিয়া থাকে। খাদ্যকে ছিন্নভিন্ন করা, পৌষ্টিক উৎসেচক

নিঃসৃত করিয়া খাদ্যখণ্ডগুলিকে তরল ও সরল করা ইত্যাদি এন্‌ডোডার্মের স্তরের কোষগুলির কার্য। মেসোগ্লিয়া স্তরটি এক্টোডার্ম ও এন্‌ডোডার্ম স্তর দুইটিকে সংযুক্ত করে। কর্ষিকার মধ্যস্থ নালীটি অন্তঃনালীর সহিত সংযুক্ত
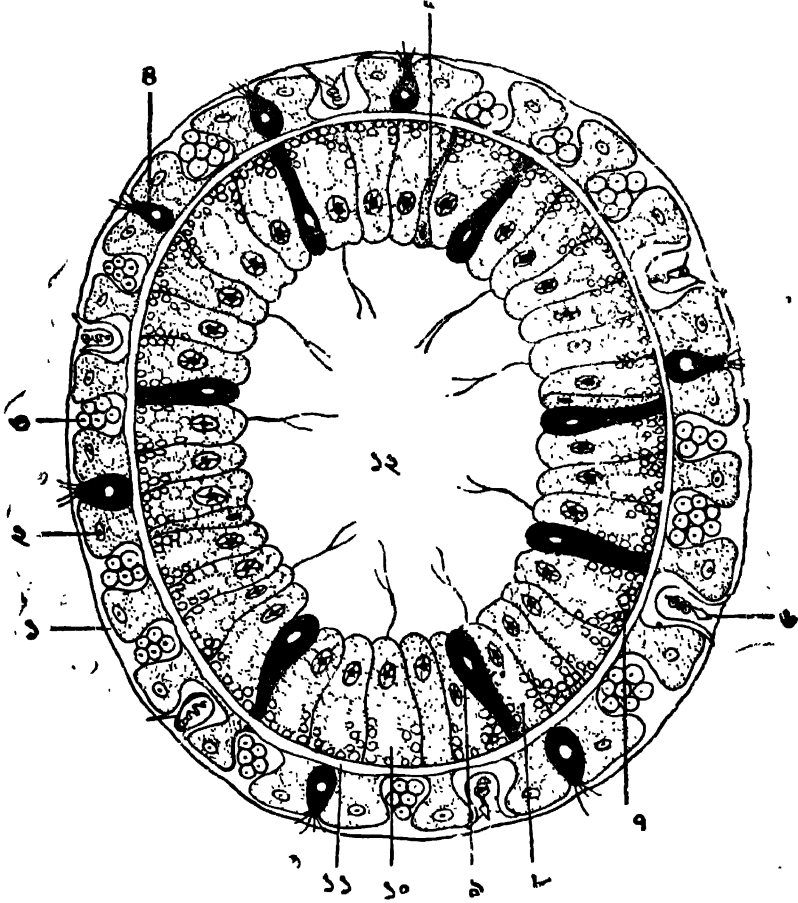
১১নং চিত্র

হাইড্রার দেহের প্রস্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে।

১, কিউটিক্‌ল ; ২, এপিথিলিও মাসকিউলার কোষ ; ৩, ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ ; ৪, স্নায়ু-কোষ ; ৫, সংবেদনশীল কোষ ; ৬, নিডোব্লাস্ট কোষ ; ৭, ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ ; ৮, নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ ; ৯, সংবেদনশীল কোষ ; ১০, ফ্ল্যাজেলাযুক্ত নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ ; ১১, মেসোগ্লিয়া , ১২, সিলেনটেরন বা গ্যাসস্ট্রোভ্যাকিউলার নালা।

থাকে এবং ইহাদের অন্তর্গঠন হাইড্রার দেহের মত দুই-স্তরবিশিষ্ট। এক্টোডার্ম ও এন্‌ডোডার্ম স্তরে বহুপ্রকারের কোষ বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে

একটোডার্মের বিবিধ কোষের সংখ্যা বেশী। নিম্নে একটোডার্মের কোষগুলির বিবরণ দেওয়া হইল :

একটোডার্মের বিবিধ কোষসমূহ
(Ectodermal Cell)

১। **এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষ (Epithelio muscular Cell) :** একটোডার্মের বিবিধ কোষের মধ্যে ইহারাই আকারে বড় এবং প্রধান। কোষগুলি মোটামুটি ত্রিভুজাকৃতি হইলেও উহার বাহিরের দিকে ও ভিতরের দিকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কোষের বাহিরের দিক চওড়া ও প্রসারিত। কোষগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত বাহিরের দিক দিয়া সংযুক্ত হইয়া হাইড্রার **দেহাবরণ বা কিউটিকল** (*Cuticle*) নির্মাণ করে। কোষের ভিতরের দিকের দুই ধার হইতে সরু ও লম্বা পেশী
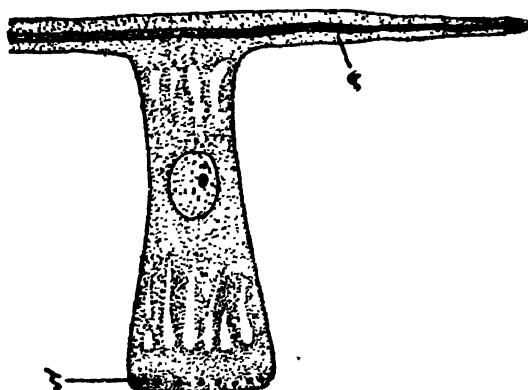
১২নং চিত্র

একটি এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষ দেখান হইতেছে।

১, মাইওনিম পরিবেষ্টিত পেশী অংশ ; ২, গ্রানুলার (Granular) বহির্ভাগ অংশ।

দেখা যায়। কোষগুলি লম্বালম্বিভাবে দেহের সর্বাঙ্গে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সজ্জিত থাকে। কোষের ভিতরের দিকের দুইধারের পেশীগুলি অত্যন্ত সংকোচন-সম্প্রসারণশীল। একটি কোষের পেশী পরবর্তী কোষের পেশীর সহিত দড়ির মত পেঁচানোভাবে থাকায় দেহের চারিপাশে লম্বালম্বিভাবে ইহারা অবস্থান করে। সুতরাং এই পেশীগুলি সংকুচিত করিলে হাইড্রার

দেহ লম্বায় ছোট হইয়া যায় এবং পেশীগুলি প্রসারিত হইলে দেহের দৈর্ঘ্যও বাড়িয়া যায়। এই কোষগুলি দুইটি প্রধান কার্যকারিতার জন্য অর্থাৎ ইহারা দেহকে আবৃত করিয়া রাখে এবং পেশীর সাহায্যে দেহের আকার পরিবর্তন করে বলিয়া, ইহাদিগকে এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষ বলা হয়। প্রতিটি কোষে একটি অপেক্ষাকৃত বড় নিউক্লিয়স থাকে এবং অনেকগুলি ছোট ছোট কোষ-গহ্বর দেখা যায়।
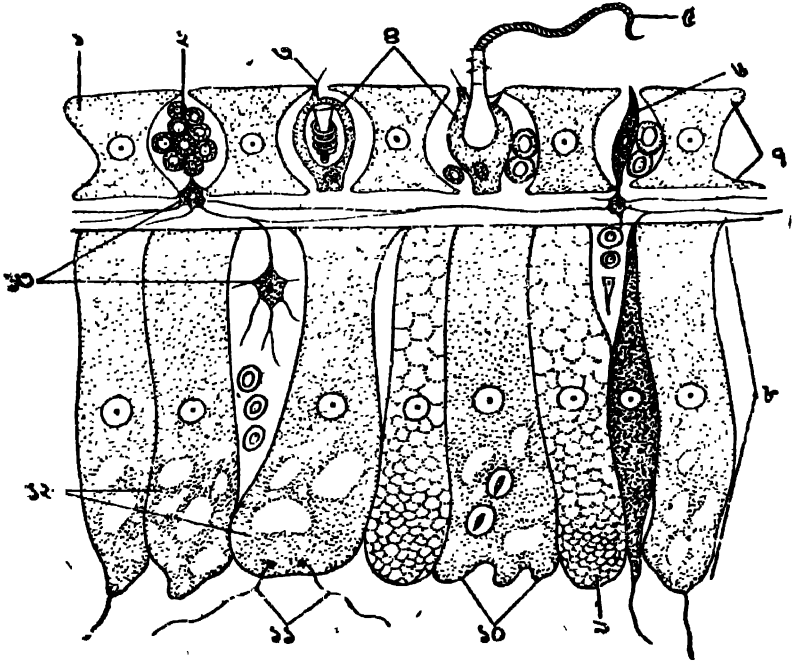
১৩নং চিত্র

হাইড্রার দেহের প্রস্থচ্ছেদ হইতে একটি অংশ বড় করিয়া দেখান হইতেছে।

১, এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষ; ২, ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ; ৩, নিডোসিল; ৪, নিডোব্লাষ্ট কোষ; ৫, নিমাটোসিস্ট; ৬, সংবেদনশীল কোষ; ৭, এক্টোডার্ম; ৮, এনডোডার্ম; ৯, গ্রন্থিকোষ; ১০, ক্ষণপদ-বিশিষ্ট এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষ; ১১, ফ্ল্যাজেলা; ১২, নিউট্রিটিভ-মাসকিউলার কোষ; ১৩, নার্ভকোষ।

বেসাল-ডিস্কের চারিপাশে এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষগুলি সরু সরু অথচ লম্বা গ্রন্থিকোষে রূপান্তরিত হয়। এইরূপ গ্রন্থিকোষ হইতে গাঢ়, চট্‌চটে আঠার মত রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই হাইড্রা যে-কোন কঠিন বস্তুর উপর নিজের দেহকে শক্তভাবে আটকাইয়া রাখিতে পারে।

কখন কখন গ্রন্থিকোষগুলি সর্বপ্রকার গ্যাস নিঃসৃত করে এবং ইহার দ্বারা বেসাল-ডিস্কের ভিতর একটি গ্যাস-বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয়। ইহার সাহায্যে হাইড্রা সময়ে সময়ে বেসাল-ডিস্ক অঞ্চলটিকে উপুড় করিয়া সাঁতার কাটে।

২। **ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial Cell) :** এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষের মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার কোষ প্রচুর দেখা যায়। ইহাদের ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ বলা হয়। ইহারা একস্থানে দশ হইতে ষোলটি করিয়া একটি কোষসমষ্টি নির্মাণ করে। কোষের সাইটোপ্লাজম গাঢ় এবং নিউক্লিয়সটি সুস্পষ্ট। এই কোষগুলিকে উহাদের কার্যকারিতা অনুযায়ী **ভিত্তিকোষও** (*formative cell*) বলা হয়। আমরা যেমন মাটির দ্বারা মানুষ, গরু, ছাগল এবং নানাবিধ দেব-দেবীর মূর্তি গঠন করি, তেমনি এই কোষ হইতে বহুবিধ কোষের সৃষ্টি হয়। হাইড্রার প্রয়োজনবোধে ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ হইতে নিডোব্লাস্ট কোষ, সংবেদনশীল কোষ, নার্ভকোষ ও জনন-কোষেরও সৃষ্টি হয়। সেইজন্য ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষকে ভিত্তি-কোষ বলা হয়। নিম্নে উপরোক্ত কোষগুলির বিবরণ দেওয়া হইল :
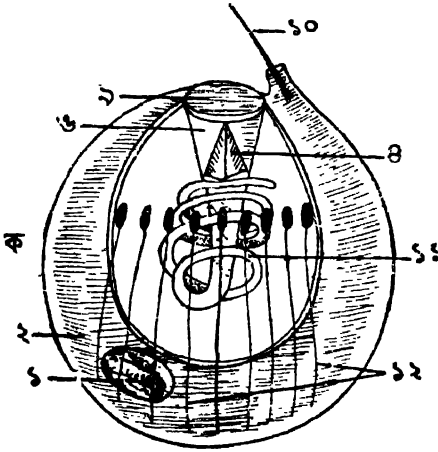
১৪ (ক) নং চিত্র।
পেনিট্রান্ট-জাতীয় নিডোব্লাস্ট কোষের বিবিধ অবস্থা দেখান হইতেছে।
১, নিউক্লিয়স ; ২, নিডোব্লাস্ট কোষ ; ৪, বার্ব বা স্টাইলেট ; ৬, গলা (shaft) ; ৯, ঢাকনা বা অপারকুলাম ; ১০, নিডোসিল ; ১১, বদ্ধ নিমাটোসিস্ট ; ১২, সঙ্কোচন-প্রসারণশীল সাইটোপ্লাজমের সূতা।

(i) **নিডোব্লাস্ট (Cnidoblast ; cnido = nettle) :** এইরূপ কোষকে **দংশনশীল কোষও** (*stinging cell*) বলা হয়। হাইড্রার বেসাল-ডিস্ক অঞ্চল ব্যতীত দেহের সর্বাঙ্গে এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষের মাঝে মাঝে নিডোব্লাস্ট কোষগুলি বিদ্যমান। দেহের উপরিভাগে এবং কর্ষিকাগুলির চারিপাশে ইহারা অধিক পরিমাণে থাকে। একটি পরিণত বা পুষ্ট নিডোব্লাস্ট কোষ আকারে ন্যাসপাতির মত। কোষগুলির

ভিতরে একটি **জলীয় পদার্থপূর্ণ থলি** থাকে। থলির চারিপাশে বেষ্টন করিয়া থাকে কোষের অত্যন্ত সঙ্কোচন-প্রসারণশীল সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়টি সাইটোপ্লাজমের একধারে বিদ্যমান। কোষের উপরিভাগে একটি **ঢাকনা** বা **অপারকুলাম** (*Operculum*) অবস্থান করে এবং ঢাকনার ঠিক পাশে সাইটোপ্লাজম হইতে একটি শক্ত সূতার মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শক্ত সূতাটি সাইটোপ্লাজমের উঁচু অংশ হইতে বাহির হইয়াছে। সমগ্র অংশটিকে বন্দুকের ঘোড়ার (tigger like) মত দেখায়। এই অংশটিকে নিডোব্লাস্ট কোষের **নিডোসিল** (*Cnidocil*) বলা হয়। অপারকুলামের তলা হইতে একটি পেঁচানো সূতার ন্যায় যন্ত্র জলীয় পদার্থপূর্ণ থলির ভিতর নিমগ্ন থাকিতে দেখা যায়। এই পেঁচানো সূতার ন্যায় যন্ত্র, এবং জলীয় পদার্থপূর্ণ থলিটিকে একত্রিত করিয়া **নিমাটোসিস্ট** (*Nematocyst*) নামে অভিহিত করা হয়। নিমাটোসিস্টের সূতাটি খুব শক্ত এবং আকারে নলের মত এবং উহার থলির জলীয় পদার্থের মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক **হিপনোটক্‌সিন্‌** (*hypnotoxin*) থাকে। কোন প্রাণী নিডোব্লাস্ট নিডোসিলের সংস্পর্শে আসিলে বা যে-কোন কারণে নিডোসিল উত্তেজিত হইলে উহা
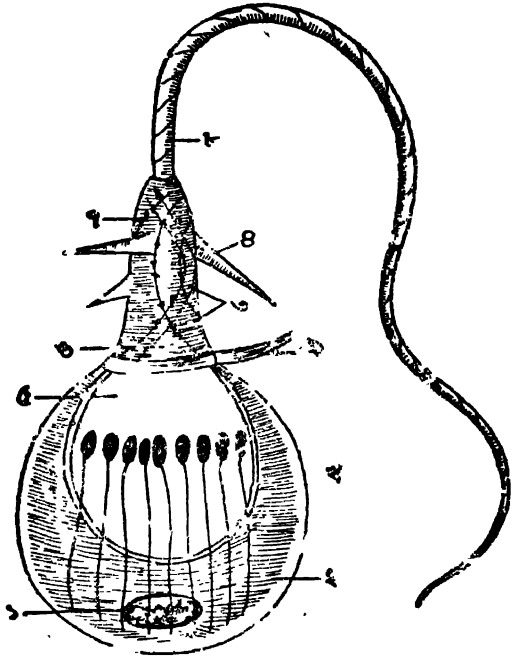
১৪(খ) নং চিত্র
পেনিট্রান্ট জাতীয় নিডোব্লাস্ট কোষের খোলা অবস্থা দেখান হইতেছে।
১, নিউক্লিয়স ; ২, নিডোব্লাস্ট কোষ ; ৩, পেঁচানো দাগ ; ৪, বার্ব বা স্টাইলেট ; ৫, থলি ; ৬, গলা (shaft) ; ৭, ক্ষুদ্র কণ্টক ; ৮, খোলা নিমাটোসিস্ট ; ৯, ঢাকনা বা অপারকুলাম।

সাইটোপ্লাজমের ভিতর তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করে। ফলে সাইটোপ্লাজম অত্যন্ত সঙ্কোচন-প্রসারণশীল হওয়ায় চাপের দ্বারা সঙ্কুচিত হইলে সমগ্র জড়ানো সূতাটি প্রবলবেগে থলির ভিতর হইতে উল্টাইয়া বাহির হইয়া কোষের
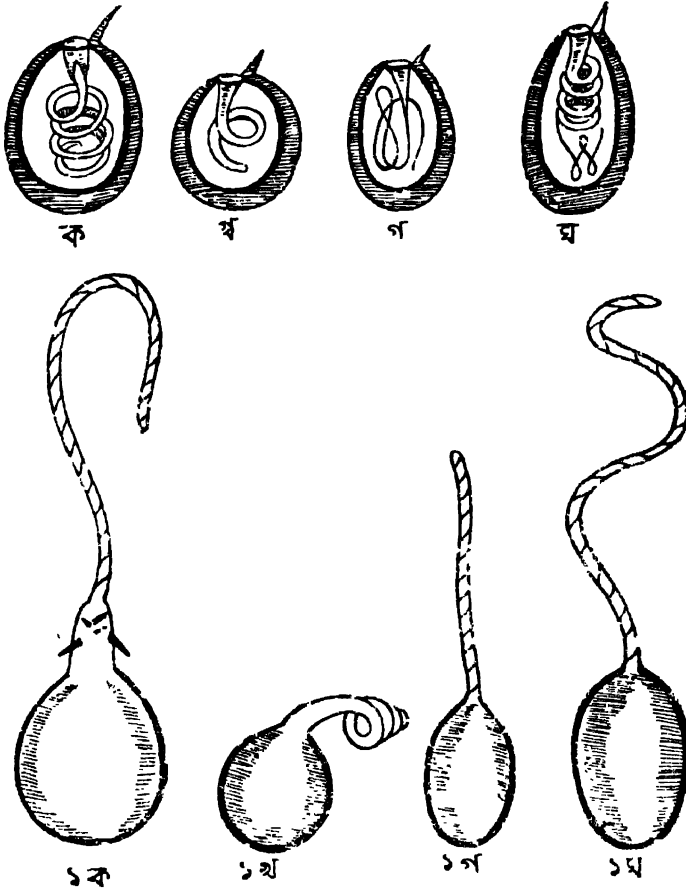
১৫নং চিত্র
বিবিধ প্রকারের নিডোব্লাস্ট কোষ দেখান হইতেছে।
ক—১ক, বন্ধ ও খোলা পেনিট্রাণ্ট জাতীয় কোষ; খ—১খ, বন্ধ ও খোলা ভলভেণ্ট জাতীয় কোষ; গ—১গ, বন্ধ ও খোলা গ্লুটিন্যাণ্ট জাতীয় কোষ; ঘ—১ঘ, বন্ধ ও খোলা বড় গ্লুটিন্যাণ্ট জাতীয় কোষ।

বাহিরে ছিটকাইয়া পড়ে। থলির ভিতরকার হিপনোটক্সিন রাসায়নিক জলীয় পদার্থও নলরূপে সূতার ভিতর দিয়া কোষের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ নিমাটোসিস্টের দ্বারা হাইড্রা খাদ্যপ্রাণীদের শিকার করে। খাদ্যপ্রাণীর

দেহের ভিতর নিমাটোসিস্টের সুতাটি সজোরে প্রবেশ করে এবং ইহার দ্বারা হিপনোটক্সিনের ক্রিয়ার ফলে খাদ্যপ্রাণীগুলি নির্জীব হইয়া যায়। এই ধরণের নিমাটোসিস্ট যে কেবল খাদ্য-সংগ্রহে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, ইহারা শত্রুদের আক্রমণ হইতেও হাইড্রাকে রক্ষা করে। এই প্রকার নিমাটোসিস্টের সুতার গোড়ায় তিন জোড়া কাঁটা থাকে। ইহাদের **বার্ব** (*Barb*) বলা হয়। নানাপ্রকারের নিমাটোসিস্টবিশিষ্ট নিডোব্লাস্ট কোষ হাইড্রার দেহে দেখা যায়, যথা—(ক) **পেনিট্রাণ্ট** (*Penitrant*) বা **প্রবিষ্টশীল :** এইরূপ নিমাটোসিস্টের সুতাটি উল্টাইয়া বাহির হইবার সম্পূর্ণ সোজা হইয়া যায় এবং ইহার ভিতরটা ফাঁপা নলের মত হওয়ায় থলির হিপনোটক্সিন সহজেই সুতার মাধ্যমে কোষের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। সুতাটি সজোরে খাদ্যপ্রাণীর দেহের ভিতর ইন্‌জেক্‌সনের মত প্রবেশ করিয়া হিপনোটক্সিন বিষাক্ত দ্রব্যের সাহায্যে খাদ্যপ্রাণীদের নির্জীব করিয়া দেয়। সুতার গোড়ায় বড় বড় তিনটি কাঁটা থাকে এবং গোড়ার তিনধারে তিন সারি করিয়া ছোট ছোট কাঁটাও দেখা যায়।

(খ) **ভলভেণ্ট** (**Volvent**)**:** এইরূপ নিমাটোসিস্ট আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। সুতাটি পেনিট্রাণ্ট নিমাটোসিস্টের সুতার মত নয়। ইহা লম্বায় অনেক ছোট, পুরু ও নলের মত ফাঁপা নয়। ইহা উল্টাইয়া বাহির হইবার পরও দুই হইতে চারিটি ফাঁসে জড়ানো থাকে। সাধারণতঃ ভলভেণ্ট নিমাটোসিস্ট নির্জীব খাদ্যপ্রাণীকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করে। সুতার গোড়ায় বড় বা ছোট কোন প্রকার কাঁটা থাকে না।

(গ) **গ্লুটিনাণ্ট** (**Glutinant**)ঃ এই প্রকার নিমাটোসিস্টের সংখ্যা সর্বাধিক। ইহাদের আকার বেশ ছোট এবং ইহাদের সুতার গোড়ায়ও কোন প্রকার কাঁটা থাকে না। নিমাটোসিস্টটি উল্টাইয়া গেলে সুতাটি সোজা ও ছোট আকারে দেখা যায়। সুতাটির ভিতর হইতে আঠার মত চট্‌চটে রস নিঃসৃত হয়। ইহার দ্বারা উহারা খাদ্যপ্রাণীকে আটকাইয়া রাখে।

সাধারণতঃ উপরোক্ত তিন প্রকার নিমাটোসিস্টবিশিষ্ট নিডোব্লাস্ট কোষগুলি প্রভূত পরিমাণে দলে দলে কর্ষিকার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া থাকে। প্রত্যেকটি দল বেশ উঁচুভাবে থাকায় উহাদের অস্তিত্ব বাহির হইতেই বুঝা যায়। প্রতিটি দলের মধ্যস্থলে দুই হইতে প্রায় চারিটি পেনিট্রাণ্ট নিমাটোসিস্টবিশিষ্ট নিডোব্লাস্ট কোষ থাকে। এই নিডোব্লাস্ট কোষগুলিকে পরিবেষ্টিত করিয়া

অনেকগুলি ভলভেণ্ট নিমাটোসিস্ট নিডোব্লাস্ট কোষে অবস্থান করে। আবার ইহাদের পরিবেষ্টিত করিয়া অনেকগুলি গ্লুটিন্যাণ্ট নিমাটোসিস্টবিশিষ্ট নিডোব্লাস্ট কোষ বিদ্যমান। বিবিধ প্রকৃতির নিডোব্লাস্ট কোষগুলি এইভাবে দল নির্মাণ করায় উক্ত স্থানটি বেশ উঁচু দেখায়। এই দলগুলিকে **নিমাটোসিস্টের ব্যাটারী** (*Batteries of nematocysts*) বলে। এই প্রকার ব্যাটারী কর্ষিকাগুলির দুইধারে এবং হাইড্রার দেহের দুই ধারে প্রচুর দেখা যায়। এইরূপ ব্যাটারীর কার্যকারিতাও অভিনব। হাইড্রার কর্ষিকাগুলি খাদ্যপ্রাণীর সংস্পর্শে আসিলে প্রথমে ব্যাটারীর মধ্যস্থ পেনিট্রাণ্ট নিমাটোসিস্টগুলি উল্টাইয়া খাদ্যপ্রাণীর দেহে প্রবেশ করে এবং উহাকে নির্জীব করিয়া দেয়। এই সময়ের মধ্যে ভলভেণ্ট নিমাটোসিস্টগুলি উল্টাইয়া খাদ্যপ্রাণীকে জড়াইয়া ধরে, তখন গ্লুটিন্যাণ্ট নিমাটোসিস্টগুলি উল্টাইয়া উহাদের দেহ-নিঃসৃত রসের দ্বারা খাদ্যপ্রাণীটিকে চারিধার হইতে হাইড্রার দেহের সহিত আটকাইয়া রাখে। ইহার পর কর্ষিকাগুলি খাদ্যপ্রাণীকে হাইড্রার মুখগহ্বরের ভিতর প্রবেশ করায়। যে-কোন নিডোব্লাস্ট কোষ উহার ভিতরকার নিমাটোসিস্ট একবার ব্যবহার করিলে বা উহার নিমাটোসিস্ট একবার উল্টাইয়া গেলে, কোষটি ধীরে ধীরে মরিয়া যায়। কারণ উহার নিমাটোসিস্টটি পুনরায় কোষের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না এবং কোষগুলি মৃত হইলে হাইড্রার দেহ হইতে ঝরিয়া পড়ে। উহার স্থানে নূতন ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি আবার বিবিধ প্রকারের নিমাটোসিস্টবিশিষ্ট নিডোব্লাস্ট কোষে রূপান্তরিত হয় এবং ব্যাটারী নির্মাণ করে। গ্লুটিন্যাণ্ট নিমাটোসিস্টবিশিষ্ট নিডোব্লাস্ট কোষগুলি, সুতা চটচটে হওয়ায়, উহা হাইড্রার চলন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

১৬নং চিত্র
ভলভেণ্ট নিমাটোসিস্ট কিভাবে কীটের বিবিধ উপাঙ্গে জড়ান থাকে তাহা দেখান হইতেছে।

(ii) **সংবেদনশীল কোষ** (Sensory cell): ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি পরিবর্তিত হইয়া সংবেদনশীল কোষে পরিণত হয়। এইরূপ

কোষগুলি আকারে সরু মাকুর মত। ইহার দুই দিক সরু ও সূচালো হয়। সাধারণতঃ ইহারা এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম কোষস্তরের কোষের মাঝে মাঝে থাকে। এক্টোডার্মের এপিথিলিও মাসকিউলার কোষগুলির মাঝে মাঝে ফাঁকা স্থান দেখিতে পাওয়া যায় এবং এক্টোডার্মের সংবেদনশীল কোষগুলির আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। এনডোডার্মের নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষগুলির মাঝে মাঝে সংবেদনশীল কোষগুলি বিদ্যমান। সাধারণতঃ ইহাদের এক প্রান্তের সূতার ন্যায় ফ্ল্যাজিলা, নার্ভ-কোষের বিবিধ শাখার সহিত সংযুক্ত থাকে।

(iii) **নার্ভ-কোষ (Nerve cell) :** ইহাদের আকার মাকড়সার মত। ইহারাও ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি হইতে সৃষ্ট। নার্ভ-কোষের মূল কোষটি খুবই ছোট হয় কিন্তু ইহার প্রোটোপ্লাজম হইতে সূতার মত চারিপাশ হইতে অনেকগুলি লম্বা লম্বা শাখা বা নার্ভ বাহির হয়। এই নার্ভগুলি এপিথিলিও মাসকিউলার কোষের ভিতর প্রবেশ করে এবং নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষের পেশীর মধ্যেও প্রবেশ করে। আগেই বলা হইয়াছে যে, সংবেদনশীল কোষের ফ্ল্যাজিলাটি নার্ভ-কোষের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সাধারণতঃ নার্ভকোষগুলি কোষহীন মেসোগ্লিয়া স্তরের ধারে ধারে সজ্জিত থাকে এবং ইহাদের নার্ভগুলি এক্টোডার্ম ও এনডোডার্ম স্তরের কোষগুলির মধ্যে ছড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। সংবেদনশীল কোষগুলির দেহের বাহিরে অনুভূতি গ্রহণ করে এবং নার্ভ-কোষের সহিত সংযুক্ত থাকায় নার্ভকোষগুলিও অনুভূতির স্বাদ পায়। আবার নার্ভ-কোষের সঙ্গে এপিথিলিও মাসকিউলার কোষ এবং নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষের সংযোগ থাকায় উপরোক্ত কোষগুলিও অনুভূতি গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনানুযায়ী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। হাইড্রার দেহের ভিতর নার্ভ-কোষগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া একটি নার্ভজালের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেইজন্যই হাইড্রা বাহির হইতে যে-কোন অনুভূতি পাইলে তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইয়া নিজ দেহকে ছোট বা বড় করিতে পারে।

(iv) **জনন-কোষ (Reproductive Cell) :** হাইড্রার জনন-কোষগুলি ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ হইতে সৃষ্ট হয়। পুং-জনন-কোষগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি পরিবর্তিত হইয়া সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ একটি শুক্রকীটে পরিণত হয়। কিন্তু

স্ত্রী-জনন-কোষ কেবলমাত্র একটি ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষের পরিবর্তিত রূপ। অন্যান্য ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া তরল খাদ্যে পরিণত হয় এবং এই তরল খাদ্যের সাহায্যে স্ত্রী-জনন-কোষটি গর্ভকোষে পরিণত হয়।

এনডোডার্মের বিবিধ কোষসমূহ
(Endodermal Cells)

পুষ্টিসাধন করাই এনডোডার্মের কোষগুলির প্রধান কার্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এনডোডার্ম স্তর এক্টোডার্ম স্তরের চেয়ে তিন বা চার গুণ পুরু। এই স্তরের কোষগুলিও বেশ বড় এবং নানা প্রকার ও প্রকৃতির কোষ এই স্তরে বিদ্যমান। নিম্নে বিবিধ এনডোডার্মের কোষগুলি বিবরণ দেওয়া হইল। যথা:
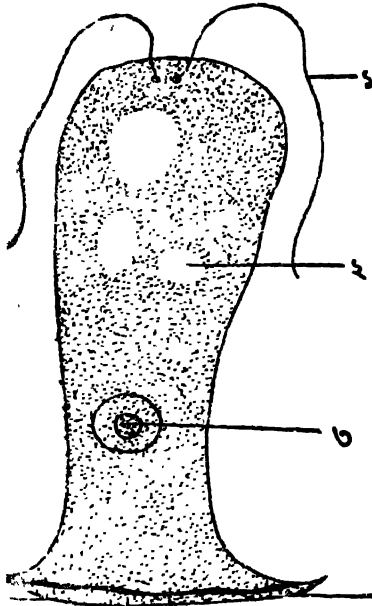
১৭নং চিত্র
এনডোডোর্মের ফ্ল্যাজিলার নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ দেখান হইতেছে।
১, ফ্ল্যাজিলা ; ২, কোষ-গহ্বর ;
৩, নিউক্লিয়স।

১। এপিথিলিও-মাসকিউলার বা নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ (Epithelio-mascular or Nutritive mascular cell) : এক্টোডার্মের এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষে ইহাদের উৎপত্তি হইলেও আকারে ইহারা বেশ লম্বা। হাইড্রার সিলেনটেরন গহ্বরকে এই কোষগুলি বেষ্টন করিয়া থাকে। কোষগুলির বাহিরের প্রান্ত বা মেসোগ্লিয়া স্তরের দিকে যে প্রান্তটি অবস্থান করে, তাহা বেশ সরু। কোষের এই সরু অংশ পেশীতে পরিণত হইয়াছে। প্রতিটি কোষের এই সরু পেশী-অংশটি পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া হাইড্রার দেহের ভিতর একটি পেশী বৃত্তের সৃষ্টি

করে। এই বৃত্তীয়-পেশী সঙ্কুচিত হইলে হাইড্রার দেহের প্রসার কমিয়া যায়, সুতরাং উহা আকারে আরও লম্বা হয়। সেইরূপ বৃত্তীয়-পেশী প্রসারিত হইলে হাইড্রা-দেহের পরিসর বাড়িয়া যায় এবং ইহাতে দেহের আকার খর্ব হয়। এই প্রকার কোষের ভিতর-প্রান্তটি প্রসারিত এবং হাইড্রার সিলেনটেরন গহ্বরে মুক্ত হয়। কতকগুলি নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ আবার পরিবর্তিত
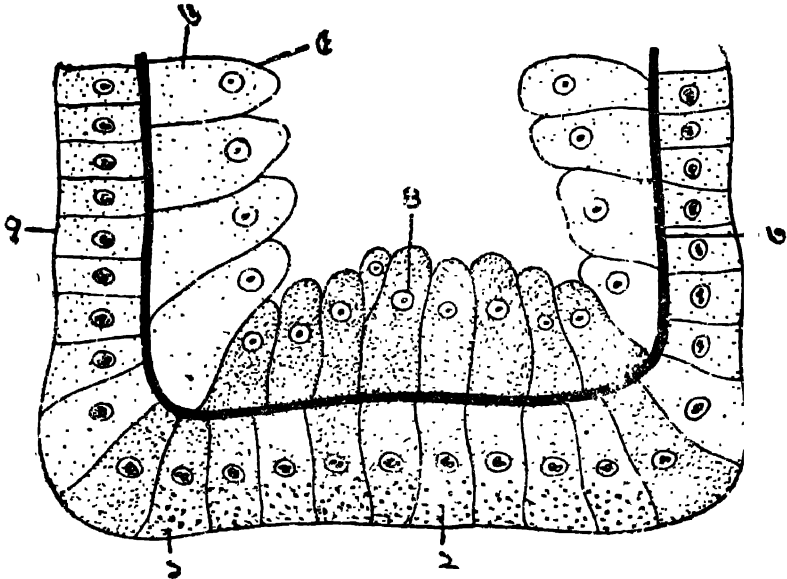
১৮নং চিত্র

হাইড্রার দেহের লম্বচ্ছেদ হইতে উহার বেসাল-ডিস্ক অঞ্চলের কোষগুলিকে বড় করিয়া দেখান হইতেছে।

১, গ্রন্থিকোষ ; ২. লালাবিন্দু (Mucus granules) ; ৩, মেসোগ্লিয়া ; ৪, বেসাল-ডিস্কের এনডোডার্ম কোষ ; ৫—৬, সাধারণ এনডোডার্ম ; ৭. এক্টোডার্ম।

হইয়া বিবিধ আকার ধারণ করে ; যথা—(i) কতকগুলি কোষের ভিতর-প্রান্তে দুইটি সরু লম্বা সুতার মত ফ্ল্যাজিলা থাকে। ইহার দ্বারা কোষগুলি একটি নির্দিষ্ট কাজ করে। খাদ্যপ্রাণী মুখ-গহ্বরের ভিতর দিয়া সিলেনটেরন গহ্বরে প্রবেশ করিলে এই কোষগুলি আপন ফ্ল্যাজিলার সঞ্চালনে সিলেনটেরন গহ্বর জলীয় পদার্থকে গহ্বরের ভিতর বৃত্তাকার প্রবাহের সৃষ্টি করে।

ইহাতে খাদ্যপ্রাণীটি সিলেনটেরন গহ্বরে ঘুরিতে থাকে। আবার এই প্রকার কোষের ফ্ল্যাজিলার আঘাতের চোটে খাদ্যপ্রাণীগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। সুতরাং এই ফ্ল্যাজিলাযুক্ত নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষগুলি খাদ্যকে পরিপাক করিতে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। ইহাদের সাধারণতঃ **ফ্ল্যাজিলা-যুক্ত নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ** (*Flagellated nutritive mascular cell*) বলা হয়। (ii) আবার কতকগুলি নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ উহার ভিতরকার প্রান্ত হইতে অ্যামিবার মত ক্ষণপদ সৃষ্টি করে। এই ক্ষণপদের দ্বারা কোষগুলি খাদ্যপ্রাণীর সূক্ষ্ম দেহখণ্ডগুলিতে অ্যামিবার মত খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি করিয়া নিজ দেহের ভিতর টানিয়া লয় এবং পরে পরিপাক করে। এইরূপ কোষের দ্বারা হাইড্রা খাদ্যের কিছুটা অংশ হজম করে। এই প্রকার কোষগুলিকে **অ্যামিবাকৃতি নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ** (*Amoeboid nutritive mascular cell*) বলা হয়।

২। **গ্রন্থিকোষ (Gland cell):** নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষের মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা সরু গ্রন্থিকোষ দেখা যায়। এইরূপ গ্রন্থিকোষ হইতে খাদ্য পরিপাকের জন্য বিবিধ রাসায়নিক উৎসেচক নিঃসৃত হয়। এই উৎসেচকগুলি হাইড্রার সিলেনটনের গহ্বরে মিশ্রিত হয় এবং খাদ্যপ্রাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলিকে কঠিন ও জটিল অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত করে। বেসাল ডিস্কের গ্রন্থিকোষগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। কিন্তু হাইপোস্টমের এনডোডার্ম স্তরের গ্রন্থিকোষগুলি আকারে বেশ বড় হয় এবং অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যায় ও বেশী পরিমাণে রাসায়নিক উৎসেচক নিঃসৃত করে। স্বতন্ত্র খাদ্যনালী হাইড্রার দেহে নাই। সিলেনটনের গহ্বরই ইহার দেহের একমাত্র গহ্বর এবং ইহার ভিতরেই যাবতীয় বিপাকীয় কার্য সম্পন্ন হয়। গ্রন্থিকোষের সাইটোপ্লাজম ঘন দানা-দানা মত এবং কোষ-গহ্বরবিহীন কিন্তু নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষের মধ্যস্থলে বেশ বড় একটি কোষ-গহ্বর দেখা যায়। গ্রন্থিকোষ এবং বিবিধ নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষের মাঝে মাঝে অবশিষ্ট ফাঁকা স্থানে প্রচুর সংবেদনশীল কোষ, নার্ভ-কোষ এবং ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষের অস্তিত্ব দেখা যায়। সুতরাং এনডোডার্ম স্তরটি নানাবিধ কোষে ভরিয়া থাকে।

বহুকোষী হাইড্রার অন্তর্গঠনের কোষগুলি এবং উহার কার্যকারিতা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে একটি নির্দিষ্ট নীতির সন্ধান পাওয়া যায়।

ইহার দেহের **কোষ-বৈশিষ্ট্য** (*Cellular differentiation*) **প্রাণীর জৈবনিক শ্রম-বিভাজন** (*Physiological division of labour*) ব্যবস্থার সহিত সমতা রক্ষা করে। প্রতিটি কোষ অন্যান্য কোষের সহযোগিতায় এক
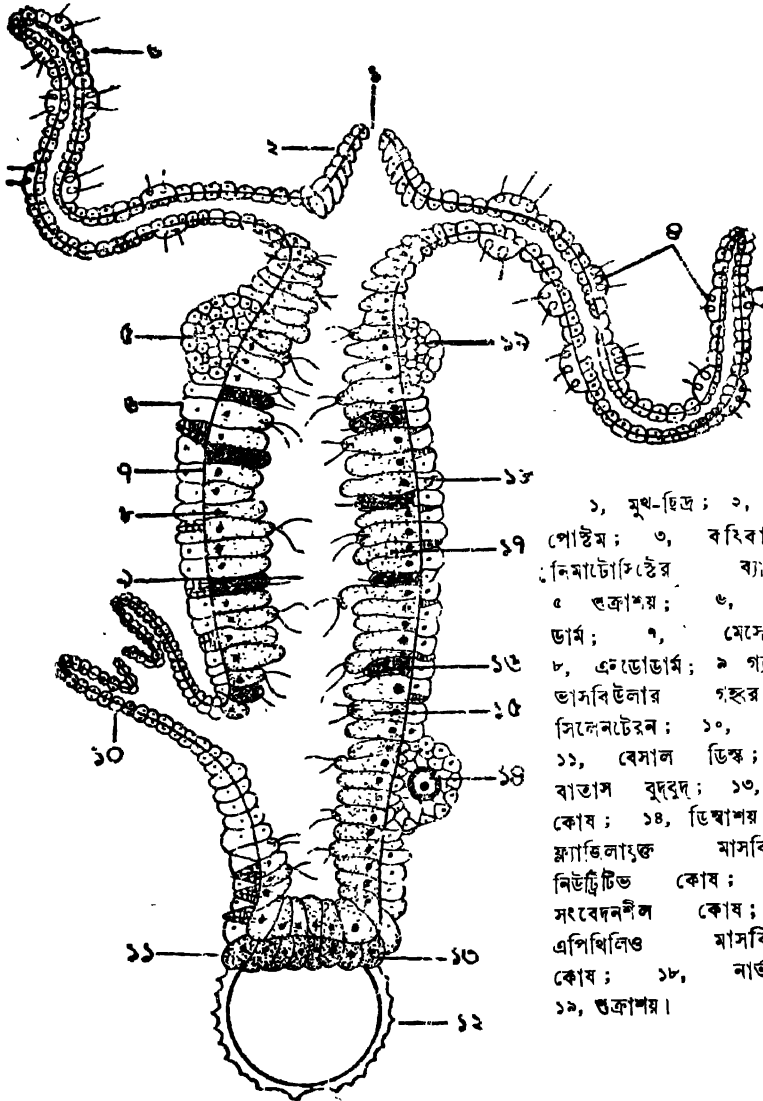
১, মুখ-ছিদ্র ; ২, হাইপোস্টম ; ৩, কর্ষিকা ; ৪, নিমাটোসিস্টের ব্যাটারী ; ৫ শুক্রাশয় ; ৬, এক্টোডার্ম ; ৭, মেসোগ্লিয়া ; ৮, এন্ডোডার্ম ; ৯ গ্যাস্ট্রোভাসকিউলার গহ্বর বা সিলেনটেরন ; ১০, কুঁড়ি ; ১১, বেসাল ডিস্ক ; ১২, বাতাস বুদ্বুদ ; ১৩, গ্রন্থি, কোষ ; ১৪, ডিম্বাশয় ; ১৫- ফ্ল্যাজিলাযুক্ত মাসকিউলো-নিউট্রিটিভ কোষ ; ১৬, সংবেদনশীল কোষ ; ১৭, এপিথিলিও মাসকিউলার কোষ ; ১৮, নার্ভ-কোষ ১৯, শুক্রাশয়।

১৯নং চিত্র

হাইড্রার লম্বচ্ছেদের দ্বারা উহার বিবিধ কোষস্তর ও কোষস্তরগুলি দেখান হইতেছে।

একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করে। প্রতিটি কোষের নির্দিষ্ট কার্যকারিতা দ্বারা একত্রে হাইড্রা তাহার জীবনের যাবতীয় জৈবনিক কার্য সম্পন্ন করিয়া সহজ ও সরলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। যেমন হাইড্রার এক্টোডার্মের কোষগুলি কিউটিকল নির্মাণ করে এবং খাদ্য সংগ্রহ ও শত্রু হইতে হাইড্রাকে রক্ষা করে, তেমনি এনডোডার্মের কোষগুলি প্রধানতঃ খাদ্য পরিপাক করে। সংবেদনশীল নার্ভকোষগুলি হাইড্রার দেহের সর্বাঙ্গে জাল বিস্তার করিয়া থাকায়, প্রাণীটিকে বাহিরের যে-কোন উদ্দীপক অনুভূতির সূচনা দ্বারা তাহাকে সজাগ করিয়া দেয়। নিডোব্লাস্টকোষগুলি হাইড্রাকে খাদ্যপ্রাণী সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে এবং শত্রু হইতে রক্ষা করে। জনন-কোষগুলি হাইড্রার বংশবৃদ্ধি প্রণালীকে পরিচালিত করে। ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি প্রধানতঃ ভিত্তিকোষ হওয়ার শূন্যস্থান পূর্ণ করে। ইহাদের দ্রুত বিভাজনের ফলেই হাইড্রার কুঁড়ির সৃষ্টি হয়। এক্টোডার্মের এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষগুলি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া হাইড্রা দেহকে ছোট বা বড় করিতে পারে এবং এনডো-ডার্মের নিউট্রিটিভ-মাসকিউলার কোষগুলিও অনুরূপভাবে হাইড্রার দেহটিকে ছোট বা বড় করে। সাধারণতঃ এক্টোডার্মের এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষের দ্বারা হাইড্রার দেহ ছোট হইয়া গোলাকারে পরিণত হয় এবং এনডোডার্মের নিউট্রিটিভ-মাসকিউলার কোষের দ্বারা হাইড্রার দেহ প্রসারিত বা লম্বা হয়। গ্রন্থিকোষগুলি, পরিপাকের জন্য, রাসায়নিক উৎসেচক নিঃসৃত করে। ফ্ল্যাজিলামুক্ত কোষগুলি খাদ্যপ্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেয় এবং সিলেনটেরন-গহ্বরে প্রবাহের সৃষ্টি করে। অ্যামিবাকৃতি কোষগুলি খাদ্যখণ্ডগুলিকে নিজ দেহের ভিতর টানিয়া লইয়া পরিপাক করে। সুতরাং "হাইড্রার দেহের কোষ-বৈশিষ্ট্য জৈবনিক শ্রম-বিভাজন ব্যবহারের সহিত সমতা রক্ষা করে"—কথাটি যে কত সত্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। নিম্নে হাইড্রার দেহগঠনের বিবিধ কোষগুলির একটি সাধারণ ছক দেওয়া হইল।
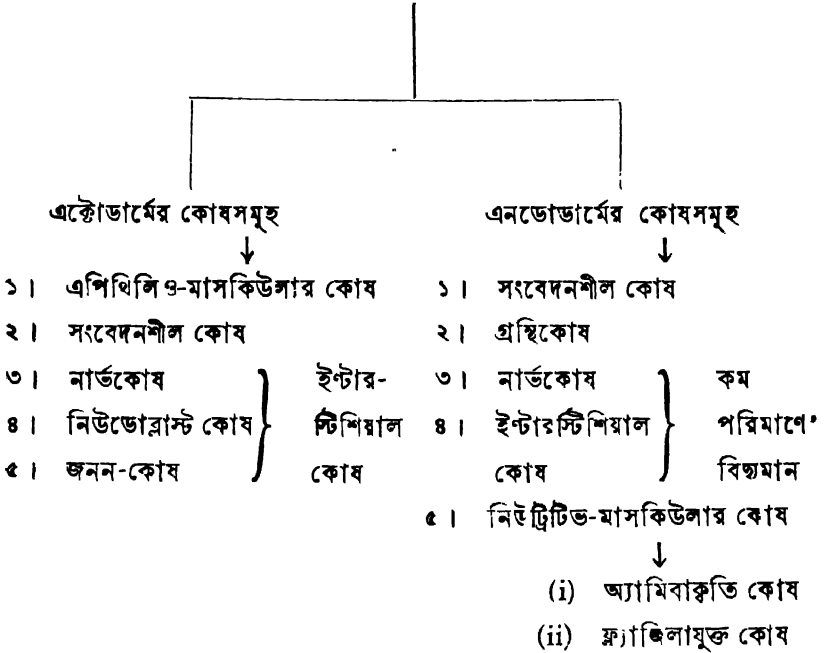
খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক

(Feeding and Digestion)

খাদ্যগ্রহণঃ হাইড্রা জলজ প্রাণী ; স্বভাবতঃই ইহাদের খাদ্যও জলজ-প্রাণীভুক্ত। সন্ধিপদ পর্বভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী, যথা—ডাফনিয়া, সাইক্লপস্ এবং জলজ পতঙ্গের শূককীটগুলি হাইড্রার প্রিয় খাদ্য। হাইড্রা ক্ষুধার্ত হইলে সমগ্র দেহটিকে প্রসারিত করিয়া খাদ্য-অন্বেষণে উহার কর্ষিকাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চালিত করে। কিন্তু ক্ষুধার্ত হইয়াও খাদ্যপ্রাণীর সন্ধান না পাইলে হাইড্রা ক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এই সময় হাইড্রা নিজ দেহ হঠাৎ সঙ্কুচিত করিয়া গোলাকারে পরিণত করে এবং পরক্ষণেই আবার দেহটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করিয়া কোষগুলিকে বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চালিত করে। হাইড্রার এইরূপ ব্যবহারকে **ক্ষুধাজনিত সঞ্চালন** (*Hunger Movement*) বলা হয়। কিন্তু খাদ্যপ্রাণীর অস্তিত্ব নাগালের মধ্যে পাইলে হাইড্রা সর্বপ্রথমে উহার নিমাটোসিস্টের ব্যাটারীগুলির দ্বারা উহাকে আক্রমণ করে। পেনিট্রাণ্ট নিমাটোসিস্টের দ্বারা খাদ্যপ্রাণীটি প্রথমে নির্জীব হইয়া যায় এবং পরক্ষণেই

ভলভেণ্ট ও গ্লুটিন্যাণ্ট নিমাটোসিস্টগুলি নির্জীব প্রাণীটিকে কর্ষিকার সহিত আটকাইয়া রাখে। কর্ষিকাগুলি ইহার পর খাদ্যপ্রাণীটিকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া ধরে এবং ইহারা সঙ্কুচিত হইয়া ধীরে ধীরে খাদ্যপ্রাণীটিকে হাইড্রার মুখ-গহ্বরের সম্মুখে উপস্থিত করে; পরে অন্যান্য কর্ষিকার সাহায্যে, খাদ্য-প্রাণীটিকে হাইড্রা, মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয়। সময় সময় দেখা গিয়াছে যে, হাইড্রা নিজের দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশী দীর্ঘ প্রাণী আহার্য হিসাবে গ্রহণ করে।

পরিপাক (Digestion): খাদ্যপ্রাণীটি মুখের ভিতর দিয়া হাইড্রার সিলেনটেরন গহ্বরে প্রবেশ করে। ফ্ল্যাজিলাযুক্ত নিউট্রিটিভ-মাসকিউলার কোষগুলি সিলেনটেরন গহ্বরের জলীয় রসে প্রবাহ সৃষ্টি করে। ইহা দ্বারা খাদ্যপ্রাণীটি গহ্বরের ভিতর ঘুরিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নরম হইয়া যায়। কারণ গ্রন্থিকোষগুলি ক্রমাগত ক্ষারীয় উৎসেচক রস নিঃসৃত করিয়া সিলেনটেরন গহ্বরের রসের সহিত মিশ্রিত করে। এই ক্ষারীয় উৎসেচকের ক্রিয়ার ফলে খাদ্যপ্রাণীটি নরম হইয়া যায়। প্রাণীটি ফ্লাজিলার সংস্পর্শে আসিলে উহার দ্রুত আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। গ্রন্থিকোষের দ্বারা নিঃসৃত রাসায়নিক উৎসেচকের মধ্যে প্রোটিন-খাদ্য পরিপাককারী **ট্রিপসিন** (*Trypsin*)-এর প্রাধান্য বেশী। ইহা সর্বপ্রথমে খাদ্যের প্রোটিন অংশগুলিকে তরল ও সরল করে। পরে তরল ও সরল প্রোটিন-খাদ্যগুলি ব্যাপন-ক্রিয়ার দ্বারা নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষগুলি শোষণ করিয়া লয়। নিউট্রিটিভ-মাসকিউলার কোষগুলি এক্টোডার্মের বিবিধ কোষগুলিকে খাদ্য-রস সরবরাহ করে। এইরূপ পরিপাক সিলেনটেরন-গহ্বরের ভিতর হয় বলিয়া ইহাকে **বহিঃকোষীয় পরিপাক** (*Extracellular digestion*) ক্রিয়া বলা হয়। অ্যামিবাকৃতি নিউট্রিটিভ-মাসকিউলার কোষগুলি ঠিক অ্যামিবার মত ক্ষণপদ নিক্ষিপ্ত করিয়া খাদ্যের সূক্ষ্ম খণ্ডগুলিকে দেহের ভিতর **খাদ্য-গহ্বর** (*food vacuole*) নির্মাণ করিয়া টানিয়া লয়। অ্যামিবার মত খাদ্য-গহ্বরে প্রথমে এই কোষের সাইটোপ্লজম হইতে অ্যাসিড নিঃসৃত হইয়া খাদ্য-গহ্বরের রসকে অম্ল করিয়া দেয় এবং পরে পেপসিন উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া প্রোটিন-খাদ্যগুলিকে তরল ও সরল করে। খাদ্যের জল-অঙ্গার ও স্নেহপদার্থগুলি পরে ক্ষারীয় মাধ্যমে বিবিধ উৎসেচক দ্বারা পরিপাক হয়। সুতরাং হাইড্রা উহার কিছু অংশ খাদ্য-কোষের ভিতর পরিপাক করে। এই ধরণের পরিপাক ক্রিয়াকে

অন্তঃকোষীয় পরিপাক (*Intercellular digestion*) বলা হয়। সাধারণতঃ খাদ্যের প্রোটিন-অংশ বহিঃকোষীয় পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা তরল ও সরল হয় এবং খাদ্যের জল-অঙ্গার ও স্নেহপদার্থ-অংশ অন্তঃকোষীয় পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা তরল ও সরল হয়। কিছু প্রোটিন অংশ অন্তঃকোষীয় পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারাও তরল হয়। কারণ খাদ্যের সমগ্র প্রোটিন-অংশ বহিঃকোষীয় পরিপাক-ক্রিয়ার দ্বারা সহজ ও তরল হয়। অবশিষ্ট প্রোটিন-অংশগুলি অন্তঃকোষীয় পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা হজম হয়। মুখ-গহ্বর ব্যতীত হাইড্রার অন্য কোন বহিঃছিদ্র না থাকায় অপরিপাক খাদ্যগুলি সিলেনটেরনের অতিরিক্ত জলের সহিত মুখ-গহ্বর দিয়াই দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।

চলন-প্রক্রিয়া
(Locomotion)

হাইড্রা খুবই সজাগ ও চঞ্চল। ইহাদের চলন-প্রক্রিয়া বহুপ্রকারের। সাধারণতঃ দুই প্রকার চলন-প্রক্রিয়ার দ্বারা হাইড্রা চলাফেরা করিয়া থাকে। প্রথম প্রক্রিয়ায় হাইড্রা সঙ্কুচিত হইয়া যে-কোন একদিকে বাঁকিয়া যায় এবং কঠিন বস্তুর সহিত উহার কর্ষিকাগুলিকে আটকাইয়া দেয়। কর্ষিকাগুলিতে গ্লুটিন্যাণ্ট নিমাটোসিস্ট থাকায় উহা চট্‌চটে রস নিঃসৃত করে এবং রসের দ্বারাই কর্ষিকাগুলি কঠিন বস্তুর সহিত আটকাইতে পারে। ইহার পর হাইড্রার বেসাল-ডিস্ক অংশটি কঠিন বস্তুটিকে ত্যাগ করিয়া মুখের দিকে আগাইয়া আসে। ইহাতে হাইড্রার দেহের মধ্যভাগটি উঁচু হইয়া যায় এবং উহার বেসাল-ডিস্ক ও মুখ, খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। এখন কর্ষিকাগুলি কঠিন বস্তুটিকে ত্যাগ করে এবং হাইড্রা প্রসারিত হইয়া দেহটিকে বেশ লম্বা করে। কঠিন বস্তুর নূতন স্থানে হাইড্রা আবার উহার কর্ষিকাগুলিকে পূর্ববর্ণিত উপায়ে আটকায়। হাইড্রা প্রসারতি হইলে বেশ কিছুটা স্থানান্তর ঘটে এবং নূতন স্থানে কর্ষিকা আটকাইয়া উহা পুনরায় বেসাল ডিস্ক অংশ স্থানচ্যুত করিয়া মুখের কাছে সরিয়া আসে। এইভাবে হাইড্রা চলাফেরা করে। এই প্রক্রিয়া সাধারণতঃ খুবই দ্রুত হয় এবং হাইড্রা খুব তাড়াতাড়ি আগাইয়া যায়। দ্রুতগতিতে হাইড্রা যখন চলে, তখন উহার চলন-প্রক্রিয়া জোঁকের মত হয়। এইরূপ চলন-প্রক্রিয়াকে **হামাগুড়ি দিয়া চলা** (*Looping*) বলে। দ্বিতীয় প্রকার চলন-

প্রক্রিয়াকে **ডিগবাজী দিয়া চলা** (*Somersault*) বলে। এই প্রকার চলন-প্রক্রিয়ায় হাইড্রা কঠিন বস্তুর সহিত কর্ষিকাগুলিকে আটকাইবার পর উহার উপর ভর করিয়া খাড়াভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় হাইড্রার মুখ নিম্নে ও উহার বেসাল-ডিস্ক ঊর্ধ্বে থাকে। পরে হাইড্রা উহার দেহটিকে বাঁকাইয়া একধারে কঠিন বস্তুর সহিত বেসাল ডিস্কটিকে আটকাইয়া দেয় এবং অপর দিক হইতে কর্ষিকাগুলিকে স্থানচ্যুত করে। ক্রমান্বয়ে এইরূপ খুব দ্রুত প্রক্রিয়ায় হাইড্রা বেশ কিছুটা আগাইয়া যায়। ইহা ব্যতীত হাইড্রা গুঁড়ি মারিয়া বেসাল-
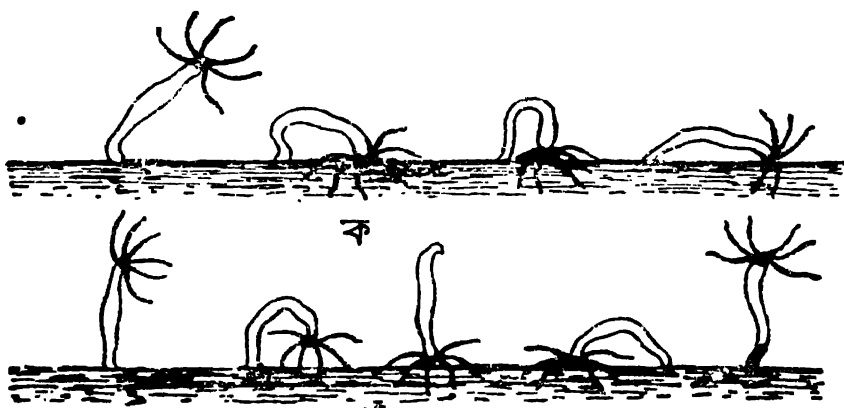
২০ নং চিত্র

রেখাচিত্রের দ্বারা হাইড্রার বিবিধ চলন দেখান হইতেছে।

ক, হামাগুড়ির দ্বারা চলন (looping movement) ; খ, ডিগবাজীর দ্বারা চলন (somersaulting movement)।

ডিস্কের উপর ভর করিয়া অল্প কিছুদূর যাইতে পারে। বেসাল-ডিস্কের কোন কোন কোষ অ্যামিবার মত ক্ষণপদ বিস্তার করিতে পারায় এইরূপ গুঁড়ি মারিয়া স্থানান্তর সম্ভবপর হয়। মাঝে মাঝে হাইড্রা কর্ষিকাগুলিকে পদের ন্যায় ভর দিয়া খাড়াভাবে বেসাল-ডিস্ককে উঁচু করিয়া চলে। আবার কখন কখন হাইড্রা জলে ভাসিয়া বেড়ায়। ডিস্কের গ্রন্থিকোষ হইতে গ্যাসীয় বুদ্বুদ নির্গত হয় এবং উহা বেসাল-ডিস্কের তলায় জমা হয়। এই গ্যাসের জন্যই হাইড্রা ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। মানুষ যেভাবে গাছে চড়ে, হাইড্রাও সেইভাবে

উহার কর্ষিকার সাহায্যে কোন কঠিন বস্তুর উপর আরোহণ করিতে পারে। হাইড্রা মূলতঃ সর্বদাই যে-কোন বস্তুর সহিত আটকাইয়া থাকে এবং কেবলমাত্র উহার কর্ষিকাগুলিকে ইতস্ততঃ প্রসারিত করে। কিন্তু বিপাকে পড়িলে হাইড্রা উপরোক্ত প্রকারের চলন-প্রক্রিয়ার দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে।

শ্বাসক্রিয়া ও রেচন-প্রক্রিয়া

(Respiration and Exeretion)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, হাইড্রার অপরিপাক দ্রব্যগুলি বাহিরগামী অতিরিক্ত জলের সহিত সিলেনটেরন গহ্বর হইতে মুখছিদ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়। শ্বাস-প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন স্বভাবতঃই হাইড্রা জলের সহিত শোষণ করে। অক্সিজেন জলের সহিত দ্রবীভূত অবস্থায় থাকায় অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা উহা এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষের ভিতর প্রবেশ করে এবং পরে এনডোডার্মের বিবিধ কোষে উপনীত হয়। খাদ্যদ্রব্যের দাহের সময় কার্বনডায়ক্সাইড নাইট্রোজেন-ঘটিত রেচন পদার্থগুলিও বিপরীত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা হাইড্রার দেহ হইতে বাহির হইয়া আসে। মুখছিদ্র দিয়া অতিরিক্ত বাহিরগামী জলের সহিতও দ্রবীভূত কার্বন-ডায়ক্সাইড বাহির হইয়া যায়, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।
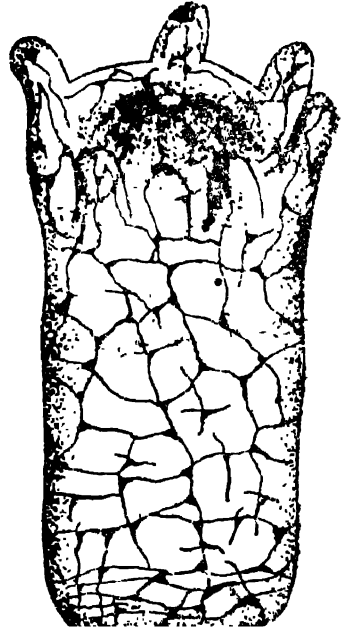
২১নং চিত্র
হাইড্রার সর্বাঙ্গে নার্ভজালের বিস্তার দেখান হইতেছে।

স্নায়ুতন্ত্র

হাইড্রার স্নায়ুতন্ত্র খুব সরলভাবে বিদ্যমান। স্নায়ুকোষগুলি এক্টোডার্মের ভিতরে মিসোগ্লিয়ার স্তরের নিকট থাকে। প্রতিটি নার্ভকোষের বা স্নায়ুকোষের চারিধার হইতে সূক্ষ্ম সুতার মত স্নায়ুসূত্র বাহির হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে। ফলে হাইড্রার দেহের চারিপাশে বৃত্তাকারে স্নায়ুজালের সৃষ্টি হয়। স্নায়ুসূত্রের সহিত সংবেদনশীল কোষগুলিও যুক্ত হয়। ইহার দ্বারা বাহির হইতে উদ্দীপকের অনুভূতি স্নায়ুকোষের মাধ্যমে সংবেদনশীল কোষ গ্রহণ করে এবং সংবেদনশীল কোষ হইতে অনুভূতি মাসকিউলো এপিথিলিও কোষে যায়। ফলে মাসকিউলো-এপিথিলিও সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়। সুতরাং হাইড্রার নার্ভ-বেষ্টনীই উহার দেহের স্নায়ুতন্ত্র।

হাইড্রার উদ্দীপকের অনুভূতি

(Response to Stimuli Hydra)

বিবিধ উদ্দীপকের প্রতি হাইড্রায় অনুভূতি লইয়া বহু প্রাণীবিদ্ গবেষণা করিয়াছেন। হাইড্রার স্পর্শ উদ্দীপকের অনুভূতিকে **থিগমোট্রপিজম** (*Thigmotropism*) বলা হয়। স্পর্শে হাইড্রা তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া গোলাকারে পরিণত হয়। সুতরাং হাইড্রা **অনুকূলবর্তী থিগমোট্রপিক** (*positively thigmotropic*)। সাধারণ আলোকে হাইড্রা উহার গতিপথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়। সুতরাং আলোক উদ্দীপকের প্রতি হাইড্রার অনুভূতি (*phototropism*) অনুকূলবর্তী হওয়ায় হাইড্রা **অনুকূলবর্তী ফটোট্রপিক** (*positively photropic*)। সেইরূপ তাপ সম্পর্কে হাইড্রার অনুভূতি বিপরীত। সামান্য গরম জলের সংস্পর্শে হাইড্রা উপনীত হইলে তথা হইতে পলায়ন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। সুতরাং তাপ উদ্দীপকের প্রতি হাইড্রার অনুভূতি (Thermotropism) বিপরীতবর্তী হওয়ায় হাইড্রা **বিপরীতবর্তী থার্মোট্রপিক** (*negatively thermotopic*)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্বের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাইড্রার থিগমোট্রপিজম্ বিষয়ে প্রচুর মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। বিবিধ স্পর্শের দ্বারা হাইড্রার দেহে নানারূপ প্রতিক্রিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জনন-প্রক্রিয়া

(Reproduction)

হাইড্রার জনন-প্রক্রিয়া প্রধানতঃ দুই প্রকারের; যথা—**অযৌন** (*Asexual*) এবং **যৌন** (*Sexual*)—এই উভয় প্রক্রিয়ার সাহায্যেই হাইড্রা বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

১। **অযৌন প্রক্রিয়া (Asexual reproduction) :**

অযৌন প্রক্রিয়া আবার দুই প্রকারের, যথা—(i) বাডিং বা কুঁড়ি উৎপাদন এবং (ii) **যুগ্মবিভাজন** (*Binary fission*)। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ হাইড্রা যখন বেশ সুখে জীবনযাপন করে ও প্রচুর খাদ্য-প্রাণী সংগ্রহ করিতে পারে, সেই সময়ই উহারা দেহের দুইধার হইতে কুঁড়ি **উৎপন্ন** করে। সাধারণতঃ একটি হাইড্রায় একটিমাত্র কুঁড়ি দেখা যায়; কিন্তু বহু কুঁড়িবিশিষ্ট হাইড্রার অস্তিত্বের অভাব নাই। অসময়ে যখন হাইড্রা খাদ্যপ্রাণীর অভাব অনুভব করে এবং নিজেদের যাবতীয় বিপাকীয় কার্যগুলি খাদ্যাভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না, তখন হাইড্রা যুগ্মবিভাজন-প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। নিম্নে বাডিং বা কুঁড়ি উৎপাদনের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল :

২২নং চিত্র

হাইড্রার বাডিং বা কুঁড়ি-উৎপাদন পদ্ধতি দেখান হইতেছে। ১, কর্ষিকা ; ২, মুখছিদ্র ; ৩, হাইপোস্টম ; ৪, শুক্রাশয় ; ৫, হাইড্রার কুঁড়ি ; ৬, ডিম্বাশয়।

(i) বাডিং বা কুঁড়ি উৎপন্ন করা (Budding) : কুঁড়ি সাধারণতঃ পূর্ণাঙ্গ হাইড্রার দেহের

মাঝখান হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমে দেহের ধারে একস্থানে সামান্য উঁচু বা ফোলার সৃষ্টি হয়। এই উঁচু স্থানের এক্টোডার্মের পিছনে যে সমস্ত ভিত্তিকোষ বা ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ থাকে, তাহাতেই দ্রুত বিভাজনের ফলে প্রচুর নূতন কোষের সৃষ্টি হয় এবং তাহার দ্বারাই উঁচু অংশের সৃষ্টি
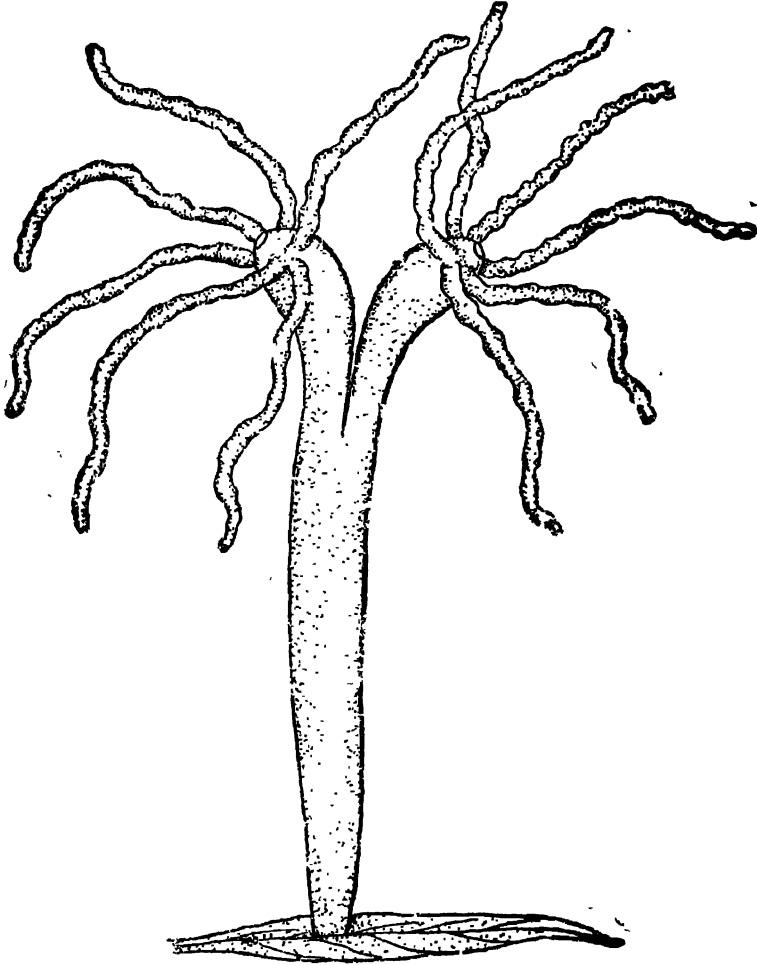
২৩নং চিত্র

হাইড্রার লম্বালম্বিভাবে বিভাগের প্রণালী দেখান হইতেছে।

হয়। নূতন ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি বারংবার বিভাগের দ্বারা স্থানটিকে ক্রমশঃ লম্বায় বড় করে। ধীরে ধীরে হাইড্রার সিলেনটেরন

গহ্বরটি নিয়েট নলাকৃতি উঁচু স্থানটির ভিতর প্রসারিত হয়। ইহার পর নলরূপ কুঁড়িটির মুখপ্রান্তে মুখ-ছিদ্রের সৃষ্টি হয় এবং মুখ-ছিদ্রকে বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে অনেকগুলি সরু সরু কর্ষিকা উৎপন্ন হয়। জনিতৃ হাইড্রার মত কুঁড়িটি এখন ধীরে ধীরে আরও বড হয় এবং এইসময় জনিতৃ-হাইড্রার খাদ্য-রসের দ্বারা পুষ্ট হয়। ইহার কুঁড়িটি জনিতৃ-হাইড্রার দেহ হইতে খসিয়া পড়ে এবং উহার বেসাল-ডিস্কের দ্বারা কোন একটি কঠিন পদার্থের সহিত আটকাইয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হয়। একই জনিতৃ-হাইড্রার এইভাবে একাধিক হাইড্রার কুঁড়ি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

(ii) যুগ্ম-বিভাজন (Binary fission): হাইড্রার যুগ্ম-বিভাজন সচরাচর হয় না। ইহার দেহ প্রস্থভাবে বা লম্বালম্বিভাবে দুইভাগে (*Longitudinally* বা *Transversely*) বিভক্ত হয় এবং দুইটি অপত্য হাইড্রা বা **হাইড্রা সন্তান** (*Daughter Hydra*) পরিণত হয়। লম্বালম্বিভাবে বিভাগের সময় জনিতৃ-হাইড্রা প্রথমে স্থির হইয়া যায় এবং নড়াচড়া করে না। প্রথমে ইহার হাইপোস্টম অংশ মুখছিদ্র হইতে দুইভাগে বিভক্ত হইতে আরম্ভ করে, পরে সম্পূর্ণভাবে মাঝামাঝি চিরিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। প্রতিটি সন্তান-হাইড্রা লুপ্ত অংশগুলি ধীরে ধীরে পুনরুৎপাদন করিয়া পূর্ণাঙ্গ হাইড্রায় পরিণত হয়। এইভাবে হাইড্রার দেহ যখন দুইভাগে বিভক্ত হয়, তখন একটি সন্তান-হাইড্রার মুখ ও কর্ষিকাগুলি থাকায় এবং দ্বিতীয় সন্তান-হাইড্রার মুখ ও কর্ষিকাগুলি না থাকায়, উহা উপরোক্ত অংশগুলি ধীরে ধীরে পুনরুৎপাদন করিয়া পূর্ণাঙ্গ হাইড্রায় পরিণত হয়।

যৌন-প্রক্রিয়া

(Sexual Reproduction)

সাধারণতঃ শরৎকালে হাইড্রা জনন-কোষের সৃষ্টি করে। সুতরাং শরৎকালই হাইড্রার প্রজনন বা জনন-ঋতু। আমাদের হাইড্রাগুলি সবই **উভলিঙ্গ** (*hermaphrodite*) অর্থাৎ স্ত্রী ও পুং-জননকোষ একই হাইড্রায় বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি হাইড্রা **একলিঙ্গ** (*unisexual*)। জনন কোষগুলি সাময়িকভাবে জনন-ঋতুতে সৃষ্ট হয়। স্ত্রী এবং পুরুষ জনন-কোষগুলি ভিত্তিকোষ বা ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষের পরিবর্তিত রূপ। ইণ্টার-

স্টিশিয়াল কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজনের দ্বারা প্রচুর নূতন সতেজ ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষের সৃষ্টি করে। এই সতেজ ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলিই জননকোষে রূপান্তরিত হয়।

হাইড্রার পুংজননকোষ বা **শুক্রাশয়** (*Testis*) সাধারণতঃ দেহের উপরিভাগে এক বা একাধিক সংখ্যায় দেখা যায়। কুঁড়ি যেভাবে প্রথমে ক্ষুদ্র ফোঁড়ার মত উঁচু হইয়া উঠে, শুক্রাশয়ও সেইভাবে বৃদ্ধিলাভ করে। এপিথিলিও মাসকিউলার কোষস্তরের পিছনের ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি জননঋতুর সময় ক্রমাগত বিভাগের দ্বারা বহু নূতন ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষের সৃষ্টি করে।
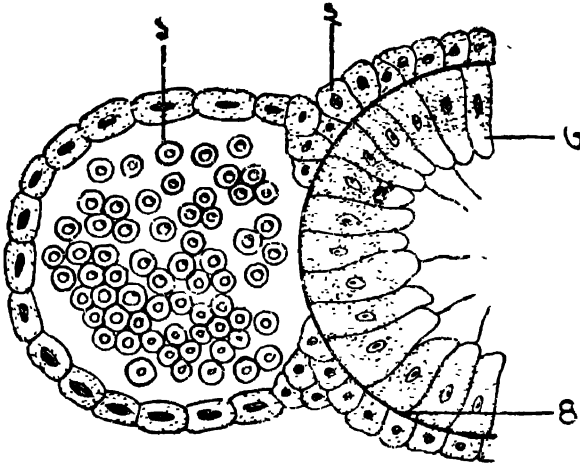
২৪নং চিত্র

হাইড্রার শুক্রাশয়সহ দেহের কিছু অংশের প্রস্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে।

১, শুক্রকীট ; ২, এক্টোডার্ম ; ৩, এনডোডার্ম ; ৪, মিশোগ্লিয়া।

কোষগুলি এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষস্তরের দ্বারা ঢাকা থাকে। এখন প্রতিটি নূতন কোষ এক একটি **স্পার্মাটোসাইটে** (*spermatocyte*) পরিণত হয়। প্রতিটি স্পার্মাটোসাইট পুষ্ট হইবার পর বিভাগের দ্বারা দুইটি কোষের সৃষ্টি করে এবং এই দুইটি অপত্যকোষ প্রত্যেকে আবার বিভক্ত হইয়া, মোট চারিটি কোষের সৃষ্টি করে। সুতরাং একটি স্পার্মাটোসাইট হইতে চারিটি কোষের উৎপত্তি হয়। এই কোষগুলি পরিবর্তিত হইয়া এক একটি **শুক্রকীটে** (*sperm*) পরিণত হয়। শুক্রকীটের একটি গোলাকার মাথা থাকে এবং ধড়টি সরু। ধড়ের শেষ-প্রান্ত হইতে একটি তরঙ্গায়িত লতার মত লেজ থাকে।

সাধারণতঃ বসন্তকালে শুক্রকীটগুলি পুষ্ট হইয়া এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষের আবরণটি ফাটাইয়া বাহির হইয়া যায় এবং জলে সুতার মত লেজটিকে নাড়া-চাড়া করিয়া শুক্রকীটগুলি সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। জলে প্রায় তিন দিন সাঁতার কাটিয়া উহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

শুক্রাশয়ের মত **ডিম্বাশয়ের** (*Ovary*) সৃষ্টির প্রথমভাগে ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি বিভাগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কোষ-বিভাগের ফলে প্রচুর নূতন সতেজ ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষস্তরের দ্বারা
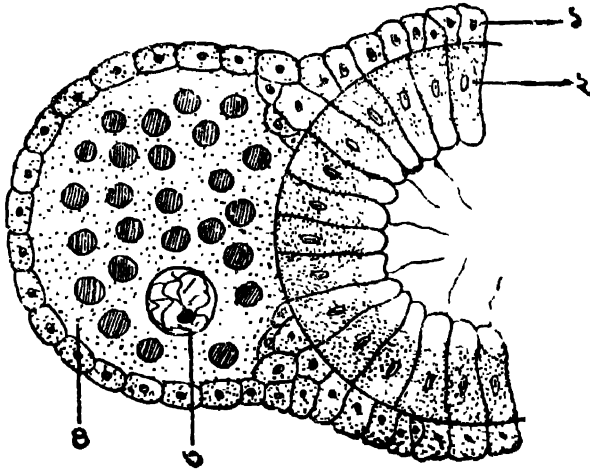
২৫নং চিত্র

হাইড্রার ডিম্বাশয়সহ দেহের কিছু অংশের প্রস্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে।

১, এক্টোডার্ম ; ২, এনডোডার্ম ; ৩, ডিম্বের ওসাইট ; ৪, ডিম্ব।

আবৃত থাকে। সাধারণতঃ হাইড্রার দেহের পশ্চাদ্ভাগে ডিম্বাশয়ের সৃষ্টি করে এবং একটি হাইড্রায় একই সময়ে একটির বেশী ডিম্বাশয়ের সৃষ্টি হয় না। নূতন ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করিলে উঁচু ফোঁড়ার মত ফোলা স্থানটি বেশ বড় হয় এবং আকারে শুক্রাশয়ের চেয়েও অপেক্ষাকৃত বড় হয়। নূতন ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলির মধ্যে যে-কোন একটি কোষ অ্যামিবার মত ক্ষণপদ বিক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করে। এই অ্যামিবাকৃতি কোষটি উহার ক্ষণপদের সাহায্যে অন্যান্য নূতন ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলিকে রাসায়নিক

উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া দ্রবীভূত করে এবং শোষণ করিয়া নিজ আকার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে। এই কোষটিকে **ওসাইট** (*Oocyte*) বলা হয়। বেশী বড় হইবার পর ওসাইটটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি অসমান অপত্যকোষের সৃষ্টি করে। বড় অপত্যকোষটিকে **পোলার বডি** (*Polar body*) বলা হয়। ইহা ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট অপত্য-কোষটি কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষের সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যেও বড়টি দ্বিতীয় পোলার-কোষ এবং অপরটিকে **ডিম্বক** (*Ovum*) বলা হয়। দ্বিতীয় পোলার-কোষটিও দ্রবীভূত হইয়া যায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, প্রথম পোলার-কোষটি দ্রবীভূত হইবার পূর্বে পুনরায় বিভক্ত হইয়া দুইটি ছোট ছোট কোষের সৃষ্টি করে এবং এই কোষগুলি পরে দ্রবীভূত হয়। মোট কথা, একটি ওসাইট যথাক্রমে তিনটি পোলার-কোষ এবং একটি ডিম্বকের সৃষ্টি করিয়া থাকে। মনে রাখা দরকার যে, সমগ্র ডিম্বাশয়ে একটিমাত্র ডিম্বক থাকে কিন্তু সমগ্র শুক্রাশয় প্রচুর শুক্রের উৎপত্তি হয়। এখন ডিম্বকটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করিয়া বেশ বড় হয় এবং এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষস্তরের দ্বারা বেষ্টিত থাকে। ডিম্বকটি পুষ্ট হইলে এপিথিলিও-মাসকিউলার আবরণটি ফাটিয়া যায়, কিন্তু ডিম্বকটি বাহিরে পতিত হয় না। ইহা হাইড্রার সহিত আটকাইয়া থাকে। অবশ্য উহার কিছু অংশ বাহিরের দিকে উন্মুক্ত থাকে। এখন ডিম্বকের চারিপাশে একটি চট্‌চটে জেলীর মত আবরণের সৃষ্টি হয়। এই আবরণটি ডিম্বকোষ হইতেই নিঃসৃত হয়। দেখা গিয়াছে যে, এই আবরণের আকর্ষণেই শুক্রকীটগুলি ডিম্বকের নিকট আসে এবং ইহারা ডিম্বকের চারি পাশে আটকাইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যে-কোন একটি শুক্রকীট ডিম্বকের ভিতর প্রবেশ করে এবং ডিম্বকটির গর্ভাধান সম্পন্ন করে। শুক্রকীটের মাথাটি কেবল ডিম্বকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বাকি অংশটি খসিয়া পড়ে। একটি শুক্রকীট ডিম্বকের ভিতর প্রবেশ করিলে আর অন্য কোন শুক্রকীট উহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। ডিম্বকের সৃষ্টির পর উহা যদি কিছুক্ষণের মধ্যে গর্ভাধান না হয়, তাহা হইলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। গর্ভাধানের পর ডিম্বকের নিউক্লিয়সটি শুক্রকীটের মাথার ভিতরকার নিউক্লিয়সটির সহিত মিলিত হইয়া একটি নিউক্লিয়সে পরিণত হয়। এই দুই মিলিত-নিউক্লিয়সবিশিষ্ট কোষটিকে **অস্পার্ম** বা **জাইগোট** (*Oosperm* বা *Zygote*) বলা হয়। উদ্ভিদের বীজের মত জাইগোটের বৃদ্ধি ও বিকাশেই নূতন হাইড্রার জন্ম হয়।

কিন্তু জনিতৃ-হাইড্রার দেহে-থাকা-অবস্থায় উহার বৃদ্ধি হয় না। জাইগোটের ভিতরকার সাইটোপ্লাজম হইতে রস নিঃসৃত হয় এবং উহার দ্বারা জাইগোটের একটি সিস্ট (Cyst) বা আবরণের সৃষ্টি হয়। ইহার পর জাইগোটটি জনিতৃ-হাইড্রার দেহ হইতে জলের ভিতর পড়ে। জলের নিম্নে জাইগোটের ভিতরে কোষ-বিভাজনের দ্বারা বৃদ্ধির সূচনা হয় এবং প্রায় দুইমাস পরে জাইগোটের আবরণ ফাটিয়া যায় এবং হাইড্রা-সন্তান বাহির হইয়া আসে। এখন হাইড্রার গর্ভাধানের প্রণালীর বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। উভলিঙ্গ হাইড্রার শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় একই সময়ে বৃদ্ধিলাভ করিয়া পুষ্ট হয় না। প্রথমে উভলিঙ্গ হাইড্রার শুক্রাশয় সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। পরে উহার শুক্রকীটগুলি শুক্রাশয় হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর উভলিঙ্গ হাইড্রার ডিম্বাশয়ের উৎপত্তি হয়। সুতরাং একই হাইড্রা-শুক্রকীট গর্ভাধানের জন্য অন্য কোন হাইড্রার ডিম্বক অন্বেষণে বাহির হয়। কারণ উপরোক্ত হাইড্রার ডিম্বাশয়টি তখন অপরিণত থাকে। অতএব হাইড্রা উভলিঙ্গ হইলেও ইহারা একই দেহে জননকোষের মিলন ঘটায় না অর্থাৎ **স্ব-গর্ভাধান** (*self-fertilization*) প্রণালী উভলিঙ্গ হাইড্রায় কার্যকরী হয় না। সুতরাং ইহাদের গর্ভাধান-প্রণালী **ইতর-গর্ভাধান** (*cross-fertilization*) প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন সময়ে জননকোষের সৃষ্টি ও পুষ্টিই ইতর-গর্ভাধান প্রণালীকে সহায়তা করে। আবার শুক্রকীট আগে এবং ডিম্বক পরে পুষ্ট হওয়াতে কম বয়সের শুক্রকীট অন্য হাইড্রার বেশী বয়সের ডিম্বকের সহিত গর্ভাধানে ব্যাপৃত হয়। ইহা হাইড্রার নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য।

হাইড্রার পুনরুৎপাদন ক্ষমতা

(Power of regeneration of Hydra)

নিম্নস্তরে প্রায় প্রতিটি প্রাণীরই পুনরুৎপাদন ক্ষমতা থাকে। হাইড্রাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটিয়া জলে ফেলিয়া দিলে প্রতি অংশ পুনরায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করিয়া পরে একটি পূর্ণাঙ্গ হাইড্রায় পরিণত হয়। অবশ্য প্রতিটি খণ্ডে কিছু সংখ্যায় এক্টোডার্ম ও এনডোডার্ম স্তরের কোষ থাকা প্রয়োজন। খণ্ডের প্রান্ত

হইতে মুখছিদ্র এবং ইহার চারিপাশ হইতে কর্ষিকাগুলির সৃষ্টি হয়। খণ্ডের অপর প্রান্তে বেসাল-ডিস্কের উৎপত্তি হয় এবং ইহার দ্বারা খণ্ডটি কঠিন বস্তুর সহিত আটকাইতে পারে। ইহাদের দেহে ক্ষত হইলে বা কোন কর্ষিকা ছিন্ন হইয়া গেলে উহা পুনরায় উৎপন্ন হয়। হাইড্রার পুনরুৎপাদন ক্ষমতা এত বেশী যে, দুইটি ভিন্ন ভিন্ন হাইড্রার খণ্ড, একটির উপর আর একটি করিয়া স্থাপিত করিলে দুই খণ্ড সংযুক্ত হইয়া একটি খণ্ডে পরিণত হয় এবং একত্রিত-খণ্ড হইতে পূর্ণাঙ্গ হাইড্রার সৃষ্টি হয়। হাইড্রার পুনরুৎপাদন ক্ষমতা ভিত্তিকোষ বা ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষের ক্রমাগত বিভাগের দ্বারা সম্ভব হয়। পরন্তু ইহার পুনরুৎপাদন ক্ষমতার জন্যই হাইড্রা নাম রাখা হইয়াছে। গ্রীকদের পুরাণে কথিত আছে যে, সমুদ্ররাণীর হাইড্রা নামক একটি বিষধর সাপ রক্ষী-হিসাবে সর্বদাই তাঁহার সমুদ্র-প্রাসাদ পাহারা দিত। উহার অনেকগুলি মুখবিশিষ্ট মাথা ছিল। যে-কোন একটি মাথা বা একাধিক মাথা গজাইয়া শূন্য স্থানগুলিকে পূর্ণ করিয়া ফেলিত। সুতরাং বিষধর সাপটিকে কেহই মারিয়া ফেলিতে পারিত না। হাইড্রার পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অনুরূপ হওয়ায়, ইহার নাম উপরোক্ত বিষধর সাপের নামানুসারে 'হাইড্রা' রাখা হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। হাইড্রার দেহের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। (Give an account of the general characteristics of Hydra.)

২। হাইড্রার দেহের প্রস্থচ্ছেদের কিছু অংশ অঙ্কন করিয়া উহার বিবিধ কোষগুলি চিহ্নিত কর এবং এক্টোডার্মের বিভিন্ন কোষগুলির বিবরণ দাও। (Draw a portion of the transverse section of Hydra and label its parts. Explain various types of ectodermal cells of Hydra.)

৩। নিডোব্লাষ্ট কোষের উৎপত্তি, প্রকারভেদ ও কার্যকারিতার বিষয় চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe the origin, types and function of cnidoblast cells. Leave sketches as far as possible.)

৪। হাইড্রার বিবিধ প্রকারের এনডোডার্ম স্তরের কোষগুলির বর্ণনা কর। (Describe various types on Endodermal cell of Hydra.)

৫। হাইড্রার খাদ্য-সংগ্রহ-পদ্ধতি এবং চলন-প্রক্রিয়ার বিষয়পূর্ণ বিবরণী দাও। (Give detailed account about the locomotion and method of capturing prey of Hydra.)

৬। হাইড্রার জনন-প্রক্রিয়ার বিষয় চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe various types of reproduction in Hydra. Leave neat sketches as far as possible.)

৭। হাইড্রার যৌনজনন-প্রক্রিয়ায় বিশেষত্ব কি? ইহারা ইতর-গর্ভাধান কিভাবে সম্পন্ন করে, পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া লিখ। (Describe the significance of sexual reproduction in Hydra. How cross fertilization is effected ?)

৮। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ :

(i) ভিত্তিকোষ, (ii) নিমাটোসিস্ট, (iii) পুনরুৎপাদন ক্ষমতা, (iv) থিগ্‌মোট্রপিজম্।

(Write short notes on : (i) Formative cell, (ii) Nematocyst, (iii) Power of regeneration, (v) Thigmotropism.)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রদর্শন ও পরীক্ষা

(Demonstration and Experiment)

জোঁকের বহিরাকৃতি (External characters of a Leech) :

জোঁকের বৈজ্ঞানিক নাম **হিরুডিনেরিয়া** (*Hirudinaria*) এবং ইহা অঙ্গুরীমাল বা অ্যানিলিডা পর্বের অন্তর্গত **হিরুডিনিয়া** (*Hirudinea*) শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। সাধারণতঃ পুষ্করিণী, বড় দীঘি, পানায় ভরা ডোবা এবং ধানক্ষেতের জলের ভিতর ইহাদের বাস। ইহারা বহিঃপরজীবী (Ectoparasite) এবং সাধারণতঃ গরু, মহিষ প্রভৃতি অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহরক্ত বাহির হইতে শোষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহারা হস্ত ও পদ প্রভৃতি অঙ্গে নিজদেহ আটকাইয়া এক অভিনব উপায়ে রক্ত শোষণ করে।

জোঁকের দেহ খুবই নরম এবং কেঁচোর মত লম্বা। সম্পূর্ণ প্রসারিত হইলে লম্বায় প্রায় এক ফুট হয়। জোঁকের পৃষ্ঠদিক উত্তল এবং অঙ্কীয় দিক সরল হওয়ায় ইহার দেহকে পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চ্যাপ্টা বলা হয়। ইহার অগ্রপ্রান্তে একটি গোলাকার **সাকার** (*Sucker*) দেখা যায় এবং ইহার পশ্চাদ্‌প্রান্তের সাকারটি অগ্রপ্রান্তের সাকারের চেয়ে আকারে বড়। জোঁকের দেহ সঙ্কুচিত হইলে ইহার আকার তিন হইতে চার ইঞ্চিতে পরিণত হয়। ইহার দেহের **চামড়া** (*Skin*) হইতে সব সময়ে জেলীর মত চট্‌চটে রস নিঃসৃত হয় এবং ইহার দেহটিকে পিচ্ছিল করিয়া রাখে। জোঁকের পৃষ্ঠদিকের চামড়ার রঙ ধূসর ও সবুজ হয় এবং অঙ্কীয়দেশের রঙ হাল্কা হলদে দেখায়। জোঁকের দুই পার্শ্ব সাদা, কালো বা কমলালেবু রঙের দাগ লম্বালম্বিভাবে থাকে। জোঁকের সর্বাঙ্গে প্রায় ৩৩টি **অঙ্গুরী** (*Segment*) দেখা যায়। আবার প্রতিটি অঙ্গুরী বহু গোলাকার ছোট ছোট অঙ্গুরীতে ভাগ করা থাকে। একটি বড় অঙ্গুরী এইভাবে বাহির হইতে পাঁচটি ছোট অঙ্গুরীতে বিভেদিত। ছোট অঙ্গুরীগুলিকে **অ্যানুলী** (*Annuli*) বলা হয়। বড় অঙ্গুরীগুলি কেঁচোর মত জোঁকের অন্তর্দেহকেও **গ্রন্থপ্রাচীর** (*Septum*) দ্বারা ভাগ করে। সুতরাং প্রতিটি বড় অঙ্গুরীতে বা অঙ্গুরীখণ্ডে (Metamere) পাঁচটি অ্যানুলি বিদ্যমান এবং
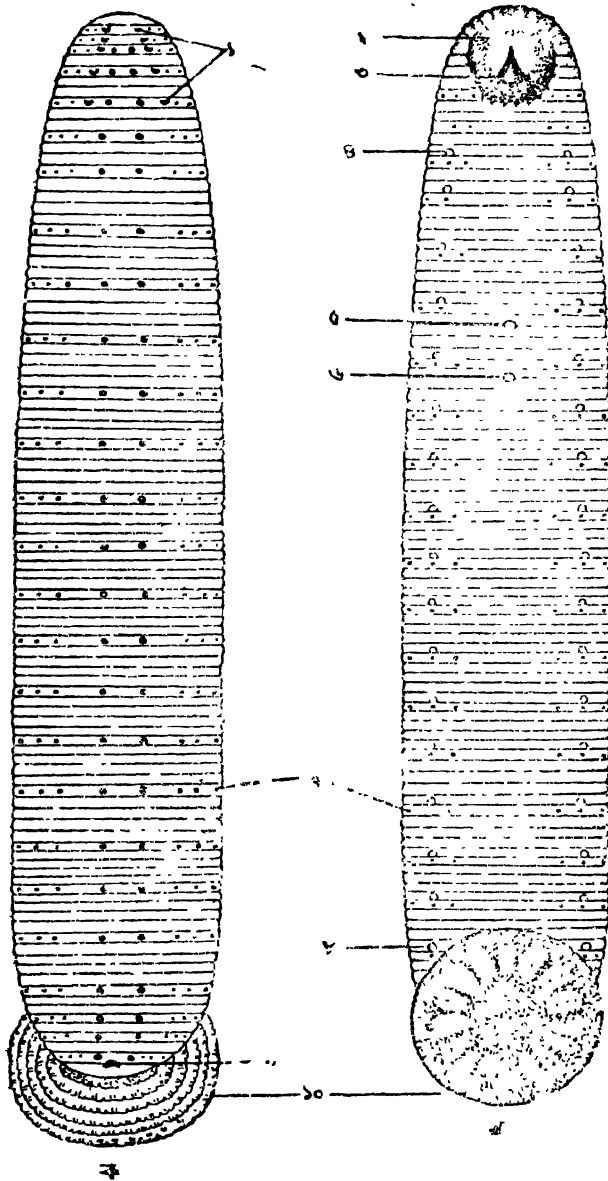
২৬নং চিত্র

জোঁকের বহিরাকৃতি দেখান হইতেছে।

ক, জোঁকের পৃষ্ঠদেশ ; খ, জোঁকের অঙ্কীয়দেশ ; ১, চক্ষু, ২, অগ্রভাগের সাকার ; ৩, মুখ-ছিদ্র ; ৪, নেফ্রিডিওপোর ; ৫, পুং-বহিঃ-জননছিদ্র : ৬, স্ত্রী-বহিঃ-জননছিদ্র ; ৭, অঙ্গুরীখণ্ডীয় সংবেদনশীল যন্ত্র ; ৮, শেষ নেফ্রিডিওপোর ; ৯, পায়ুছিদ্র, ১০, পশ্চাদ্ভাগের সাকার।

প্রতি অঙ্গুরীখণ্ডের প্রথম অ্যান্থুলির উপর এক সারিতে বৃত্তাকারে কালো কালো বিন্দু থাকে। এই কৃষ্ণবর্ণের বিন্দুগুলি জোঁকের সংবেদনশীল যন্ত্র এবং ইহাদের **অঙ্গুরীখণ্ডীয় সংবেদনশীল যন্ত্র** (*segmental receptor organs*) বলা হয়। প্রতিটি অঙ্গুরীখণ্ডের পৃষ্ঠদেশে চার-জোড়া অঙ্গুরীখণ্ডীয় সংবেদনশীল যন্ত্র বৃত্তাকারে বিদ্যমান।

জোঁকের **অগ্রপ্রান্তের সাকার** (*Anterio sucker*) দেহের প্রথম পাঁচটি অঙ্গুরীখণ্ড একত্রিত করিয়া গঠিত এবং ইহা আকারে পেয়ালার মত। মুখটি জোঁকের অঙ্কীয়দেশের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। অগ্রপ্রান্তের সাকারের পৃষ্ঠদেশে-অবস্থিত পাঁচ-জোড়া সংবেদনশীল যন্ত্র বেশ স্পষ্ট এবং ইহাদের জোঁকের **চোখ** (*eye*) বলা হয়। পেয়ালার মধ্যস্থলে **মুখছিদ্র** (*Mouth*) বিদ্যমান। জোঁকের শেষ সাতটি দেহখণ্ড লইয়া পশ্চাদ্ভাগের সাকারটি নির্মিত হয়। ইহার আকার একটি ছোট গোলাকার থালার মত। পশ্চাদ্ভাগের **সাকারটি** (*Posterior sucker*) আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং ইহা কঠিন বস্তু আঁকড়াইবার জন্য চলন-প্রক্রিয়ার সময় ব্যবহৃত হয়।

মুখ-ছিদ্রটি ত্রিকোণাকৃতি এবং অগ্রভাগের সাকারের মধ্যস্থলে বিদ্যমান। জোঁকের পৃষ্ঠদেশের ছাব্বিশ দেহখণ্ডের মধ্যরেখার উপর **পায়ুছিদ্রটি** (*Anus*) অবস্থান করে। সতরো জোড়া রেচনছিদ্র জোঁকের ছয় দেহখণ্ড হইতে বাইশ দেহখণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান। ইহার প্রতিটি দেহখণ্ডের দুই পাশে একটি করিয়া মোট একজোড়া করিয়া রেচনছিদ্র সজ্জিত থাকে। এই রেচনছিদ্রগুলিকে **নেফ্রিডিওপোর** (*Nephridiopore*) বলা হয়। জোঁক উভলিঙ্গ প্রাণী হওয়ায় উহার পুং-জননতন্ত্রের বহিঃছিদ্র এবং স্ত্রী-জননতন্ত্রের বহিঃছিদ্র উভয়ই বিদ্যমান। জোঁকের অঙ্কীয়দেশের দশম দেহখণ্ডের মধ্যরেখার উপর **পুং-জননছিদ্র** (*Male gonopore*) দেখা যায় এবং মাঝে মাঝে পাতলা সুতার মত ক্ষুদ্র একটি **পুংলিঙ্গ** (*Penis*) উপরোক্ত ছিদ্র হইতে বাহির হইতেও দেখা যায়। জোঁকের **স্ত্রী-জননছিদ্রটি** (*Female gonopore*) সেইরূপ ইহার অঙ্কীয়দেশের একাদশ দেহখণ্ডের মধ্যরেখার উপর বিদ্যমান।

জোঁকের বিবিধ তন্ত্র (General viscera of Leech) :

জোঁকের দেহের ভিতরকার বিবিধ তন্ত্র উহার দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা যায়। সাধারণতঃ অ্যানিলিডা পর্বের বিবিধ প্রাণীদের একটি দেহ-

গহ্বর (coelome) থাকে, কিন্তু জোঁকের তাহা নাই। দেহ-গহ্বরটি কেবল জোঁকের বৃদ্ধির সময় দেখা যায়। কিন্তু পরে দেহ-গহ্বরের ভিতর সরু সরু নালী-জালিকায় পূর্ণ হইয়া যায়—এই নালী জালিকাগুলির ভিতর গাঢ়
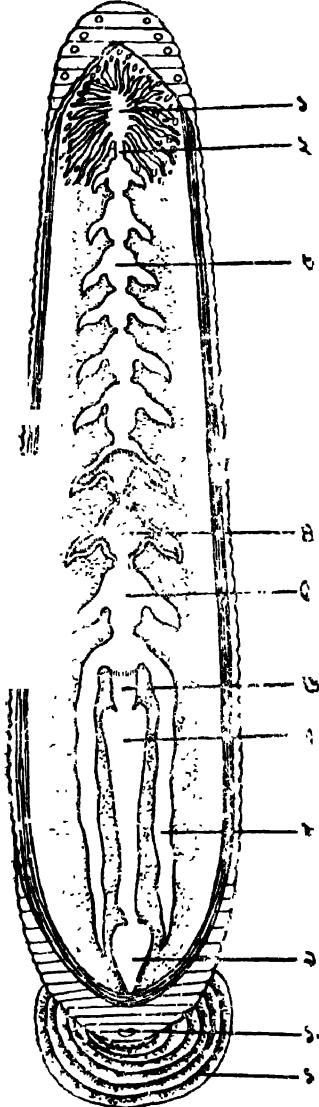
২৭নং চিত্র

জোঁকের পৌষ্টিকতন্ত্র দেখান হইতেছে।

বাদামী রঙের পদার্থ থাকে এবং সেইজন্য নালীগুলির রঙও গাঢ় বাদামী হয়। ইহাদের **বট্রায়োইডাল কলা** (*Botrayoidal tissue*) বলে। সুতরাং জোঁকের চামড়ার সহিত বিবিধ তন্ত্রগুলি বট্রায়োইডাল কলার দ্বারা সমগ্রভাবে সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য জোঁকের ব্যবচ্ছেদের সময় চামড়ার সহিত **পৌষ্টিকতন্ত্রের** (*Alimentry System*) অংশগুলির কিছু ভাগ কাটিয়া যায়। অতএব খুব সাবধানে জোঁকের চামড়া কাটা দরকার। সকল অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মত জোঁকের পৃষ্ঠদেশে মধ্যরেখার উপর দিয়া উহার ব্যবচ্ছেদ করা হয়। জোঁকের প্রথমে স্পিরিট বা নুন দিয়া মারিয়া ফেলিয়া
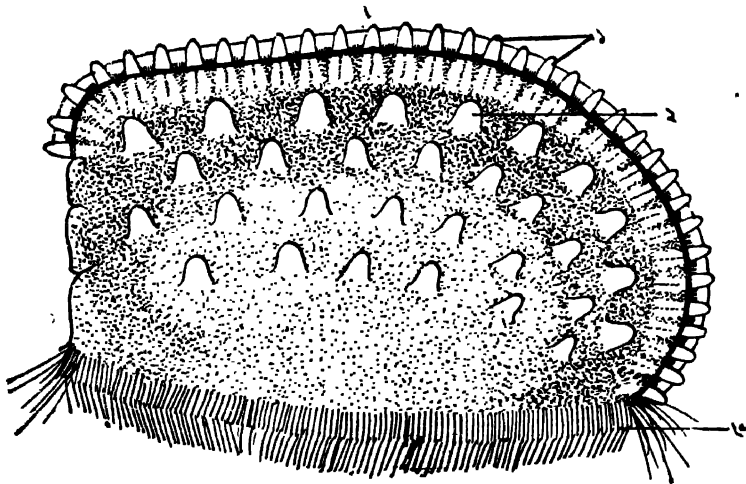
২৮নং চিত্র
জোঁকের একটি সম্পূর্ণ চোয়াল (Jaw) দেখান হইতেছে।
১, দাঁত; ২, লালা প্যাপিলা; ৩, চোয়ালের পেশীসমূহ।

উহার দেহ হইতে সমস্ত রক্ত বাহির করিয়া দিতে হইবে। জোঁকের পশ্চাদ্ভাগটির শেষাগ্রে ধরিয়া দুই অঙ্গুলী সহকারে পশ্চাদ্ভাগ হইতে অগ্রভাগের দিকে চাপ দিয়া টানিলেই মুখছিদ্র দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায়। উহার পর ব্যবচ্ছেদ করিলে পৌষ্টিকতন্ত্র ভালভাবে দেখা যায়।

পৌষ্টিকতন্ত্র (Alimentary system) :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মুখছিদ্রটি জোঁকের অগ্রভাগে সাকারের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং মুখবিবরটি ত্রিকোণাকৃতি। মুখবিবরের মধ্যে মাংসল বেড়ী-দ্বারা তিনটি চোয়াল আবদ্ধ থাকে। **চোয়ালগুলির** (*Jaw*) সহিত মুখের

পেশীগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যাহাতে চোয়ালগুলি সহজে উঠা-নামা করিতে পারে। চোয়ালগুলির ধার দাঁতালো এবং জোঁক কামড়াইবার পর এই দাঁতগুলি ক্ষত সৃষ্টি করিয়া তথায় আটকাইয়া থাকে। মুখ-বিবরটি ভিতরের দিকে একটি ছোট থলির মত অংশে পরিণত হয়। এই থলির গাত্র বেশ পুরু ও মাংসল এবং ইহা দেহের সহিত বহুপ্রকারের পেশী দ্বারা সংযুক্ত থাকে। পেশীগুলি সঙ্কোচনে থলির গহ্বর চুপসাইয়া যায় এবং উহার প্রসারণে আবার ফুলিয়া উঠে। এই থলিটিকে **গলবিল** (*Pharynx*) বলা হয়। গলবিলটিকে পরিবেষ্টিত করিয়া বহু **লালাগ্রন্থি** (*Salivary gland*) থাকে। প্রতিটি লালাগ্রন্থি হইতে একটি বাহিকা বাহির হইয়া দাঁতগুলির উপর যুক্ত হয়। এই যুক্ত স্থানটি বেশ উঁচু দেখায়। এইরূপ উঁচু স্থান দাঁতের উপর প্রচুর দেখা যায়। ইহাদের **লালা পাপিলা** (*Salivary papillae*) বলা হয়। গলবিলটি কালি তুলিবার ড্রপারের রবারের মত ক্ষতস্থান হইতে সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা রক্ত শোষণ করে। গলবিলের পরের অংশটি সরু নলের মত। ইহাকে **গ্রাসনালী** (*Oesophagus*) বলে। গ্রাসনালীর পরবর্তী অংশগুলি এক একটি করিয়া দশটি পাতলা থলিতে বিভেদিত হয়। এই থলিগুলির গাত্র খুবই পাতলা। প্রতিটি থলি হইতে দুই পাশে একটি করিয়া উপথলি বাহির হইতে দেখা যায়। থলিটিকে জোঁকের **ক্রপ** (*Crop*) ও উহাদের উপথলি দুইটিকে **সিকা** (*Coeca*) বলা হয়। ক্রপগুলি জোঁকের নয় হইতে আঠারো দেহখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। প্রথম ক্রপটি সর্বাপেক্ষা ছোট এবং পর্যায়ক্রমে ইহাদের আকারে বৃদ্ধি পায়; দশম ক্রপটি সর্বাপেক্ষা বড়। দশম ক্রপের সিকা দুইটি প্রায় ছাব্বিশ দেহখণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত। জোঁক ক্রপ ও সিকার মধ্যে রক্ত জমা করিয়া রাখে। সুতরাং ইহারা পৌষ্টিকতন্ত্রের সঞ্চয়ী অঙ্গ। দশম ক্রপটি উনিশ দেহখণ্ডে সরু হইয়া পাকস্থলীতে পরিণত হয়। দশম ক্রপ ও **পাকস্থলীর** (*Stomach*) মাঝে **কপাটিকা** (*Valve*) থাকে। সুতরাং ক্রপের ভিতর হইতে পাকস্থলীতে রক্ত ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। কুড়িটি দেহখণ্ডের পর হইতে পাকস্থলী অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া **অন্ত্রে** (*Intestine*) পরিণত হয়। পৌষ্টিকনালীর অন্ত্র আরও পশ্চাদ্ভাগের শেষাগ্রে ধাবিত হইয়া স্থূল **মলাশয়ে** (*Rectum*) পরিণত হয়। মলাশয়ে জোঁকের ছাব্বিশটি দেহখণ্ডের পৃষ্ঠদেশ ও **পায়ুছিদ্র** (*Anus*) দেহের বাহিরে যুক্ত হয়।
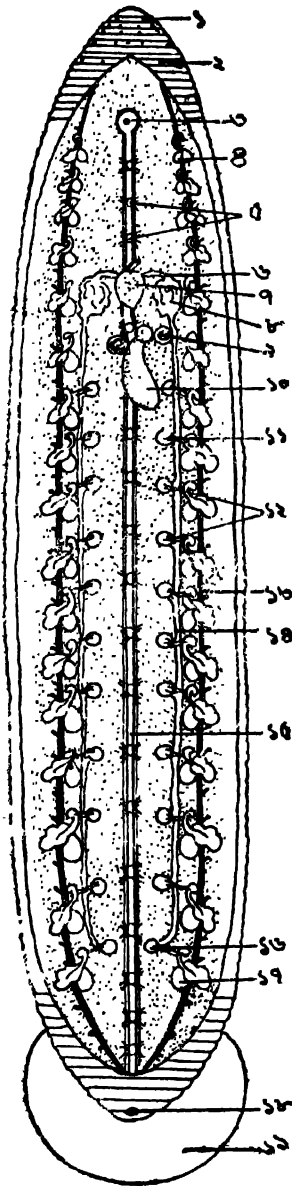
২৯নং চিত্র—জোঁকের সংবহন-তন্ত্র, রেচন-তন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও জননতন্ত্র দেখান হইতেছে।

সংবহনতন্ত্র (Circulatory system) :—জোঁকের দেহে প্রকৃত রক্তবাহী নালী নাই। উহার দেহ-গহ্বরের রস (*Coelomic fluid*)

এবং দ্রবীভূত রক্ত একত্রিত মিলিত হইয়া **রক্তমিশ্রিত দেহরসে** (*haemocelomic*) পরিণত হয়। ইহাই জোঁকের দেহে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। জোঁকের দেহে চারিটি রক্তমিশ্রিত-দেহরসবাহী বাহিকা দেখা যায়। ইহারা দেহের ভিতর লম্বালম্বিভাবে বিদ্যমান। পৌষ্টিক-নালীর উপর লম্বালম্বিভাবে এক **পৃষ্ঠদেশীয় বাহিকা** (*Dorsal vessel*) থাকে এবং সেইরূপ পৌষ্টিক-নালীর নিম্নেও লম্বালম্বিভাবে এক **অঙ্কীয়দেশীয় বাহিকা** (*Ventral vessel*) বিদ্যমান। জোঁকের দুইপাশে লম্বালম্বিভাবে একটি করিয়া **পার্শ্ববাহিকা** (*Lateral vessel*) থাকে। উপরোক্ত চারিটি বাহিকা পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। সাধারণতঃ পৃষ্ঠদেশীয় বাহিকার দ্বারা রক্তমিশ্রিত দেহরস জোঁকের সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে এবং দুইটি পার্শ্ববাহিকার দ্বারা রক্তমিশ্রিত দেহরস সংগৃহীত হয়।

রেচনতন্ত্র (Excretory system) :

রেচনতন্ত্র কতকগুলি গ্রন্থির ন্যায় যন্ত্রের দ্বারা গঠিত। এইরূপ যন্ত্রটিকে **নেফ্রিডিয়া** (*Nephridia*) বলা হয়। জোঁকের দেহখণ্ডের মধ্যে ছয় দেহখণ্ডে ও বাইশ দেহখণ্ডের দুইপাশে একটি করিয়া মোট একজোড়া নেফ্রিডিয়া বিদ্যমান। এই নেফ্রিডিয়াগুলি বাহিরে নেফ্রিডিওপোরে যুক্ত হয় এবং নেফ্রিডিওপোর বা রেচনছিদ্র হইতেই রেচনপদার্থগুলি দেহের ভিতর হইতে বাহির হয়। নেফ্রিডিয়া গ্রন্থিগুলি দুইদিকের রক্তমিশ্রিত দেহরসবাসী পার্শ্বস্থ বাহিকার বাহিরে অবস্থান করে। দেহের একটি মধ্যকার নেফ্রিডিয়া লইয়া ভালভাবে লেন্‌সের তলায় পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার আকার ঘোড়ার খুরের মত। ইহার প্রধান **দুইটি বাহু** (*limbs*) একটি **মধ্যখণ্ডের** (*Main lobe*) দ্বারা সংযুক্ত থাকে। প্রধান দুইটি বাহুর মধ্যে প্রথমটি বা আগের বাহুটিকে **অগ্রখণ্ড** (*anterior lobe*) এবং পেছনেরটিকে **পশ্চাদ্‌খণ্ড** (*Posterior lobe*) বলা হয়। অগ্রখণ্ড হইতে **একটি নালী ভেসিক্‌ল ডাক্‌** (*Vesicle duck*) নামে বাহির হয় এবং নীচের দিকে নামিয়া একটি পাতলা **থলির** (*Vesicle*) মধ্যে মিলিত হয়। থলি হইতে আবার একটি নালী বাহির হইয়া জোঁকের দেহের বাহিরে নেফ্রিডিওপোরে মিলিত হয়। শেষ নালীটিকে **গবিনী** (*Ureter*) বলা হয়। নেফ্রিডিয়ার পশ্চাদ্‌খণ্ডটি প্রথম নালীটিকে অতিক্রম করিয়া উপরের দিকে আগাইয়া যায়। তখন ইহাকে **শীর্ষখণ্ড** (*Apical lobe*) বলা হয়। শীর্ষখণ্ডগুলি আবার জোঁকের

দেহের আরও ভিতরে বা মধ্যস্থলে আগাইয়া যায়। শীর্ষখণ্ডের এই অংশটিকে **প্রারম্ভিক খণ্ড** (*Initial lobe*) বলে। প্রারম্ভিক খণ্ডটি জোঁকের **শুক্রথলির** (*Testis-sac*) ভিতর যুক্ত হয়। প্রচুর রক্তবাহী-জালিকা জোঁকের নেফ্রিডিয়াগুলি পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে। নেফ্রিডিয়াগুলি কতকগুলি হালকাভাবে-সন্নিবিষ্ট কোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলি রক্তবাহী-জালিকা হইতে রেচন পদার্থ শোষণ করিয়া লয়। অগ্রখণ্ডের সহিত নেফ্রিডিয়া পশ্চাদ্‌খণ্ডটি এক সরু **অন্তঃখণ্ডের** (*Inner lobe*) দ্বারা সংযুক্ত
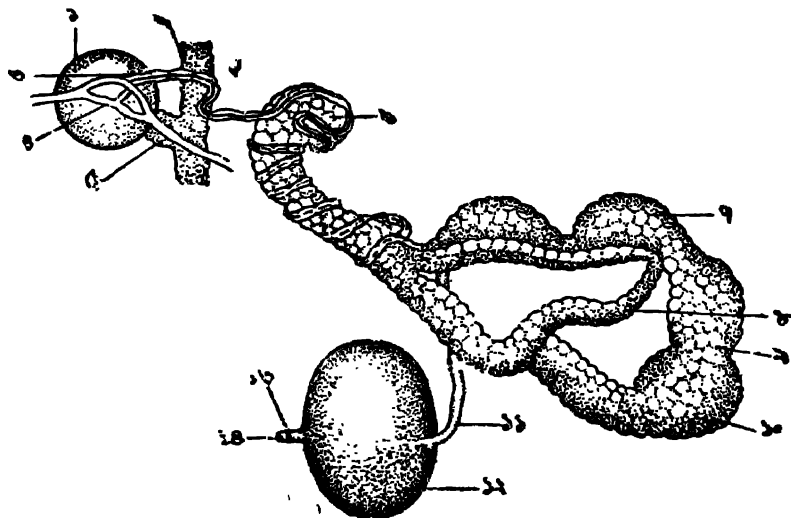
৩০নং চিত্র

জোঁকের একটি সম্পূর্ণ নেফ্রিডিয়মের চিত্র দেখান হইতেছে।

১, শুক্রাশয় থলি; ২, সংযুক্ত শুক্রাশয় (vasa-defferentia); ৩, প্রারম্ভিক খণ্ড (initial lobe); ৪, নেফ্রিডিয়মের রক্তবাহীনালী; ৫, শুক্রাশয়নালী (vasa-efferentia); ৬, শীর্ষখণ্ড (apical lobe); ৭, অগ্রখণ্ড (anterior lobe); ৮, অন্তঃখণ্ড (inner lobe); ৯, মধ্যখণ্ড (main lobe); ১০, পশ্চাদ্‌খণ্ড (posterior lobe); ১১, ভেসিক্‌ল ডাক্ (vasicle duct); ১২, থলি (vesicle); ১৩, গবিনী ছিদ্র বা নেফ্রিডিওপোর।

হওয়ায় পশ্চাদ্‌খণ্ডের রেচন পদার্থগুলি অনায়াসে অগ্রখণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে। রেচন পদার্থগুলি কোষগুলি হইতে ধীরে ধীরে নীলাকার দ্বারা থলি বা ভেসিক্‌লে জমা হয় এবং সময়মত উহার সংকোচনে নেফ্রিডিওপোরের ভিতর দিয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) :

জোঁকের স্নায়ুতন্ত্র প্রায় কেঁচোর মত। জোঁকের মধ্যে অঙ্কীয় রেখা দিয়া একটা মোটা সূতার মত যন্ত্র লম্বালম্বিভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূতাটি শত-সহস্র স্নায়ুকোষের সমবায়ে গঠিত এবং ইহাকে অঙ্কদেশীয় **স্নায়ুসূত্র** (*Ventral nerve cord*) বলা হয়। অঙ্কদেশীয় স্নায়ুসূত্রের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম, যথা—অঙ্কদেশীয় স্নায়ুসূত্রের অগ্রাংশে একজোড়া সেরিব্রাল স্নায়ুগ্রন্থি বা **উর্ধ্বস্থ গলবিলের স্নায়ুগ্রন্থি** (*Cerebral ganglia or Suprapharyngeal ganglia*); ইহার সহিত সংযুক্ত একজোড়া **নিম্নস্থ গলবিলের স্নায়ুগ্রন্থি** (*Sub-pharygeal ganglia*), উপরোক্ত দুইটি স্নায়ুগ্রন্থিকে সংযুক্ত করিয়াছে **একজোড়া যোগস্নায়ু** (*Nerve connective or Circumpharyngeal connective*)। নিম্নস্থ গলবিলের স্নায়ুগ্রন্থির পর হইতে স্নায়ুসূত্রটিকে **অঙ্কদেশীয় স্নায়ুসূত্র** (*Ventral nerve cord*) বলা হয়। এই স্নায়ুসূত্রটি প্রকৃতপক্ষে লম্বালম্বিভাবে স্নায়ুসূত্রের দ্বারা গঠিত। কিন্তু এই দুইটি স্নায়ুসূত্রকে বেষ্টন করিয়া একটি পাতলা পর্দা থাকায় একটি সূত্র বলিয়া মনে হয়। জোঁকের প্রতিটি দেহখণ্ডে, এই স্নায়ুসূত্রে, একটি করিয়া **স্নায়ুগ্রন্থি** (*Nerve ganglia*) থাকে। এই স্নায়ুগ্রন্থি হইতে দেহের দুইদিকে স্নায়ু বাহির হইয়া বিবিধ অঙ্গে প্রবেশ করে।

জননতন্ত্র (Reproductive system) : কেঁচোর মত জোঁকও উভলিঙ্গ প্রাণী। প্রতিটি জোঁকের দেহের ভিতর পুং-জননতন্ত্র ও স্ত্রী-জননতন্ত্র উভয়ই বিদ্যমান। জোঁকের **পুং-জননতন্ত্রে** (*male reproductive organs*) এগারো জোড়া শুক্র-থলি (*Testis sac*), এগারো জোড়া ক্ষুদ্র **শুক্রনালী** (*Vasa efferentia*), একজোড়া **সংযুক্ত শুক্রনালী** (*Vasa efferntia*) থাকে। সংযুক্ত শুক্রনালীর বিবিধ অংশকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা:— **এপিডিডাইমিস্** (*Epididymis*), **ইজাকুলেটারি ডাক** (*Ejaculatory duct*) এবং **অ্যাট্রিয়ম** (*Atrium*)।

জোঁকের বারো হইতে বাইশ দেহখণ্ডের মধ্যে প্রতিটি দেহখণ্ডের পৌষ্টিক-নালীর নিম্নে এবং নেফ্রিডিয়া ও অঙ্কদেশীয় স্নায়ুসূত্রের মাঝামাঝি স্থানে, উপরোক্ত শুক্রথলিগুলি বিদ্যমান। **শুক্রথলির** (*Testis sac*) আকার গোলাকার এবং ইহার রঙ সাদা। ইহা দেহরসপূর্ণ থলিকা মাত্র। এই

থলির গাত্র হইতে শুক্রকীট জন্মায়। প্রতিটি শুক্রথলি হইতে একটি সূক্ষ্ম নালী বাহির হয়। এই নালীগুলিকে ক্ষুদ্র শুক্রনালী (*Vasa-efferentia*) বলা হয়। এইরূপ এগারো জোড়া ক্ষুদ্র শুক্রনালী, এগারো জোড়া শুক্রথলি
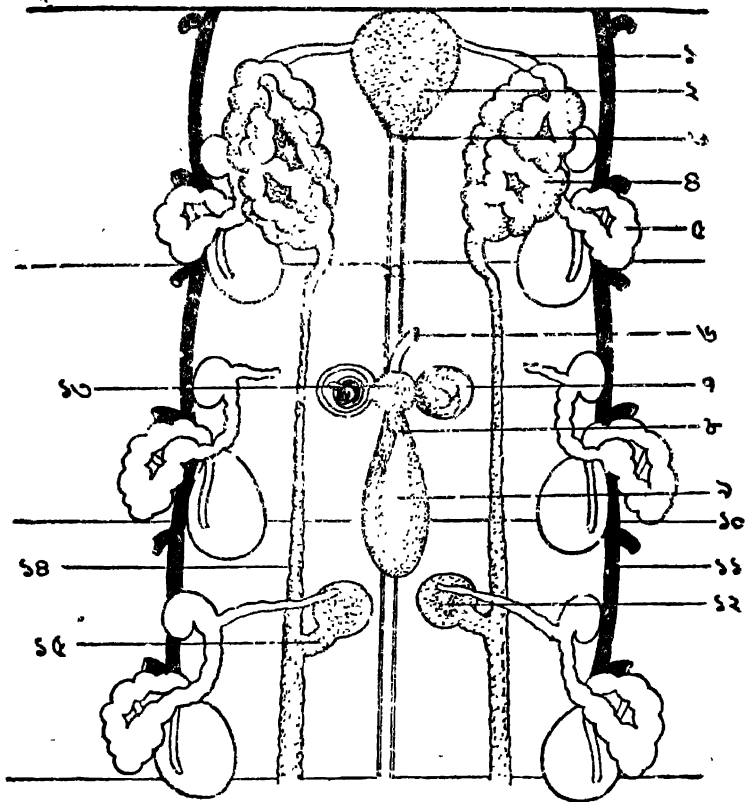
৩১নং চিত্র

জোঁকের দশম হইতে দ্বাদশ অঙ্গুরীখণ্ডের ভিতরের জননঅঙ্গ ও রেচন অঙ্গগুলি দেখান হইতেছে।

১, ইজাকুলেটরি ডাক ; ২, অ্যাট্রিয়ম ; ৩, সঙ্গম-অঙ্গের থলি ; ৪, এপিডিডাইমিস ; ৫, নেফ্রিডিয়ম ; ৬, স্ত্রী-বহিঃজননছিদ্র ; ৭, ডিম্বাশয়ের থলি ; ৮, সাধারণ ডিম্বনালী (common oviduct) ; ৯, স্ত্রী-বহিঃজনন অঙ্গ (vagina) ; ১০—১১, পার্শ্বীয় দেহরসমিশ্রিত রক্তবাহী নালী ; ১২, শুক্রাশয় থলি ; ১৩, অ্যালবুমেন গ্রন্থি ; ১৪, সংযুক্ত শুক্রাশয় নালী (vasa-defferentia) ; ১৫, শুক্রাশয়নালী (vasa-efferentia) ।

হইতে বাহির হইয়া জোঁকের দেহের দুইপাশে একটি করিয়া সংযুক্ত শুক্রনালীর (*Vasa-defferentia*) সৃষ্টি করে। সংযুক্ত শুক্রনালী এই

ভাবে ক্ষুদ্র শুক্রনালীগুলিকে যুক্ত করিয়া জোঁকের অগ্রভাগের দিকে ধাবিত হয়। সংযুক্ত শুক্রনালী দুইটি যখন জোঁকের দশম দেহখণ্ডের দুই পাশে পৌঁছায়, তখন ইহারা পেঁচাইয়া ফুলিয়া উঠে। শুক্রনালীর এই অংশটি
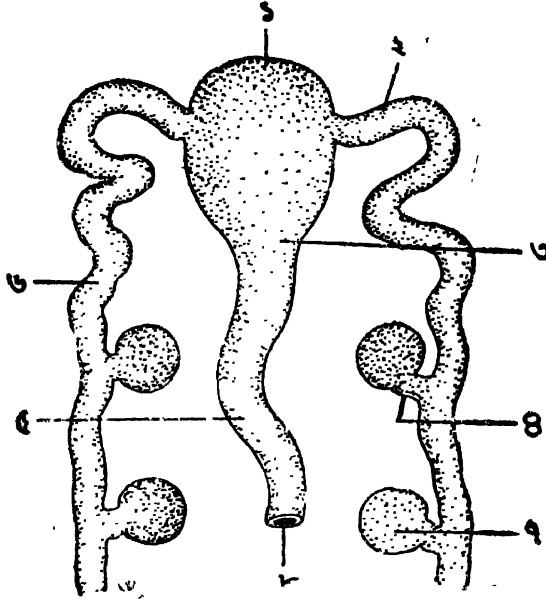
৩২নং চিত্র

জোঁকের পুং-জননতন্ত্রের অগ্রভাগ দেখান হইতেছে।

১, অ্যাট্রিয়ম ; ২, ইজাকুলেটরি ডাক্ ; ৩, পুংলিঙ্গ বা সঙ্গম-অঙ্গ ; ৪, শুক্রাশয় নালী ; ৫, সঙ্গম-অঙ্গের থলি ; ৬, এপিডিডাইমিস ; ৭, শুক্রাশয় থলি।

একটি গ্রন্থির ন্যায় দেখিতে হয় এবং এই অংশটিকে শুক্রনালীর **এপিডিডাই-মিস** (*Epididymis*) বলে। এপিডিডাইমিস্ দশম দেহখণ্ডের অগ্রভাগে আবার সোজা হইয়া জোঁকের অঙ্কীয় মধ্যরেখার দিকে ধাবিত হয়। শুক্র-নালীর এই সোজা নালীটিকে **ইজাকুলেটরি** (*Ejaculatory duct*) **ডাক্** বলা হয়। দুইধারে ইজাকুলেটরি ডাক্ জোঁকের অঙ্কীয় মধ্যরেখায় অবস্থিত একটি বেশ বড় গোলাকার থলির সহিত যুক্ত হয়। এই বড় গোলাকার থলিকে **অ্যাট্রিয়ম** (*Atrium*) বলা হয়। অ্যাট্রিয়মের উপরিভাগ একটি গ্রন্থিবিশেষ। ইহাকে **প্রোস্টেট গ্রন্থি** (*Prostate*

gland) বলা হয়। অ্যাট্রিয়ম থলিটি ধীরে ধীরে সরু হইতে হইতে একটি
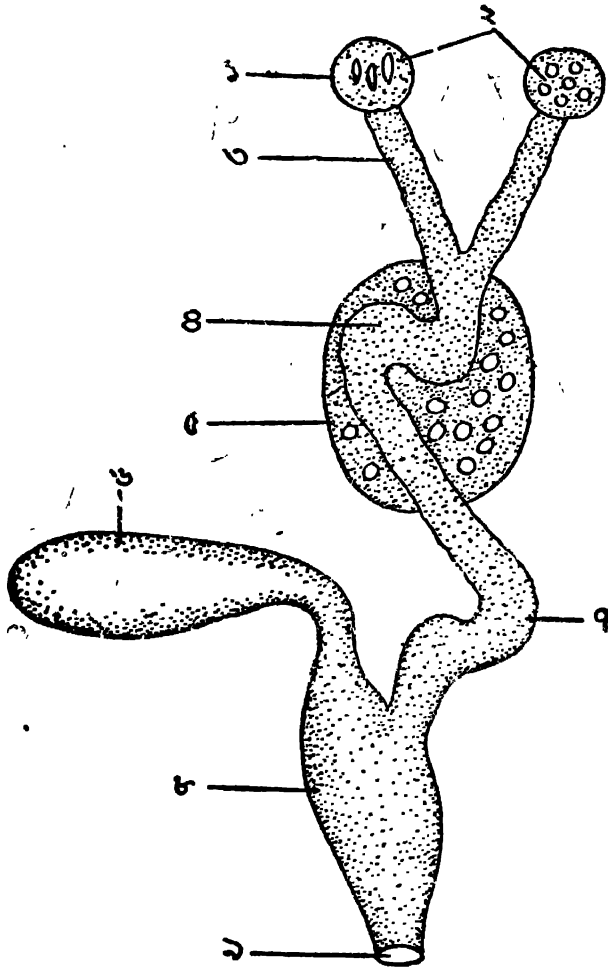
৩২নং চিত্র

জেঁাকের স্ত্রী-জননতন্ত্র দেখান হইতেছে।

১, ডিম্বাশয় থলি ; ২, ডিম্ব ; ৩, ডিম্বনালী ; ৪, সাধারণ ডিম্বনালী ;
৫, অ্যালবুমেন গ্রন্থি ; ৬, বহিঃ-স্ত্রী জননঅঙ্গের পার্শ্বথলি ;
৭, সাধারণ ডিম্বনালীর শেষাগ্র ; ৮, বহিঃ-স্ত্রী-জননতন্ত্র ;
৯, বহিঃ-জননছিদ্র।

সূক্ষ্ম পুংলিঙ্গে (*Penis*) পরিণত হয়। এই পুংলিঙ্গের একটি আবরণ থাকে। পুংলিঙ্গটি জেঁাকের অঙ্কীয়দেশের দশম দেহখণ্ডের মধ্যরেখায়

পুং-জননছিদ্রে (*Male gonopore*) মুক্ত হয়। প্রয়োজনের সময় জেঁাকের পুং-লিঙ্গটি উল্টাইয়া পুংজনন-ছিদ্র হইতে বাহির হইতে দেখা যায়।

স্ত্রী-জননতন্ত্র (*Female reproductive system*): জেঁাকের স্ত্রী-জননতন্ত্রে একজোড়া **ডিম্বথলি** (*Ovisac*), একজোড়া **ডিম্বনালী** (*Oviduct*), একটি **সংযুক্ত ডিম্বনালী** বা **সাধারণ ডিম্বনালী** *Common oviduct*) এবং একটি **বহিঃ-স্ত্রীজননঅঙ্গ** (*Vagina*) বিদ্যমান। জেঁাকের ডিম্বথলি দুইটি উহার এগারো দেহখণ্ডকের দুইপার্শ্বে, অঙ্কদেশীয় স্নায়ুসূত্রটিকে মাঝে রাখিয়া অবস্থান করে। শুক্রথলির মত ডিম্বথলিও দেহরসপূর্ণ গোলাকার থলি মাত্র; কিন্তু ইহার ভিতর পেঁচানো সূতার মত **ডিম্বাশয়** (*Ovary*) থাকে। ডিম্বাশয়থলি হইতে একটি করিয়া নালী বাহির হয়। **নালী দুইটিকে ডিম্বনালী** (*Oviduct*) বা **ডিম্বাশয় নালী** বলা হয়। এই দুইটি ডিম্বাশয় নালী জেঁাকের অঙ্কীয় মধ্যরেখার উপর মিলিত হইয়া একটি **যুক্ত** বা **সাধারণ ডিম্বাশয় নালী** (*Common oviduct*) সৃষ্টি করে। যুক্ত ডিম্বাশয় নালীটির অগ্রভাগ **এলবুমেন গ্রন্থির দ্বারা** (*Albumen gland*) আবৃত থাকে। এই গ্রন্থির রসযুক্ত ডিম্বাশয় নালীর ভিতর নিঃসৃত হয়। যুক্ত-ডিম্বাশয় নালীটি ধীরে ধীরে স্থূল হইয়া একটি থলিকার আকার গ্রহণ করে এবং ইহার মুখটি জেঁাকের এগারো দেহখণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে অঙ্কীয় মধ্যরেখায় **স্ত্রী-জননছিদ্রে** (*Female gonopore*) মুক্ত হয়। স্থূল মাংসল থলিকাটিকে **বহিঃ-স্ত্রী-জননঅঙ্গ** (*Vagina*) বলা হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিংড়ি

(Palaemon Carcinus)

গলদা চিংড়ির বহিরাকৃতি ও স্বভাব এবং বাসস্থানের বিষয় জীববিজ্ঞান প্রবেশের প্রথম ভাগে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নে উহার বিবিধ তন্ত্র (System)-গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

পৌষ্টিকতন্ত্র (Alimentary system) :

পৌষ্টিকতন্ত্রটি দুইভাগে বিভক্ত; যথা—পৌষ্টিকনালী এবং পুষ্টিগ্রন্থি। চিংড়ির **পৌষ্টিকনালীটি** (*Alimentary canal*) উহার মুখছিদ্রের দ্বার হইতে আরম্ভ হইয়া পায়ুছিদ্রে শেষ হইয়াছে। নালীটি বেশ বড় এবং ইহার বিবিধ অঞ্চল নানা আকারের, এবং প্রকৃতির দিক দিয়াও অঞ্চলগুলি এক নহে। সুতরাং মোটামুটি পৌষ্টিকনালীকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়; যথা—(i) **অগ্র-পৌষ্টিকনালী** (*Fore-gut*) বা **স্টোমোডিয়ম** (*Stomodoeum*); (ii) **মধ্য-পৌষ্টিকনালী** (*Mid-gut*) বা **মেসেনটেরন** (*Mesenteron*), এবং **পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালী** (*Hind-gut*) বা **প্রোক্টোডিয়ম** (*Proctodoeum*)। অগ্র ও পশ্চাৎ পৌষ্টিকনালীর ভিতরের দিকের গাত্র (wall) পুরু এবং কৃত্তিকাবরণী দিয়া আবৃত থাকে; কিন্তু মধ্য-পৌষ্টিকনালীর ভিতরের দিকের গাত্র নরম কোষের দ্বারা আবৃত থাকে। চিংড়ির দেহের বাহিরের কৃত্তিকাবরণীটি মুখছিদ্র এবং পায়ুছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া অগ্র ও পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালীর ভিতরের দিকের গাত্রটিকে আবৃত করিয়াছে। পৌষ্টিকনালীর অগ্র ও পশ্চাৎ অংশটি চিংড়ির বহিরাবরণের সহিত একই সময় ত্বককোষ হইতে (Epidermal growth) বৃদ্ধিকালে সৃষ্টি হওয়ায় উহাদের ভিতরের গাত্রটিও কৃত্তিকা-আবরণী দ্বারা আবৃত হইয়া যায়। কিন্তু মধ্য-পৌষ্টিকনালী পরে মধ্য-ত্বককোষ (Mesodermal growth) হইতে বৃদ্ধিকালে সৃষ্টি হওয়ায় উহার ভিতরের গাত্রটি নরম কোষে আবৃত থাকে। বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে পৌষ্টিকনালীর তিনটি অঞ্চল পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া একটি-নালীতে পরিণত হয়। নিম্নে তিনটি অঞ্চলের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(i) অগ্র-পৌষ্টিকনালী (**Fore-gut or Stomodoeum**): মুখছিদ্র (*Mouth*), গলবিল (*Oesophagus*) এবং পাকস্থলী (*Stomach*)
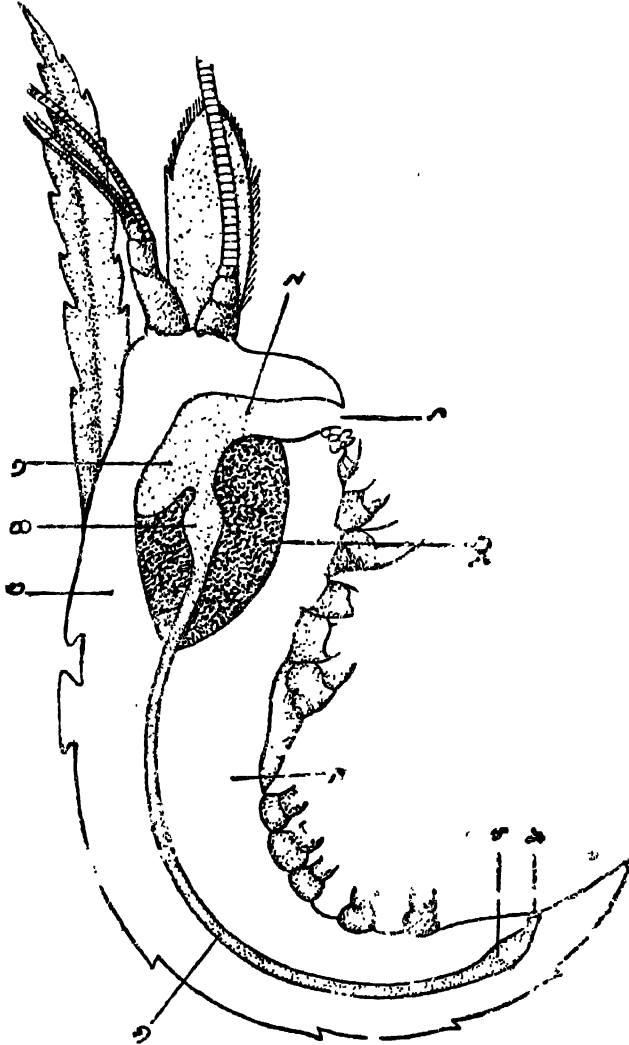
৩৪নং চিত্র

চিংড়ির পৌষ্টিকতন্ত্র দেখান হইতেছে।

১, মুখছিদ্র ; ২, শ্বাসনালী ; ৩, কার্ডিয়েক পাকস্থলী ; ৪, পাইলোরিক পাকস্থলী ; ৫, সেফালোথোরাক্স ; ৬, অন্ত্র ; ৭, মলাশয়ের কন্দ ; ৮, পায়ুছিদ্র।

—এই কয়টি অংশের একত্রিত অঞ্চলকেই অগ্র-পৌষ্টিকনালী বলা হয়। চিংড়ির মুখছিদ্রটি উহার অঙ্কীয়দেশের তিন এবং চার দেহখণ্ডের মাঝে বিদ্যমান।

ছিদ্রমুখটি বিভিন্ন আকৃতির অঙ্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার উপরিভাগ শীল্ডের মত প্রসারিত একটি **ল্যাব্রাম** (*Labrum*) এবং নিম্নে **লেবিয়ম** (*Labium*) ও মুখছিদ্রের দুইপাশ কঠিন **ম্যানডিবল** (*Mandible*) দ্বারা আবৃত থাকে। **মুখগহ্বরটি** (*Buccal cavity*) খুবই ছোট এবং ইহার পরবর্তী অংশ বেশ সুস্পষ্ট আয়তাকার। এই অংশটিকে **গলবিল** (*Oesophagus*) বলা হয়। পৌষ্টিকনালীর পরবর্তী অঞ্চল বেশ বড় এবং থলির মত। এই অঞ্চলটি চিংড়ির শিরোবক্ষের বা **সেফালোথোরাক্সের** (*Cephalothorax*) অধিকাংশ স্থানাই দখল করিয়া থাকে। এই অঞ্চলটিকে **পাকস্থলী** (*Stomach*) বলা হয়। পাকস্থলী আবার দুইভাগে বিভক্ত
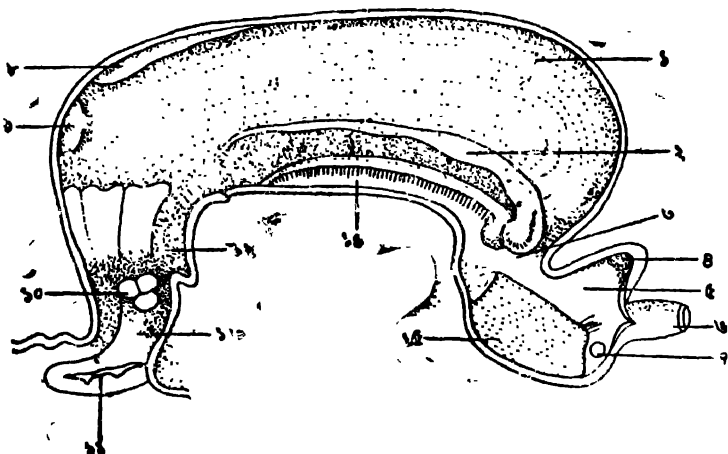
৩৫নং চিত্র

চিংড়ির অগ্রভাগটিকে উপর হইতে লম্বালম্বিভাবে কাটিয়া দেখান হইতেছে।

১, কার্ডিয়েক পাকস্থলী ; ২, পরিচালন প্লেট ; ৩, কার্ডিয়েক ও পাইলোরিক পাকস্থলীর সংযোগস্থল ; ৪, পাইলোরিক সিকম ; ৫, পাইলোরিক পাকস্থলীর উপরকার গহ্বর ; ৬, পৌষ্টিক-নালীর মধ্যভাগ ; ৭, হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থির নালীর ছিদ্র ; ৮, ল্যান-সিওলেট প্লেট ; ৯, গোলাকার কৃত্তিকা প্লেট ; ১০, ম্যানডিবল উপাঙ্গের মোলার দাঁত ; ১১, মুখছিদ্র ; ১২, গ্রাসনালী ও কার্ডিয়েক পাকস্থলীর সংযোগস্থল ; ১৩, গ্রাসনালী ; ১৪, হ্যাস্‌টেট্ প্লেট ; ১৫, পাইলোরিক পাকস্থলীর ছাঁকনী যন্ত্র।

প্রথম ভাগটি বেশ স্থূল থলির মত এবং দ্বিতীয় ভাগটি প্রথম ভাগের শেষাংশের নিম্নে বিদ্যমান। এই দুই ভাগের সংযুক্ত অংশটি সরু নালীর মত এবং ইহার ভিতর **কপাটিকা** (*Valve*) বিদ্যমান। পাকস্থলীর প্রথম ভাগটিকে

কর্ডিয়েক পাকস্থলী (*Cardiac stomach*) এবং দ্বিতীয় ভাগটিকে **পাইলোরিক পাকস্থলী** (*Pyloric stomach*) বলা হয়। সংযুক্ত সরু নালীর কপাটিকাগুলি পাইলোরিক পাকস্থলীর ভিতরে মুক্ত হয় এবং বিপরীত দিকে মুক্ত হয় না। আগেই বলা হইয়াছে, অগ্র-পৌষ্টিক নালীর ভিতরকার গাত্র বা দেওয়াল কৃত্তিকার দ্বারা আবৃত। কার্ডিয়েক পাকস্থলীর **মেঝেতে** (*Floor*) বিবিধ প্রকারের কঠিন **কৃত্তিকা** (*Cuticle*) বিদ্যমান। এই কঠিন কৃত্তিকা-খণ্ডগুলির ধারে কাঁটার মত অঙ্গ দেখা যায়। ইহারা কার্ডিয়েক পাকস্থলীকে বল দান করে এবং খাদ্যপ্রাণীকে চূর্ণ করিয়া নির্দিষ্ট পথে ধীরে ধীরে আগাইয়া দেয়। গলবিল যে ছিদ্র দিয়া কার্ডিয়েক পাকস্থলীতে মুক্ত হইয়াছে, সেই ছিদ্রের উপরে একটি গোলাকার **কৃত্তিকা প্লেট** (*Circular Plate*) থাকে। গোলাকার কৃত্তিকা-প্লেটের পিছনে কার্ডিয়েক পাকস্থলীর অগ্রাংশের উপরে দুইপাশে শূলের ফলার মত একটি করিয়া **ল্যানসিওলেট কৃত্তিকা প্লেট** (*Lanceolate Plate*) বিদ্যমান। কার্ডিয়েক পাকস্থলীর মেঝের অঙ্কীয় মধ্যরেখার উপর বর্শার ফলার মত আরও একটি কঠিন ত্রিকোণাকৃতি কৃত্তিকা প্লেট অবস্থান করে। ইহা আকারে সবচেয়ে বড় এবং ইহাকে **হ্যাসটেট** (*Hastate plate*) বলা হয়।

ত্রিকোণাকৃতি হ্যাসটেট্ প্লেটের চওড়া তলটি পাইলোরিক পাকস্থলীর দিকে থাকে এবং ইহার অগ্রাংশ গলবিলমুখী। হ্যাসটেট্ তলটি প্লেটের নিম্নে কার্ডিয়েক পাকস্থলী ছিদ্রপথে পাইলোরিক পাকস্থলীর সহিত সরু নালীর দ্বারা সংযুক্ত। হ্যাসটেট্ প্লেটের চারিপাশে কঠিন চুলের মত **ব্রিস্টিল্‌স্** (*Bristles*) দেখা যায়। হ্যাসটেট প্লেটের দুই পাশে একটি করিয়া বাঁকানো চিরুণীর মত প্লেট থাকে। এই প্লেটগুলির চিরুণীর মত আকার হওয়ায় ইহাদের **চিরুণী-প্লেট** (*Comb-plate*) বলা হয়। চিরুণী প্লেটের ভিতরের ধারে, হ্যাসটেট প্লেটের দিকে সারিবদ্ধভাবে চিরুণীর দাঁড়ার মত ব্রিস্টিল্‌স্ থাকে। হ্যাসটেট প্লেটের দুইপাশে একটি করিয়া সরু নালী থাকে। এই সরু নালীগুলিও ধারগুলির ব্রিস্টিল্‌স্ দ্বারা আবৃত থাকে। নালী দুইটি কার্ডিয়েক ও পাইলোরিক পাকস্থলীর মধ্যস্থ ছিদ্রে মিলিত হয়। চিরুণী প্লেটের দুই ধারে লম্বালম্বিভাবে উঁচু কঠিন কৃত্তিকা প্লেট দেখা যায়। ইহারা খাদ্যচূর্ণকে **কার্ডিও-পাইলোরিক ছিদ্রপথে** (*Cardio Pyloric-Aperture*) প্রবেশ

করাইতে সাহায্য করে। সেইজন্য উঁচু প্লেট দুইটিকে **পরিচালন প্লেট** (*Guiding Ridge*) বলা হয়। সমগ্র কার্ডিয়েক পাকস্থলীর কার্য খাদ্য-প্রাণীকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করা। ইহা পরিপাকের অন্ত ব্যবহৃত হয় না। কার্ডিয়েক পাকস্থলীর বাহিরের গাত্রের সহিত নানাবিধ পেশী যুক্ত থাকে। এই পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণ ক্রিয়ার ফলে বিবিধ প্লেটের সহিত খাদ্যপ্রাণীর সংঘর্ষ হয়। দুইটি প্লেটের ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে উহাদের মধ্যকার খাদ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। খাদ্যপ্রাণী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেলে উহা
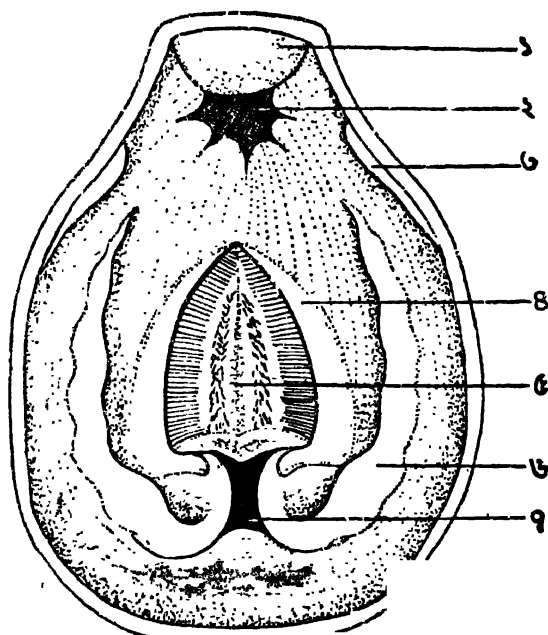
৩৬নং চিত্র

রেখাচিত্রের দ্বারা চিংড়ির কার্ডিয়েক পাকস্থলীর তল বা মেঝে দেখান হইতেছে।

১, গোলাকার কুণ্ডিকা প্লেট ; ২, গ্রাসনালীর প্রবেশ পথ ; ৩, ল্যানসিওলেট প্লেট ; ৪, চিরুণী প্লেট ; ৫, হ্যাসটেট্ প্লেট ; ৬, পরিচালন প্লেট ; ৭, কার্ডিও-পাইলোরিক ছিদ্র।

ধীরে ধীরে পাইলোরিক পাকস্থলীর দিকে আগাইয়া যায়। খাদ্যচূর্ণের গতিকে, পরিচালন প্লেট পথ দেখাইয়া দেয়। খাদ্যচূর্ণ এইভাবে কার্ডিয়েক পাইলোরিক ছিদ্রপথে পৌছায়। আগেই বলা হইয়াছে যে, ছিদ্রের মুখে সারিবদ্ধভাবে

কপাটিকা বিদ্যমান। বড় আকারের খাদ্যবস্তুগুলি এই কপাটিকার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কেবলমাত্র অতি সূক্ষ্ম খাদ্যচূর্ণগুলি কার্ডিও পাইলোরিক ছিদ্রপথে পাইলোরিক পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে। পাইলোরিক পাকস্থলী কার্ডিয়েক পাকস্থলী অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার মেঝেয়ও একটি ব্যারেলের মত কঠিন কাঁটানির্মিত জালিকা বিদ্যমান। খাদ্যচূর্ণগুলি এই জালিকার ভিতর কার্ডিও-পাইলোরিক ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে। জালিকাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় বড় খাদ্যচূর্ণগুলিকে আটকাইয়া রাখে। জালিকার ন্যায় ফাঁপা ব্যারেলটিকে **ছাঁকনী যন্ত্র** (*filtering chamber*) বলা হয়। ছাঁকনী যন্ত্রের পিছনে দুই দিক হইতে দুইটি নালী যুক্ত হয়। এই নালী দুইটি **হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থি** (*Hipatopancreatic gland*) হইতে বাহির হইয়া পাইলোরিক পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে। হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থি হইতে বিবিধ জলীয় পরিপাককারী উৎসেচক এই নালীগুলিই বহন করিয়া পাইলোরিক পাকস্থলীর ভিতর জমা করে। সুতরাং এই নালী দুইটিকে **হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক নালী** (*Hepatopancreatic duct*) বলা হয়। পাইলোরিক পাকস্থলীর উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র নলাকার থলি থাকে। ইহাকে **পাইলোরিক সিকম** (*Pyloric Caecum*) বলে। পাইলোরিক পাকস্থলী ধীরে ধীরে সরু হইয়া **অন্ত্রে** (*Intestime*) পরিণত হয়। অন্ত্রই মধ্য-পৌষ্টিকনালীর সমগ্র অংশ। ইহা সরু নালীর মত এবং ইহা চিংড়ির পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার পেশীর ঠিক নিম্নে বিদ্যমান। অন্ত্র সোজা লম্বালম্বিভাবে চিংড়ির পশ্চাদ্-অঞ্চলে আগাইয়া যায়। ইহা চিংড়ির পৌষ্টিকনালীর সর্ববৃহৎ অঞ্চল। তরল ও সরল খাদ্যরস শোষণ করাই ইহার কার্য। অন্ত্রের প্রাচীর খুবই পাতলা, সেইজন্য খাদ্যবস্তু থাকা অবস্থায় ইহার রঙ কালো দেখায়। অন্ত্র চিংড়ির লেজ-উপাঙ্গ অঞ্চলের নিকট **মলাশয়ে** (*Rectum*) পরিণত হয়। মলাশয়ই পশ্চাদ্-পৌষ্টিকনালীর সমগ্র অংশ। মলাশয়ের অগ্রভাগ একটি ক্ষুদ্র **কন্দে** (*Bulb*) পরিণত হয়। এই কন্দকে **মলাশয় কন্দ** (*Rectum bulb*) বলা হয়। মলাশয় নালী দুইটি লেজ-উপাঙ্গের মাঝে একটি আড়াআড়ি ছিদ্রের দ্বারা বাহিরে মুক্ত হয়। ইহাই চিংড়ির **পায়ুছিদ্র** (*Anus*) এবং ছিদ্রের দ্বারাই অপরিপাক খাদ্যবস্তু পৌষ্টিকনালী হইতে দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।

চিংড়ির একটিমাত্র বৃহৎ পুষ্টিগ্রন্থি বিদ্যমান। ইহাকে **হিপাটোপ্যান-**

ক্রিয়াস (*Hepatopancreas*) বলা হয়। এই গ্রন্থির মধ্যে যকৃৎ (*Hepatic*) কোষ এবং অগ্ন্যাশয় (*Pancreas*) কোষ উভয়ই থাকে। গ্রন্থিটি বেশ বড় ও নরম এবং ইহার রঙ কমলালেবুর মত। গ্রন্থিটি শিরোবক্ষ চুল কারাপেসের ঠিক নিম্নে বিস্তারিতভাবে থাকে। প্রধানতঃ ইহা পাইলোরিক পাকস্থলী এবং মধ্য-পৌষ্টিকনালীর অগ্রভাগ আবৃত করিয়া রাখে। গ্রন্থিটি মোটামুটি দুই খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ড হইতে একটি নালী বাহির হইয়া পাইলোরিক পাকস্থলীতে যুক্ত হয়। গ্রন্থিটি বিবিধ প্রকারের পরিপাক উৎসেচক নিঃসৃত করে এবং উহা নালীর দ্বারা পাইলোরিক পাকস্থলীতে নীত হয়। পেপসিন, স্ট্রিয়েপসিন, ট্রাইপসিন ইত্যাদি উৎসেচক থাকায় কঠিন প্রোটিন, জল-অঙ্গার ও স্নেহপদার্থ খাদ্যগুলি দ্রবীভূত হইয়া তরল ও সরল হয়। তরল ও সরল খাদ্যকে হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থি আবার শোষণ করিয়া লইতে পারে। গ্রন্থিটি খাদ্যসার শোষণ করিয়া চিংড়ির ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। সুতরাং হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থি প্রধানতঃ দুইটি কার্য করে, যথা—উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া খাদ্য পরিপাক করা এবং উহার কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা। অতএব হিপাটোপ্যানক্রিয়াস একটি পুষ্টিগ্রন্থি, আবার সঞ্চয়-অঙ্গও (*Storage Organ*) বটে।

খাদ্যগ্রহণ-প্রণালী ও পরিপাক প্রক্রিয়া
(Machanism of feeding and Digestion)

চিংড়ি সাধারণ শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ, জলজ পোকা-মাকড় এবং গলিত জৈব পদার্থ ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহাদের ভক্ষণের সময়ও নির্দিষ্ট। সন্ধ্যায় এবং ভোরবেলা ইহারা ভক্ষণ করে। চিংড়ি উহার দ্বিতীয় পদউপাঙ্গের সাঁড়াশির মত অংশের দ্বারা খাদ্যবস্তু ধরিয়া ম্যাক্সিলিপেড উপাঙ্গগুলির নিকট জমা করে। ইহার পর মুখের দুই পাশের ম্যাক্সিলিপেড খাদ্যবস্তুগুলিকে মুখছিদ্রের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রথম ম্যাক্সিলা ও দ্বিতীয় ম্যাক্সিলাও চিংড়ির মুখের ভিতর খাদ্য প্রবেশ ক্রিয়ায় সাহায্য করে। কঠিন দাঁতের মত ম্যানডিবল বড় বড় খাদ্যবস্তুগুলিকে ঘর্ষণের দ্বারা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দেয়। পৌষ্টিকনালীর সহিত সংযুক্ত পেশীগুলি সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা খাদ্যবস্তু নালীর ভিতর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। কার্ডিয়েক

পাকস্থলীর কৃত্তিকা প্লেটের সাহায্যে খাদ্যবস্তু চূর্ণ হয় এবং হিপাটোপ্যান-ক্রিয়েটিক গ্রন্থির উৎসেচকের দ্বারা পাইলোরিক পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু হজম হয়। এই পুষ্টিগ্রন্থি আবার খাদ্যসার সঞ্চয় করে।

পৌষ্টিকনালীর অন্ত্র-অঞ্চলে খাদ্যসার উহার ভিতরকার কোষস্তরের দ্বারা শোষিত হয় এবং তার পরে সংবহন-তন্ত্রের দ্বারা দেহের সর্ব-অঙ্গে সরবরাহ হয়। অপরিপাক খাদ্যগুলি পায়ুছিদ্র দ্বারা দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।

শ্বাসতন্ত্র
(Respiratory System)

চিংড়ি জলজ প্রাণী। সুতরাং জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন ইহারা শ্বাস-কার্যের জন্য শোষণ করে। চিংড়ির রক্তে হোমোগ্লোবিনের মত তাম্রঘটিত **হোমোসায়ানিন** (*Hoemocyanin*) নামক একপ্রকার সাদা রাসায়নিক পদার্থ থাকে এবং ইহাই জল হইতে দ্রবীভূত অক্সিজেন শোষণ করে।

চিংড়ির শ্বাস-অঙ্গ তিন প্রকারের ; যথা—(*i*) কারাপেসের দুইপাশের মুক্ত ধারটি একটি পাতলা পর্দা দিয়া আবৃত থাকে। ইহাকেই **ব্রাঙ্কিওস্টিগাইট** (*Branchiostegite*) পর্দা বলা হয়। ব্রাঙ্কিওস্টিগাইট পর্দায় প্রচুর সূক্ষ্ম রক্তবাহী নালী থাকে। নালীগুলির প্রাচীর খুবই পাতলা এবং পর্দাটি সর্বক্ষণ জলের সংস্পর্শে থাকায় জল হইতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা রক্তবাহী নালীর ভিতর প্রবেশ করে। এইভাবে রক্তে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং শুদ্ধ হয়। রক্তবাহী নালীর ভিতর হইতে একই উপায়ে দ্রবীভূত কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাহির হইয়া আসে এবং জলের স্রোতের সহিত মিশিয়া যায়।

(ii) তিন-জোড়া মেক্সিলিপিডের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া পাতার মত মোট তিন-জোড়া অংশ থাকে। এই অংশগুলিকে **এপিপোডাইট** (*Epipodite*) বলে। এই এপিপোডাইটগুলিতে প্রচুর সূক্ষ্ম রক্তনালী থাকে। ইহা জলে সঞ্চালিত হয় এবং সেইসময় জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন রক্তবাহী নালীর ভিতর প্রবেশ করে ও রক্তবাহী নালীর ভিতর হইতে দ্রবীভূত কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাহির হইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়।

(iii) চিংড়ির শিরোবক্ষের দুইপাশের বাহিরের দেওয়ালে সারিবদ্ধভাবে আটটি করিয়া মোট আট-জোড়া **ফুলকা** (*Gill*) থাকে। ফুলকাগুলিকে

ব্রাঙ্কিওস্টিগাইট পর্দা আবৃত রাখে। চিংড়ির শিরোবক্ষের দুইপাশের বাহিরের দেওয়াল এবং ব্রাঙ্কিওস্টিগাইট পর্দার মাঝে একটি প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি হয়। এই প্রকোষ্ঠটির কেবলমাত্র পৃষ্ঠাদিকটি বন্ধ থাকে, কিন্তু ইহার অঙ্কীয়, অগ্র ও পশ্চাদ্দিক খোলা থাকে। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে ফুলকাগুলি থাকে বলিয়া ইহাকে **ফুলকা প্রকোষ্ঠ** (*Gill-chamber*) বলে। ফুলকা-প্রকোষ্ঠের ভিতর সর্বদাই বাহিরের জল প্রবেশ করে এবং ফুলকাগুলি জলে ডুবিয়া থাকে। এই ফুলকাগুলির ভিতর প্রচুর সূক্ষ্ম রক্তবাহী-নালী থাকে এবং জলের ভিতরকার দ্রবীভূত অক্সিজেন রক্তবাহী-নালীর ভিতর প্রবেশ করে এবং রক্তরসে দ্রবীভূত কার্বন-ডাইক্সাইড বাহির হইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। ব্রাঙ্কিওস্টিগাইট পর্দা কাটিয়া ফেলিলে শিরোবক্ষের যে-কোন একপাশের সাতটি ফুলকা দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় ফুলকাটি দ্বিতীয় ফুলকার নিম্নে থাকায় বাহির হইতে দেখা যায় না। প্রথম ফুলকাটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং ইহাদের আকার পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে বাড়িয়া যায় এবং অষ্টম ফুলকাটি আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রতিটি ফুলকা অর্ধচন্দ্রাকৃতি (Crescent shaped) এবং প্রত্যেকটি ফুলকার মাঝে একত্র করিয়া লম্বা ও সরু মধ্যশিরা বিদ্যমান। মধ্যশিরার দুইপাশ হইতে সারিবদ্ধভাবে পাতার মত ফুলকাপত্র (Filaments) থাকে। ফুলকাগুলিকে বইয়ের সহিত তুলনা করা হয়। একটি বই লইয়া দুইভাগ করিলে যেমন দুইপাশে প্রচুর পাতা, তেমনি ফুলকার মধ্যশিরার দুইপাশেও প্রচুর পাতার মত ফুলকাপত্র থাকে। সুতরাং এই ধরণের ফুলকাগুলিকে **বই-ফুলকাও** (*book-gill*) বলা হয়। প্রতিটি ফুলকায় দুই প্রকারের রক্তবাহীনালী থাকে। কার্বন-ডায়ক্সাইড-যুক্ত রক্তবাহীনালীগুলি ফুলকার বাহির-স্তরে অবস্থান করে এবং তথায় প্রসারিত হইয়া জালকাকারে শেষ হইয়া যায়। এই জালক হইতে নূতন রক্তবাহী নালীর সৃষ্টি হয় এবং তাহা অক্সিজেনপূর্ণ রক্ত ফুলকার মধ্যে প্রবেশ করে।

ফুলকাগুলি চিংড়ির বিবিধ অঙ্গের সহিত যুক্ত বা সংলগ্ন হইয়া থাকে। সুতরাং ফুলকাগুলির অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন ফুলকার নানারূপ নামকরণ করা হইয়াছে। প্রথম ফুলকাটি দ্বিতীয় মেক্সিলিপেডের বা কক্সার সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহাকে **পোডোব্র্যাঙ্ক** (*Podobranch*) বলা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফুলকা চিংড়ির আর্থোডিয়াল পর্দার সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহাদের
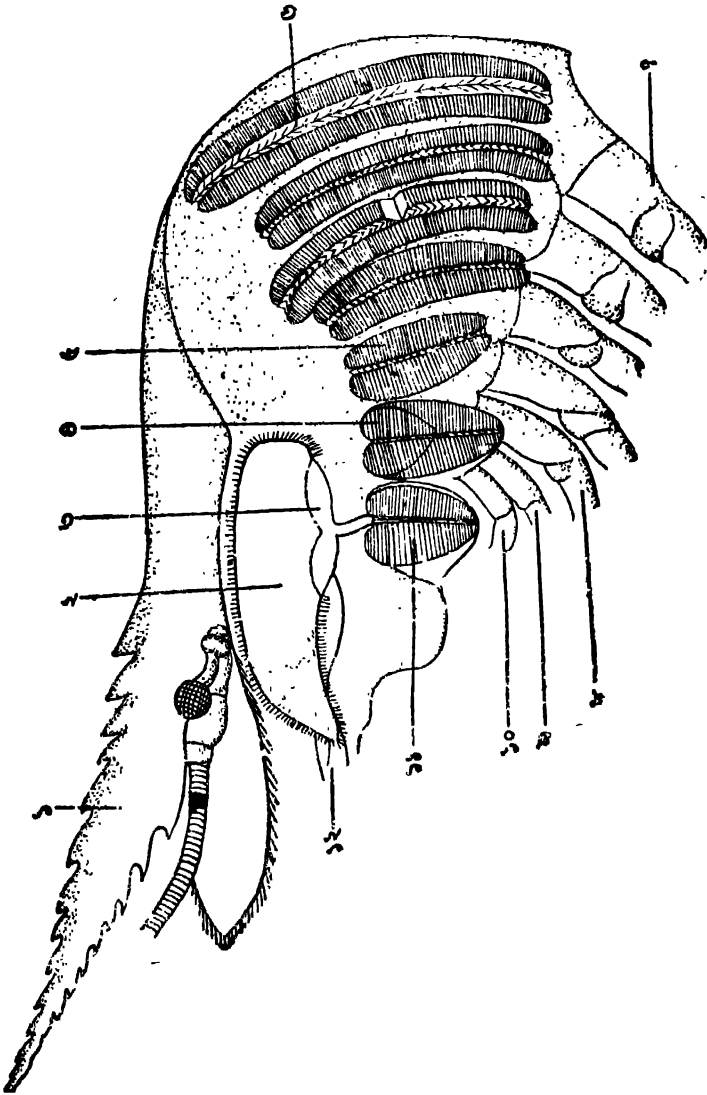
৩৭নং চিত্র—চিংড়ির ফুলকা-গহ্বরের ভিতরকার শ্বাসযন্ত্রগুলি দেখান হইতেছে।

১, রসট্রাম; ২, দ্বিতীয় ম্যাক্‌সিলার স্ক্যাফোগ্নাথাইট; ৩, এপিপোডাইট; ৪, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফুলকা (আর্থোব্রাঙ্ক); ৫, চতুর্থ ফুলকা; ৬, অষ্টম ফুলকা; ৭, পঞ্চম পদ-উপাঙ্গ; ৮, প্রথম ম্যাকসিলিপেড; ৯, তৃতীয় ম্যাকসিলিপেড; ১০, দ্বিতীয় ম্যাকসিলিপেড; ১১, প্রথম ফুলকা (পোডোব্রাঙ্ক); ১৩, প্রথম ম্যাকসিলিপেড।

আর্থ্রোব্রাঙ্ক (*Arthrobranch*) বলা হয়। চতুর্থ হইতে অষ্টম ফুলকা অর্থাৎ পরবর্তী পাঁচটি ফুলকা পাঁচটি পদ-উপাঙ্গের উপরকার দেহখণ্ডের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহাদের **প্লুরোব্রাঙ্ক** (*Pleurobranch*) বলা হয়। ফুলকা-প্রকোষ্ঠে অভিনব উপায়ে জলস্রোতের সৃষ্টি হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ফুলকা-প্রকোষ্ঠের অঙ্কীয়, অগ্র ও পশ্চাদ্দিক্ খোলা থাকে। প্রথম ফুলকার ঠিক উপরে চিংড়ির দ্বিতীয় মেক্সিলা বিদ্যমান। উহার পাখার মত **স্কাফোগ্নাথাইট** (*Scaphognathite*) অংশটি ক্রমাগত জলের ভিতর বেগে সঞ্চালিত হওয়ায় বাহিরের জল অঙ্কীয় পশ্চাদ্দিক্ হইতে ফুলকা-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সামনের দিক হইতে বাহির হইয়া যায়। এইভাবে ক্রমাগত ফুলকা-প্রকোষ্ঠের ভিতর জল প্রবেশ করে এবং বাহির হইয়া যায়। সুতরাং ফুলকাগুলি সর্বদাই অক্সিজেন দ্রবীভূত টাটকা জলের সংস্পর্শে আসে এবং উহার ভিতরকার রক্তবাহী নালীর রক্ত হইতে দ্রবীভূত কার্বন-ডায়ক্সাইড বাহির হইয়া যায় এবং জলের ভিতরকার অক্সিজেন রক্তের ভিতর প্রবেশ করে। এইরূপ ব্রাঙ্কিওস্টিগাইটের সংলগ্ন পাতলা পর্দা ও এপিপোডাইট্ অংশগুলিও টাটকা জলের সংস্পর্শে সদাসর্বদা আসে এবং উহাদের ভিতরকার রক্তে দ্রবীভূত অক্সিজেনের বিনিময় হয়।

সংবহন-তন্ত্র

(Circulatory System)

দেহের সর্বাঙ্গে রক্ত-সংবহন তন্ত্রের নালীগুলি বিদ্যমান। রক্তের সহিত দ্রবীভূত খাদ্যরস (অক্সিজেন), দেহের প্রতি কোষে রক্ত-সংবহন-তন্ত্রের দ্বারা পৌঁছায় এবং কোষগুলি হইতে দূষিত পদার্থ ও দ্রবীভূত কার্বন-ডায়ক্সাইড এই একই তন্ত্রের দ্বারা বাহির হয়। সুতরাং রক্ত-সংবহনতন্ত্রই চিংড়ির প্রতিটি কোষে খাদ্য জোগায় ও অক্সিজেনের দ্বারা দগ্ধ হইয়া খাদ্য হইতে গতি-শক্তি নির্গত করে এবং এই দহনপ্রণালীর ফলে যে সকল দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, তাহাও দেহ হইতে বাহির করিবার বন্দোবস্ত করে। চিংড়ির রক্ত সাদা এবং প্রোটিনজাতীয় হোমোসায়ানিন হইতে দ্রবীভূত থাকে। চিংড়ির রক্ত-সংবহন-তন্ত্রে ধমনী (Arteries) থাকিলেও রক্ত খোলা নালার ভিতর দিয়া প্রবাহিত

হয়। সাধারণতঃ বিবিধ ধমনীগুলি বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে উপরোক্ত খোলা নালার ভিতর রক্ত জমা করে। সুতরাং চিংড়ির এইরূপ নালাগুলিতে দেহরস-ও রক্ত দুই-ই জমা হয়। সেইজন্য চিংড়ির দেহের গহ্বরে কেবলমাত্র দেহ-রস না থাকায় উহাকে **দেহ-গহ্বর** (*Coelome*) না বলিয়া **রক্তমিশ্রিত দেহ-গহ্বর** (*Hoemocoel*) বলা হয়। প্রকৃত দেহ-গহ্বর কেবলমাত্র জনন-অঙ্গের চারিপাশে বিদ্যমান। চিংড়ির রক্ত-সংবহন তন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে উহার হৃদ্‌যন্ত্র ও উহার বিবিধ ধমনীর উল্লেখ করা প্রয়োজন। হৃদ্‌যন্ত্রটি এই ধমনীগুলির দ্বারা চিংড়ির বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে।

হৃদ্‌যন্ত্র (Heart)ঃ প্রথমেই হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থিতি জানা প্রয়োজন। ইহা চিংড়ির শিরোবক্ষের পশ্চাদ্ভাগে, পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার উপর, কেরাপেসের ঠিক নিম্নে বিদ্যমান। সুতরাং চিংড়ির হৃদ্‌যন্ত্র ব্যবচ্ছেদ করিতে হইলে সাবধানে কেরাপেস মুক্ত করিতে হয়। হৃদ্‌যন্ত্রটি আকারে মূলতঃ ত্রিকোণাকৃতি এবং ইহার অগ্রভাগ রসট্রামের দিকে এবং পশ্চাদ্ভাগ চিংড়ির উপর অঞ্চলের দিকে থাকে। প্রচুর সুতার মত **কার্ডিও পাইলোরিক** (*Cardio Pyloric*) মাংসল পেশীর দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্রটির স্থিতি কার্যকরী হয়। হৃদ্‌যন্ত্রটি একটি রক্ত-দেহরসপূর্ণ থলির মধ্যে থাকে। রক্ত-দেহরসপূর্ণ থলিটিকে **পেরিকার্ডিয়েল সাইনাস** (*Pericardial sinus*) বলা হয় এবং ইহার প্রাচীরকে **পেরিকার্ডিয়ম** (*Pericardium*) বলে। প্রকৃতপক্ষে চিংড়ির হৃদ্‌যন্ত্রটি পুরু-মাংসল পত্রবিশিষ্ট থলি। ইহার গাত্রে পাঁচ জোড়া ছিদ্র নির্দিষ্ট স্থানে থাকে। ছিদ্রগুলি আড়াআড়িভাবে (*Slit-like*) বিদ্যমান। ছিদ্রগুলির দুইটি ধার কপাটিকার মত কাজ করে অর্থাৎ রক্ত দেহ হইতে এই ছিদ্রপথে হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু ছিদ্রপথে বাহির হইতে পারে না। ছিদ্রগুলিকে **অস্‌টিয়া** (*Ostia*; sing. *Ostum*=door) বলা হয়; হৃদ্‌যন্ত্রের অঙ্কীয় মধ্যরেখার উপর এইরূপ একজোড়া অস্‌টিয়া ও পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার উপর দ্বিতীয় জোড়া অস্‌টিয়া থাকে। তৃতীয় জোড়া অসটিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগের ধারে বিদ্যমান। চতুর্থ ও পঞ্চম জোড়া অসটিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের দুইধারে একজোড়া করিয়া থাকে। যদিও যন্ত্রটি থলি-বিশেষ, তবুও ইহার বিবিধ ছেদ (section) লইলে দেখা যায় যে, হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর পেশীগুলি জালকাকারে থাকে এবং সেইজন্য স্পর্শ করিলে হৃদ্‌যন্ত্রটি স্পঞ্জের মত মনে হয়। বিবিধ নালীর দ্বারা রক্ত ধীরে ধীরে পেরিকার্ডিয়েল
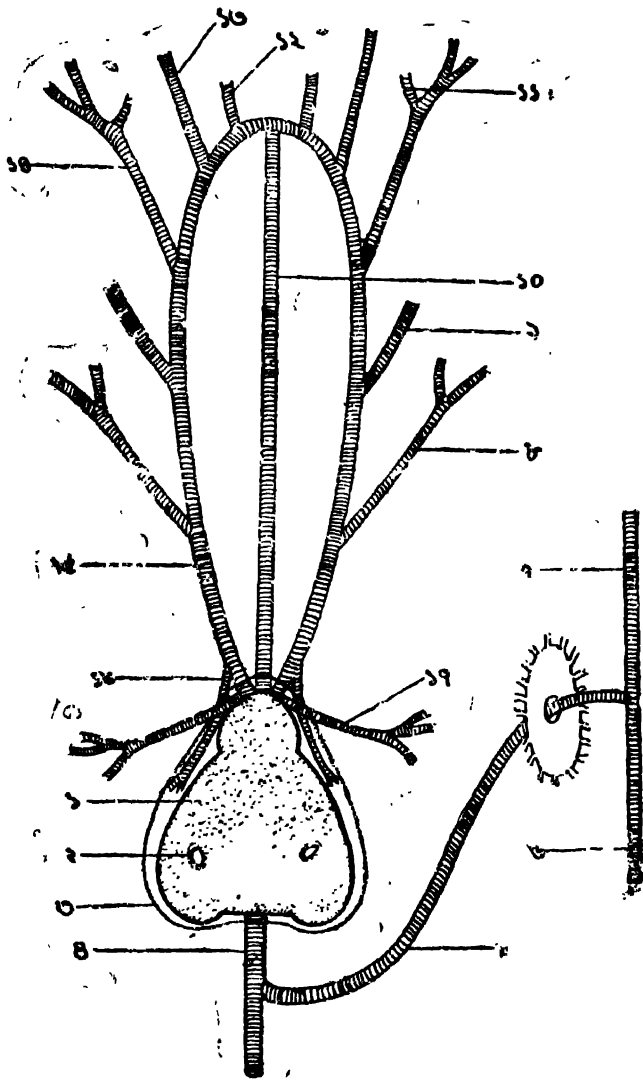
৩৮নং চিত্র—চিংড়ির হৃদ্‌যন্ত্র এবং উহার প্রধান প্রধান ধমনীসমূহ দেখান হইতেছে।

১, হৃদ্‌যন্ত্র; ২, অসটিয়ম; ৩, পেরিকার্ডিয়েল; ৪, অন্ত্র-উপরিস্থিত ধমনী (Supra-intestinal artery); ৫, ষ্টারনাল ধমনীর (Sternal artery) বক্ষ-স্নায়ু গ্রন্থির ছিদ্রপথে প্রবেশ; ৬, উদরের অক্ষীয় ধমনী (Ventral abdominal artery); ৭, বক্ষের অক্ষীয় ধমনী (Ventral throacic artery); ৮, পাকস্থলীর ধমনী (Gastric artery); ৯, ম্যাণ্ডিবিউলার ধমনী (Mandibular artery); ১০, মিডিয়ান অপথ্যালমিক ধমনী (Median opthalmic artery); ১১, অ্যানটিনিউলার ধমনী (Antinular artery); ১২, রসট্রাল ধমনী (Rostral artery); ১৩, অপ্‌টিক ধমনী (Optic artery); ১৪, অ্যানটিন্নাল ধমনী (Antennal artery); ১৫, অ্যানটিনারী ধমনী (Antennary artery); ১৬, পেরিকার্ডিয়েল ধমনী (Pericardial artery); ১৭, হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক ধমনী (Hepatopancreatic artery)।

সাইনাসে জমা হয় এবং পরে রক্তের চাপে পেরিকার্ডিয়েল সাইনাসের পেরিকার্ডিয়ম প্রাচীরে চাপা পড়ে, তখন দেহরসমিশ্রিত রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রের অস্টিয়ার উপর চাপ দেয় এবং কপাটিকাগুলিকে খুলিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করে। ইহাতে হৃদ্‌যন্ত্রটি প্রসারিত হইয়া ফুলিয়া উঠে। হৃদ্‌যন্ত্রের পেশীতন্ত্রগুলির সম্প্রসারণের জন্যই উপরোক্ত প্রসারণ সম্ভবপর হয়। কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের এই সম্প্রসারণশীলতা যখন শেষ সীমায় পৌঁছায়, তখন পেশীতন্তুগুলি সংকুচিত হয়, ফলে হৃদ্‌যন্ত্র হইতে যে সকল ধমনী বাহির হইয়াছে তাহাদের ভিতর দেহরসমিশ্রিত রক্ত প্রবাহিত হয়। এইভাবে হৃদ্‌যন্ত্রটি একবার দেহরসমিশ্রিত রক্তগ্রহণে ফুলিয়া উঠে এবং পরে সংকুচিত হইয়া ধমনীগুলির ভিতর রক্ত প্রবেশ করায়। হৃদ্‌যন্ত্রে যখন দেহরসমিশ্রিত রক্ত প্রবেশ করে, তখন তাহা কার্বন-ডায়ক্সাইডবিহীন এবং শুদ্ধ।

ধমনী (Arteries) : হৃদ্‌যন্ত্রের অগ্রভাগ হইতে চিংড়ির মাথার দিকে যে সকল ধমনী বাহির হইয়াছে, তাহাদের **অগ্রভাগের ধমনী** (*Anterior arteries*) বলা হয় এবং যে সকল ধমনী হৃদ্‌যন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগ হইতে বাহির হইয়া চিংড়ির উদরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেগুলিকে **পশ্চাদ্ভাগের ধমনী** (*Posterior arteries*) বলে। হৃদ্‌যন্ত্রের অগ্রভাগের ধমনী প্রধানতঃ তিনটি, যথা—(১) **মিডিয়ান অপথ্যালমিক** (*Median opthalmic*) **:** এই ধমনী পাতলা ও সূক্ষ্ম। ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের শীর্ষাগ্র হইতে সোজা মাথার দিকে আগাইয়া যায় এবং পৌষ্টিকতন্ত্রের গ্রাসনালীর নিকট অ্যান্টিনারী ধমনীগুলির সহিত মিলিত হয়। ইহা কারাপেসের ঠিক তলায় পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার উপর দিয়া অগ্রসর হয়। (২) **অ্যান্টিনারী** (*Antennary*) **:** অ্যান্টিনারী ধমনী একজোড়া। ইহারা অপথ্যালমিক ধমনীর দুইপাশ হইতে বাহির হইয়া তির্যকভাগে মাথার দিকে অগ্রসর হয় এবং পৌষ্টিকনালীর তন্ত্রের **গ্রাসনালীর** (*Oesophagus*) নিকট, অপথ্যালমিক ধমনীর সহিত মিলিত হয়। প্রতিটি অ্যান্টিনারী ধমনী হৃদ্‌যন্ত্র হইতে বাহির হইবার পর আপন অগ্রগতির পথে, বাহিরের দিকে, অনেকগুলি ছোট ছোট ধমনীর দ্বারা চিংড়ির বিবিধ অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে। নিম্নে প্রতিটি আন্টিনারী ধমনীর ছয়টি শাখা-ধমনীর বিবরণ দেওয়া হইল :

(i) হৃদ্‌যন্ত্র হইতে বাহির হইবার পরেই অ্যান্টিনারী ধমনী পেরিকার্ডিয়েল সাইনাসে একটি শাখা ধমনীর দ্বারা রক্ত সরবরাহ করে।

এই ধমনীকে **পেরিকার্ডিয়েল ধমনী** (*Pericardial artery*) বলা হয়। (ii) অ্যান্টিনারী ধমনী কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দ্বিতীয় শাখা-ধমনীর দ্বারা চিংড়ির পাকস্থলীতে রক্ত সরবরাহ করে। এই শাখা-ধমনীকে পাকস্থলীয় **ধমনী** বা **গাস্ট্রিক ধমনী** (*Gastric artery*) বলা হয়। এই ধমনীটি আবার শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করিয়া পাকস্থলী অঞ্চলে প্রবেশ করে। (iii) চোয়াল ধমনী বা **ম্যানডিবিউলার ধমনী** (*Mandibular artery*): অ্যান্টিনারী ধমনীর তৃতীয় শাখা-ধমনী চিংড়ির ম্যান্ডিবল্ বা চোয়াল উপাঙ্গের পেশীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তথায় রক্ত সরবরাহ করে। (iv) অ্যান্টিনারী ধমনীর চতুর্থ শাখা-ধমনীটি আরও মাথার দিকে অগ্রসর হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। প্রথম ভাগের ধমনীটি চিংড়ির দেহের পিঠের দিকে অগ্রসর হয় এবং উহা পুনরায় বিভক্ত হইয়া চিংড়ির প্রথম ও দ্বিতীয় শুঁড় উপাঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে। প্রথম শুঁড়-উপাঙ্গে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীকে প্রথম শুঁড়-ধমনী বা **অ্যান্টিনিউলার ধমনী** (*Antennular artery*) বলা হয়। সেইরূপ দ্বিতীয় **শুঁড় উপাঙ্গে** রক্ত সরবরাহকারী ধমনীকে দ্বিতীয় শুঁড় ধমনী বা **অ্যান্টিন্যাল ধমনী** (*Antennal artery*) বলে। (v) দ্বিতীয় ভাগের ধমনীটি চিংড়ির দেহের ভিতরে অক্ষীয়ের দিকে অগ্রসর হয় এবং সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একটি **চক্ষু ধমনী** বা **অপটিক ধমনী** (*Optic artery*) দ্বারা চিংড়ির চোখে রক্ত সরবরাহ করে। (iv) অ্যান্টিনারী-ধমনীর দ্বিতীয় ভাগটি চক্ষু-ধমনী সৃষ্টি করিবার পর ধীরে ধীরে চিংড়ির মধ্য-রেখার দিকে আরও অগ্রসর হয় এবং মিডিয়ান অপথ্যালমিক ধমনীর সহিত মিলিত হইবার পরে চিংড়ির রস্ট্রামে একটি ছোট ধমনীর দ্বারা রক্ত সরবরাহ করে। ইহাকে **রস্ট্রাল ধমনী** (*Rostral artery*) বলে। অ্যান্টিনারী ধমনী হইতে রস্ট্রাল ধমনীর সৃষ্টির পর উহা চিংড়ির দেহের আরও ভিতরে অগ্রসর হইবার পর অপথ্যালমিক ধমনীর সহিত মিলিত হয়। (৬) হৃদ্‌যন্ত্র হইতে আরও একটি ধমনী বাহির হইয়াছে। ইহা অ্যান্টিনারী ধমনীর ঠিক নিম্নস্থান হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অ্যান্টিনারী ধমনীর মত ইহাও একজোড়া। এই ধমনীটি সোজা হৃদ্‌যন্ত্র হইতে বাহির হইয়া হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থিতে প্রবেশ করিয়া এই গ্রন্থিকে রক্ত সরবরাহ করে। ইহাকে **হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক ধমনী** (*Hepatopancreatic artery*) বলা হয়।

অ্যান্টিনারী ধমনী দুইটি যখন বৃত্তাকারে মিডিয়ান অপথ্যালিক ধমনীর সহিত মিলিত হয়, তখন অ্যান্টিনারী ধমনীর অর্ধবৃত্তাকার অংশটিকে **সারকুলাস সেফালিকাস** (*Circulas Cephalicus*) বলা হয়। প্রতিটি ধমনীর গোড়ায় কপাটিকা (*valve*) থাকায় ধমনী হইতে রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রে ফিরিবার উপায় থাকে।

হৃদ্‌যন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগ হইতে একটিমাত্র ধমনী বাহির হইয়াছে। ইহা চিংড়ির পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার উপর দিয়া সোজা পায়ুছিদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। এই ধমনীটিকে **অন্ত্র-উপরিস্থিত ধমনী** বা **সুপ্রা-ইন্‌টেস্টিনাল ধমনী** (*Supra-intestinal artery*) বলা হয়। ইহা চিংড়ির অন্ত্রের উপরে লম্বালম্বিভাবে বিদ্যমান। অগ্রসর হইবার সময় ইহা অন্ত্র, মলাশয় এবং অন্ত্র-সংলগ্ন পেশীগুলিতে ছোট ছোট শাখা-ধমনীর দ্বারা রক্ত সরবরাহ করে। অন্ত্র-উপরিস্থিত ধমনীটি হৃদ্‌যন্ত্র হইতে বাহির হইবার পর একটা মোটা ধমনীর দ্বারা চিংড়ির অঙ্কীয়দেশের বিবিধ অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে। এই মোটা ধমনীটি অন্ত্র-উপরিস্থিত ধমনী হইতে বাহির হইবার পর তির্যকভাবে চিংড়ির দেহের ভিতর প্রবেশ করে এবং ইহা যখন অঙ্কীয়দেশের দিকে অগ্রসর হয়, তখন **চিংড়ির বক্ষ-সংলগ্ন স্নায়ু-গ্রন্থি** (*Thoracic nerve ganglia*) ভেদ করিয়া অঙ্কীয়দেশে উপস্থিত হয়। এই বক্ষ-সংলগ্ন স্নায়ু-গ্রন্থি-ভেদকারী তির্যক ধমনীটিকে **স্টারনাল ধমনী** (*Sternal artery*) বলা হয়। স্টারনাল ধমনী চিংড়ির অঙ্কীয়দেশে পৌছিবার পর দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমভাগ চিংড়ির অঙ্কীয়-মধ্যরেখার তলা দিয়া মাথার দিকে অগ্রসর হয় এবং ইহাকে **অঙ্কদেশীয় বক্ষসংলগ্ন ধমনী** (*Ventral thoracic artery*) বলা হয়। এই ধমনীটি চিংড়ির শিরোবক্ষের অঙ্কীয়-অঞ্চলগুলিতে রক্ত-সরবরাহ করে। দ্বিতীয় ভাগটি চিংড়ির অঙ্কীয়-মধ্যরেখার তলা দিয়া পায়ুছিদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। ইহাকে **অঙ্কদেশীয় উদর-সংলগ্ন ধমনী** (*Ventral abdominal artery*) বলে। ধমনীটি অগ্রগতির পথে পশ্চাদ্-পৌষ্টিকনালীতে এবং চিংড়ির উদরের অঙ্কীয় দেশে রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে।

ধমনীগুলি **রক্ত-জালিকা** (**blood-capillary**) পদ্ধতিতে বিবিধ অঙ্গে প্রবেশ করে না। ধমনীগুলি সূক্ষ্ম অসংখ্য মুখ-খোলা শাখা-ধমনীর দ্বারা রক্ত সরবরাহ করে, ফলে দেহরসমিশ্রিত রক্ত চিংড়ির দেহরসমিশ্রিত রক্তবাহী

গহ্বরে বা খোলা নালায় (Blood sinuses or Lacunae) ধীরে ধীরে জমা হয়। শাখা-ধমনীগুলির খোলামুখের জন্য চিংড়ির রক্ত-সংবহন তন্ত্রকে বদ্ধ (*closed type of vascular system*) না বলিয়া খোলা (*open type of vascular system*) বলা হয়।

চিংড়ির দেহগহ্বরের নালা (Sinuses or lacunae): পূর্বে বলা হইয়াছে যে, চিংড়ির দেহগহ্বরে অনিয়মিতভাবে প্রচুর সরু সরু দেহরস-মিশ্রিত রক্তনালা থাকে। এই নালাগুলিতে ধমনীগুলি চিংড়ির
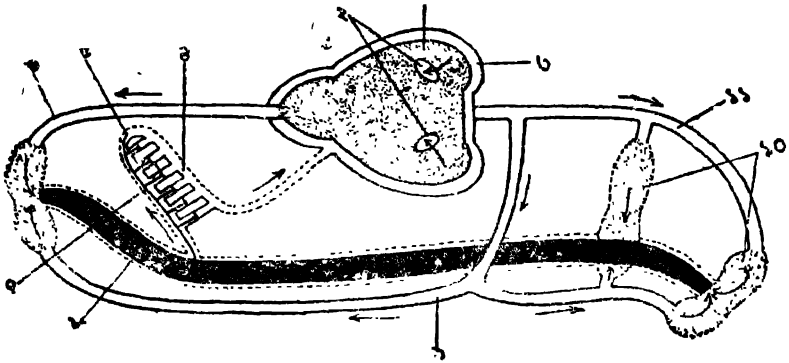
৩৯নং চিত্র

চিত্রের দ্বারা চিংড়ির ভিতরে রক্তচলাচলের আবর্তন দেখান হইতেছে।

১, হৃদ্‌যন্ত্র; ২, অস্টিয়াম; ৩, পেরিকার্ডিয়েল থলি; ৪, ইফারেণ্ট-ব্র্যাঙ্কিয়েল নালী; ৫, ফুলকা; ৬, দেহের সম্মুখভাগের রক্তবাহী নালীসমূহ; ৭, এ্যাফারেণ্ট ব্র্যাঙ্কিয়েল নালী; ৮, অঙ্কীয় নালী (Ventral sinus); ৯, অঙ্কীয় ধমনী (Ventral artery); ১০, দেহনালী (Lacunae); ১১, দেহের পশ্চাদ্ভাগের রক্তবাহী নালী।

বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে রক্ত জমা করে। এইরূপ সরু সরু নালাগুলি ধীরে ধীরে চিংড়ির অঙ্কীয়দেশে একজোড়া বড় নালায় একত্রিত হয়। বড় দেহগহ্বরের, নালাজোড়াকে **অঙ্কীয় নালা** (*Ventral sinus*) বলা হয়। এই অঙ্কীয় নালায় চিংড়ির বিবিধ অঙ্গের দূষিত রক্ত আসিয়া জমা হয়। প্রতিটি অঙ্কীয় নালা অঙ্কীয়-মধ্যরেখার দুই পাশে লম্বালম্বিভাবে হিপাটোপ্যানক্রিয়াস গ্রন্থির নিম্ন হইতে উদর অঞ্চলের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তারিত। দুইটি অঙ্কীয় নালা পরস্পর পরস্পরের সহিত লম্বা লম্বা সূক্ষ্ম নালার দ্বারা সংযুক্ত। প্রতিটি অঙ্কীয় নালা হইতে ছয়টি রক্তবাহী নালী হইয়া সেই পাশের ফুলকাগুলির ভিতর প্রবেশ করে এবং ফুলকায় রক্ত সরবরাহ করে। সুতরাং চিংড়ির

দুই পার্শ্বে মোট ছয় জোড়া রক্তবাহী নালী, ফুলকাগুলিতে প্রবেশ করে। এই রক্তবাহী নালী দেহনিঃসৃত দূষিত রক্ত বহন করিয়া ফুলকাগুলিকে সরবরাহ করে বলিয়া ইহাদের **অ্যাফারেণ্ট ব্রাঙ্কিয়াল নালী** (*Afferent branchial channels*) বলা হয়। দেহরসমিশ্রিত দূষিত রক্ত ফুলকায়, ব্রাঙ্কিওস্টিগাইটের পাতলা পর্দায় ও এপিডিডাইট অঞ্চলে শ্বাস-প্রণালীর দ্বারা শুদ্ধ হইয়া যায়। এখন দেহরসমিশ্রিত শুদ্ধ রক্ত নূতন ছয় জোড়া রক্তবাহী নালীর দ্বারা ফুলকা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া পেরিকার্ডিয়েল সাইনাসে জমা হয়। এই ছয় জোড়া রক্তবাহী নালীকে **ইফারেণ্ট ব্রাঙ্কিয়াল নালী** (*Efferent branchial channel*) বলা হয়। পেরিকার্ডিয়েল সাইনাস হইতে দেহরসমিশ্রিত শুদ্ধ রক্ত অসটিয়ার ভিতর দিয়া হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করে। এইভাবে চিংড়ির রক্ত-সংবহন তন্ত্রের বিবর্তন সমাপ্ত হয়। মনে রাখা দরকার যে, রক্ত চিংড়ির হৃদযন্ত্রে একবারই আসে এবং ইহা কেবল সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা দেহরসমিশ্রিত রক্তস্রোতকে ধমনীর ভিতর প্রবাহিত করিতে পারে। হৃদযন্ত্রের অসটিয়ার কপাটিকাগুলি রক্তস্রোতকে একটি গতিপথে প্রবাহিত করিতে সাহায্য করে। নিম্নে একটি বিবরণী-ছকের দ্বারা চিংড়ির রক্ত-সংবহনের প্রণালী দেখান হইল :
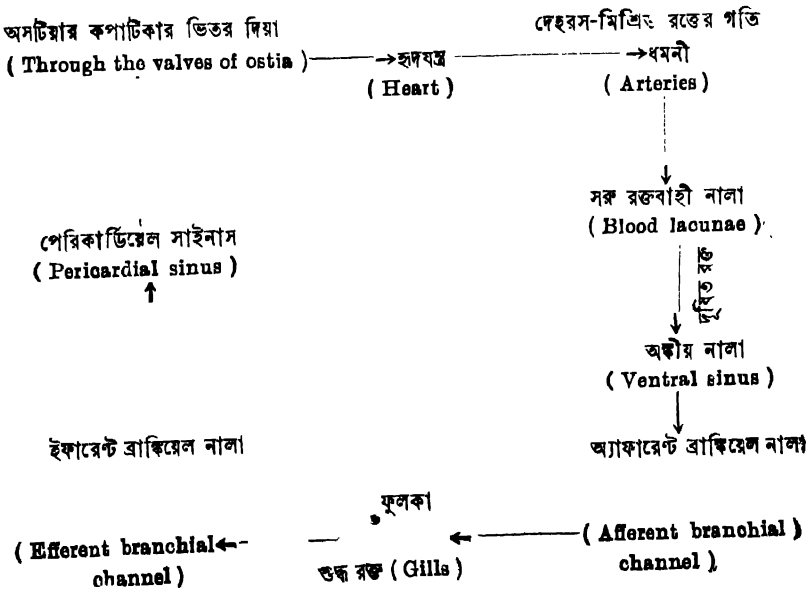
স্নায়ুতন্ত্র

(Nervous System)

চিংড়ির দেহের স্নায়ুতন্ত্র বেশ ভালোভাবেই বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। স্নায়ুতন্ত্রটিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করা হয়; যথা—(১) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (*Central Nervous System*)—ইহা চিংড়ির অঙ্কীয়-মধ্যরেখার উপরে অবস্থিত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অগ্রাংশ চিংড়ির রস্ট্রামের মূলে বা দুইটি প্রথম শুঁড়-উপাঙ্গের মাঝে বিদ্যমান। ইহাকে চিংড়ির **মস্তিষ্ক** (*Brain*) বলা হয়। মস্তিষ্কটি দুইটি স্নায়ুগ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। সেইজন্য মস্তিষ্কের ভাঁজ দেখা যায়। স্নায়ুগ্রন্থি জোড়াকে চিংড়ির **গ্রাসনালীর উপরিস্থিত স্নায়ুগ্রন্থি** (*Supra oesophageal ganglia*) বলা হয়। এই স্নায়ুগ্রন্থি হইতে মোট তিন জোড়া **স্নায়ু** (Nerve) বাহির হইয়া চিংড়ির অগ্রাংশের বিবিধ উপাঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। (i) এক জোড়া মোটা **চক্ষুস্নায়ু** (*Optic Nerve*) একটি করিয়া প্রতিটি গ্রন্থি হইতে বাহির হইয়া চক্ষুর বৃন্তের ভিতর দিয়া উহার রেটিনাল-অঞ্চলে বহু শাখায় বিস্তার লাভ করে। (ii) গ্রাসনালীর উপরিস্থিত স্নায়ুগ্রন্থি হইতে দ্বিতীয় জোড়া স্নায়ু প্রতিটি গ্রন্থি হইতে বাহির হইয়া চিংড়ির প্রথম শুঁড-উপাঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্নায়ু জোড়াকে **অ্যান্টিনিউলার স্নায়ু** (*Antennular nerve*) বলা হয়। অ্যান্টিনিউলার স্নায়ু প্রথম শুঁড়-উপাঙ্গের মূলে প্রবেশ করিয়া বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া উপাঙ্গের শেষ সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। (iii) গ্রাসনালীর উপরিস্থিত স্নায়ুগ্রন্থি হইতে তৃতীয় জোড়া স্নায়ু প্রতিটি গ্রন্থির নিম্নভাগ হইতে বাহির হয় এবং চিংড়ির দ্বিতীয় শুড-উপাঙ্গের ভিতর প্রবেশ করে। এই তৃতীয় জোড়া স্নায়ুকে **অ্যান্টিনারী স্নায়ু** (*Antennary nerve*) বলা হয়। ইহাও দ্বিতীয় জোড়া শুঁড়-উপাঙ্গের মূলে প্রবেশ করিবার পর বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া শেষসীমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এই স্নায়ুর একটি শাখা শুঁড়-সংলগ্ন **রেচন-গ্রন্থির** (*Antennary gland*) ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিস্তারলাভ করে। গ্রাসনালীর উপরিস্থিত স্নায়ুগ্রন্থি দুইটি উহার বেশ কিছু নিম্নে লম্বালম্বিভাবে একটি **বক্ষ-সংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থির** (*Thoracic Ganglionic Mass*) সহিত যুক্ত হয়। উপরিস্থিত দুইটি স্নায়ুগ্রন্থি হইতে একটি করিয়া স্থূল বায়ু-গ্রাসনালী বাহির হইয়া বক্ষ-সংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থির সহিত মিলিত হয় এবং এইভাবে গ্রাসনালী উপরিস্থিত

স্নায়ুগ্রন্থি দুইটির সহিত বক্ষসংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি যুক্ত হয়। এই দুইটি স্থূল স্নায়ু গ্রাসনালীর দুই পাশ দিয়া অগ্রসর হইয়া বক্ষসংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থির সহিত মিলিত
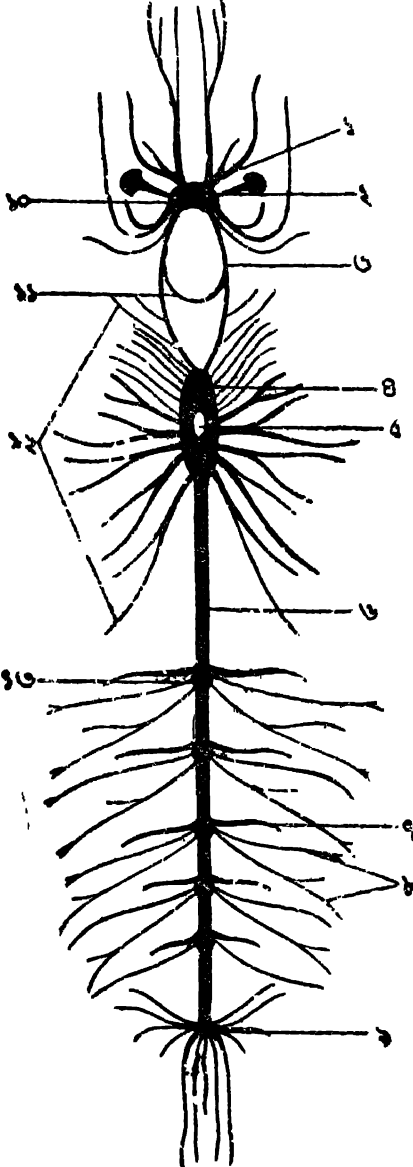
৪০নং চিত্র

চিংড়ির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দেখান হইতেছে।

১, অ্যানটিনিউলার স্নায়ু; ২, চক্ষু-স্নায়ু; ৩, গ্রাসনালী পরিবেষ্টিত সংযোগকারী স্নায়ু (Circum-oesophageal commissure); ৪, বক্ষ-সংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি; ৫, স্টারনাল ধমনীর পথ-ছিদ্র; ৬, অঙ্কীয় স্নায়ুসূত্র (Ventral nerve cord); ৭, অঙ্কীয় স্নায়ুসূত্রের গ্রন্থি; ৮, অঙ্কীয় স্নায়ুতন্ত্রর বিবিধ শাখা-স্নায়ু; ৯, ষষ্ঠ অঙ্কীয় স্নায়ুসূত্রের গ্রন্থি; ১০, মস্তিষ্ক বা গ্রাসনালীর উপরিস্থিত স্নায়ুগ্রন্থি; ১১, গ্রাসনালীর পশ্চাদ্দেশীয় ফাঁস (post-oesophageal loop); ১২, সেফালো থোরাসিক উপাঙ্গের জন্য শাখাস্নায়ু; ১৩, প্রথম অঙ্কীয় স্নায়ুসূত্রের গ্রন্থি।

হয়। সেইজন্য এই দুইটি স্নায়ুকে সংযোগকারী স্নায়ু বা গ্রাসনালী পরিবেষ্টিত

সংযোগকারী স্নায়ু (*Circum-oesophageal Commissures*) বলা হয়। গ্রাসনালী পরিবেষ্টিত সংযোগকারী স্নায়ু দুইটিকে আবার একটি পাতলা স্নায়ু সংযোগ করে। এই স্নায়ুটি গ্রাসনালীর উপরিভাগের উপর আড়াআড়িভাবে বিদ্যমান এবং ইহাকে প্রস্থ-সংযোগকারী স্নায়ু বা **গ্রাসনালীর পশ্চাদ্দেশীয় ফাঁস** (*Transverse Commissure or Post-oesophageal Loop*) বলে। গ্রাসনালী-পরিবেষ্টিত সংযোগকারী প্রতিটি স্নায়ু হইতে একটি শাখা-স্নায়ু বাহির হইয়া চিংড়ির চোয়ালের ভিতর প্রবেশ করে। এই দুইটি স্নায়ুকে চোয়াল-স্নায়ু (Mandibular Nerve) বলা হয়।

(১) **বক্ষসংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি (Thoracic Ganglionic Mass) :** ইহা বেশ বড় এবং আকারে ডিম্বাকৃতি। ইহা শিরোবক্ষ অঞ্চলের মধ্যরেখায় বিদ্যমান। বক্ষসংলগ্ন গ্রন্থিটি প্রকৃতপক্ষে একটি গ্রন্থি নহে। বক্ষের অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থি চিংড়ির বৃদ্ধির সময় একত্রিত হইয়া উপরোক্ত বড় বক্ষ-সংলগ্ন গ্রন্থির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রতি পাশ হইতে পর্যায়ক্রমে প্রায় এগারোটি করিয়া স্নায়ু বাহির হইয়া শুঁড়গুলি ও চোয়াল ব্যতীত সকল শির ও বক্ষ-উপাঙ্গের ভিতর প্রবেশ করে। প্রতিটি স্নায়ু উপাঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিভক্তির দ্বারা বিস্তারলাভ করে। বক্ষসংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থির মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র দেখা যায়। ঐ ছিদ্রপথে রক্তসংবহনতন্ত্রের স্টারনাল ধমনী চিংড়ির অঙ্কীয়দেশে অগ্রসর হয়।

বক্ষসংলগ্ন গ্রন্থি হইতে একটি স্থূল স্নায়ু বাহির হইয়া লম্বালম্বিভাবে অঙ্কীয় মধ্যরেখা দিয়া চিংড়ির পশ্চাদ্ভাগের দিকে অগ্রসর হয় এবং **টেলসন** (*telson*) পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়া যায়। এই স্থূল স্নায়ুটিকে **অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু** (*Ventral Nerve Cord*) বলা হয়। বাহির হইতে ইহাকে একটি স্নায়ুরূপে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা দুইটি স্নায়ুর সমষ্টি। দুইটি স্নায়ু লম্বালম্বিভাবে থাকে এবং উহাদের চারিপাশে একটি স্নায়ুপর্দা পরিবেষ্টিত থাকে বলিয়া বাহির হইতে একটি স্নায়ু মনে হয়। চিংড়ির ছয়টি উদর দেহ-খণ্ডে অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জুর গতিপথে প্রতিটি খণ্ডে একটি একটি করিয়া **স্নায়ুগ্রন্থি** (*Nerve Ganglion*) সৃষ্টি করে। শেষ-স্নায়ুগ্রন্থিটি দেহখণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে বিদ্যমান। ইহার আকার অন্যান্য পাঁচটি স্নায়ুগ্রন্থির চেয়ে বড়। প্রতিটি দেহখণ্ডের স্নায়ুগ্রন্থি হইতে চিংড়ির অন্ত্র ও মলাশয় উপরোক্ত স্নায়ুগ্রন্থি হইতে স্নায়ুর দ্বারা কার্য

করিতে পারে। অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জুর মত উহার গ্রন্থিগুলিও দুইটি গ্রন্থি একত্রিত হইয়া গঠিত।

(২) **দেহপার্শ্বস্থ** (**Peripheral Nervous System**) **:**

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হইতে স্নায়ুগুলি বাহির হইয়া দেহপার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্র গঠন করে। স্নায়ুগুলি আবার কতকগুলি স্নায়ুতন্ত্র সমন্বয়ে গঠিত। স্নায়ুতন্ত্রগুলি দুই প্রকারের। কতকগুলি স্নায়ুতন্ত্র বিবিধ অঙ্গে প্রবেশ করে এবং ইহাদের **অন্তর্মুখী** (*Afferent*) স্নায়ুতন্ত্র বলা হয়। বিবিধ অঙ্গ হইতে ইহারাই সংবাদ বা অনুভূতি বহন করিয়া আনে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সরবরাহ করে, সেইজন্য এইরূপ স্নায়ুতন্ত্রকে **সংবেদ স্নায়ু** (*Sensory nerve*) বলা হয়। আবার কতকগুলি স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা অনুভূতির প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হইতে অঙ্গে প্রবাহিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পেশী এবং চিংড়ির বিবিধ গ্রন্থিতে এইরূপ তন্তুবিশিষ্ট স্নায়ু প্রবেশ করে। ইহাদের **বহির্মুখী** (*Efferent nerve*) স্নায়ু বলা হয়। ইহারা অনুভূতির প্রতিক্রিয়া বহন করে বলিয়া এইরূপ স্নায়ুতন্তু-বিশিষ্ট স্নায়ুকে **চেষ্টীয় স্নায়ু** (*Motor nerve*) বলা হয়। আবার কতকগুলি স্নায়ুরজ্জুতে উপরোক্ত দুই প্রকারের স্নায়ুতন্তু থাকে এবং ইহারা অনুভূতি বহন ও উহার প্রতিক্রিয়াও ফিরাইয়া আনিতে পারে ; সেইজন্য এইরূপ দুইপ্রকার স্নায়ুতন্তু-মিশ্রিত স্নায়ুকে **মিশ্রস্নায়ু** (*Mixed nerve*) বলা হয়।

(৩) **সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্তু** (**Symphathetic Nervous System**) **:**

কতকগুলি ছোট ছোট স্নায়ুগ্রন্থি এবং উহাদের মধ্যস্থ সংযোগকারী স্নায়ু লইয়া সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। স্নায়ুগুলি প্রধানতঃ পৌষ্টিক-নালীর কার্ডিয়েল পাকস্থলীর উপরিভাগে বিদ্যমান এবং ইহারা চিংড়ির বিবিধ অঙ্গের সহিত জড়িত **অনৈচ্ছিক** (*Involuntary*) পেশাগুলিতে প্রবেশ করিয়া বিস্তারলাভ করিয়াছে।

চিংড়ির মস্তিষ্ক, স্নায়ুগ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্রগুলির ভিতর অংশ ভরাট, ফাঁপা নহে। সাধারণতঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রের বিবিধ স্নায়ুগ্রন্থিও ও মস্তিষ্ক ইত্যাদি ফাঁপা থাকে।

স্নায়ুতন্ত্রই জীবের প্রতিটি বিপাকীয় কার্য নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করাইতে পারে এবং জীবের প্রতিটি অঙ্গের কার্যের হার ও গতি নিয়ন্ত্রণ করে। স্নায়ুতন্ত্র জীবের অন্য সকল তন্ত্রের কার্যদক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে।

রেচনতন্ত্র

(Excretory System)

চিংড়ির দেহের জলীয় দূষিত পদার্থগুলি নিষ্কাশন করিবার জন্য একজোড়া অঙ্গ বিদ্যমান। এই অঙ্গগুলিকে **রেচনঅঙ্গ** (*Excretory organ*) বলা হয়। রস্ট্রামের দুই পাশে দ্বিতীয় **শুঁড়-উপাঙ্গের কক্সার** (*Coxa of the Second Antenna*) ভিতরে একটি হালকা বাদামী রঙের গ্রন্থি থাকে। ইহাই রেচনগ্রন্থি। শুঁড়-উপাঙ্গের মূলে ইহার অবস্থিতি বলিয়া ইহাকে **শুঁড়-সংলগ্ন গ্রন্থি** (*Antennry gland*) বলা হয়। শুঁড়-সংলগ্ন গ্রন্থি অপেক্ষা ইহার "সবুজ গ্রন্থি" নামই বেশী প্রসিদ্ধ। কারণ ইউরোপের সামুদ্রিক চিংড়ির রেচনগ্রন্থি দুইটি সবুজ রঙের এবং বহুকাল যাবৎ আমাদের দেশে এইরূপ চিংড়ির বর্ণনা লিপিবদ্ধ থাকায় আমরা সব চিংড়ির রেচনগ্রন্থি সবুজ রঙের মনে করিয়া থাকি।

প্রতিটি রেচনগ্রন্থির তিনটি ভাগ আছে ; যথা:—(i) শেষ থলি বা **এণ্ড-স্যাক্** (*End-sac*), (ii) **ল্যাবাইরিন্থ্** (*Labyrinth*), (iii) **মূত্রাশয়** (*Bladder*)। উপরোক্ত রেচনগ্রন্থির তিনটি অংশ ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া কক্সার ভিতরের নির্দিষ্ট গহ্বরে অবস্থান করে। সমগ্র রেচন যন্ত্রটির আকার একটি ছোট মটর বীজের মত।

চিংড়ির শেষ থলি বা এণ্ড-স্যাক্টি আকারে ফুলের মত প্রস্ফুটিত এবং ইহার মধ্যে একটি দেহরস-মিশ্রিত রক্তবাহী নালা বিদ্যমান। ইহার একদিকে ল্যাবাইরিন্থ্ অংশ ও বিপরীত দিকে মূত্রাশয় অবস্থান করে। ল্যাবাইরিন্থ্ই রেচনযন্ত্রের প্রকৃত গ্রন্থি। গ্রন্থিটি অনেকগুলি পাকানো **রেচন-নালী** (*Excretory tubules*) দ্বারা গঠিত। রেচন-নালীগুলি একত্রিত হইয়া মূত্রাশয় থলিতে যুক্ত হয়। রেচন-গ্রন্থির ভিতরের দিকে মূত্রাশয়টি বিদ্যমান। ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি পাতলা প্রাচীর-পরিবেষ্টিত থলি-বিশেষ। মূত্রাশয়টি রেচন-ছিদ্রের দিকে সরু নলাকারে অগ্রসর হয় এবং মূত্রাশয়ের এই নালীটিকে **গবিনী** (*Ureter*) বলা হয়। রেচন-নালী রেচন-ছিদ্রে মুক্ত হয়। **রেচন-ছিদ্রটি** (*Renal aperature*) চিংড়ির দ্বিতীয় শুঁড়-উপাঙ্গের মূলে বিদ্যমান।

কারাপেসের ঠিক তলায় এবং কার্ডিয়েক পাকস্থলীর উপরে একটি বড় থলি থাকে। ইহাকে রেচন-থলি (*Renal sac*) বলা হয়। ইহার প্রাচীর পাতলা

এবং থলিটি স্বচ্ছ। প্রত্যেকটি রেচন-যন্ত্রের মূত্রাশয়-অঞ্চলের সহিত রেচন-থলিটি সংযুক্ত। এই সংযুক্তি প্রত্যেক দিকের একটি পার্শ্বনালী (*Lateral duct*) দ্বারা সম্পন্ন হয়।
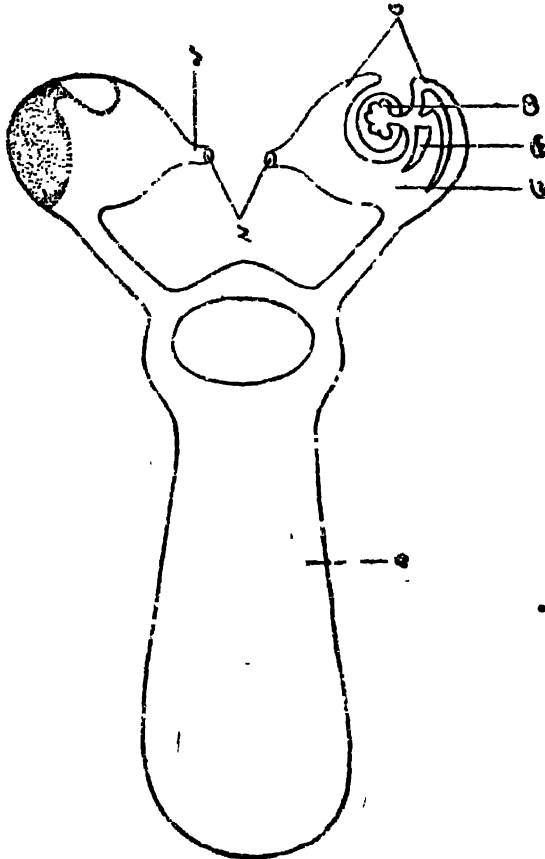
৪১নং চিত্র
চিংড়ির রেচনতন্ত্র দেখান হইতেছে।

১, রেচন-নালী ; ২, রেচন-ছিদ্র ; ৩, সবুজগ্রন্থি (Antennary gland) ; ৪, এণ্ড-স্যাক্ (End-sac) ; ৫, গ্রন্থি-অংশ ; ৬, থলি ; ৭, রেচন-থলি।

চিংড়ির দেহের বিপাকীয় কার্যের ফলে দেহরস-মিশ্রিত রক্তে নাইট্রোজেন-ঘটিত অ্যামোনিয়া ও দ্রবীভূত রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়া থাকে। রেচন-থলির এণ্ড-স্যাকের রক্তবাহী নালার ভিতর এইরূপ রক্ত জমা হয় এবং এণ্ড-স্যাকের কোষগুলি অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য দূষিত পদার্থগুলিকে শোষণ করে।

অতঃপর শোষণ করিয়া রেচন-নালীর ভিতর ঢালিয়া দেয়। ইহার পর রেচন-নালীগুলি একত্রিত হইয়া এই দূষিত পদার্থগুলিকে মূত্রাশয়ের ভিতর নিক্ষেপ করে। মূত্রাশয় নালীগুলি অতিরিক্ত ফুলিয়া উঠিলে মূত্র বা দূষিত পদার্থ রেচন-নালীর ভিতর দিয়া রেচন-ছিদ্র হইতে বাহির হইয়া যায়। **রেচন-থলি** (*Renal Sac*) সাময়িকভাবে মূত্রাশয় হইতে মূত্র বা দূষিত রেচন-পদার্থ সঞ্চয় করে এবং পরে রেচন-থলি হইতে পার্শ্ব-নালার ভিতর দিয়া উহা পুনরায় মূত্রাশয়ে ফিরিয়া যায় এবং রেচন-ছিদ্র দিয়া দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।

চিংড়ির কৃত্তিকা বা বহিরাবরণ উহার নাইট্রোজেন-ঘটিত দূষিত পদার্থের দ্বারা গঠিত হয়। এই কৃত্তিকাবরণী বৃদ্ধির সময় বহুবার খসিয়া পড়ে এবং পুনরায় ত্বকের কোষ হইতে নিঃসৃত দূষিত দ্রব্যের দ্বারা গঠিত হয়। সুতরাং এককথায় বলা যায় যে, চিংড়ির চামড়ার ত্বককোষও উহার আর একটি রেচন-যন্ত্র।

জননতন্ত্র
(Reproductive System)

চিংড়ি একলিঙ্গ প্রাণী অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী ভেদ আছে। সমবয়সী পুরুষ চিংড়িগুলি স্ত্রী-চিংড়ি অপেক্ষা আকারে বড় হয়। পুরুষ চিংড়িগুলির বক্ষ-উপাঙ্গগুলি খুবই কাছাকাছি বিদ্যমান। ইহাদের দ্বিতীয় জোড়া পদ-উপাঙ্গ খুবই স্থূল এবং বেশী সংখ্যায় কঠিন কাঁটা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। ইহাদের দ্বিতীয় উদর-উপাঙ্গে একটি অতিরিক্ত **এ্যাপেনডিক্স ম্যাসকিউলিনা** (*Appendix Masculina*) নামে অঙ্গ থাকে। পুরুষ চিংড়ির পঞ্চম পদজোড়ার গোড়ায় পুংজনন-ছিদ্রটি (*Male gonopore*) বিদ্যমান, কিন্তু স্ত্রী-চিংড়ির **স্ত্রীজনন-ছিদ্রটি** (*Female gonopore*) উহার তৃতীয় পদজোড়ার মূলে থাকে। ইহা ব্যতীত পুরুষ চিংড়ির রস্ট্রামের উপর বেশ বড় বড় এবং বেশী সংখ্যায় শক্ত কাঁটা দেখা যায়।

পুং-জননতন্ত্র (Male Reproductive System) :—পুং-জননতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির দ্বারা গঠিত, যথা—(i) **একজোড়া শুক্রাশয়** (*testes*) ; (ii) **একজোড়া শুক্রনালী** (*Vasa defferentia*) ; (iii) এক

জোড়া শুক্রসঞ্চয় থলি (*Seminal vesicle*) এবং (vi) একজোড়া বহিঃ-পুংজননছিদ্র (*Male gonopore*)।
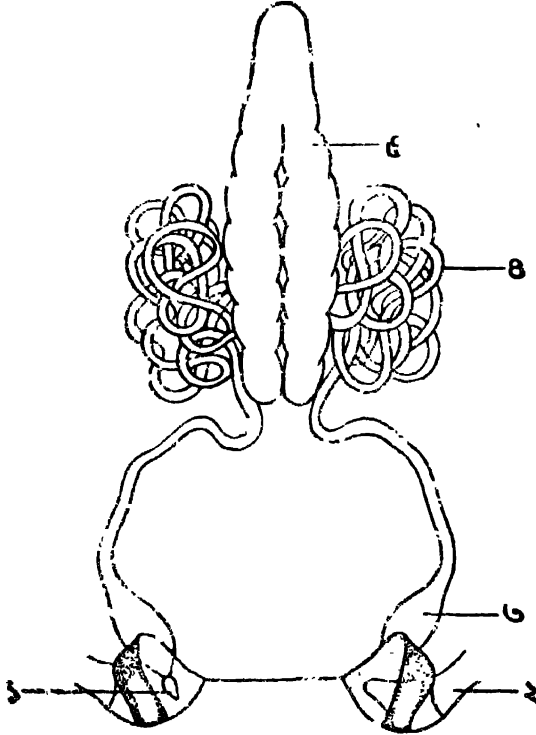
৪২নং চিত্র

চিংড়ির পুং-জননতন্ত্র দেখান হইতেছে।

১, বহিঃ-পুংজননছিদ্র ; ২, পঞ্চম পদ-উপাঙ্গের গোড়া ; ৩, শুক্র-সঞ্চয়ী থলী ; ৪, শুক্রনালী ; ৫, শুক্রাশয়।

শুক্রাশয় দুইটি নরম ও লম্বা, ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের নিম্নে অথচ হিপোটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থির উপরে বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকের অগ্রভাগ পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং এই যুক্ত অগ্রভাগ রেচনথলি পর্যন্ত বিস্তারিত। শুক্রাশয়ের পশ্চাদ্ভাগ দুইটি পৃথক থাকে এবং পূর্ণাঙ্গ চিংড়িতে ইহাদের পশ্চাদ্ভাগটি প্রথম উদর-দেহখণ্ড পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। চিংড়ির হৃদ্‌যন্ত্রকে যে সকল কার্ডিও-পাইলোরিক পেশীরজ্জু আবদ্ধ করিয়া রাখে,

সেইগুলি শুক্রাশয়দ্বয়ের মাঝে ফাঁকের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া উহাদেরও আবদ্ধ করে। প্রতিটি শুক্রাশয়ের বাহিরের প্রাচীরটি তরঙ্গায়িত এবং উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুক্রাশয়খণ্ড-সমন্বয়ে পেশীর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া গঠিত। ইহার জন্যই শুক্রাশয়ের বাহিরের প্রাচীর তরঙ্গায়িত হয়। প্রতিটি শুক্রাশয়খণ্ডের ফাঁপা গহ্বরের ভিতর উহার ভিতরকার প্রাচীরকোষ হইতে **শুক্রকীট** (*Spermatozoa*) জন্মায় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ শুক্রকীটের আকার প্রায় খোলা ছাতার মত। প্রতিটি শুক্রাশয়খণ্ড হইতে একটি করিয়া নালী বাহির হইয়া পরে পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত হইবার পর একটিমাত্র বড় নালীতে পরিণত হয়। এই বড় নালীটিকে **শুক্রনালী** (*Vasa-defferentia*) বলে। দুইটি শুক্রাশয়ের বিপরীত পার্শ্ব হইতে এইভাবে একটি করিয়া শুক্রনালী বাহির হইয়া আসে। শুক্রাশয় হইতে বাহির হইবার পরেই ইহারা জড়াইয়া যায়, তখন ইহাদের একটি গ্রন্থির মত দেখায়। শুক্রনালী দুইটি চিংড়ির দুই পাশ হইতে নীচের দিকে সোজাভাবে অগ্রসর হয়; তখন ইহাদের আকারও বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম পদ-উপাঙ্গের নিকট শুক্রনালী দুইটি ফুলিয়া উঠে এবং শুক্রনালীর এই অংশকে শুক্রসঞ্চয়ী থলি বা **সেমিনাল ভেসিকল** (*Seminal vesicle*) বলে। সেমিনাল ভেসিকল পঞ্চম উপাঙ্গের পুং-জননছিদ্রে মিলিত হয় এবং শুক্রকীটগুলি শুক্রনালী দিয়া অগ্রসর হইয়া সেমিনাল ভেসিকলে জমা হয় এবং প্রজননের সময় পুং-জননছিদ্র হইতে বাহির হইয়া আসে। সেমিনাল ভেসিকলে শুক্রকীটগুলি আবদ্ধ হইয়া এক একটি প্যাকেটে পরিণত হয়। এই প্যাকেটগুলিকে **শুক্রকীট প্যাকেট** (*Spermatophore*) বলা হয়।

স্ত্রী-জননতন্ত্র (Female Reproductive System): চিংড়ির স্ত্রী-জননতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির দ্বারা গঠিত: যথা—(*i* একজোড়া **ডিম্বাশয়** (*Ovary*), (*ii*) **একজোড়া ডিম্বাশয় নালী** (*Oviduct*) এবং এই ডিম্বাশয় নালী দুইটি পৃথকভাবে চিংড়ির দেহের বাহিরে **স্ত্রী-জনন-ছিদ্রের** (*Female gonopore*) মাধ্যমে যুক্ত হয়।

চিংড়ির ডিম্বাশয়ের আকার বয়স অনুযায়ী এবং ঋতু অনুসারে বড় বা ছোট হয়। ইহা হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থির পৃষ্ঠদেশের উপর বিদ্যমান। হৃদ্-যন্ত্রের ঠিক নিম্নে ইহাদের অবস্থিতি প্রজনন ঋতুতে স্পষ্ট হয়। শুক্রাশয়ের মত ডিম্বাশয়গুলির অগ্রভাগ রেচন-থলি পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে এবং পশ্চাদ্ভাগ উদরের প্রথম দেহখণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। প্রজনন ঋতুতে

ডিম্বাশয়ের রঙ বাদামী হয়। ডিম্বাশয় দুইটির অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং ইহাদের মধ্যস্থলে সামান্য ফাঁক দেখা যায়। ওই ফাঁকের ভিতর দিয়া কার্ডিও-পাইলোরিক পেশীমজ্জু প্রবেশ করিয়া ডিম্বাশয় দুইটিকে আবদ্ধ করে; ডিম্বাশয়ের ভিতর **ডিম্বের** (*Ova*) সৃষ্টি হয়। একটি পুষ্ট ডিম্ব প্রকৃতপক্ষে একটি কোষবিশেষ। ইহার আকার গোলাকার এবং
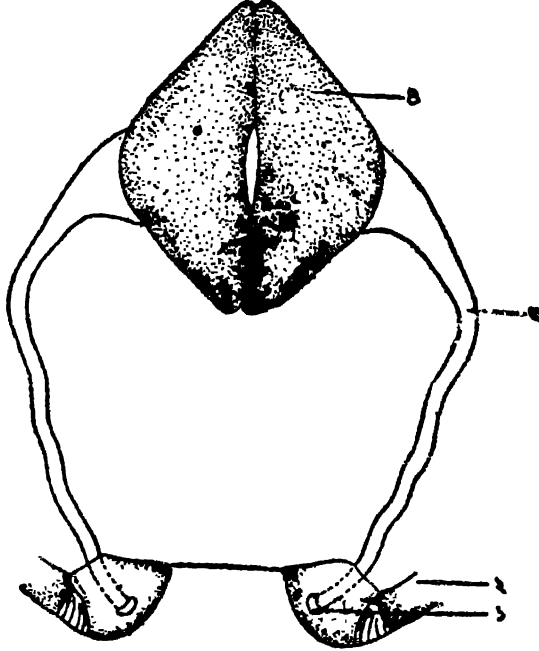
৪৩নং চিত্র

চিংড়ির স্ত্রী-জননতন্ত্র দেখান হইয়াছে।

১, বহিঃ-স্ত্রীজননতন্ত্র; ২, তৃতীয় পদ-উপাঙ্গের গোড়া; ৩, ডিম্বাশয় নালী; ৪, ডিম্বাশয়।

ইহার নিউক্লিয়সটি বড ও স্পষ্ট। ডিম্বের সাইটোপ্লাজম-এ প্রচুর প্রোটিন কণা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়।

প্রতিটি ডিম্বাশয় হইতে একটি ডিম্বনালী উহার বাহিরের দিক হইতে বাহির হয়। এই **ডিম্বনালী** (*Oviduct*) ডিম্বাশয় হইতে বাহির হইবার সময় আকারে স্থূল বা কিছুটা ফানেলের মুখের মত দেখায়। ডিম্বনালী পরে ক্রমশঃ সরু হইয়া যায় এবং চিংড়ির তৃতীয় পদ-উপাঙ্গের মূলে **স্ত্রী-জনন-ছিদ্রে** (*Female gonopore*) মুক্ত হয়। শুক্রনালী অপেক্ষা ইহা লম্বায়

অনেক ছোট এবং মোটা। দুইটি ডিম্বনালী শুক্রনালীর মত দুইটি পৃথক স্ত্রী-জননছিদ্রে মুক্ত হয়। স্ত্রী-জননছিদ্র দুইটি প্রতিটি তৃতীয় পদ-উপাঙ্গের ভিতরের দিকে বিদ্যমান।

প্রদর্শন ও পরীক্ষা

(Demonstration and Experiments)

চিংড়ির ভারসাম্য অঙ্গ (Statocysts or Otocysts):

স্টাটোসিস্ট্‌কে চিংড়ির ভারসাম্য-অঙ্গ বলা হয়। প্রথম শুঁড়-উপাঙ্গের প্রি-কক্সা অঞ্চলের তলার দিকে পেশীতন্তুর মধ্যে ইহা বিদ্যমান। স্টাটোসিস্ট আকারে (15 মিলিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট) গোলাকার। ইহা কৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত কঠিন থলিবিশেষ। থলিটি বাহিরের দিকে একটি ছিদ্রের দ্বারা সংযোগ
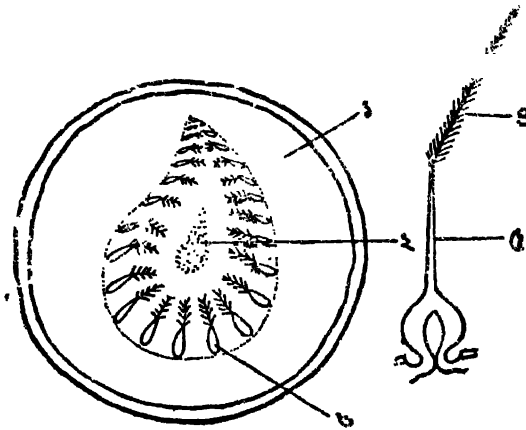
৪৪নং চিত্র

চিংড়ির ভারসাম্য-অঙ্গ দেখান হইতেছে।

১, কৃত্তিকা নির্মিত থলি ; ২, সূক্ষ্ম বালুকা কণা ; ৩, সংবেদনশীল সিটা, ৪, সংবেদনশীল সিটার অগ্রভাগের ব্রিষ্টিলস্ ; ৫, সংবেদনশীল সিটার পশ্চাদ্ভাগ।

রক্ষা করে। থলিটির অভ্যন্তরে একটি বৃত্তরেখা থাকে। বৃত্তরেখাটি সিটার (*Seta*) দ্বারা পরিবেষ্টিত। সিটাগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ইহার অগ্রভাগের দুইধারে সারি সারি ব্রিস্টিল্‌স্ (*Bristles*) থাকে। প্রতিটি সিটার ভিতর স্নায়ু অবস্থান করায় বস্তু সংস্পর্শের অনুভূতি ইহারা তৎক্ষণাৎ চিংড়ির মস্তকে পৌঁছাইয়া দেয়। সিটা-পরিবেষ্টিত বৃত্তরেখার মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম

বালুকণা থাকে। চিংড়ি স্থান পরিবর্তন করিলে বা সামান্য নড়াচড়া করিলে স্ট্যাটোসিস্টের সূক্ষ্ম বালুকণাগুলি যে-কোন সংবেদনশীল সিটার সংস্পর্শে আসে, তখন সিটাগুলি পরিবর্তনের অনুভূতি তৎক্ষণাৎ চিংড়ির মস্তিষ্কে পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে চিংড়ি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। প্রত্যেকটি শুঁড়-উপাঙ্গে প্রি-কক্সা অঞ্চলে একটি করিয়া স্ট্যাটোসিস্ট্ থাকে।

চিংড়ির চক্ষু (Eye) :

চিংড়ির চোখ দুইটি আকারে অর্ধবৃত্তের মত এবং প্রতিটি শিরোবক্ষের শীর্ষাগ্রের দুইপাশে বিদ্যমান। চোখগুলি সবৃন্তক (stalked)। ইহাদের
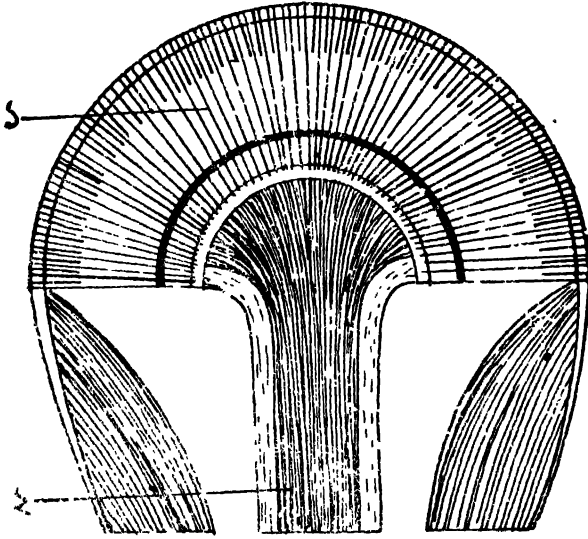
৪৭নং চিত্র
চিত্রের দ্বারা চিংড়ির যৌগিক-চক্ষুর লম্বচ্ছেদ দেখান হইতেছে।
১. অসিলি বা ওমাটিডিয়ম : চক্ষু বা অপটিক স্নায়ু।

বৃন্তটি দুইটি সন্ধির দ্বারা গঠিত। বৃন্তটির সঞ্চালনে চোখটি উপরে, নীচে, সামনে ও পিছনে অনায়াসে ঘুরিতে পারে। সুতরাং এই ধরণের চোখের দ্বারা চিংড়ি নিজেকে সহজেই শত্রু হইতে রক্ষা করিতে পারে। চিংড়ির চোখগুলিকে **যৌগিক চোখ** (*Compound eye*) বলা হয়। কতকগুলি সরল চোখের সমন্বয়ে এই যৌগিক চোখ নির্মিত। চিংড়ির সরল চোখগুলিকে **অসিলি** বা **ওমাটিডিয়া** (*Ocelli or Ommatidia*) বলা হয়। যৌগিক চোখের

বাহিরের দিক বা অগ্রভাগ **উত্তল** (*Convex*) এবং "গ্রাফ" কাগজের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষেত্রবিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ক্ষেত্রই এক একটি অসিলির অগ্রভাগ। অসিলিগুলি অর্ধবৃত্তাকৃতি যৌগিক চোখের এক একটি ব্যাসার্ধে সজ্জিত থাকে।
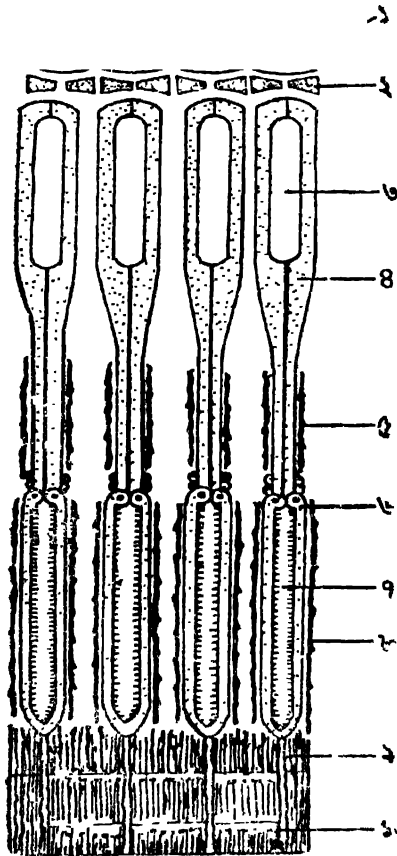
৪৬নং চিত্র
চিংড়ির যৌগিক-চক্ষুর ওমাটিডিয়াগুলির বিবিধ অংশ দেখান হইতেছে।
১, করনিয়া; ২, কর্নিয়াজেন কোষ; ৩, স্বচ্ছ লেনস্: ৪, কোষ; ৫, আইরিস আবরণী: ৬, রেটিনিউলার কোষ; ৭, র‍্যাবডোম; ৮, রেটিনাল আবরণী; ৯, স্নায়ু-রজ্জু; ১০, পেশী ও রক্তবাহীনালীর জালিকা অংশ।

প্রতিটি **ওমাটিডিয়ম বা অসিলাস্** (**Sing. Ommatidium or Ocellus**) লম্বাকৃতি এবং পর পর সন্নিবিষ্ট বহু-কোষ দ্বারা গঠিত। ইহা আলোক রেখার প্রতিবিম্ব সহজেই প্রতিফলিত করিতে পারে। প্রতিটি ওমাটিডিয়মের অগ্রভাগে কৃত্তিকানির্মিত **কর্নিয়া** (*Cornea*) স্তর থাকে। কর্নিয়া স্তরের নিম্নে একজোড়া **কর্নিয়াজেন** (*Corneagen*) কোষ বিদ্যমান। এই কোষগুলি কর্নিয়া স্তর নিঃসৃত করে। কর্নিয়াজেন কোষদ্বয়ের নিম্নে একটি **স্বচ্ছ লেনস্** (*Crystalline Cone or Lens*) বিদ্যমান। এই লেনস্‌টিকে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে লম্বা লম্বা চারিটি **লেনস্ কোষ বা কোন্-কোষ** (*Cone cell or Vitrellae*)। কোন্ কোষগুলির নিঃসৃত পদার্থের দ্বারা লেনসের সৃষ্টি। লেনস্ ও কোন্-কোষের চারিপাশ কালো পর্দার আবরণে থাকে। আবরণটিকে **আইরিস-আবরণী** (*Iris-sheath)* বলা হয়

ইহা আলোক-শক্তির তীব্রতা অনুযায়ী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। কোন্-কোষের নিম্নে লম্বালম্বিভাবে একটি মাকুর মত বস্তু থাকে। ইহার সর্বাঙ্গ প্রস্থভাবে স্তরিত। এই বস্তুটিকে **র‍্যাবডোম্** (*Rhabdome*) বলা হয়। র‍্যাবডোমের চারিপাশে সাতটি **রেটিনিউলার কোষ** (*Retinular cell*) উহাকে বেষ্টিত করিয়া থাকে। রেটিনিউলার কোষগুলির নিঃসৃত বস্তু দ্বারা র‍্যাবডোম্ সৃষ্টি হয়। রেটিনিউলার কোষগুলির চারিপাশেও কালো পর্দার আবরণী থাকে। এই আবরণীকে **রেটিনাল আবরণী** (*Retinal sheath*) বলা হয়; আলোকের যখন তীব্রতা কম থাকে, তখন রেটিনাল আবরণীও সঙ্কুচিত হয় এবং যখন আলোক বেশ তীব্র হয়, তখন প্রসারিত হইয়া যায়। চিংড়ির চক্ষুস্নায়ু হইতে সূক্ষ্ম শাখাস্নায়ু র‍্যাবডোমের ভিতর প্রবেশ করে এবং চারিধারে প্রসারিত হয়। বস্তুর প্রতিবিম্ব র‍্যাবডোমের উপর পড়ে এবং ইহার মস্তিষ্ক-কোষে প্রেরিত হয়; কেবলমাত্র সোজা আলোকরশ্মিই ওমাটিডিয়ার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে। তির্যক আলোকরশ্মিগুলি কালো পর্দা-আবরণীর উপর পতিত হয় এবং তাহা কালো রঙে শোষিত হইয়া যায়। একটি বস্তুর প্রতিটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের প্রতিবিম্ব এক একটি ওমাটিডিয়ার দ্বারা প্রতিফলিত হয়। সকল ওমাটিডিয়ার প্রতিবিম্ব একত্রে বস্তুটির প্রতিবিম্বে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এক অংশের প্রতিবিম্ব অন্য অংশের প্রতিবিম্বের উপর পতিত হইলে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্বটি ঝাপসা হইয়া যায়। প্রথম প্রকার প্রতিবিম্বকে **মোজাইক** (*Mosaic*) বা **এ্যাপোজিসন্ প্রতিবিম্ব** (*Apposition Image*) বলে। দিবাকালে আলোকের তীব্রতা থাকিলে মোজাইক দ্বারা চিংড়ি দেখিতে পায়। কিন্তু রাত্রিকালে কালো পর্দা-আবরণী সঙ্কুচিত হইলে দ্বিতীয় প্রকার ঝাপসা প্রতিবিম্বের দ্বারা চিংড়ি দেখিতে পায়। রাত্রিকালেই চিংড়ি ঝাপসা দেখে। এইরূপ প্রতিবিম্বকে **সুপারপোজিসন্ প্রতিবিম্ব** (*Superposition Image*) বলে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাধারণতঃ ওমাটিডিয়ার মত সরল চক্ষু থাকে। কিন্তু অধিকাংশ সন্ধিপদ প্রাণী যৌগিক-চক্ষুর দ্বারাই দেখিতে পায়। মেরুদণ্ডী-প্রাণীদের চক্ষু দুইটি সরল এবং আদর্শ-মেরুদণ্ডী প্রাণীর চক্ষু হিসাবে ব্যাঙের চক্ষুর বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

অনুশীলনী

১। চিত্রসহ চিংড়ির পাচন-তন্ত্রটি বর্ণনা কর। (Describe the digestive system of a prawn with a sketch.)

২। চিংড়ির পাকস্থলীর ভিতরকার বিবিধ কৃত্তিকা প্লেটগুলির অবস্থিতি ও কার্যকারিতা বর্ণনা কর। (Explain the position and function of the various cuticular plates present within the stomach of a prawn.)

৩। চিংড়ির বিবিধ শ্বাসযন্ত্রগুলির বিশদ বিবরণ দাও। (Describe various types of respiratory organs of a prawn in detail.

৪। চিংড়ির শ্বাসপদ্ধতির বর্ণনা কর। (Explain the mechanism of respiration of a prawn.)

৫। চিংড়ির হৃদ্‌যন্ত্র ও উহার বিবিধ ধমনীর অবস্থান ও কার্যকারিতা বর্ণনা কর। (Describe the heart and the distribution of the various arteries of a prawn. Explain their function and leave neat sketches.)

৬। চিংড়ির রক্তসংবহন প্রণালী রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশদভাবে বর্ণনা কর। (Explain the course of circulation of blood within the body of a prawn with elucidative sketch.)

৭। চিংড়ির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রটি চিত্রসহ বর্ণনা করিয়া উহার বিবিধ স্নায়ুগতিপথের বিষয় যাহা জান লিখ। (Describe the central nervous system of a prawn with a neat sketch. State the distribution of the principal nerves.)

৮। চিংড়ির জননতন্ত্রের বিষয় চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe the reproductive system of prawn. Leave neat sketches.)

৯। চিংড়ির যৌগিক-চক্ষুর গঠন ও অবস্থান চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe the structure and the position of the compound eye of a prawn. Leave neat sketches.)

১০। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ:

(i) হোমোসায়ানিন্ (ii) অস্টিয়া (iii) দেহরস-মিশ্রিত রক্ত (iv) স্টাটোসিস্ট, (v) ওমাটিডিয়া এবং (vi) রেচনগ্রন্থি: [Write short notes on :—(i) Hoemocyanin, (ii) Ostia, (iii) Hoemocoelomic fluid, (iv) Statocyst, (v) Ommatidia, (vi) Renal gland.]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরশোলা

(Cockroach)

আরশোলার রক্ত সংবহনতন্ত্র (Circulatory System) :

আরশোলার রক্ত-সংবহনতন্ত্র উহার অন্যান্য তন্ত্রের চেয়ে সরল। বস্তুতঃ এই তন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন আরশোলার বিবিধ কোষে সরবরাহ হয় না; কারণ, বাহির হইতে অক্সিজেন শ্বাসছিদ্রের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি কোষের ভিতর প্রবেশ করে। সুতরাং রক্ত-সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে আরশোলা বিবিধ কোষে খাদ্য সরবরাহ করে এবং প্রত্যাবর্তনের সময় কোষের রেচন পদার্থগুলিকে বহন করিয়া আনে। আরশোলার রক্তেও চিংড়ির মত দেহ-গহ্বরের রস মিশিয়া যায় এবং তাহার রক্তকে সেইজন্য **দেহমিশ্রিত রক্ত** (*Hoemocoelomic fluid*) বলা হয়। এই রক্তে হোমোগ্লোবিন বা হোমোসায়ানিনের মত অক্সিজেনশোষক রাসায়নিক পদার্থ নাই। আবার আরশোলার রক্ত-সংবহনতন্ত্রে কোন রক্তবাহী-নালী বা রক্ত-জালিকা নাই। আরশোলার রক্ত-সংবহনতন্ত্রের এইরূপ পরিবর্তন পতঙ্গ শ্রেণীর প্রতিটি পতঙ্গের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অক্সিজেন শোষণ পদ্ধতির সহিত রক্ত-সংবহনতন্ত্রের কোন যোগাযোগ নাই বলিয়াই উপরোক্ত পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়াছে। আরশোলার রক্ত সাদা এবং ভিতরে অসংখ্য অ্যামিবার মত **শ্বেত কণিকা** (*Leucocytes*) থাকে। ইহার হৃদ্‌যন্ত্রটি নলাকার এবং ইহা বক্ষ-উদর অঞ্চলে লম্বালম্বিভাবে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখায় বিদ্যমান। পাতলা গাত্রবিশিষ্ট **পেরিকার্ডিয়েল সাইনাসের** (*Pericardial sinus*) দ্বারা পরিবেষ্টিত। হৃদ্‌যন্ত্রে তেরোটি একের নীচে এক করিয়া প্রকোষ্ঠ থাকে। ইহাদের মধ্যে তিনটি বক্ষ-অঞ্চলে বিদ্যমান। প্রতি হৃদ্‌যন্ত্রের প্রকোষ্ঠ আকারে ফানেলের মত এবং প্রকোষ্ঠগুলির মাঝে কপাটিকা বিদ্যমান। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের দুই একটি করিয়া **অসটিয়া** (*Ostia*) থাকে। অসটিয়াগুলি হৃদ্‌যন্ত্রের প্রকোষ্ঠের সহিত পেরিকার্ডিয়েল সাইনাসকে যুক্ত করে। এই অসটিয়াগুলির মুখেও কপাটিকা থাকে এবং ইহারা

পেরিকার্ডিয়েল সাইনাসের রক্তস্রোতকে হৃদ্‌যন্ত্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে দেয় এবং রক্তস্রোতের বিপরীত গতিপথে; বাধা দেয়। পেরিকার্ডিয়েল সাইনাসের ঠিক নিম্নে আরশোলার অঙ্কীয়দেশে লম্বা-লম্বিভাবে দেহরসমিশ্রিত দেহ-গহ্বর বিদ্যমান। দেহগহ্বরটিকে **হোমোসিল** (*Homoecoele*) বলা হয়। পেরিকার্ডিয়েল সাইনাসের অঙ্কীয়দেশের অসংখ্য ছিদ্রপথে দেহরসমিশ্রিত রক্ত হেমোসিল গহ্বর হইতে পেরিকার্ডিয়েল সাইনাসে প্রবেশ করে এবং পেরিকার্ডিয়েল সাইনাস হইতে পরে অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। হৃদ্‌-যন্ত্রের অগ্রভাগ সরু নলের মত লম্বালম্বিভাবে উপরের দিকে আগাইয়া যায়। এই নলটিকে **পৃষ্ঠদেশীয় ধমনী** (*Dorsal Aorta*) বলে। হৃদ্‌যন্ত্রের পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীর ভিতর দিয়া আরশোলার দেহরস অগ্র-ভাগের দিকে অগ্রসর হয় এবং তথা হইতে উহা ধীরে ধীরে দেহরসমিশ্রিত রক্তগহ্বর বা

৪৭নং চিত্র

আরশোলার রক্ত-সংবহনতন্ত্রে হৃদ্‌যন্ত্রের অবিস্থিতি বর্ণনা করা হইয়াছে।
১, মস্তক ; ২, অ্যালারি পেশী : ৩, বক্ষ অঞ্চল।
৪, হৃদ্‌যন্ত্র ; ৫, উদর অঞ্চল।

হোমোসিলে মিশিয়া যায়। প্রতিটি হৃদ্ প্রকোষ্ঠের দুই পাশে চওড়াভাবে পেশীগুচ্ছ বিদ্যমান। এইরূপ মাংসল পেশীগুলি হৃদ্‌যন্ত্রটিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত করে এবং ইহাদের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে রক্তপাত হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর দিয়া অগ্রভাগের দিকে অগ্রসর হয়। এইরূপ চওড়া মাংসল

পেশীগুলিকে **অ্যালারী পেশী** (*Alary muscles*) বলা হয়। অ্যালারী পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের প্রকোষ্ঠগুলি পর্যায়ক্রমে নিম্ন হইতে উপরের দিকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় এবং ইহার ফলে রক্ত হেমোসিল হইতে হৃদ্‌প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীর মাধ্যমে আবার হেমোসিলে ফিরিয়া যায়। সাদা **চর্বি** (*Fatbody*) সূতার জালিকার মত হেমোসিলে এবং পেরিকার্ডিয়েল সাইনাসে ভাসমান অবস্থায় প্রচুর দেখা যায়। ইহারা অতিরিক্ত খাদ্য, যথা গ্লাইকোজেন, চর্বি ও অ্যালবুমেন প্রভৃতি সঞ্চয় করিয়া রাখে।

আরশোলার রক্ত-সংবহনতন্ত্র উহার প্রতিটি কোষকে খাদ্যরস যোগায় এবং ফিরিবার পথে কোষ হইতে রেচন-পদার্থ নিষ্কাশন করিয়া আনে।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System) :

আরশোলার স্নায়ুতন্ত্র চিংড়ির স্নায়ুতন্ত্রের মত হইলেও উহা উন্নত ধরনের। অঙ্গুরীমাল প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্রের সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে। আরশোলার গ্রাসনালীর শীর্ষাগ্রের ঠিক উপরে **মস্তিষ্কটি** (*supra-oesophageal ganglia*) বিদ্যমান। ইহা তিন জোড়া স্নায়ুগ্রন্থি একত্রিত হইয়া গঠিত। ইহার মাঝে ভাঁজ দেখা যায় এবং ইহার দ্বারা মস্তিষ্কটি দুই ভাগে বিভক্ত। তিন জোড়া গ্রন্থি পরস্পর একত্রিত হওয়ায় মস্তিষ্কে দুইটি পাতলা যুক্ত-রেখা দেখা যায় এবং ইহাতেই মস্তিষ্ক তিন জোড়া গ্রন্থির দ্বারা গঠিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। মস্তিষ্কের প্রথম ভাগটিকে **অগ্রমস্তিষ্ক** (*protocerebrum*) বলে। সমগ্র মস্তিষ্কের অর্ধেকই অগ্রমস্তিষ্ক অঞ্চল। ইহা এক জোড়া চক্ষুস্নায়ু (optic ganglia) সমবায়ে গঠিত। অগ্রমস্তিষ্ক অঞ্চল হইতে স্নায়ু বাহির হইয়া আরশোলার **সরল চক্ষুগুলিতে** (*Ocelli*) প্রবেশ করে এবং ইহার পশ্চাদ্ভাগ দুই দিকে প্রসারিত হইয়া প্রতি যৌগিক চক্ষুতে একটি করিয়া বহু স্নায়ু রজ্জু একত্রিত **চক্ষু-স্নায়ুখণ্ডের** (*optic lobe*) সৃষ্টি করে। আরশোলার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সেইজন্য অতি তীক্ষ্ণ। মস্তিষ্কের অগ্রভাগের অঞ্চলে স্নায়ুকোষগুলি অতীব জটিলভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। মস্তিষ্কের মধ্য-ভাগটিকে **মধ্য-মস্তিষ্ক** (*Deutocerebrum*) বলা হয়। ইহা প্রথম শুঁড়-উপাঙ্গস্থিত দেহখণ্ডের দুই গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। মস্তিষ্কের মধ্যভাগ হইতে প্রতি শুঁড়-উপাঙ্গে একটি করিয়া **শুড়সংলগ্ন স্নায়ু** (*Antennary nerve*) প্রবেশ করিয়াছে এবং শুঁড়-উপাঙ্গ সংলগ্ন পেশীগুলিতেও

অনেকগুলি স্নায়ু প্রবেশ করে। মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগটি দ্বিতীয় উপাঙ্গের দেহখণ্ডের ভিতরকার দুই জোড়া গ্রন্থি-সমন্বয়ে গঠিত। আরশোলার দ্বিতীয় শুঁড়-উপাঙ্গ থাকায় মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগ-অঞ্চল কম বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু আরশোলার মস্তিষ্কে এই অঞ্চলটি সুস্পষ্ট এবং এই অঞ্চলকে **পশ্চাদ্-মস্তিষ্ক** (*tritocerebrum*) বলা হয়। পশ্চাদ্-মস্তিষ্ক হইতে আরশোলার
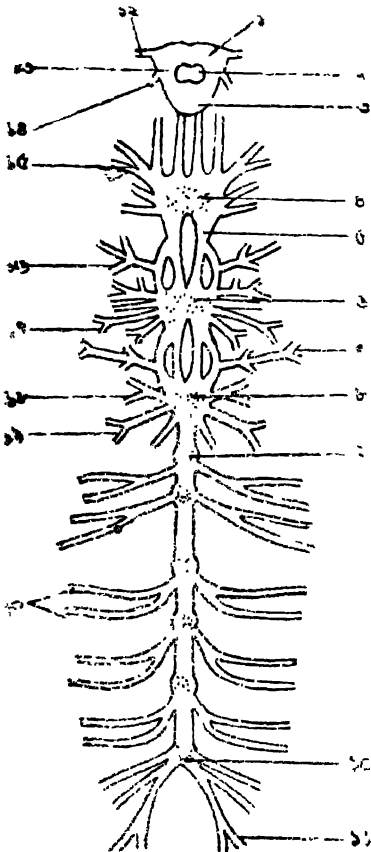
১, অগ্রমস্তিষ্ক; ২, গ্রাসনালীর পদ; ৩, গ্রাসনালীর নিম্নস্থ স্নায়ুগ্রন্থি; ৪, অগ্রবক্ষ সংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি; ৫, সংযোগী স্নায়ু; ৬, মধ্য-বক্ষ সংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি; ৭, দ্বিতীয় পদ-উপাঙ্গের স্নায়ু, ৮, পশ্চাদ্-বক্ষ সংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি; ৯, উদর-অঞ্চলের অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জুর প্রথম-স্নায়ুগ্রন্থি, ১০, উদর-অঞ্চলের অঙ্কীয় স্নায়ু-রজ্জুর শেষ (ষষ্ঠ) স্নায়ুগ্রন্থি; ১১, পায়ু-অঞ্চলের স্নায়ু; ১২, চক্ষু-স্নায়ু; ১৩, মধ্য-মস্তিষ্ক, ১৪, শুঁড়সংলগ্ন স্নায়ু, ১৫, প্রথম পদ-উপাঙ্গের স্নায়ু, ১৬-১৭, দ্বিতীয় পদ-উপাঙ্গের স্নায়ুসমূহ; ১৮, ডানার স্নায়ু; ১৯, তৃতীয় পদ-উপাঙ্গের স্নায়ু; ২০, উদর অঞ্চলের স্নায়ু।

৪৮নং চিত্র

আরশোলার স্নায়ুতন্ত্র দেখানো হইতেছে।

উপরোষ্ঠে এবং অগ্র পাকস্থলীতে অনেকগুলি স্নায়ু বাহির হইয়া উপরোক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে। মস্তিষ্কের দুই পাশের পশ্চাদ্-অঞ্চলটির মাঝে বেশ বড় ফাঁক থাকে। এই ফাঁকের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কের পিছন হইতে গ্রাসনালী

প্রবেশ করে। গ্রাসনালীর ঠিক উপরে আড়াআড়িভাবে একটি সরু স্নায়ু, মস্তিষ্কের দুই দিকের পশ্চাদ্‌মস্তিষ্ককে যুক্ত করে। এই সরু স্নায়ুটিকে গ্রাসনালীর **উপরিস্থিত সংযোগকারী স্নায়ু** (*Post-Oesophageal Commissure*) বলা হয়। আরশোলার মস্তিষ্ক অনুভূতি ও অঙ্গসংযোগিতার কেন্দ্র। কিন্তু চলন-প্রক্রিয়ায় ইহার প্রভাব কম। পশ্চাদ্‌মস্তিষ্কের নিম্নে
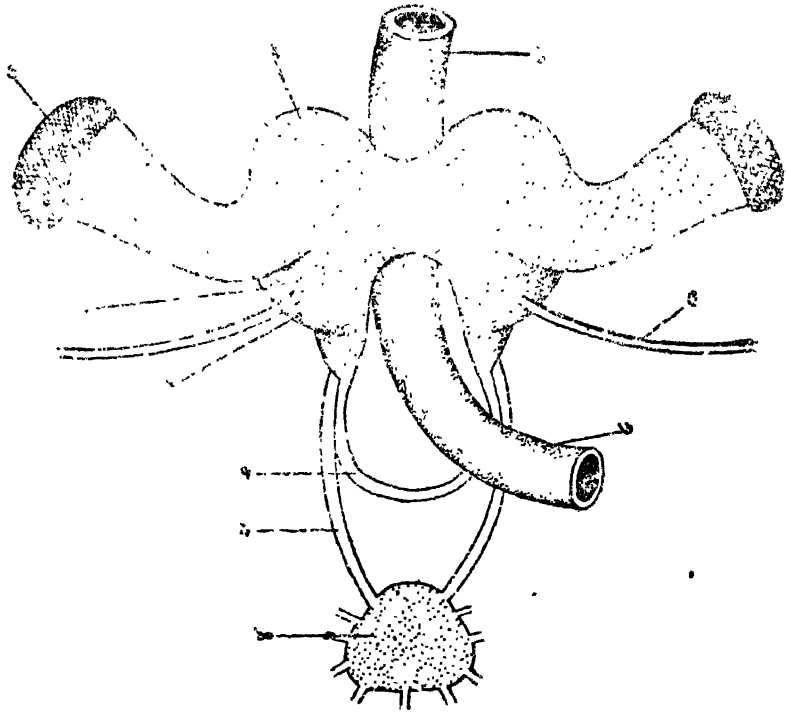
৪৯নং চিত্র

আরশোলার মস্তিষ্কের বিবিধ অঞ্চল ও উহার স্নায়ুগুলি দেখান হইয়াছে।

১, গ্রাসনালীর অগ্রভাগ ; ২, অগ্র মস্তিষ্ক ; ৩, মধ্য-মস্তিষ্ক . ৪, চক্ষু ; ৫, শুঁড়সংলগ্ন স্নায়ু (antennary nerve), ৬, গ্রাসনালীর পশ্চাদ্ভাগ ; ৭, গ্রাসনালীটিকে উপরের দিকে তুলিয়া দিয়া গ্রাসনালীর উপরিস্থিত সংযোগকারী স্নায়ু (Po t-Oe oph geal Co nmissures) ; ৮, পশ্চাদ্‌-বক্ষ : ৯, গ্রাসনালীর নিম্নস্থ স্নায়ুগ্রন্থির সহিত পশ্চাদ্‌ বক্ষের সংযোগকারী স্নায়ু (Para Oesophageal connectivas) ; ১০, গ্রাসনালীর নিম্নস্থ স্নায়ুগ্রন্থি (Sub-Oesophageal Ganglion)।

একটি বড় স্নায়ুগ্রন্থি বিদ্যমান। এই গ্রন্থিটি আরশোলার চোয়াল, মেক্সিলা ও ওষ্ঠ-উপাঙ্গস্থিতি দেহখণ্ড যথাক্রমে তিন-জোড়া ছোট স্নায়ুগ্রন্থি একত্রিত হইয়া গঠিত হয়। এই গ্রন্থিটিকে **গ্রাসনালীর নিম্নস্থ স্নায়ুগ্রন্থি** (*Sub-*

Oesophageal Ganglia) বলা হয়। এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের দুইপাশে পশ্চাদ্-মস্তিষ্ক অঞ্চলের সহিত একটি করিয়া সরু স্নায়ু দ্বারা যুক্ত। এই স্নায়ু দুইটিকে **গ্রাসনালী পরিবেষ্টিত সংযোগকারী স্নায়ু** (*Circum-Oesophageal Commissure*) বলা হয়। এই গ্রন্থি হইতে প্রতিটি পার্শ্বে তিনটি করিয়া মোট তিনজোড়া স্নায়ু যথাক্রমে চোয়াল, মেক্সিলা ও ওষ্ঠে প্রবেশ করে। গ্রন্থিটির পশ্চাৎ হইতে একজোড়া স্নায়ু বাহির হইয়া অগ্রবক্ষসংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থির সহিত যুক্ত হয়। অগ্রবক্ষ, মধ্যবক্ষ ও পশ্চাদ্‌বক্ষ অঞ্চলে একটি করিয়া যথাক্রমে **অগ্রবক্ষসংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি** (*Prothoracic Ganglia*), **মধ্যবক্ষ-সংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি** (*Meso Thoracic*), **পশ্চাৎ-বক্ষ সংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি** (*Meta-Thoracic*) থাকে। উপরোক্ত স্নায়ুগ্রন্থিগুলি পর পর অবস্থান করে এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত একজোড়া স্নায়ু দিয়া যুক্ত। পশ্চাদ্-বক্ষসংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি হইতে দুইটি স্নায়ু বাহির হইয়া উদরের মধ্যস্থ অঙ্কীয়-মধ্যরেখার প্রথম দেহখণ্ডের স্নায়ুগ্রন্থির সহিত সংযুক্ত করে। এইরূপ ছয়টি স্নায়ুগ্রন্থি আরশোলার ছয়টি উদর দেহখণ্ডে বিদ্যমান। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত একজোড়া স্নায়ুর দ্বারা যুক্ত। আরশোলার উপর অংশের লম্বা স্নায়ুগ্রন্থিটিকে **অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু** (*Ventral Nerve Cord*) বলা হয়। এই অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জুতে ছয়টি স্নায়ুগ্রন্থি থাকে এবং শেষ স্নায়ুগ্রন্থিটি আকারে বড। প্রতিটি স্নায়ুগ্রন্থি হইতে দুই পাশে স্নায়ু বাহির হইয়া বিবিধ অঙ্গে প্রবেশ করে। বক্ষসংলগ্ন স্নায়ুগ্রন্থি হইতে স্নায়ু বাহির হইয়া আরশোলার পদ ও পাখায় প্রবেশ করে।

জননতন্ত্র (Reproductive System) ঃ

আরশোলা চিংড়ির মত **একলিঙ্গ** (*Unisexual*) প্রাণী। ইহাদের বহিরাকৃতির দ্বারাও কোন্ আরশোলাটি পুরুষ আর কোন্ আরশোলাটি স্ত্রী, তাহা জানা যায়। পুরুষ আরশোলার নবম দেহখণ্ডের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া অতিরিক্ত লম্বা কূর্চ (*Styles*) থাকে। ইহা স্ত্রী-আরশোলায় না থাকায় আরশোলা পুরুষ কিংবা স্ত্রী, তাহা সহজেই জানা যায়।

(ক) আরশোলার পুং-জননতন্ত্র (*Male Reproductive System*) **:** আরশোলার পুং-জননতন্ত্রে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি থাকে, যথা—(*i*) **একজোড়া শুক্রাশয়** (*Testes*), (*ii*) **একজোড়া শুক্রনালী** (*Vas-defferens*) (*iii*) **একজোড়া শুক্রসঞ্চয়ী থলি** (*Seminal Vesicle*) ; (*iv*) **একটি**

ক্ষেপণ নালী (*Ejaculatory duct*); (*v*) **একটি কংগ্লোবেটগ্রন্থি** (*Conglobate Gland*); (*vi*) **একটি জনন-থলি** (*Genital pouch*) **এবং উহার বহির্মুখ** বা **পুং-জননছিদ্র** (*Male Gonopore*)।

আরশোলার শুক্রাশয় দুইটি উহার পঞ্চম-ষষ্ঠ উদর দেহখণ্ডের প্রতি পার্শ্বে পৃষ্ঠদেশে টার্‌গা (*Terga*) পাত্রের তলায় বিদ্যমান। প্রতিটি শুক্রাশয় প্রায় ৩০-৪০টি **শুক্রাশয় খণ্ড** (*Vesicle*) সমন্বয়ে গঠিত। শুক্রাশয় খণ্ডগুলি লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত থাকে।
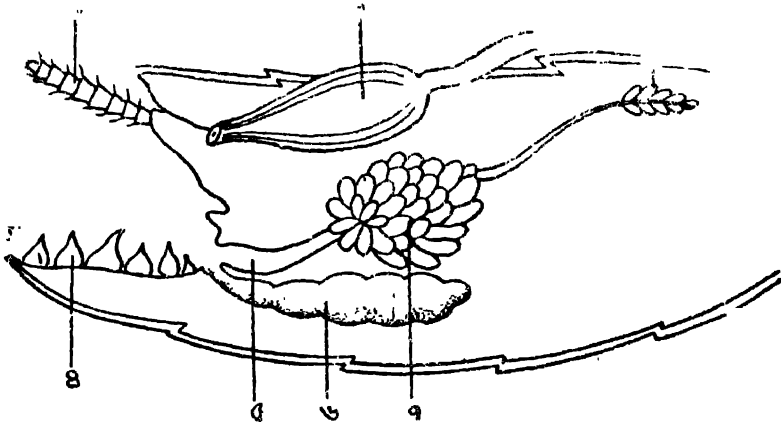
৫৯নং চিত্র

আরশোলার পুং-জননতন্ত্রের পার্শ্ব-দৃশ্য দেখানো হইতেছে।

১, পায়ু-কুর্চ ; ২, মলাশয় : ৩, শুক্রাশয় ; ৪, গোনাপোফাইসেস ; ৫, ইজাকুলেটারি ডাক্ট ; ৬, কংগ্লোবেট রসগ্রন্থি ; ৭, সেমিনাল ভেসিকল।

প্রতিটি শুক্রাশয়খণ্ডের আকার গোলাকার থলির মত এবং ইহার আবরণী কোষ হইতে শুক্রের সৃষ্টি হয়। অপরিণত পুং-আরশোলার শুক্রাশয়গুলি পরিষ্কার স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু পরিণত হইয়া শুক্রসৃষ্টির পর ইহার আকার ক্ষুদ্র হইয়া যায়। পরিণত আরশোলায় এমনও দেখা গিয়াছে যে, শুক্রাশয় দুইটি ক্ষুদ্র হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, পরিণত আরশোলার শুক্রাশয় দুইটি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়া উহার দেহের ভিতরকার চর্বির জালিকার সহিত মিশিয়া যায় এবং সেইজন্যই দেখা যায় না। প্রতিটি শুক্রাশয় হইতে একটি সরু শুক্রনালী বাহির হয় এবং দুই পার্শ্বের **শুক্রনালী** (*Vas deferens*) আরশোলার দেহ-মধ্যরেখার নিকট

মুক্ত হয়। শুক্রনালী দুইটি মিলিত হইবার পূর্বে স্থূল হইয়া **শুক্রসঞ্চয়ী থলির** (*Seminal Vesicle*) সৃষ্টি করে। এই শুক্রসঞ্চয়ী থলি দুইটি হইতে অসংখ্য নলাকার সরু সরু গ্রন্থি বাহির হয়। দুইটি শুক্রসঞ্চয়ী থলি এবং উহাদের অসংখ্য নলাকার গ্রন্থি প্রায় একত্রিত হইয়া ব্যাঙের ছাতার মত দেখায়। সেইজন্য এই একত্রিত অংশটিকে **ছাতা-গ্রন্থি** (*Mushroom Gland*) বলে। শুক্রকীটগুলি নলাকার পকেটের মত গ্রন্থির ভিতর জমা হয় এবং গ্রন্থি-নিঃসৃত খাদ্য-রসের দ্বারা পুষ্ট হয়। দুইটি শুক্রনালী সংযুক্ত হইবার পর একটি মোটা মাংসল নালীতে পরিণত হয়। এই নালীকে **ক্ষেপণ নালী** (*Ejaculatory Duct*) বলা হয়। ক্ষেপণ-নালীটি সোজা নীচের দিকে অগ্রসর হইয়া পুং-জনন থলিতে যুক্ত হয়। **পুং-জনন থলিটি** (*Male Genital Pouch*) আরশোলার অঙ্কীয়দেশে নবম-দশম দেহখণ্ডের মাঝে বিদ্যমান। জনন-থলিটি পুং জননছিদ্রে (*Male Gonopore*) যুক্ত হয়। আরশোলার পুং-জননছিদ্রটির চারিপাশে কৃত্তিকা নির্মিত হুক ও প্লেট থাকে। এইগুলিকে **গোনাপোফাইসিস** (*Gonapophysis*) বলা হয়। গোনাপোফাইসিসের হুক ও প্লেটগুলি প্রজনন-প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। ক্ষেপণ নালীর অঙ্কীয়ের দিকে একটি পাতার মত প্রসারিত গ্রন্থি বিদ্যমান। ইহাকে **কংগ্লোবেট গ্রন্থি** *Conglobate Gland*) বলে। এই গ্রন্থি হইতে একটি স্বতন্ত্র নালী বাহির হইয়া পুং-জননছিদ্রের পাশে জনন-থলির ভিতরমুখী হয়। ইহা একটি বহু সূক্ষ্মশাখাবিশিষ্ট নলাকার গ্রন্থি। কংগ্লোবেট গ্রন্থি হইতে একপ্রকার ক্ষারীয়-রস নিঃসৃত হয়। ইহার তীব্র গন্ধে স্ত্রী-আরশোলা আকৃষ্ট হয়। আরশোলা এই তীব্রগন্ধযুক্ত রস নিক্ষেপ করিয়া শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করে।

(খ) আরশোলার স্ত্রীজননতন্ত্র (Famale Reproductive System) : আরশোলার স্ত্রী-জননতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির দ্বারা গঠিত; যথা—(*i*) **একজোড়া ডিম্বাশয়** (*Ovary*), (*ii*) **একজোড়া ডিম্বনালী** (*Oviduct*), (*iii*) **একটি স্ত্রী-বহিঃ-জননতন্ত্র** (*Vagina*), (*iv*) **একজোড়া শুক্রসঞ্চয়ী থলি** (*Spermathecae*), (*v*) **একজোড়া কোলেটারিয়েল গ্রন্থি** (*Colleterial Gland*) এবং (*vi*) **একটি জনন-থলি** (*Genital Pouch*)।

আরশোলার স্ত্রী-জননতন্ত্রে ডিম্বাশয় দুইটি উদর অঞ্চলের পশ্চাদ্ভাগে

বিদ্যমান। প্রতিটি ডিম্বাশয়, আটটি **ডিম্বাশয়-নালী** বা **ওভারিওল** (*Ovarian tube or Ovarioles*) একত্রিত হইয়া গঠিত। একটি ডিম্বাশয় নালীতে লম্বালম্বিভাবে একটির পর একটি করিয়া ডিম্ব সজ্জিত থাকে। ডিম্বাশয় নালীর অগ্রভাগের ডিম্ব আকারে ক্ষুদ্র ও অপরিপক্ক, কিন্তু উহার পশ্চাদ্ভাগের ডিম্বগুলি ধীরে ধীরে আকারে বড় হওয়ায় ডিম্বাশয়-নালীটিকে মটর-হারের মত দেখায়। ডিম্বাশয়-নালীর পশ্চাদ্ভাগের ডিম্বগুলি আকারে বড় ও পুষ্ট।
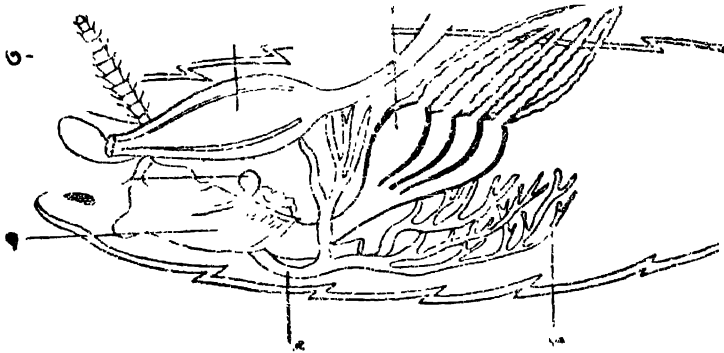
৫১নং চিত্র

আরশোলার স্ত্রী-জননতন্ত্রের পার্শ্ব-দৃশ্য দেখান হইতেছে।

১, ডিম্বাশয়; ২, মলাশয়; ৩, পায়ুকূট, ৪, শুক্রসঞ্চয়ী থলি বা স্পারমাথিকা; ৫, কোলেটেরিয়েল নালী: ৬, কোলেটেরিয়েল গ্রন্থি: ৭, গোনাপোফাইসেস।

প্রতিটি ডিম্বাশয়-নালী অগ্রভাগে একটি সরু সূতার মত ডিম্বসূতায় সাধারণতঃ হয় এবং এইরূপ ডিম্বসূতাগুলি একত্রিত হইয়া একটি সাধারণ নালীর সৃষ্টি করে। ডিম্বাশয়ের সাধারণ নালীটি আরশোলার চর্বির সহিত আটকাইয়া থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় নালী পশ্চাতে একত্রিত হইয়া একটি অপেক্ষাকৃত স্থূল ডিম্বনালীর সৃষ্টি করে। দুই পাশের **ডিম্বনালী** (*Oviduct*) আরশোলার দেহের অঙ্কীয় মধ্যরেখায় পুনরায় একত্রিত হইয়া একটি **বহিঃ-স্ত্রী-জননতন্ত্রের** (*Vagina*) সৃষ্টি করে। বহিঃ-স্ত্রী-জননতন্ত্রটি লম্বা লম্বা চেরা ছিদ্র দ্বারা একটি **জনন-থলিতে** (*Genital Pouch*) শেষ হয়। আরশোলার অষ্টম ও নবম উদর-দেহখণ্ডের **স্টার্‌না** (*Sterna*) বা অঙ্কীয় দেহখণ্ড-কৃত্তিকা সম্পূর্ণভাবে সপ্তম উদর-দেহখণ্ডের ভিতর ঢাকা থাকা এবং ইহার দ্বারা একটি প্রশস্ত স্থানের সৃষ্টি হয়। ইহার ভিতরেই জনন-থলির দুইপাশে দুইটি শুক্রসংক্রান্ত থলি থাকে। এই থলি দুইটির বাহিকা নবম দেহখণ্ডটি

জনন-থলির দুই পার্শ্ব হইতে অগ্রসর হইয়া একটি ছিদ্রে মিলিত হয়। দুইটি **শুক্রসংক্রান্ত থলির** (*Spermathecal sac*) আকার দুই প্রকারের; একটি থলির ন্যায় এবং অন্যটি ফাঁকা ফিতার মত। যৌন-সঙ্গমের সময় পুং-আরশোলা হইতে আগত শুক্রকীট স্ত্রী-আরশোলার শুক্রসংক্রান্ত
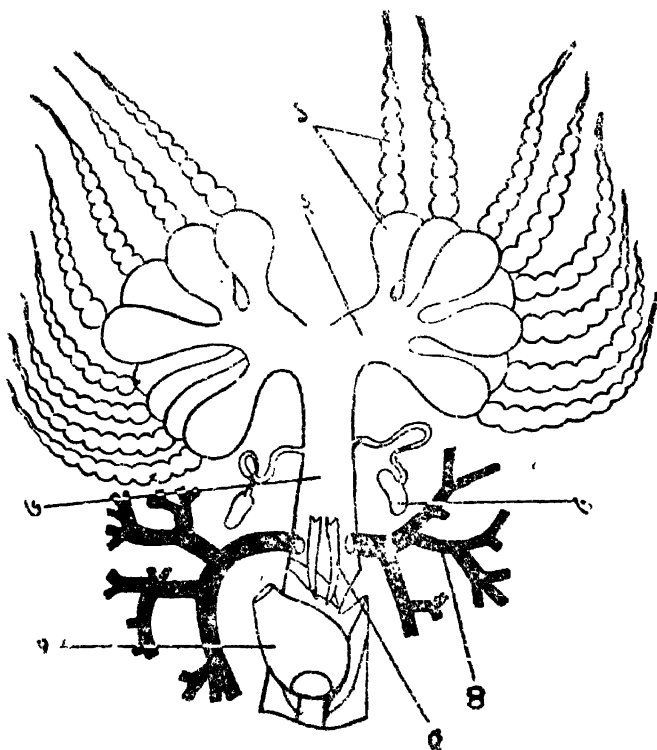
৫১নং চিত্র

উপরের হইতে আরশোলার স্ত্রী-জননতন্ত্র দেখান হইতেছে।

১, ডিম্বাশয় (Ovariole); ২, ডিম্বনালী; ৩, শুক্রসঞ্চয়ী থলি বা স্পারমাথিকা; ৪, কোলেটে-রিয়েল গ্রন্থি; ৫, গোনাপোফাইসিস; ৬, বহিঃ-স্ত্রীজনন-অঙ্গ (Vagina); ৭, মলাশয়।

থলির ভিতর জমা হয়। বহিঃ-স্ত্রী-জননতন্ত্রের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া বহুশাখাবিশিষ্ট **কোলেটেরিয়েল** (*Colleterial gland*) গ্রন্থি বিদ্যমান। এই গ্রন্থি হইতে আগত বাহিকা পৃথকভাবে বহিঃ-স্ত্রীজননতন্ত্রের দুই পাশে প্রবেশ করে। কোলেটেরিয়েল গ্রন্থি-নিঃসৃত রসের দ্বারাই ডিমের আধার (*Egg-case*) নির্মিত হয়; শুক্রসংক্রান্ত থলির ভিতরকার শুক্রকীটগুলির **জনন-থলির** (*Genital Pouch*) ডিম্বগুলিকে নিষিক্ত বা গর্ভাধান করে। জনন-থলির ভিতর নিষিক্ত ডিম্বগুলি আটটি করিয়া

দুই সারিতে মোট যোলটি করিয়া সাজানো থাকে। ইহাদের চারিপাশে কোলেটেরিয়েল রস জমা হয় এবং রাসায়নিক পদার্থ কঠিন হইয়া ডিম্ব-আধারের সৃষ্টি করে। আরশোলার ডিম্ব-আধারকে **উথিকা** (*Ootheca*) বলা হয়।

আরশোলার স্ত্রী-জননতন্ত্রে সঙ্গম অঙ্গও বিদ্যমান। **জনন-থলিটি** (*Genital Pouch*) **বহিঃ-জনন-ছিদ্রে** (*Female Gonopore*) মুক্ত হয়। জনন-ছিদ্রের দুই পার্শ্বে তিনটি করিয়া মোট তিনজোড়া কৃত্তিকা-নির্মিত সঙ্গম অঙ্গ বা **গোনাপোফাইসিস** (*Gonapophysis*) থাকে। ইহা সঙ্গমের সময় আরশোলার পুং-জননছিদ্র এবং স্ত্রী-জননছিদ্র দুইটিকে মুখোমুখি আবদ্ধ করিতে সক্ষম। ইহার দ্বারাই সঙ্গম কার্যকরী হয়। স্ত্রী-আরশোলার স্ত্রী-জননছিদ্র হইতে যোলটি নিষিক্ত ডিম্বযুক্ত উথিকা বাহির হইয়া আসে।
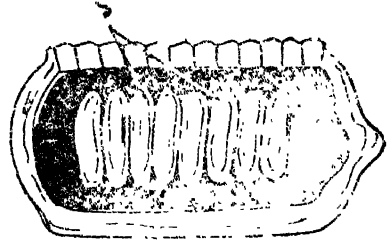
৫৩নং চিত্র
আরশোলার ডিম্বাধার বা উথিকা (Ootheca) দেখান হইতেছে।
১, ডিম্বাশয়।

অনুশীলনী

১। আরশোলার রক্তকে দেহবসমিশ্রিত রক্ত বলা হয় কেন? চিত্রসহ ইহার রক্ত সংবহন-তন্ত্র বর্ণনা কর। (Why the blood of Cockroach is called "hoemocoelomic fluid?" Describe the circulatory system of Cockroach with suitable sketch.)

২। চিংড়ির কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সহিত আরশোলার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের তুলনা কর। (Compare the central nervous system of a Prawn with suitable sketch.)

৩। আরশোলার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি পৃষ্ঠাপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিয়া উহার বিবিধ অংশগুলি দেখাইয়া দাও। (Draw and label a full-page sketch of the central nervous system of Cockroach.)

৪। আরশোলার জননতন্ত্রের বিবিধ অংশগুলি চিত্রসহ বর্ণনা কর। শুক্রসংক্রান্ত থলি এবং কোলেটেরিয়েল-গ্রন্থির কাযকারিতা কি? (Describe the reproductive system of Cockroach with suitable sketches. What are the functions of spermathecal sac and colleterial glands of Cockroach?)

৫। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ:—(i) দেহরক্ত-গহ্বর, (ii) মস্তিষ্ক, (iii) ডিম্বাশয়, (iv) উথিকা, (v) গোনাপোফাইসিস্। (Write short notes on:—(i) Hoemocoel, (ii) Brain, (iii) Ovary, (iv) Ootheca, (v) Gonapophysis.)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মেরুদণ্ডী প্রাণী

কুনো ব্যাঙ

(Toad)

ব্যাঙের বহিরাকৃতি, স্বভাব ও আচরণ পূর্বেই বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

পৌষ্টিক-তন্ত্র (Alimentary System) :

সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিকতন্ত্রের দুইটি ভাগ থাকে। **মুখবিবর** (*Buccal cavity*) হইতে **পায়ুছিদ্র** (*Anus*) পর্যন্ত বিস্তারিত **পৌষ্টিক-নালী** (*Alimentary Canal*) এবং উহার সংশ্লিষ্ট বিবিধ **পুষ্টিগ্রন্থিগুলি** (*Digestive Gland*) খাদ্যবস্তু হজম করিতে সহায়তা করে। এই দুইটি ভাগের একত্র কার্যকারিতা দ্বারাই জটিল ও কঠিন খাদ্যবস্তু সহজ ও তরল হয় এবং **পৌষ্টিক নালীর** গাত্রের কোষ দ্বারা শোষণের ফলে খাদ্যসার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

পৌষ্টিক-নালী (Alimentary Canal) :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই নালীটি প্রাণীর মুখবিবরের সহিত উহার পায়ুছিদ্রকে সংযুক্ত করে। এই নালীটির কোন অঞ্চল স্থূল, আবার কোন অঞ্চল সরু। সাধারণতঃ ইহার মধ্যস্থল পাকানো অবস্থায় থাকে এবং অগ্র-পশ্চাদ্ ভাগ সোজা হয়। পৌষ্টিক-নালীর অগ্রভাগের দ্বারা প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অগ্রভাগের পরবর্তী অঞ্চলে খাদ্যবস্তু ধীরে ধীরে হজম হয়। পৌষ্টিক-নালীর খাদ্য হজমকারী অঞ্চলের পরবর্তী অঞ্চলে খাদ্যসার শোষিত হয় এবং ইহার পশ্চাদ্-অঞ্চলে অপরিপাক খাদ্যবস্তু জমা হয় এবং সময়মত বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই লম্বা নালীটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত অঞ্চলে বিভেদিত, যথা—**মুখছিদ্র** (*Mouth*), **মুখবিবর** (*Buccal Cavity*), **গ্রাসনালী** (*Oesophagus*), **পাকস্থলী** (*Stomach*) **ক্ষুদ্র অন্ত্র** (*Small Intestine*), **বৃহৎ অন্ত্র** (*Large Intestine*), এবং **অবসারণী** (*Cloacal*) মধ্যে অবস্থিত **পায়ুছিদ্র** (*Cloacal Aperture*)।
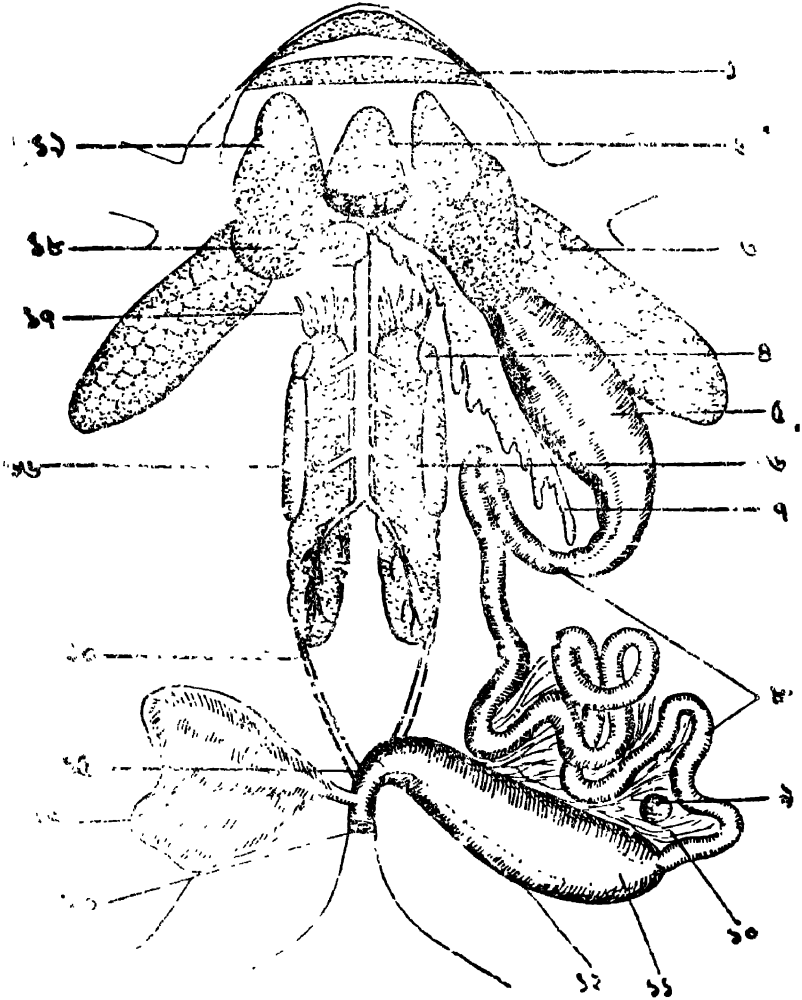
৫৪নং চিত্র

কুনো ব্যাঙেব ভিতবকার বিবিধ তন্ত্রের অবস্থা দেখান হইতেছে।

১, স্বরযন্ত্রের পর্দা : ২, হৃদযন্ত্র ; ৩, ফুসফুস ; ৪, বিডারস্ যন্ত্র ; ৫, পাকস্থলী ; ৬, বৃক্ক ; ৭, অগ্ন্যাশয় ; ৮, অন্ত্র ; ৯, প্লীহা ; ১০, সংযোগী পর্দা বা মিসেনট্রি ; ১১, মলাশয় ; ১২, পশ্চাদ্ পদের স্থান ; ১৩, অবসারণী ছিদ্র ; ১৪, মূত্র-থলি ; ১৫, অবসারণী ; ১৬, শুক্রাশয় : ১৭, স্নেহ-পদার্থের ফিতা বা ফ্যাট বডি : ১৮, পিত্তথলি ; ১৯, যকৃৎ ; ২০, গবিনী

ব্যাঙের মুখছিদ্রটি ম্যাক্সিলারী ও ম্যানডিবল চোয়ালের দ্বারা আবদ্ধ। ইহা বিস্তারিত এবং ইহার দুইটি খাঁজ প্রায় কর্ণপটহ পর্যন্ত আগাইয়া যাইতে দেখা যায়। ম্যাক্সিলারী ও ম্যানডিবল চোয়াল দুইটি বেশ শক্ত কিন্তু দন্তবিহীন। ম্যাক্সিলারী বা উপরের চোয়ালটি নড়ে না, কিন্তু ম্যানডিবল বা নিচের চোয়ালটি উঠা-নামা করিয়া মুখছিদ্রটিকে বন্ধ করে ও খুলিয়া দেয়। মুখছিদ্রের ভিতর অঞ্চলটি প্রশস্ত এবং এই অঞ্চলটিকে **মুখ-বিবর** (*Mouth Cavity or Buccal Cavity*) বলা হয়। মুখ-বিবরের
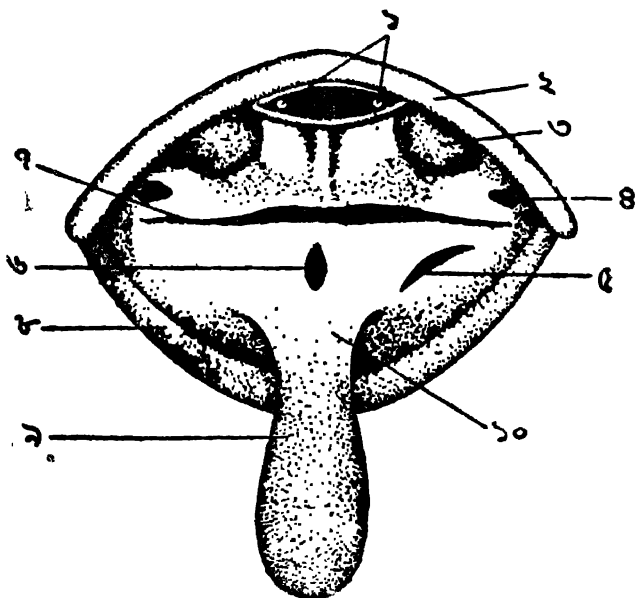
৫৫নং চিত্র

কুনো ব্যাঙের মুখবিবরটি খুলিয়া দেখান হইতেছে।

১, অন্তঃ-নাসারন্ধ্র; ২, উপরের চোয়াল; ৩, চোখের ছাপ; ৪, ইউস্টেচিয়ান নালীর ছিদ্র; ৫, স্বরযন্ত্রের ছিদ্র, ৬, গ্লটিস; ৭, গ্যালেট বা গ্রাসনালীর প্রবেশ পথ; ৮, নীচেকার চোয়াল; ৯, জিহ্বা।

ভিতরটি পাতলা মিউকাস পর্দার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। মুখ-বিবরের উপরিভাগের অগ্রাংশে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার পার্শ্বে একটি করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দুইটিকে **অন্তঃ-নাসারন্ধ্র** (*Internal Nares or Internal Nostril*) বলা হয়। বহিঃ-নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাতাস মুখের ভিতর উপরোক্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়াই প্রবেশ করে। প্রতিটি অন্তঃ-নাসারন্ধ্রের

পিছনে গোলাকার সাদা ফোলা দাগ থাকে। ব্যাঙের চোখ দুইটিকে বাহির হইতে চাপ দিলে মুখ-বিবরের উপরোক্ত গোলাকার ফোলা দাগ দুইটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং গোলাকার ফোলা দাগগুলিকে **চোখের ছাপ** (*Impression of the eye*) বলা হয়। চোখের ছাপগুলি আরও পিছনে দুই চোয়ালের কোণের নিকটে একটি করিয়া ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্র দুইটিকে **ইউস্টেচিয়ান ছিদ্র** (*Eustachian Aperture*) বলা হয়। এই ছিদ্র দুইটি মুখ-বিবরকে কর্ণের মধ্যকর্ণ-অঞ্চলের সহিত যুক্ত করে। প্রতিটি ইউস্টেচিয়ান ছিদ্র উহার পার্শ্বস্থ কর্ণের সহিত মিলিত আছে এবং এই মিলনের ফলে যে নালীর সৃষ্টি হয়, তাহাকে **ইউস্টেচিয়ান নালী** (*Eustachian Tube*) বলা। মুখ-বিবরের মেঝের একটি **জিহ্বা** (*Tongue*) বিদ্যমান। জিহ্বাটি লম্বা ও প্রসারিত এবং ইহার চারিপাশে **মিউকাস** (*Mucous*) পর্দার দ্বারা পরিবেষ্টিত। জিহ্বাটি নিচেকার চোয়ালের অগ্রাংশের সহিত যুক্ত থাকে এবং ইহার মুক্ত দিকটি মুখ-বিবরের ভিতরের দিকে বিদ্যমান। জিহ্বার অগ্রভাগে প্রচুর **আঠাল গ্রন্থি** (*Sticky Gland*) থাকে। জিহ্বার দ্বারাই ব্যাঙ সজীব প্রাণী (পতঙ্গ) আটকাইয়া মুখ-বিবরে প্রবেশ করায়। জিহ্বাটি উল্টাইয়া মুখ-বিবর হইতে বাহির হয় এবং পতঙ্গের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে পতঙ্গটি জিহ্বায় আটকাইয়া যায় ও জিহ্বা তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পুনরায় মুখের ভিতর পতঙ্গসহ প্রবেশ করে। জিহ্বার পিছনে একটি লম্বালম্বিভাবে চেরা ছিদ্র থাকে। ইহাকে **শ্বাসছিদ্র** বা **গ্লটিস** (*Glottis*) বলা হয়। এই ছিদ্রটি ব্যাঙের দুইটি ফুসফুসকে উহার মুখ-বিবরের সহিত যুক্ত করে।

মুখ-বিবরটি ধীরে ধীরে সরু হইয়া যায় এবং গ্লটিসের আরও পিছনে উহা স্থূল নলাকারে ব্যাঙের দেহের ভিতর প্রবেশ করে। মুখ-বিবরের এই স্থূল নলাকার অস্পষ্ট অঞ্চলটিকে পৌষ্টিক-নালীর **গলবিল** (*Pharynx*) বলা হয়। গলবিলের পরবর্তী অঞ্চল সোজা দেহের ভিতর নামিয়া যায়। এই অঞ্চলও বেশ স্থূল এবং ইহার গাত্রও বেশ মোটা। এই অঞ্চলটিকে ব্যাঙের **পৌষ্টিক-নালীর গ্রাসনালী** (*Oesophagus*) বলা হয়। গ্রাসনালী দেহের ভিতর একটি বাঁকানো থলির সহিত যুক্ত হয়। গ্রাসনালীর ভিতরকার আস্তরটিতে লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ থাকায় প্রসারণের সময় সম্পূর্ণ খাদ্যপ্রাণীটিকে অনায়াসে পৌষ্টিক-নালীর ভিতর
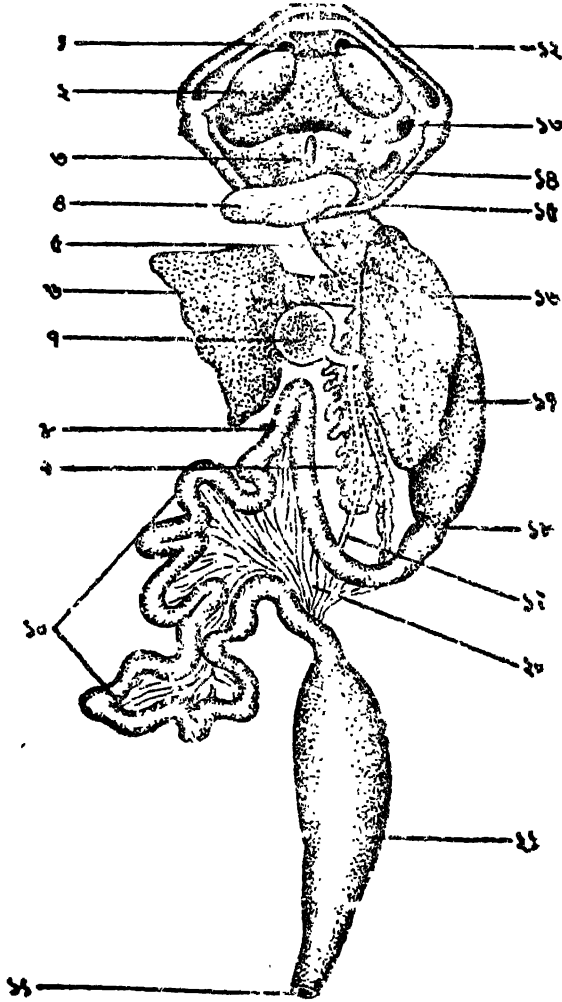
৫৬নং চিত্র

কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র দেখানো হইতেছে।

১, অন্তঃ-নাসারন্ধ্র ; ২, চোখের ছোপ ; ৩, গ্লটিস ; ৪, জিহ্বা ; ৫, গ্রাসনালী ; ৬, যকৃৎ ; ৭, পিত্তথলি ; ৮, ডিওডিনাম ; ৯, অগ্ন্যাশয় ; ১০, অন্ত্র ; ১১, অবসারণী ছিদ্র ; ১২, উপরের চোয়াল ; ১৩, ইউস্টেচিয়ান নালীর ছিদ্র ; ১৪, স্বরযন্ত্রের ছিদ্র ; ১০, নীচেকার চোয়াল ; ১৬, কার্ডিয়াক সংযোগ ; ১৭, পাকস্থলী ; ১৮, পাইলোরিক সংযোগ ; ১৯, সাধারণ পিত্তনালী ২০, পাতলা সংযোগী পর্দা বা মিসেনট্রি ; ২১, মলাশয়।

অগ্রসর হইতে পথ করিয়া দিতে পারে। গ্রাসনালীর পরবর্তী অঞ্চল বাঁকানো থলির মত। ইহাকে ব্যাঙের **পাকস্থলী** (*Stomach*) বলা হয়। **পাকস্থলীটির** গাত্র পুরু মাংসল এবং ইহা অঙ্কীয় মধ্যরেখার সামান্য ডান দিকে বিদ্যমান। গ্রাসনালী এবং পাকস্থলীর সংযোগস্থলটি অপেক্ষাকৃত সরু এবং এই অংশকে **কার্ডিয়েক প্রান্ত** (*Cardiac End*) বলে। কারণ এই অংশটি ব্যাঙের **হৃদযন্ত্রের** (*Kardia = Heart*) খুবই নিকটে বিদ্যমান। পাকস্থলীর অপর প্রান্তটিকে **পাইলোরিক প্রান্ত** (*Pyloric*
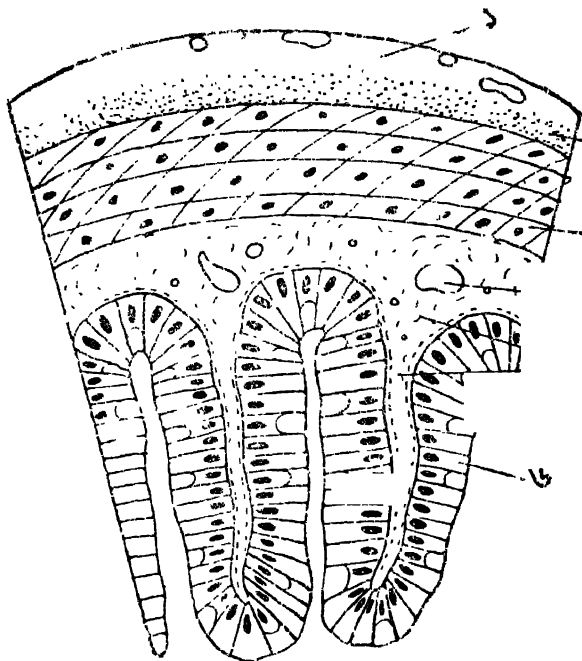
৫৭নং চিত্র

রেখাচিত্রের দ্বারা অন্ত্রের প্রস্থচ্ছেদের কিছু অংশ দেখান হইতেছে।

১, পেরিটোনিয়ম বা মিউকাস পর্দা ; ২, লম্বভাবে অবস্থানকারী পেশী ; ৩, গোলাকার বেষ্টিত পেশী ; ৪, রক্তবাহী নালী ; ৫, সাব-মিউকাসের সংযোগী কলা ; ৬, মিউকাস পর্দার এপিথিয়েল কোষসমূহ।

End) বলা হয়। এই প্রান্তের ভিতরে গোলাকার মাংসল **কপাটিকা** (*Value*) থাকে। সেইজন্য খাদ্য সহজে এই পথে প্রবেশ করিতে পারে না। এই অঞ্চলটি কার্ডিয়েক প্রান্ত অপেক্ষা সরু। পাকস্থলীর ভিতরকার আস্তরে নলাকার পুষ্টিকোষ বিদ্যমান। আস্তরটির আবরণীস্তর

লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ করিয়া থাকায় পাকস্থলীর গহ্বরটি বেশ বড়। পুষ্টি-কোষ হইতে পুষ্টিরস নিঃসৃত হয় এবং ইহার দ্বারা খাদ্যপ্রাণীর কিছু অংশ হজম হয়। পাকস্থলীর পাইলোরিক প্রান্ত হইতে সরু একটি নালী বাহির হইয়া উহার সহিত সমান্তরাল করিয়া উপরের দিকে উঠিয়া যাইতে দেখা যায়। নালীটিকে **ডিওডিনম** (*Duodenum*) বলা হয় এবং ইহা অপেক্ষাকৃত সরু। পৌষ্টিক নালীর ডিওডিনম অঞ্চলটি পাকস্থলীর সহিত স্বচ্ছ, পাতলা পেরিটোনিয়ম পর্দার দ্বারা যুক্ত থাকে। যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিগুলির বাহিকা-গুলি একত্রিত হইয়া একটি বাহিকায় পরিণত হইয়া পৌষ্টিক নালীর ডিওডিনম অঞ্চলে মুক্ত হয়। ইহারা **পুষ্টিগ্রন্থির** (*Digestive Gland*) বাহিকা হওয়ায় বহুবিধ রাসায়নিক উৎসেচক বহন করিয়া আনে এবং তদ্দ্বারা ডিওডিনমের ভিতর খাদ্যের বহুল্যাংশ সরল তরল হয়।

পাকস্থলী ও ডিওডিনম মিলিত হইলে পৌষ্টিক-নালীর এই অঞ্চলটি ইংরেজী অক্ষরের "U"-এর মত দেখায়। ডিওডিনমের পরবর্তী অঞ্চলকে **ইলিয়ম** (*Illeum*) বলা হয়। পৌষ্টিকনালীর এই অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত সরু ও নরম। ইলিয়ম অঞ্চলটি বেশ প্যাঁচানো। ইহার প্রতি অংশ পরস্পরের সহিত স্বচ্ছ ও পাতলা পর্দা বা **মিসেনট্রি** (*Mestntry*) দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ডিওডিনম এবং ইলিয়ম একত্রিত অঞ্চলকে **ক্ষুদ্র অন্ত্র** (*Small Intestine*) বলে। সুতরাং ক্ষুদ্র অন্ত্রের অগ্রভাগকে ডিওডিনম এবং পশ্চাদ্ভাগে ইলিয়ম বলা হয়। ডিওডিনমের মত ইলিয়মের ভিতরকার আস্তরে লম্বালম্বি ভাঁজ দেখা যায়। এইরূপ ভাঁজের জন্য ইলিয়মের গহ্বরে (*Lemen*) অঙ্গুলীর মত মাংসল অভিক্ষেপ দেখা যায়। এই অভিক্ষেপের কোষগুলি হইতে পুষ্টিরস নিঃসৃত হয় এবং অভিক্ষেপের আবরণী কোষের দ্বারা তরল ও সরল খাদ্যরস ব্যাঙের দেহের ভিতর শোষিত হয়। শোষিত খাদ্যরস পরে রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই অভিক্ষেপগুলিকে ইলিয়মের **ভিলাই** (*Villi*) বলা হয়। পৌষ্টিক নালীর ইলিয়ম অঞ্চলই বৃহত্তম অঞ্চল। এই অঞ্চলের পরবর্তী অঞ্চলকে **বৃহৎ অন্ত্র** (*Large Intestine*) বলা হয়। পৌষ্টিক নালীর এই অঞ্চলটি মলাশয় (*Rectum*) এবং **অবসারণী** (*Cloaca*) সমন্বয়ে গঠিত। মলাশয় নালীটি বেশ স্থূল এবং লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি হয়। ইহার পশ্চাদ্ভাগ আরও বেশী স্থূল হইয়া অবসারণী অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। অবসারণী অঞ্চলে **মূত্রনালী** বা **গবিনী** (*Ureter*),

মূত্রাশয় থলি (*Urinary Bladder*) এবং **জননালীগুলি** (*Reproductive Ducts*) পৃথক ভাবে মুক্ত হয়। অবসারণী ব্যাঙের ধড়ের পশ্চাদ্ভাগের শেষ অংশ একটি ছিদ্রের দ্বারা বাহিরে মুক্ত হয়। এই ছিদ্রটিকে **পায়ুছিদ্র** (*Vent or Cloaca*) বলা হয়। অপরিপাক খাদ্যবস্তু বা যাহাকে মল বলা হয়, সেগুলি পায়ুছিদ্র দিয়া পৌষ্টিক-নালীর মলাশয় হইতে বাহিরে বাহির হইয়া যায়।
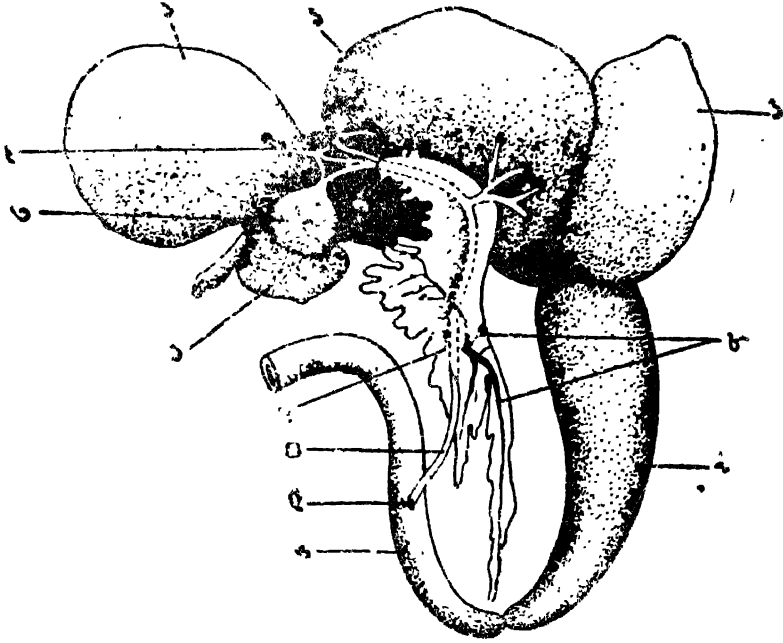
৫৮নং চিত্র

যকৃৎ অগ্ন্যাশয়, পিত্তথলির বিবিধ নালী এবং উহাদের সহিত পৌষ্টিক নালীর ডিওডিনম অঞ্চলের সম্পর্ক দেখান হইতেছে।

১, যকৃৎ-যন্ত্রের বিবিধ অঞ্চল; ২, যকৃৎ নালী; ৩, পিত্তথলি, ৪, সাধারণ পিত্তনালী (Common Bile Duct); ৫, সাধারণ পিত্তনালীব ডিওডিনমের প্রবেশ মুখ; ৬, ডিওডিনম; ৭, অগ্ন্যাশয়; ৮, অগ্ন্যাশয় নালী; ৯, পাকস্থলী।

পুষ্টিগ্রন্থি

(Digestive Glands)

পৌষ্টিক-নালীর বিবিধ অঞ্চলের আভিরে পুষ্টিগ্রন্থির অবস্থিতি সম্বন্ধে আগেই বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দুইটি বৃহৎ গ্রন্থি-দ্বারা পৌষ্টিক-নালীর

ভিতরকার খাদ্য হজম হয়। সেইজন্য ইহাদেরও পুষ্টি-গ্রন্থি বলা হয়। **যকৃৎ** (*Liver*) এবং **অগ্ন্যাশয়** (*Pancreas*) ইহাদের নাম। যকৃৎ ব্যাঙের বিবিধ গ্রন্থির মধ্যে বৃহত্তম। ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের নিম্নে দুই পার্শ্বে বিদ্যমান।

ইহার রঙ গাঢ় লাল। গ্রন্থিটি বেশ পুরু এবং প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; যথা—**ডানদিকের যকৃৎ-খণ্ড** (*Right Liver Lobe*) এবং **বামদিকের**
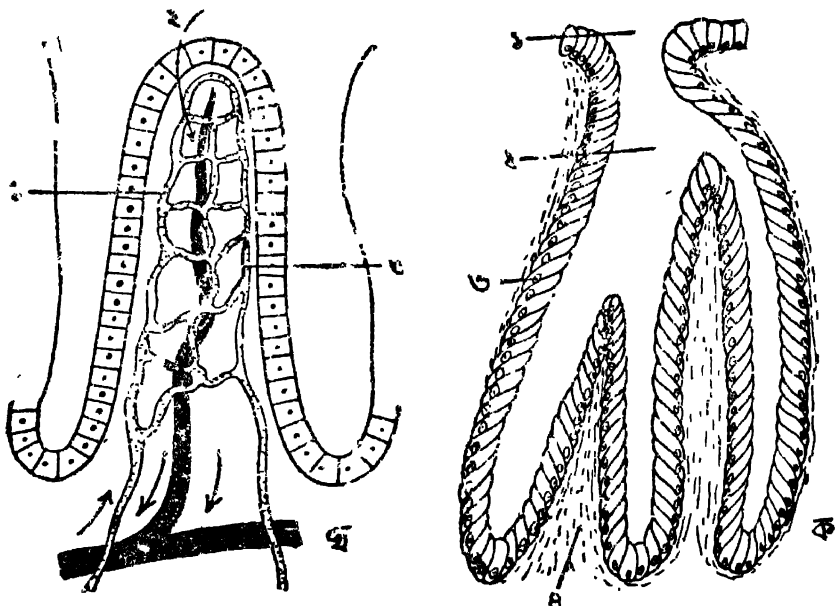
৫৯নং চিত্র

পাকস্থলীর ভিতরকার গ্রন্থি (Gastric Gland) এবং অন্ত্রের একটি ভিলাসের (Villus) প্রস্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে।

ক, পাকস্থলীর ভিতরকার গ্রন্থি: ১, মুখ-ছিদ্র; ২, গ্রন্থি-গহ্বর; ৩, নিউক্লিয়স; ৪, সাব-মিউকোসা (Submocosa)। খ, অন্ত্রের আস্তরণের একটি ভিলাস; ১, এই স্থলে শ্বেতসার ও শর্করা শোষিত হয়; ২, এই স্থলে স্নেহ পদার্থ শোষিত হয়; ৩, এই স্থলে আমিনো অ্যাসিড শোষিত হয়।

কালো রেখাটি লসিকা-নালী। উহা শোষিত পদার্থ বহন করে।

যকৃৎ-খণ্ড (*Left Liver Lobe*)। যকৃৎ-গ্রন্থির বামখণ্ডটিকে আবার অস্পষ্ট-ভাবে দুইভাগে বিভক্ত হইতে দেখা যায়। যকৃৎ-গ্রন্থির ডান ও বাম-খণ্ড দুইটি, একটি সরু ও ক্ষুদ্র **মধ্যবর্তী খণ্ডের** (*median lobe of the liver*) দ্বারা সংযুক্ত থাকে। সমগ্র যকৃৎ-গ্রন্থিটি পাতলা স্বচ্ছ পর্দার দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকিতে দেখা যায়। যকৃৎ হইতে পিত্ত (Bile)

নিঃসৃত হয়। পিত্ত-রস গ্রন্থির ভিতর হইতে বহুসংখ্যক নালীর দ্বারা বড় **যকৃৎ-নালীতে** (*Hepatic duct* ; *heaper* = liver) পরিণত হয়। মধ্যবর্তী যকৃৎখণ্ডের ডানদিকে একটি গোলাকার গাঢ় সবুজ রঙের থলি থাকে। থলিটি আকারে মটরদানার চেয়েও বড় এবং ইহার গাত্রের চামড়া খুবই নরম ও পাতলা হওয়ায় থলিটি থলথলে হয়। এই থলিটিকে **পিত্তথলী** (*Gall Bladder*) বলা হয়। যকৃৎ-নালী দুইটি দুই পার্শ্বের যকৃৎ-খণ্ড হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া এই থলির ভিতরে প্রবেশ করে এবং পিত্ত নিঃসৃত করে। সুতরাং পিত্তথলিকে এককথায় পিত্ত-সঞ্চারী থলিও বলা যাইতে পারে। পিত্তথলি হইতে একটি **পিত্তবাহী নালী** (*Cystic Duct*) বাহির হয় এবং ইহা যকৃৎ নালীগুলির সহিত মিলিত হইয়া একটি **সংযুক্তপিত্তবাহী** নালীতে (*Common Bile Duct*) পরিণত হয়। এখন যকৃৎ-গ্রন্থির ঠিক পিছনে ডিওডিনম এবং পাকস্থলীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি হালকা হলদে রঙের গ্রন্থি থাকে। গ্রন্থিটি প্রধানতঃ লম্বাকৃতি এবং উহার প্রান্ত অসমান হয়। এই গ্রন্থিটিকে **অগ্ন্যাশয়** (*Pancreas*) বলা হয়। উপরোক্ত সংযুক্ত পিত্তবাহী নালীটি অগ্ন্যাশয়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয় এবং অগ্রসর হইবার সময় ইহার সহিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **অগ্ন্যাশয় নালী** (*Pancreatic Duct*) মিলিত হয়। এই নালীগুলি অগ্ন্যাশয় হইতে পুষ্টিরস সংগ্রহ করিয়া আনে। সংযুক্ত পিত্তবাহী নালীটি এইভাবে ধীরে ধীরে অগ্ন্যাশয় অতিক্রম করিয়া পৌষ্টিকনালীর ডিওডিনম অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সংযুক্ত পিত্তবাহী নালীটিকে অগ্ন্যাশয় অতিক্রম করিবার পর উহাকে সংযুক্ত পিত্তবাহী নালীরূপে অভিহিত না করিয়া **যকৃৎ-অগ্ন্যাশয় রসবাহিকা** (*Hepato-pancreatic Duct*) বলা হয়। ডিওডিনমের ভিতর ক্রমাগত উপরোক্ত উপায়ে পুষ্টিরস প্রবেশ করে এবং ইহার দ্বারা ডিওডিনমের ভিতরকার বিবিধ খাদ্য হজম হয়।

পরিপাক-প্রণালী

(Mechanism of Digestion)

ব্যাঙ মাংসাশী প্রাণী। জীবিত পতঙ্গ, কেঁচো ও ছোট ছোট শামুক প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। আগেই বলা হইয়াছে যে, উহারা জিহ্বার দ্বারা সজীব প্রাণীদের আটকাইয়া মুখ-বিবরে প্রবেশ করায় এবং ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া

দেয়। ইহাতে যখন প্রাণীগুলি জ্ঞান হারাইয়া ফেলে, তখন ব্যাঙ উহাদের গিলিয়া ফেলে। চোয়ালে দাঁত না থাকায় কুনো ব্যাঙ মুখবিবরের ভিতরে খাদ্যপ্রাণীকে চিবাইতে পারে না। গ্রাসনালীর ক্রমাগত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে ব্যাঙ সহজে খাদ্যপ্রাণীটিকে গিলিয়া ফেলিতে পারে। ব্যাঙের খাদ্য সাধারণতঃ ছয় প্রকারের হয়; যথা—প্রোটিন, জলঅঙ্গার, স্নেহপদার্থ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও জল। শেষ তিন প্রকারের খাদ্য জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকায় উহাদের পরিপাক করিতে হয়। খাদ্যগুলি সহজেই ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা পাকস্থলী বা অন্ত্রের ভিতরকার আস্তরের কোষের ভিতর সোজাসুজি প্রবেশ করে এবং রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। কিন্তু প্রোটিন, জলঅঙ্গার ও স্নেহপদার্থ খাদ্যগুলি ব্যাঙ মূলতঃ কঠিন ও জটিল রাসায়নিক অবস্থায় গ্রহণ করে। ইহাদের পরিপাক করিতে হইলে খাদ্যগুলিকে সরল ও তরল করিতে হয় এবং তবেই ইহারা অন্ত্রকোষের দ্বারা শোষিত হইতে পারে। বিবিধ পুষ্টিগ্রন্থির রসের ভিতর নানাপ্রকার রাসায়নিক **উৎসেচক** (*Enzyme*) দ্বারাই কঠিন ও জটিল খাদ্যগুলি সরল ও তরলে পরিণত হয়। সকল প্রকার রাসায়নিক উৎসেচকের কয়েকটি নির্দিষ্ট ধর্ম আছে। প্রথমতঃ, প্রতিটি উৎসেচক বিশেষ রাসায়নিক মাধ্যমে কাজ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এক একটি উৎসেচক নির্দিষ্ট খাদ্যকে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হয়। তৃতীয়তঃ, উৎসেচকগুলি বিবিধ খাদ্যের রূপান্তর ঘটাইলে উহাদের প্রকৃতি বা আয়তনের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না বা উৎসেচকগুলি যেমনটি তেমনই থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ কঠিন খাদ্যগুলিতে জল-অণু (*Water molecule*) প্রবেশ করাইয়া উৎসেচকগুলি উহাদের দ্রবীভূত করিয়া তরল ও সরল করে। এই প্রক্রিয়াকে জলমিশ্রণ প্রক্রিয়া (Hydrolysis) বলা হয়। প্রোটিন খাদ্যকে সরল ও তরলকারী উৎসেচককে, **প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক** (*Proteolytic enzyme*) বলে। সেইরূপ জলঅঙ্গার ও স্নেহপদার্থ সরল ও তরলকারী উৎসেচকগুলিকে যথাক্রমে **অ্যামাইলোলাইটিক** ও **লিপোলাইটিক** (*Amylolytic and Lypolytic enzyme*) উৎসেচক বলা হয়।

ব্যাঙের মুখবিবরের ভিতরে বা গ্রাসনালীর অভ্যন্তরে কোন প্রকার পুষ্টিগ্রন্থি না থাকায় পৌষ্টিকনালীর এই দুইটি অঞ্চলে খাদ্য পরিপাক হয় না। গ্রাসনালী খাদ্যপ্রাণীটিকে পাকস্থলীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেয়।

পাকস্থলীর ভিতরকার আস্তরে প্রচুর গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থি হইতে **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** (*Hydrochloric acid*—Hcl.) নিঃসৃত হয়। খাদ্যগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং পাকস্থলীর গ্রন্থি হইতে একপ্রকার উৎসেচক নিঃসৃত হয় এবং ইহা খাদ্য হইতে প্রোটিন অংশকে আংশিকভাবে পরিপাক করে। সুতরাং পাকস্থলীর উৎসেচকটি অ্যাসিড বা অম্ল রাসায়নিক মাধ্যমে কাজ করে। এই উৎসেকটিকে **পেপ্সিন** (*Pepsin*) বলা হয় এবং ইহা কঠিন প্রোটিন খাদ্যকে অম্ল রাসায়নিক মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল **পেপটোন** (*Peptone*) প্রোটিন খাদ্যে রূপান্তরিত করে। ব্যাঙের পাকস্থলীতে বেশ কিছুক্ষণ খাদ্য জমা থাকে। ইহার পর খাদ্য ধীরে ধীরে নরম "দলা-পাকানো" অবস্থায় পাইলোরিক প্রান্তরের ভিতর দিয়া পৌষ্টিকনালীর ডিওডিনমের ভিতর প্রবেশ করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় পুষ্টি-গ্রন্থি হইতে রস, যকৃৎ-অগ্ন্যাশয় বাহিকার দ্বারা বাহিত হইয়া, ডিওডিনমের ভিতর প্রবেশ করে। যকৃৎ-গ্রন্থির পিত্ত ক্ষারজাতীয় হওয়ায় পাকস্থলীর অম্ল সর্বপ্রথমেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহাতে পাকস্থলীর পেপসিন উৎসেচক ডিওডিনমের ভিতর অম্লের অভাবে কাজ করিতে পারে না। পিত্ত খাদ্যের ভিতরকার ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করে এবং ইহা রাসায়নিক সংকেতে ক্ষারীয় হওয়াতে, অগ্নাশয়ের বিবিধ উৎসেচকগুলি ক্ষার-রাসায়নিক মাধ্যমে কাজ করিতে পারে। সুতরাং পিত্ত ছাড়া অগ্ন্যাশয়ের উৎসেচকগুলি কোন কাজ করিতে পারে না। অগ্নাশয় গ্রন্থি হইতে তিন প্রকারের উৎসেচক নিঃসৃত হয় ; যথা—(*i*) **ট্রাইপসিন** (*Trypsin*) : ইহা অবশিষ্ট প্রোটিনজাতীয় খাদ্যকে পেপটোনে পরিবর্তিত করে। (*ii*) **অ্যামাইলপ্সিন** (*Amylopsin*) : ইহা খাদ্যকে জল-অঙ্গার অংশ-গুলিকে শর্করায় পরিণত করে। (*iii*) **স্টিয়েপসিন** (*Steapsin*) : ইহা স্নেহজাতীয় খাদ্য অংশ ধীরে ধীরে তরল ও সরল করিয়া **স্নেহঅম্লে** (*Fatty acid*) এবং **গ্লিসারিনে** (*Glycerine*) রূপান্তরিত করে। ক্ষার সংস্পর্শে স্নেহপদার্থগুলি সাবানের ফেনার সৃষ্টি করে। ইহার দ্বারা সমগ্র খাদ্য অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে পৌষ্টিক নালীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে পারে। যকৃৎ-গ্রন্থি প্রত্যক্ষভাবে পুষ্টি-প্রণালীতে অংশ গ্রহণ না করিলেও পরোক্ষভাবে ইহা অগ্নাশয় উৎসেচকগুলিকে কাজ করিতে দেয়।

ডিওডিনমের ভিতর খাদ্য প্রায় পরিপাক হইয়া যায় এবং ইহার সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যস্রোত ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র অন্ত্রের শেষভাগ বা পশ্চাদ্‌দেশের ইলিয়ম অঞ্চলে প্রবেশ করে। ইলিয়মের ভিতরকার আস্তরকোষ হইতে **এরিপসিন** (*Erepsin*) নামক উৎসেচক নিঃসৃত হয়। ইহা পেপটোন পদার্থগুলিকে আরও সরল ও তরল পদার্থ বা **অ্যামিনো-অ্যাসিডে** (*Amino acid*) পরিণত করে। সেইরূপ শর্করা পদার্থগুলি **গ্লুকোজে** (*Glucose*) পরিণত করে। এইরূপে ইলিয়ম অঞ্চলে খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে সরল ও তরল অবস্থায় পরিণত হয়। ইলিয়মের ভিতরকার আস্তরে লম্বালম্বিভাবে অসংখ্য ভাঁজ আছে। ভাঁজের অংশটি অভিক্ষেপের মত দেখায়। এইরূপ ভাঁজকে **ভিলাই** (*Villi*) বলা হয়। ভিলাইয়ের ভিতর একটি ধমনী প্রবেশ করিয়া জালকাকারে বিস্তারলাভ করে এবং উহা হইতে জালকাকারে ধীরে ধীরে একটি শিরার উৎপত্তি হয়। ভাঁজের কোষগুলি ধীরে ধীরে খাদ্যসার শোষণ করে এবং তাহা রক্তে মিশ্রিত হয়। রক্তের মাধ্যমেই বিবিধ অঙ্গের কোষে এই খাদ্যরস পৌঁছায়। খাদ্যরস কোষে পৌঁছিলে উহা সাইটোপ্লাজমে পরিণত হয়। অতিরিক্ত খাদ্যরস ব্যাঙের বিবিধ অঙ্গে সঞ্চিত হয়। যকৃৎ-গ্রন্থির ভিতরে ও কঙ্কাল পেশীগুলিতে **গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে** (*Glucose converted into Glycogen*) **রূপান্তরিত** হইয়া সঞ্চিত হয়। স্নেহপদার্থগুলি (*Fats*) **চর্বি ফিতায়** (*Fat bodies*) পরিণত হইয়া ব্যাঙের দেহের ভিতর জমা থাকে। অতিরিক্ত অ্যামিনো-অ্যাসিড মূত্রাকারে রেচন-ছিদ্র দিয়া দেহের ভিতর হইতে বাহির হইয়া যায়। অপরিপাক খাদ্যগুলি মলাশয়ে জমা হইয়া থাকে এবং সময় অনুযায়ী বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।

রক্ত-সংবহনতন্ত্র

(Circulatory System)

সংবহনতন্ত্রের দ্বারা প্রাণিদেহে খাদ্যসার, অক্সিজেন ও কোষের রেচন দ্রব্যগুলি উহার এক অংশ হইতে অন্য অংশে প্রবাহিত হয়। একপ্রকার জলীয় সংযোগ-কলার মাধ্যমেই উপরোক্ত পদার্থগুলি সরবরাহ হয়। এই জলীয় সংযোগ কলাকে **রক্ত** (*Blood*) বলে; ব্যাঙের **হৃদ্‌যন্ত্র** (*Heart*) উহার সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা রক্তস্রোতকে দেহের সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া দেয় এবং আবার দেহের সর্বাঙ্গ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনে বা ফিরাইয়া

আনে। যে সকল রক্তবাহী নাসিকার দ্বারা রক্ত হৃদ্‌যন্ত্র হইতে দেহে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদের **ধমনী** (*Arteries*) বলা হয়। এইরূপ ধমনীগুলি হৃদ্‌যন্ত্র হইতে বাহির হইয়া পুনঃ পুনঃ বিভাজনের দ্বারা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীতে পরিণত হয়। এই নালীগুলি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কলার ভিতর আরও সরু সরু নালীতে বিভক্ত হইয়া প্রবেশ করে। এই নালীগুলি অতীব সূক্ষ্ম এবং ইহাদের গাত্রও খুবই পাতলা। ইহারা কলার প্রতিটি কোষের চারিপাশ পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। কলার দিক হইতে সেইরূপ দ্বিতীয় একধরণের সূক্ষ্মনালী বহু সংখ্যায় বাহির হইয়া, পরে একটি নালীতে পরিণত হয় এবং কলা হইতে বাহির হইয়া আসে। কলার এইরূপ অসংখ্য কোষ পরিবেষ্টিত নালীজালকগুলিকে এককথায় **জালক** (*Capillaries*) বলা হয়। কলার দ্বিতীয় ধরণের সূক্ষ্মনালীগুলি বহু সংখ্যায় বাহির হইয়া একটি নালীতে পরিণত হইয়া কলা হইতে বাহির হইয়া আসে। এই একত্রিত নালীকে **শিরা** (*Vein*) বলা হয়। সুতরাং কলায় ধমন জালকের সাহায্যে রক্ত সরবরাহ করে এবং কলার অপর প্রান্ত হইতে জালকের সমন্বয়ে রক্ত সংগৃহীত হইয়া শিরার সৃষ্টি করে। ধমনীর রক্ত প্রত্যক্ষভাবে কলার কোষগুলির প্রয়োজনীয় খাদ্য-রস ও অক্সিজেন সরবরাহ করিতে পারে না। কোষগুলি ধমনীর জালিকার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার
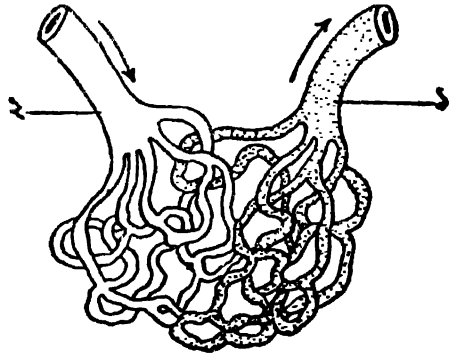
৬০নং চিত্র
ধমনী হইতে জালকের দ্বারা শিরার উৎপত্তি দেখান হইতেছে।
১, শিরা ; ২, ধমনী।

সময় উহাদের পাতলা দেওয়াল বা গাত্র হইতে খাদ্যরস এবং উহাতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ইত্যাদি ব্যাপন-ক্রিয়ার দ্বারা বাহির হইয়া আসে এবং কোষগুলির ফাঁকে ফাঁকে জমা হয়। ধমনীর জালিকার দেওয়াল হইতে নিঃসৃত এই পুষ্টি রসকে **লসিকা** (*Lymph*) বলা হয়। এই লসিকা হইতেই কোষগুলি প্রয়োজনীয় খাদ্যরস ও অক্সিজেন শোষণ করে এবং ইহার পরিবর্তে কোষ

হইতে কার্বন-ডাকসাইড ও নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ জলীয় অবস্থায় নিঃসৃত করিয়া লসিকায় জমা করে। ইহার পর লসিকা হইতে বিশেষ ধরণের অসংখ্য **লসিকা নালীর** (*Lymphatics*) উৎপত্তি হয় এবং ইহারা একত্রিত হইয়া দূষিত লসিকা-রসকে প্রবাহিত করিয়া শিরার সহিত মিশ্রিত করে। সুতরাং লসিকারই প্রয়োজনীয় খাদ্যরস ও অক্সিজেন কোষে কোষে প্রত্যক্ষভাবে সরবরাহ করে। আবার উহার ভিতরেই কোষগুলি যাবতীয় রেচন দ্রব্য, যথা—কার্বন ডায়কসাইড ও নাইট্রোজেনঘটিত দূষিত পদার্থ জমা করে এবং তথা হইতে দূষিত পদার্থগুলি শিরায়, শিরায় প্রবেশ করে। সুতরাং ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, রক্ত-সংবহন-তন্ত্রের ধমনী বা শিরা কেহই প্রত্যক্ষভাবে খাদ্যরস ইত্যাদি সরবরাহ বা রেচনপদার্থ নিষ্কাশন করিতে পারে না। ইহারা সর্বতোভাবে লসিকাতন্ত্রের সহিত যুক্ত। নদীর সেতু যেমন উহার দুই ধার যুক্ত করে, সেইরূপ লসিকাতন্ত্র একদিকে ধমনীকে এবং অন্যদিকে শিরাকে যুক্ত
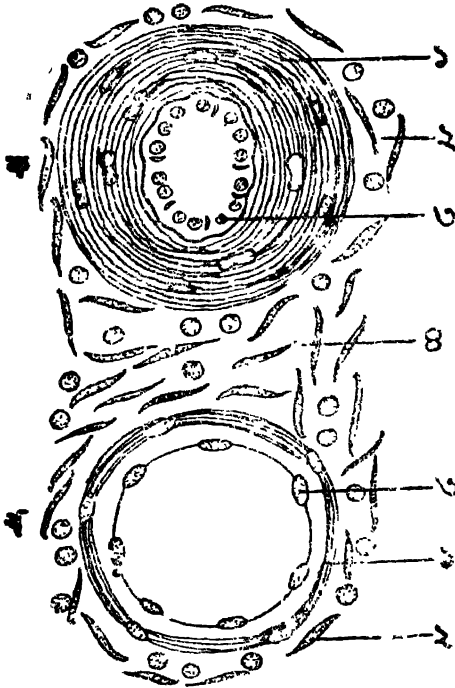
৬১নং চিত্র

ধমনী ও শিরার প্রস্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে। ক, ধমনীর প্রস্থচ্ছেদ ; ১, টিউনিকা মিডিয়ার (Tunica Media) প্রসারণশীল পেশীসমূহ ; ২, টিউনিকা এডভেন্টিসিয়ার (Tunica Adventitia) তন্তু, ৩, টিউনিকা ইন্টারনার (Tunica Intirnar) কোষসমূহ। খ, শিরার প্রস্থচ্ছেদ ; ১, টিউনিকা এ্যাডভেন্টীসিয়ার তন্তু ; ২, টিউনিকা মিডিয়ার পাতলা প্রসারণশীল পেশী ; ৩, টিউনিকা ইন্টারনার কোষ ; ৪, সংযোগী তন্তু।

করে। সুতরাং সংবহনতন্ত্র (*Circulatory system*) **লসিকা-সংবহন প্রণালী** (*Lymphatic system*) এবং **রক্ত-সংবহন প্রণালী** একত্রিত

হইয়া গঠিত। হৃদ্‌যন্ত্র হইতে ধমনীগুলি বাহির হইয়া দেহের সর্বাঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে এবং দেহের সর্বাঙ্গ হইতে শিরার দ্বারা রক্ত পুনরায় হৃদ্‌যন্ত্রে ফিরিয়া আসে। ইহাকেই **সংবহনতন্ত্র** (*Circulatory system*) বলে। লসিকানালীগুলি কোষান্তর-রন্ধ্র হইতে লসিকারস সংগ্রহ করিয়া লসিকা-তন্ত্রের সৃষ্টি করে এবং **কোষান্তর রন্ধ্রগুলিকে** (*Inter-cellular space*) ধমনী-জালিকা হইতে নিঃসৃত খাদ্যরসে পূর্ণ করিতে সহায়তা করে। কার্যকারিতা ব্যতীত ধমনী ও শিরার গঠন-প্রণালীতে প্রচুর প্রভেদ থাকে। ধমনীর দেওয়াল বা গাত্রটি তিনটি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। ইহার বাহিরের স্তরটি **আবরণী তন্তুকলার** (*Fibrous tissue*) দ্বারা গঠিত। ইহাকে **টিউনিকা এ্যাডভেন্টিসিয়া** (*Tunica adventitia*) বলা হয়। ধমনীর দেওয়ালে মধ্যম স্তরটি স্থূল অনৈচ্ছিক পেশী দ্বারা গঠিত। এই পেশীগুলি ধমনীকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। ইহাকে **টিউনিকা মিডিয়া** (*Tunica Media*) বলা হয়। ধমনীর দেওয়ালের তৃতীয় বা শেষ স্তরটি সঙ্কোচন-প্রসারণশীল রজ্জুকলার (*Elastic fibres*) দ্বারা গঠিত এবং ইহাকে **টিউনিকা ইন্‌টারনা** (*Tunica Interna*) বলা হয়। ধমনীর দেওয়ালে উপযুক্ত তিনটি স্তরের মধ্যে তৃতীয় স্তরটি বা টিউনিকা ইন্‌টারনা সঙ্কোচন-প্রসারণশীল হাওয়ায় উহা সহজে ছিঁড়িতে পারে না। কিন্তু শিরার দেওয়ালে উপরোক্ত তিন প্রকারের স্তর থাকিলেও উহার টিউনিকা ইন্‌টারনাতে সঙ্কোচন-প্রসারণশীল রজ্জুকলা থাকে না। উপরন্তু দ্বিতীয় স্তটিতে পেশীকলা থাকিলেও উহা খুবই পাতলা। ফলে শিরা সহজেই ছিঁড়িয়া যায় বা চাপে ফাটিয়া যায়। ধমনীর গহ্বরের (*Lumen*) ব্যাস শিরায় গহ্বরের ব্যাসের চেয়েও কম। আবার প্রধান প্রধান শিরার ভিতরেও একমুখী কপাটিকা থাকে কিন্তু কপাটিকার অস্তিত্ব ধমনীর ভিতর থাকে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রক্ত একপ্রকার জলীয় সংযোগ-কলা। ইহার রঙ লাল। রক্তের মধ্যে রক্তকণিকা এবং রক্তরস বিদ্যমান। রক্তকণিকা-গুলি রক্তরসের ভিতর নিমগ্ন থাকে। রক্ত হইতে রক্তকণিকাগুলি বাদ দিলে **রক্তরসের** (*Plasma*) রঙ যে খড়ের মত হালকা পীতবর্ণ, তাহা জানা যায়। রক্তরসের ভিতর খাদ্যসার, রেচন পদার্থ, **উদ্বোধক** (*Hormones*) এবং অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাস দ্রবীভূত হইয়া থাকে। রক্তের রক্তরসই প্রধান সরবরাহের বাহন। নানাবিধ **রক্ত-কণিকার**

(*Blood Corpuscles*) মধ্যে প্রধানতঃ তিন প্রকার কণিকাই প্রধান; যথা—

(*i*) **লোহিত রক্ত-কণিকা বা এরিথ্রোসাইটস্** (*Red-blood Corpuscles or Erythrocytes*)**:** এইরূপ কণিকাগুলি আকারে প্রায় গোলাকার এবং ইহার দুইদিকই **উত্তল** (*Convex*)। প্রতিটি কণিকা এক একটি কোষ বিশেষ। প্রতিটি কণিকায় একটি করিয়া সুস্পষ্ট নিউক্লিয়স দেখা যায়। প্রতিটি লোহিত রক্ত-কণিকার ব্যাস প্রায় ১৫ হইতে ১৬ মাইক্রা (এক মাইক্রা = এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের একভাগ)।

লোহিত রক্ত-কণিকার নিউক্লিয়সে লৌহঘটিত প্রোটিন পদার্থ বিদ্যমান। ইহাকে **হোমোগ্লোবিন** (*Hoemoglobin*) বলা হয়। নিউক্লিয়সের হোমোগ্লোবিন অক্সিজেন কণাগুলিকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে এবং অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া **অক্সিহোমোগ্লোবিনে** (*Oxy-hoemoglobin*) পরিণত হয়। অক্সিহোমোগ্লোবিনের রঙ লাল হওয়ায় রক্ত-কণিকাগুলিকে লাল দেখায়। এইজন্যই ব্যাঙের রক্ত লাল। রক্তে লোহিত রক্ত-কণিকা প্রচুর পরিমাণে থাকে। কাচের স্লাইডে এক কিউবিক মিলিমিটার আয়তনের উপর ব্যাঙের রক্তস্তরে প্রায় চার হইতে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত লোহিত রক্ত-কণিকা দেখা যায়। লোহিত রক্ত-কণিকার নিউক্লিয়সের মধ্যে হোমোগ্লোবিন থাকায় রক্ত অক্সিজেন শোষণ করিতে পারে এবং দেহের সর্বাঙ্গে রক্তের মাধ্যমে তাহা সরবরাহ করে। হোমোগ্লোবিন যখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিতে পারে না, তখন ইহার রঙ কালচে হয়। লোহিত রক্ত-কণিকা হাড়ের মজ্জার ভিতর হইতে সৃষ্টি হয়।

(*ii*) লোহিত রক্ত-কণিকার তুলনায় **শ্বেত রক্ত-কণিকা** (*White-blood Corpuscles or Leucocytes*) সংখ্যায় অনেক কম। কাচের স্লাইডে এক কিউবিক মিলিমিটার আয়তনের উপর ব্যাঙের রক্তস্তরে প্রায় চার হইতে পাঁচ হাজারের মত শ্বেত রক্ত-কণিকা দেখা যায়। ইহাদের আকার ক্ষুদ্র এবং প্রতি কণিকায় নিউক্লিয়স আছে। নিউক্লিয়সে হেমোগ্লোবিন না থাকায় ইহারা বর্ণহীন। শ্বেত রক্ত কণিকার কোন আকৃতি বা আকার নাই। ইহারা অ্যামিবার মত সর্বদাই আকার পরিবর্তন করে। অ্যামিবার মত **ক্ষণপদ** (*Pseudopodia*) সৃষ্টি করিয়া ইহা প্রয়োজন মত চলাফেরা করিতে পারে। এমন কি দরকার হইলে ইহারা রক্তবাহী নালীর

পাতলা জালিকার মধ্য দিয়াও যাতায়াত করিতে পারে। শ্বেত রক্ত-কণিকা দেহের ভিতরকার কোষেও ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে। বহিরাগত জীবাণু রক্তে প্রবেশ করিলেই শ্বেত রক্ত-কণিকাগুলি উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নিজ নিজ ক্ষণপদের সাহায্যে ধ্বংস করে এবং প্রাণিদেহকে জীবাণুমুক্ত করে। সুতরাং শ্বেত রক্ত-কণিকা প্রাণিদেহকে বিবিধ শত্রু, যথা—ব্যাক্‌টিরিয়া ও জীবাণু হইতে রক্ষা করে এবং সেইজন্য ইহাকে দেহের প্রহরী বলা হয়। ইহা ব্যতীত অন্ত্র অঞ্চলের ভিতরকার আস্তর হইতে স্নেহবিন্দু সংগ্রহ করিয়া উহা পুনরায় রক্তবাহী নালীর ভিতর জমা করাও শ্বেত রক্ত-কণিকার দ্বিতীয় কাজ। সুতরাং খাদ্য-সরবরাহেও ইহার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
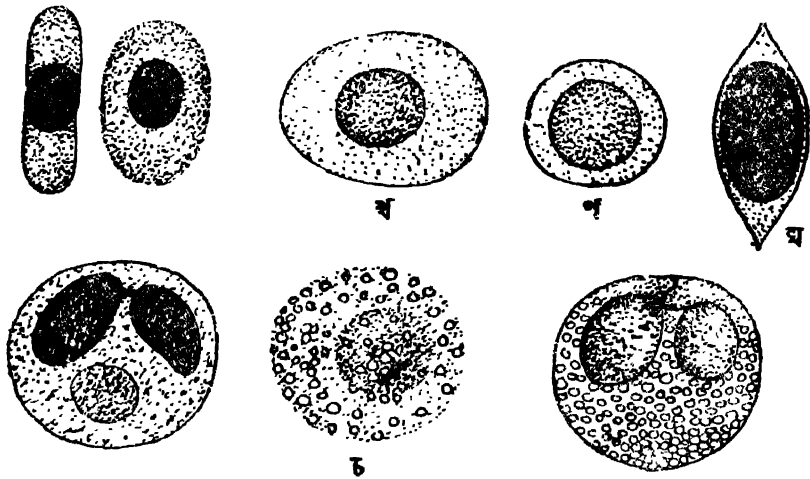
৬২নং চিত্র

বিবিধ রক্ত-কণিকা দেখানো হইতেছে।

ক, লোহিত রক্ত-কণিকা (Erythrocyte) ; খ, মনোসাইট ; গ, লিম্ফোসাইট (Limphocyte), ঘ, থ্রম্বোসাইট্ (Thrombocyte) ; ঙ, নিউরোসাইট বা নিউরোফিল ; চ, বেসোফিল ; ছ, ইওসিনোফিল (Eosinophil)।

(*iii*) **থ্রম্বোসাইট্‌স (Thrombocytes or Blood platelet) :** ইহা সরু, সূচালো, নিউক্লিয়সবিশিষ্ট একপ্রকার রক্ত-কণিকা। কোন স্থান কাটিয়া গেলে রক্ত বাহির হয়। তখন এইরূপ রক্তকোষগুলি দ্রবীভূত হইয়া একপ্রকার উৎসেচক সৃষ্টি করে। উৎসেচক রক্তের ফাইব্রিনো-

জেন (*Fibrinogen*) পদার্থকে কঠিন সুতার মত **ফাইব্রিনে** (*Fibrin*) পরিণত করে। ফাইব্রিন রক্ত-কণিকাগুলিকে জড় করিয়া দেয় এবং ইহার ফলে কাটা-স্থানে উহা জমিয়া যায় এবং কাটা মুখটিকে বন্ধ করিয়া দেয়। রক্তের জমাট-বাঁধা প্রক্রিয়াকে **রক্ত-তঞ্চন** (*Clotting*) বলা হয়।

রক্তকণিকাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে উহা **প্লীহায়** (*Spleen*) জমা হয়। ইহা ব্যতীত প্লীহার রক্তকণিকা ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে এবং শ্বেত রক্ত-কণিকাগুলি প্লীহার ভিতরে বিভাজনের দ্বারা বৃদ্ধিলাভ করে। লসিকা-গ্রন্থির মধ্যে একপ্রকার ছোট ছোট শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। ইহাদের **লিমফোসাইট্‌স** (*Lymphocytes*) বলা হয়। লিমফোসাইট্‌স রক্ত-কণিকার কোষের সাইটোপ্লাজম দানাপূর্ণ নহে। দেহের সকল শ্বেত রক্ত-কণিকার মধ্যে লিমফোসাইট্‌স্ কণিকা চার ভাগের একভাগ থাকে। **দানাপূর্ণ** (*granula*) সাইটোপ্লাজমবিশিষ্ট শ্বেত রক্ত-কণাগুলিকে আবার **গ্রানুলো-সাইট্‌স** (*granulocytes*) বলা হয়। যে সমস্ত গ্রানুলোসাইট্‌স অ্যাসিডের মাধ্যমে রঙ ধারণ করে, তাহাদের **অ্যাসিডোফিল** (*Acidophil*) বলা হয়। আবার যে সমস্ত গ্রানুলোসাইট্‌স ইওসিন রঙের দ্বারা রঙিন হয়, তাহাদের **ইওসিনোফিল** (*Eosinophil*) বলা হয়। সেইরূপ বিবিধপ্রকার রঙ ধারণের ক্ষমতা অনুযায়ী আবার গ্রানুলোসাইট্‌স্‌কে **বেসোফিল** (*Basophil*), **নিউরোফিল** (*Neurophil*) ইত্যাদি নামও দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রাণিদেহে রক্তের প্রকৃত কার্যকারিতা কি, তাহার গবেষণা এখনও শেষ হয় নাই। ভ্রূণ হইতে প্রাণিদেহের বৃদ্ধির সময় ইহা ভ্রূণের **মধ্যত্বক্‌** (*Meso-derment layer*) হইতে উৎপত্তিলাভ করে। প্রাণিদেহের প্রতিটি কলা ও কোষের সজীবতা ও তাহার বিকাশ রক্তের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। রক্ত দেহের প্রতিটি কোষের **জলের সমতা** (*equilibration of water content*) রক্ষা করে। কোন-কোষের সাইটোপ্লাজমে উহার সজীবতার জন্য কত পরিমাণ জল দরকার, তাহার সরবরাহ রক্তই করিয়া থাকে। লোহিত রক্ত-কণিকার নিউক্লিয়সের ভিতর হেমোগ্লোবিন থাকায় উহা অক্সিজেন শোষণ করিয়া লয় এবং প্রতি কোষে কলা বা খাদ্য দহনের জন্য সরবরাহ করে। এই দহন-ক্রিয়ায় কলা বা খাদ্যের ভিতরকার স্থিরশক্তি গতি শক্তিরূপে বাহির হইয়া আসে এবং এই গতিশক্তি দ্বারাই প্রাণী উহার যাবতীয় জৈবনিক কার্য সম্পন্ন করে। পৌষ্টিক নালীর অন্ত্র অঞ্চলের

ভিতরকার দেওয়ালে ভিলাইগুলির সাহায্যে খাদ্যসার রক্তের ভিতর প্রবেশ করে। রক্ত এই খাদ্যসার রক্তরসের সহিত বহন করিয়া প্রতিটি কোষে সরবরাহ করে। সেইরূপ রক্তকোষ বা কলা হইতে শিরার দ্বারা ফিরিবার সময় কোষ বা কলার কার্বন-ডায়কসাইড ও রেচন পদার্থগুলি বহন করিয়া আনে এবং বিবিধ তন্ত্রের দ্বারা বাহিরে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্বেত রক্ত-কণিকা ব্যাক্‌টিরিয়া প্রভৃতি জীবাণু দেহে প্রবেশ করিয়া রক্তে বা লসিকায় প্রবেশ করিলে উহাদের আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। ফলে প্রাণীদের রোগমুক্তি হয়। রক্তরসের মাধ্যমে উদ্বোধক ও ভিটামিন প্রভৃতি বৃদ্ধিকারক রাসায়নিক পদার্থ দেহের কোষকে শক্তিশালী ও সতেজ রাখে।

হৃদ্‌যন্ত্র
(Heart)

হৃদ্‌যন্ত্রটি ব্যাঙের অঙ্কীয় বক্ষদেশের মধ্যস্থলে বিদ্যমান। ইহার সঙ্কোচন ও প্রসারণের জন্যই রক্ত ব্যাঙের সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হয়। হৃদ্‌-যন্ত্রটি যকৃৎ খণ্ড দুইটির ঠিক উপরে এবং দুইটি ফুসফুসের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার আকার কিছুটা নাসপাতির মত। হৃদ্‌যন্ত্রটি ফাঁপা এবং ইহার দেওয়াল বা গাত্র মাংসল। ইহা একটি পাতলা থলির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। থলিটিকে **পেরিকার্ডিয়াম** (*Pericardium*) বলা হয়। পেরিকা-র্ডিয়াম আবার দুই সূক্ষ্ম পর্দার সমন্বয়ে গঠিত। উহার বাহিরের পর্দাটিকে **প্যারাইটেল** (*Parietel*) এবং ভিতরের পর্দাটিকে **ভিসারাল** (*Visceral*) স্তর বলা হয়। পেরিকার্ডিয়ামের এই দুইটি স্তরের মধ্যে দুইটি লসিকা রস থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রের অঙ্কীয় দেশের ঠিক উপরে **জাইফিস্টারনাম** (*Xiphisternum*) বিদ্যমান। ইহা হৃদ্‌যন্ত্রটিকে রক্ষা করে। হৃদ্‌যন্ত্রের চওড়া দিকটি ব্যাঙের মুখের দিকে এবং উহার কোণাকৃতি দিকটি ব্যাঙের পেটের দিকে বা পশ্চাদ্ভাগের দিকে অবস্থিত। হৃদ্‌যন্ত্রের চওড়ার দিকে দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। একটি ডান দিকে থাকে, তাহাকে **ডান অলিন্দ** (*Right auricle*) বলে এবং দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটি বামদিকে বিদ্যমান, ইহাকে **বাম অলিন্দ** (*Left auricle*) বলা হয়। অলিন্দের দেওয়ালগুলি পাতলা পেশীর দ্বারা গঠিত। হৃদ্‌যন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগের কোণাকৃতি অংশে তৃতীয় প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। এই প্রকোষ্ঠের দেওয়াল বেশ পুরু ও মাংসল। কিন্তু ইহার গহ্বরটি অপেক্ষাকৃত

ক্ষুদ্র। এই তৃতীয় প্রকোষ্ঠটিকে **নিলয়** (*Ventricle*) বলে। হৃদ্‌যন্ত্রের অঙ্কীয়দেশে উহার নিলয়ের ডান দিক হইতে একটা মোটা নালী বাহির হইতে দেখা যায়। এই নালীটিকে **কোনাস আর্টারিওসাস** (*Conus arteriosous*) বলা হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের পৃষ্ঠদেশে একটি পাতলা দেওয়াল-বিশিষ্ট ত্রিকোণাকৃতি থলি থাকে। ইহাকে **সাইনাস ভেনোসাস** (*Sinus*
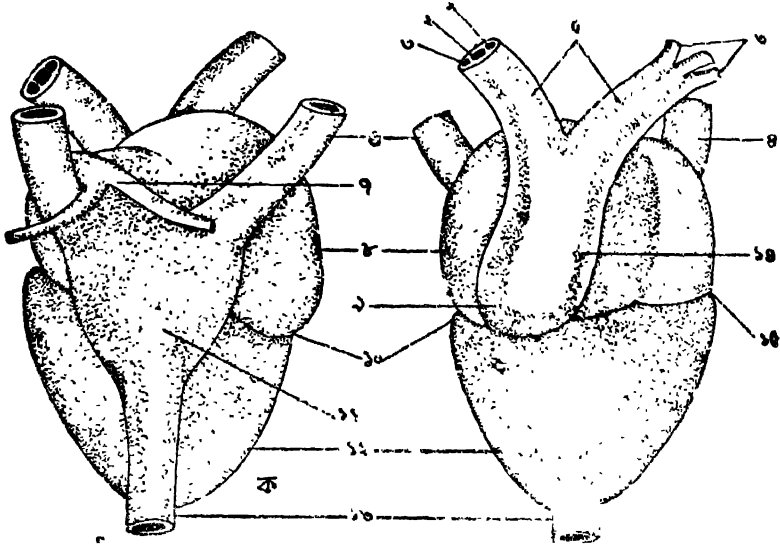
৬৩নং চিত্র
ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্রের বহিরাকৃতি দেখান হইতেছে।

ক, হৃদ্‌যন্ত্রের পৃষ্ঠদেশ ; খ, হৃদ্‌যন্ত্রের অঙ্কীয় দেশ।

১, ক্যারোটিড খিলান ধমনী ; ২, সিস্টেমিক খিলান ধমনী ; ৩, ফুসফুসীয়-চার্ম-খিলান ধমনী ; ৪, সম্মুখস্থ মহাশিরা ; ৫, বাম ও ডান দিকের প্রধান ধমনী ; ৬, তিনটি খিলান ধমনীর উৎপত্তি ; ৭, ফুসফুসীয় শিরা ; ৮, ডান দিকের অলিন্দ ; ৯, কোনাস আর্টারিওসাস ; ১০, করোনারি সালকস্ ; ১১, সাইনাস ভেনোসাস ; ১২, নিলয় ; ১৩, পশ্চাতের মহাশিরা ; ১৪, ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস ; ১৫, অলিন্দ-নিলয় খাঁজ।

venosus) বলে। সাইনাস ভেনোসাসের তলদেশে একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের দ্বারা উহা হৃদ্‌যন্ত্রের ডান অলিন্দের সহিত যুক্ত। এই ছিদ্রকে **সাইনু-অরিকিউলার ছিদ্র** (*Sinu-auricular aperture*) বলা হয়। সাইনু-অরিকিউলার ছিদ্রটি আড়াআড়িভাবে বিদ্যমান এবং ইহার মুখে একমুখী **কপাটিকা** (*Valve*) আটকানো থাকে। রক্ত সেইজন্য সাইনাস ভেনোসাস হইতে ডান অলিন্দে ধাবিত হয়, কিন্তু ডান অলিন্দ হইতে

পুনরায় সাইনাস ভেনোসাসে ধাবিত হইতে পারে না। ত্রিভুজাকৃতি সাইনাস ভেনোসাসের তিনকোণে তিনটি **মহাশিরা** (*Caval veins*) প্রবেশ করিয়াছে। এই মহাশিরাগুলি ব্যাঙের সর্বাঙ্গ হইতে কার্বন-ডায়কসাইড মিশ্রিত দূষিত রক্ত বহন করিয়া আনে এবং সাইনাস ভেনোসাস জমা করে। সাইনাস ভেনোসাস হইতে উহা সাইনু-অরিকিউলার ছিদ্রপথে ডান অলিন্দে প্রবেশ করে ও তথায় জমা হয়। সাইনু-অরিকিউলার ছিদ্র-মুখের কপাটিকাগুলিকে **সাইনু-অরিকিউলার কপাটিকা** (*Sinu-auricular valve*) বলা হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের ডান অলিন্দ ও বাম অলিন্দের মাঝে একটি পুরু, শক্ত প্রাচীর থাকে এবং উহা উপরোক্ত দুইটি অলিন্দকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে। এই পর্দাটিকে **ইণ্টার অরিকিউলার প্রাচীর** (*Inter auricular septum*) বলা হয়। এই ইণ্টার-অরিকিউলার প্রাচীরের ঠিক ডানদিকে ডান অলিন্দের মধ্যে সাইনু-অরিকিউলার ছিদ্রটি বিদ্যমান। বাম অলিন্দের চেয়ে ডান অলিন্দ অনেক বড। ডান অলিন্দের দেওয়ালও অপেক্ষাকৃত পুরু। বাম অলিন্দের বামদিকে একটি মাত্র ছিদ্র দিয়া একটি ফুসফুসীয় শিরা ফুসফুস হইতে পরিশুদ্ধ রক্ত বা অক্সিজেনপূর্ণ রক্ত বহন করিয়া জমা করে। বাম অলিন্দের এই ছিদ্রটি কপাটিকাবিহীন এবং উহাকে সাধারণ **ফুসফুসীয় শিরা-ছিদ্র** (*Aperture of the common pulmonary vein*) বলা হয়। ছিদ্রটি বক্রভাবে থাকায় বাম অলিন্দ সঙ্কুচিত হইলে উহা বন্ধ হইয়া যায় এবং রক্ত বাম অলিন্দ হইতে পুনরায় **ফুসফুসীয় শিরায়** (*Pulmonary vein*) ফিরিয়া যাইতে পারে না। ডান অলিন্দ ও বাম অলিন্দ উভয়ই একটি ছিদ্রের মাধ্যমে নিলয়ের সহিত যুক্ত হয়। এই ছিদ্রটি বেশ বড় এবং ইহাও আড়াআড়িভাবে বিদ্যমান। ছিদ্রটিকে **অরিকিউলো-ভেণ্ট্রিকিউলার ছিদ্র** (*Auriculo-Ventricular Aperture*) বলা হয়। অরিকিউলো-ভেণ্ট্রিকিউলার ছিদ্রটির মুখে নিলয়ের দিকে চারিটি কপাটিকা থাকে। কপাটিকাগুলি ঝোলানো পর্দার মত। চারিটি কপাটিকার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কপাটিকা আকারে বড় এবং প্রথম ও চতুর্থ কপাটিকা আকারে ছোট। কপাটিকাগুলি ছিদ্রের মুখে একধার দিয়া আটকানো থাকে এবং অন্য ধারটি নিলয়ের ভিতর ঝুলিতে থাকে। নিলয়ের ভিতরকার দেওয়ালের সহিত এই কপাটিকাগুলি সূক্ষ্ম সূতার দ্বারা যুক্ত থাকে। **এই সূতাগুলিকে কডি টেণ্ডিনি** (*Chordae Tendinae*) বলে। কপাটিকাগুলিকে এইভাবে আবদ্ধ রাখার ফলে নিলয়ের সঙ্কোচনের সময়ে উহারা অরিকিউলো-ভেণ্ট্রিকিউলার

ছিদ্রটিকে বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হয়। সুতরাং নিলয়ের রক্ত পুনরায় অলিন্দে ফিরিয়া যাইতে পারে না।
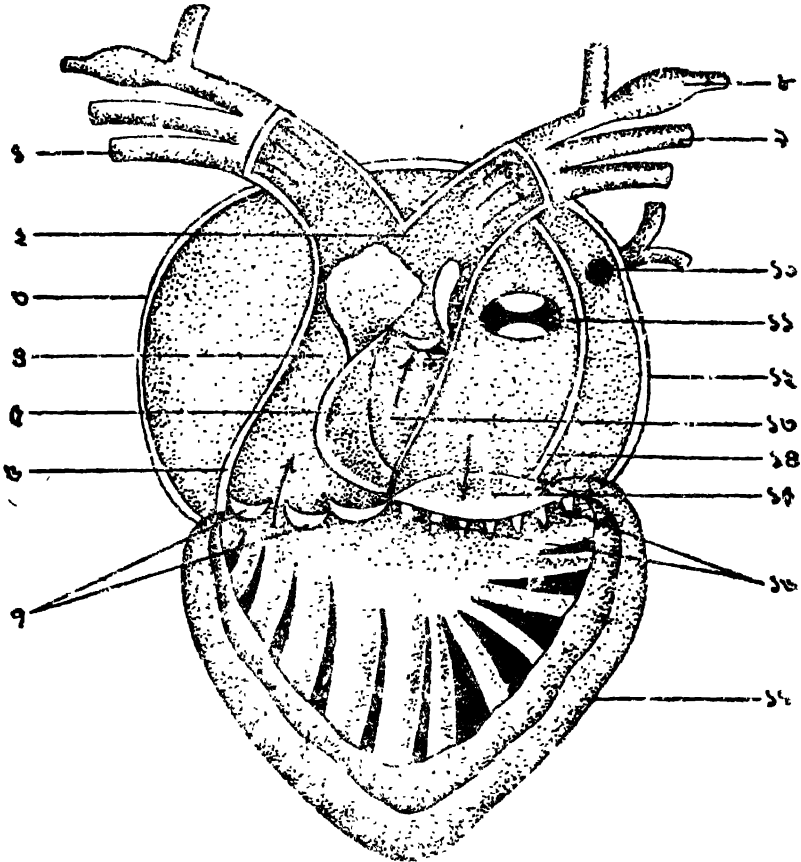
৬৪নং চিত্র

ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্রের লম্বচ্ছেদে রক্ত চলাচল হইতেছে।

১, ফুসফুসীয় চার্ম-খিলান ধমনী : ২, ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস : ৩, ডান অলিন্দ : ৪, ক্যাভাম অ্যাওর্টিকাম ; ৫, পাকানো কপাটিকা ; ৬, কোনাস আর্টারিওসাস ; ৭, অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি কপাটিকা ; ৮, ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থ ; ৯, সিস্টেমিক মহাধমনী ; ১০, ফুসফুসীয় শিরার প্রবেশ পথ ; ১১, সাইনু-অরিকিউলার ছিদ্র : ১২, বাম-অলিন্দ ; ১৩, ক্যাভাম পালমোকিউটেনিয়ম ; ১৪, ইন্টার-অরিকিউলার প্রাচীর ; ১৫, অরিকিউলো ভেন্টিকিউলোর কপাটিকা ; ১৬, কডি টেণ্ডিনি ; ১৭, নিলয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নিলয় অলিন্দের নিম্নে বিদ্যমান। ইহা একটি সরু হইয়া হৃদ্‌যন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগে একটি কোণের সৃষ্টি করিয়াছে। নিলয়ের

দেওয়াল খুব পুরু হওয়ায় উহার ভিতরকার গহ্বর ক্ষুদ্র। কেবল ইহাই নহে, নিলয়ের ভিতরে উঁচু-উঁচু-ভাবে পেশী নানা দিকে ধাবিত হইয়া নিলয়ের দিকে প্রচুর পেশীবহুল খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহার গহ্বরটিকে প্রায় মৌমাছির চাকে পরিণত করিয়াছে। খাঁজগুলিকে **ট্রাবেকিউলি** (*Trabeculae*) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রভূত পেশীরজ্জুর সমাবেশের ফলে নিলয়টি স্পঞ্জের মত হইয়া যায় এবং এইরূপ অবস্থার জন্যই নিলয়ের ভিতরে শুদ্ধ (অক্সিজেন মিশ্রিত) ও দূষিত (কার্বন-ডায়কসাইড মিশ্রিত) রক্তের মিশ্রণ হয় না। ডান অলিন্দ দূষিত রক্ত, নিলয়ের ডানদিকের গহ্বরে জমা করে এবং বাম অলিন্দ শুদ্ধ রক্ত, নিলয়ের বামদিকের গহ্বরে জমা করে। সুতরাং নিলয়ের ডান দিকে **দূষিত রক্ত** (*Impure Blood*) ও বামদিকে **শুদ্ধ রক্ত** (*Pure Blood*) জমা হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, নিলয়ের মধ্যবর্তী স্থানের রক্তকে **মিশ্র রক্ত** (*Mixed Blood*) বলা হয়।

নিলয়ের ডানদিক হইতে একটি স্থূল নালী বাহির হইয়া বক্রভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের বামদিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের অঙ্কীয় দেশে বিদ্যমান। এই নালীটিকে **কোনাস আর্টারিওসাস** (*Conus Arteriosus*) বলা হয়। ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের অংশ। এই নালীটি অগ্রসর হইবার পরে আরও একটি নালীর সহিত যুক্ত হইয়া হৃদ্‌যন্ত্রটিকে অতিক্রম করে। এই দ্বিতীয় নালীটিকে **ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস** (*Truncus Arteriosus*) বলে। ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাসই ধমনীর মূল এবং প্রধান প্রধান ধমনীগুলি এই ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাসের বিভাজনের দ্বারাই সৃষ্ট হয়; ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস নালীটি হৃদ্‌যন্ত্রের অংশ নহে। কারণ হৃদ্‌যন্ত্র যে কলার দ্বারা নির্মিত হয়, ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস নালীটি সেই জাতীয় কলার দ্বারা নির্মিত হয় না। সুতরাং ইহা ধমনী প্রণালীর (*Arterial System*) একটি অংশ। কোনাস আর্টারিওসাস ও ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস এই দুইটি নালী পরস্পর সংযুক্ত হওয়ায় বাহির হইতে কিছু বুঝা যায় না। সেইজন্য এই দুইটি নালীকে প্রাণিতত্ত্ববিদেরা বহু নামে অভিহিত করিয়াছেন। অবশেষে **অলিভার** (*Oliver—1909*) সমগ্র সংযুক্ত নালীটিকে ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস নামে অভিহিত করেন এবং ইহার প্রথম অংশটিকে **পাইল্যানজিয়ম** (*Pylangium*) ও দ্বিতীয় অংশটুকু **সাইন্যানজিয়ম** (*Synangium*) নামে অভিহিত করেন। কিন্তু **গুডরিচ**

(*Goodrich*) উপরোক্ত নালী দুইটি উৎপত্তি অনুসারে প্রথমটিকে কোনাস আর্টারিওসাস এবং দ্বিতীয়টিকে ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস নামে অভিহিত করেন। কোনাস আর্টরিওসাসের দুই মুখে তিনটি করিয়া (ডাঃ শর্মার মতে চারিটি করিয়া—1957) অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে। নিলয় ও কোনাসের সংযোগস্থলে তিনটি একমুখী অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকায় রক্ত নিলয় হইতে কোনাসের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া যাইতে পারে না। সেইরূপ কোনাস ও ট্রাঙ্কাসের সংযোগস্থলে

ক

খ

৬৫নং চিত্র
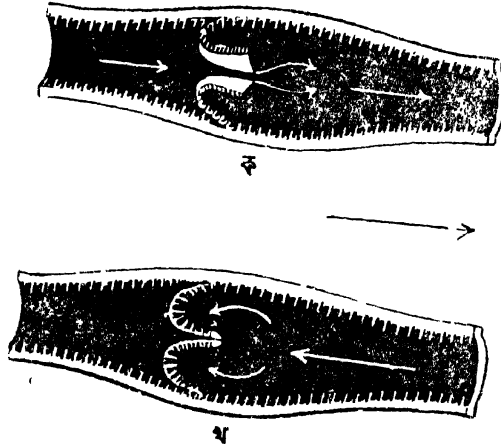
কপাটিকার কার্যকারিতা দেখান হইতেছে।

ক, একমুখী কপাটিকার ভিতর দিয়া রক্ত-চলাচল; খ, বিপরীতমুখী রক্তচলাচল পথে কপাটিকা বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

আরও তিনটি একমুখী অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে। ইহারা কোনাস হইতে রক্তস্রোতকে ট্রাঙ্কাসের ভিতর প্রবেশ করিতে দেয়। কিন্তু রক্ত পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। আবার কোনাস আর্টারিওসাসের মধ্যে একটি বেশ বড় পাকানো **কপাটিকা** (*spiral valve*) লম্বালম্বিভাবে থাকে। ইহার দ্বারা কোনাস আর্টারিওসাস নালীটি লম্বালম্বিভাবে মধ্যস্থল হইতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পাশাপাশি দুইটি নালীতে পরিণত হয়। কোনাস আর্টারিওয়াসের ভিতরকার ডানদিকের নালীটিকে **ক্যাভাম**

অ্যাওর্টিকাম (*Cavum aorticum*) এবং বামদিকের নালীটিকে **ক্যাভাম পালমোকিউটেনিয়ম** (*Cavum Pulmocutaneum*) বলা হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নিলয়ের ডানদিকে অশুদ্ধ রক্ত, মধ্যস্থলে মিশ্রিত রক্ত এবং উহার বামদিকে শুদ্ধ রক্ত থাকে। নিলয়ের সঙ্কোচনের ফলে প্রথমে বামদিকের রক্ত ক্যাভাম পালমোকিউটেনিয়মের পথে অগ্রসর হয় এবং ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস তৃতীয় খিলান অর্থাৎ **ফুসফুসীয় চার্ম-খিলান ধমনীর** (*Pulmocutaneous arch*) ভিতর দিয়া ব্যাঙের ফুসফুসে ও চামড়ায় রক্ত সরবরাহ করে। নিলয়ের পরবর্তী সঙ্কোচনে মিশ্রিত রক্ত ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাসের দ্বিতীয় খিলান ধমনী অর্থাৎ **সিস্টেমিক খিলান ধমনীর** (*Systemic arch*) ভিতর দিয়া ব্যাঙের দেহে বিবিধ তন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করে। নিলয়ের পরবর্তী সঙ্কোচনে শুদ্ধ রক্ত ক্যাভাম পালমোকিউটেনিয়মের ভিতর দিয়া **ক্যারোটিড খিলান ধমনীর** (*Carotid arch*) পথে মাথা ও মুখের চারিপাশে রক্তসরবরাহ করে। অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি কপাটিকা এবং নিলয়ের মধ্যস্থিত স্পঞ্জের মতো পেশী-ব্যবস্থার একত্রে মিলিত কার্যের ফলে এইভাবে অশুদ্ধ ও শুদ্ধ রক্তকে হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে পৃথক করিয়া রাখে। কিন্তু *Vandervael* ও *Foxon* বিবিধ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন যে, ব্যাঙের কোনাস আর্টারিওসাসের ভিতরে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রক্তের ভেদ নাই। উপরোক্ত তিনটি খিলান-ধমনীর রক্তের মধ্যস্থ প্রস্তুতি প্রায় একই রকমের। তাঁহাদের মতে নরম সদাসিক্ত চামড়া ও মুখবিবরের মধ্যেই সর্বদাই রক্ত শুদ্ধ হয় এবং সেইজন্য ফুসফুসীয় চার্ম-শিরার রক্তের ও জুগুলার শিরার রক্তের প্রকৃতি শুদ্ধ। সুতরাং সাইনাস ভেনোসাসের ভিতরকার রক্ত যে সম্পূর্ণ অশুদ্ধ (impure), তাহা বলা যায় না।

হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতরের রক্তপ্রবাহ (Circulation of Blood in the heart) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাইনাস ভেনোসাসের ডান ও বাম দিক হইতে একটি করিয়া প্রধান শিরা (Vena Cava) ব্যাঙের মাথা, মুখ, অগ্রপদ ও চামড়া হইতে রক্ত বহন করিয়া আনে ও সাইনাস ভেনোসাসে জমা করে। সেইরূপ ব্যাঙের পশ্চাদ্ভাগের যাবতীয় তন্ত্রের রক্ত আর একটি প্রধান শিরা বহন করিয়া আনে এবং উহা সাইনাস ভেনোসাসের পশ্চাদ্-কোণে প্রবেশ করে। এইভাবে দেহের সমস্ত রক্ত (ফুসফুসের রক্ত বাদে) সাইনাস ভেনোসাসে আসিয়া জমা হয়। ইহাতে

সাইনাস ভেনোসাস অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয় এবং পরে ইহারা এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যই সঙ্কুচিত হয় এবং ইহার মধ্যস্থ অশুদ্ধ রক্ত, সাইনু-অরিকিউলার ছিদ্রপথে হৃদ্‌যন্ত্রের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। ঠিক এইসময় ফুসফুসীয় শিরা শুদ্ধ রক্ত বহন করিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের বাম অলিন্দে প্রবেশ করায়। অলিন্দ দুইটি অন্তঃঅলিন্দ প্রাচীরের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকায় অশুদ্ধ ও শুদ্ধ রক্ত উভয়ে মিশিতে পারে না। দুই অলিন্দের রক্ত উহাদের সঙ্কোচনের সময় আরকিউলো-ভেন্ট্রিকিউলার ছিদ্রপথে নিলয়ে প্রবেশ. করে। ইহার পর ভেন্ট্রিকল পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত হইলে রক্ত কোনাস আর্টারিওসাস ও ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাসের ভিতর দিয়া বিবিধ ধমনীর ভিতর প্রবেশ করে এবং সর্বদেহে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় নিলয়ের ডান দিকের বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় চার্ম-ধমনীর ভিতর দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসে এই অশুদ্ধ রক্ত শুদ্ধ হইয়া পুনরায় ফুসফুসীয় শিরা দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্রের বাম অলিন্দে ফিরিয়া যায়। এইভাবে ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত দুইবার প্রবেশ করে এবং তাহার পর শুদ্ধ হইয়া ব্যাঙের সর্বাঙ্গে ধমনীর দ্বারা ছড়াইয়া পড়ে।

ধমনী প্রণালী

(Arterial System)

কোনাস আর্টারিওসাস হইতে ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাসের নিলয় অন্তরস্থ রক্ত প্রবাহিত হয়। ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাসই ধমনী প্রণালীর গোড়া। ইহা হৃদ্‌যন্ত্র অতিক্রম করিবার পর ডান ও বাম দিকে দুইভাগে বিভক্ত হয়। ডানদিকের ধমনীটিকে **ডানদিকের প্রধান ধমনী** (*Right aortic arch*) এবং বামদিকের ধমনীটিকে **বামদিকের প্রধান ধমনী** (*Left aort.c arch*) বলা হয়। এখন প্রতিটি প্রধান ধমনী আবার দুইদিকে তিনভাগে বিভক্ত হয় ; যথা (i) **ক্যারেটিড মহাধমনী** (*Carotid arch*), (ii) **সিস্টেমিক মহাধমনী** (*Systemic arch*) এবং (ii) **পালমোকিউটেনিয়ম মহাধমনী** (*Palmocutanoeum arch*)। সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্র হইতে ব্যাঙের অগ্রভাগের দুই পাশে মোট তিনজোড়া মহাধমনীর দ্বারা উহার বিবিধ তন্ত্রে রক্ত প্রবাহিত হয়। নিলয়ের প্রথম সংকোচনে অশুদ্ধ রক্ত পালমোকিউটেনিয়ম
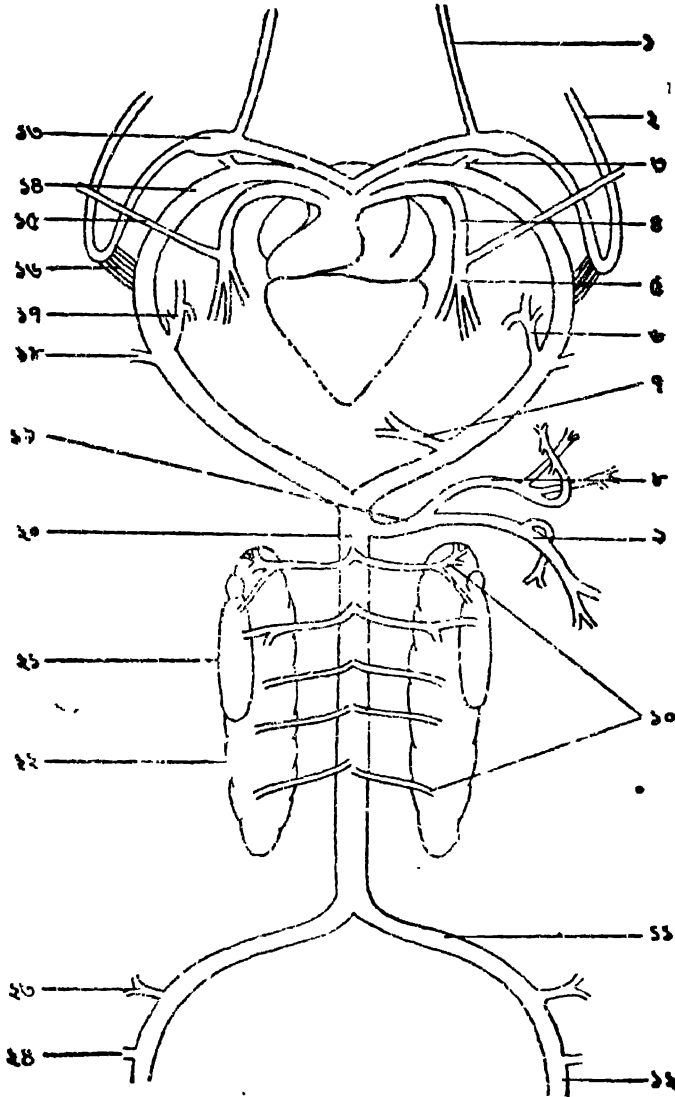
৬৬নং চিত্র—ব্যাঙের দেহের ধমনী-বিন্যাস দেখানো হইতেছে।

১, বহিঃ-ক্যারোটিড ; ২, অন্তঃ-ক্যারোটিড ; ৩, স্বরযন্ত্র ধমনী : ৪, ফুসফুসীয় চার্ম-ধমনী ; ৫, ফুসফুসীয় ধমনী ; ৬, অক্সিপিটো ভার্টিব্রাল ধমনী ; ৭, গ্রাসনালী ধমনী ; ৮, সিলিয়াক ধমনী ; ৯, মেসেনটারিক ধমনী ; ১০, বৃক্ক ধমনী ; ১১, ইলিয়াক ধমনী ; ১১, ফিমোরাল ধমনী ; ১৩, ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থ ১৪, সিস্টেমিক খিলান-ধমনী ; ১৫, চার্ম ধমনী ; ১৬, সন্ধি-বন্ধনী (Ligament) ; ১৭, অক্সিপিটো ভার্টিব্রাল ধমনী ; ১৮, সবক্লেভিয়ান ধমনী ; ১৯, সিলিঅ্যাকো মেসেনটারিক ধমনী ; ২০, পৃষ্ঠদেশীয় মহাধমনী (Dorsal Aorta) ; ২১, শুক্রাশয় ; ২২, বৃক্ক ; ২৩, এপিগ্যানট্রিকো ভেসিকালিস ; ২৪, সায়াটিক ধমনী।

মহাধমনীর ভিতর দিয়া ফুসফুসে ও ব্যাঙের চামড়ায় প্রবেশ করে এবং তথায় রক্ত সরবরাহ করে। নিলয় পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত হয় এবং দ্বিতীয় সঙ্কোচনে নিলয়ের মিশ্ররক্ত সিস্টেমিক মহাধমনীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং ইহা মাথা ও মুখ ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলে রক্ত সরবরাহ করে। নিলয়ের কোষ সঙ্কোচনে শুদ্ধ রক্ত ক্যারোটিড মহাধমনীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং মস্তিষ্ক, জিহ্বা ও মুখের বিবিধ অঞ্চলে রক্ত সরবরাহ করে। নিম্নে উপরোক্ত তিনটি মহাধমনীর বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল।

(i) **ক্যারোটিড মহাধমনী** (Carotid Arches) ঃ প্রধান ধমনীর ইহা প্রথম মহাধমনী। ইহা উপরের দিকে প্রবাহিত হইয়া বাহিরে ধারের দিকে আগাইয়া যায়। কিছুদূর আগাইবার পর ইহা দুইটি অপেক্ষাকৃত সরু ধমনীতে বিভক্ত হয়। প্রথম ধমনীটি ব্যাঙের অঙ্কীয় মধ্য-রেখার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মুখবিবরের তলদেশ পর্যন্ত আগাইয়া যায়। ক্যারোটিড মহাধমনীর এই শাখা-ধমনীটিকে **বহিঃস্থ ক্যারোটিড** (*External Carotid*) বলা হয়। ইহা মুখবিবরের তলদেশ, জিহ্বা এবং মাথার বাহিরের বিবিধ অঞ্চলে রক্ত সরবরাহ করে। ক্যারোটিড মহাধমনীর দ্বিতীয় শাখা-ধমনীটি, উৎপত্তির পরই নিচের দিকে নামিতে থাকে এবং সিস্টেমিক মহাধমনীর খুবই কাছাকাছি আসিয়া আবার ম্যানডিবলের কোণের নিকট হইতে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। ইহা এই সময় পেশী ভেদ করিয়া করোটির ছিদ্রপথে ব্যাঙের মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করে এবং সমগ্র মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে। ক্যারোটিড মহাধমনীর এই দ্বিতীয় শাখা-ধমনীটিকে **অন্তঃস্থ ক্যারোটিড** (*Internal Carotid*) বলা হয়। অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনী যখন সিস্টেমিক মহাধমনীর কাছাকাছি আসে, তখন উহা অনেকগুলি সূক্ষ্ম পেশীতন্তুর দ্বারা সিস্টেমিক মহাধমনীর সহিত যুক্ত হয়। এই পেশীগুলিকে **ক্যারোটিড বন্ধনী** (*Carotid ligaments*) বলা হয়। বহিঃস্থ ক্যারোটিড ও অন্তঃস্থ ক্যারোটিডের সংযোগস্থলের অতি নিকটে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার রক্তনালীপিণ্ড থাকে। ইহাকে **ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থ** (*Carotid Labyrinth*) বলা হয়। ক্যারোটিড মহাধমনী প্রকৃতপক্ষে দুইভাগে বিভক্ত হইবার আগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালী জালিকা একত্রিত হইবার পর পুনরায় ক্যারোটিড মহাধমনীতে পরিণত

হয়। ইহা পুনরায় দুইটি শাখা-ধমনীতে বিভক্ত হয়। ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থ উহার ভিতর দিয়া রক্ত-প্রবাহের গতিকে বাধা দেয়। ইহার জন্যই ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থের দিক হইতে ট্রাঙ্কাস্ আর্টারিওসাসের ভিতর একটি নিম্নমুখী চাপের সৃষ্টি হয়। নিম্নমুখী চাপটিকে অতিক্রম করিতে পারিলে রক্তপ্রবাহ ক্যারোটিড শাখা-ধমনীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। সেইজন্য নিলয় প্রারম্ভিক সঙ্কোচনে, ক্যারোটিড মহাধমনীর ভিতর রক্ত প্রবেশ করাইতে পারে। যখন সঙ্কোচনের চাপ বাড়িতে থাকে এবং ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থের চাপকে অতিক্রম করে, তখন নিলয় উহার শুদ্ধ-রক্ত ক্যারোটিড প্রধান-ধমনীর ভিতর প্রবেশ করাইতে পারে। এইজন্যই ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থে শুদ্ধ-রক্ত প্রবাহিত হয়।

(ii) **সিস্টেমিক মহাধমনী** (Systemic Arches): প্রতিটি সিস্টেমিক মহাধমনী ট্রাঙ্কাস্ আর্টারিওসাস হইতে বাহির হইয়া বাহিরের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রবাহিত হইবার সময় প্রতিটি সিস্টেমিক মহাধমনী হৃদ্‌যন্ত্রের দুই পাশ ঘুরিয়া গ্রাসনালীকে আবর্তন করে এবং পরে ব্যাঙের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার নিকটে ডানদিকের সিস্টেমিক মহাধমনী, বামদিকের সিস্টেমিক মহাধমনীর সহিত মিলিত হয়। সংযুক্ত ধমনীটিকে পৃষ্ঠদেশীয় ধমনী বা **ডরসাল আওরটা** (*Dorsal Aorta*) বলা হয়। প্রতিটি সিস্টেমিক মহাধমনীতে মিলিত হইবার পূর্বে অনেকগুলি শাখা-ধমনীর উৎপত্তি করে। সিস্টেমিক মহাধমনীর বিবিধ শাখাগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:

(ক) **স্বরযন্ত্রীয় ধমনী বা লেরিঞ্জিয়াল ধমনী** (**Laryngeal Artery**): ইহা খুবই সূক্ষ্ম এবং সিস্টেমিক মহাধমনীর অগ্রভাগের সর্বপ্রথম শাখা। ব্যাঙের স্বরযন্ত্রে এই শাখা-ধমনীটি রক্ত সরবরাহ করে।

(খ) **করোটি-মেরুদণ্ডীয় ধমনী** (**Occipito-Vertebral Artery**): হৃদ্‌যন্ত্রটিকে বেষ্টন করিবার সময় প্রতিটি সিস্টেমিক মহাধমনী হইতে উহার ভিতরের দিকে একটি অপেক্ষাকৃত স্থূল ধমনী বাহির হইয়া ব্যাঙের অক্ষীয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। পরে ইহা বহুভাবে বিভক্ত হইয়া পৌষ্টিক নালীর গলবিলে, মাথার পশ্চাদ্ভাগে মেরুদণ্ডে ও মেরুদণ্ডের ভিতরের **সুষুম্না-কাণ্ডতে** (*Spinal cord*) রক্ত সরবরাহ করে।

(গ) **সাবক্লেভিয়ান** (**Sub-clavian Artery**) **করোটি**: মেরুদণ্ড

ধমনীর বিপরীত দিকে সিস্টেমেটিক মহাধমনী একই স্থান হইতে ব্যাঙের বাহিরের দিকে উপরোক্ত ধমনীটির উৎপত্তি হয়। ইহা ব্যাঙের স্কন্ধ (*shoulder*) এবং অগ্রপদে রক্ত সরবরাহ করে। সাবক্লেভিয়ান ধমনীটি বেশ স্থূল ও সুস্পষ্ট।

(ঘ) **গ্রাসনালীর ধমনী (Oesophageal Artery)**—বামদিকের সিস্টেমিক মহাধমনীটিকে আবর্তন করিবার সময় একটি সূক্ষ্ম ধমনীর দ্বারা গ্রাসনালীকে রক্ত সরবরাহ করে। মনে রাখা দরকার, গ্রাসনালীর ধমনী কেবলমাত্র বামদিকের সিস্টেমিক মহাধমনী হইতে বাহির হয় এবং ডানদিকের সিস্টেমিক হইতে এইরূপ কোন ধমনী বাহির হয় না।

দুইটি সিস্টেমিক মহাধমনী ব্যাঙের পৃষ্ঠমধ্যরেখার উপর যুক্ত হইয়া একটি স্থূল **পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীর** (*Dorsal aorta*) উৎপত্তি করে। এই ধমনীটি সোজা পৃষ্ঠ-রেখার উপর দিয়া ব্যাঙের পশ্চাদ্ভাগের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হইবার সময় ইহা দুইটি বৃক্কের মধ্যস্থল দিয়াই অগ্রসর হয় এবং শ্রোণী অঞ্চলে পৌঁছিবার পর দুইভাগে বিভক্ত হয়। এই দুই শাখা-ধমনী এক একটি করিয়া প্রতি পশ্চাদ্‌পদের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয় এবং তথায় রক্ত সরবরাহ করে। পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীটি অগ্রসর হইবার পথে উহার দুইদিক হইতে বিবিধ শাখা-ধমনীর উৎপত্তি হয়। পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীটির বিবিধ শাখাগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল: (ক) সিস্টেমিক ধমনী দুইটি যে স্থলে যুক্ত হইয়া পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীর সৃষ্টি করে, ঠিক সেই স্থান হইতেই একটি অপেক্ষাকৃত স্থূল শাখা-ধমনীর উৎপত্তি। ইহাকে **সিলিয়াকো মেসেন্টিক ধমনী** (*Coeliaco-mesentric Artery*) বলা হয়। এই শাখা-ধমনীটি পৌষ্টিকনালীর দিকে অগ্রসর হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়। ইহার প্রথম ভাগটিকে **সিলিয়াক ধমনী** (*Coeliac Artery*) বলা হয়। ইহা পৌষ্টিকতন্ত্রের পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় যকৃৎ ও পিত্তথলিতে রক্ত সরবরাহ করে। সিলিয়াকো মেসেন্টিকের দ্বিতীয় ধমনীটিকে **মেসেন্টিক ধমনী** (*Mesentric artery*) বলা হয়। ইহা অন্ত্র, প্লীহা, মলাশয়, অবসারণী এবং পাতলা মেসেন্টারী পর্দায় সরু সরু সূক্ষ্ম শাখা-ধমনীর দ্বারা রক্ত সরবরাহ করে। পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীটি দুইটি বৃক্কের মাঝপথ দিয়া অগ্রসর হইবার সময় প্রতিটি বৃক্কের পর পর চারিটি বা পাঁচটি করিয়া **বৃক্ক-ধমনীর** (*Renal Arteries*) জন্য রক্ত সরবরাহ করে; সুতরাং মোট চারিটি বা পাঁচটি জোড়া

বৃক্ক-ধমনী পৃষ্ঠদেশীয় ধমনী হইতে বাহির হয়। এই বৃক্ক-ধমনী হইতে আরও শাখা-ধমনী বাহির হইয়া ব্যাঙের জনন-অঙ্গে **জনন-ধমনী** (*Genital Arteries*) নামে ধমনীর দ্বারা রক্ত সরবরাহ করে। পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীটি আরও নীচে অগ্রসর হইয়া শ্রোণী অঞ্চলে পৌঁছাইলে ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ডান ও বামদিকে একটি করিয়া **ইলিয়াক** (*Iliac Artery*) **ধমনী** সৃষ্টি করে। প্রতিটি ইলিয়াক ধমনী বাহিরের দিকে একটি ক্ষুদ্র **এপিগ্যাসট্রীক ধমনীর** (*Epigastric artery*) দ্বারা ব্যাঙের **রেচনথলি** (*Urinary Bladder*) এবং দেহের অঙ্কীয়দেশে রক্ত সরবরাহ করে। ইহার পর প্রতিটি ইলিয়াক ধমনী পশ্চাদ্-পদের ভিতর প্রবেশ করিয়া **সায়াটিক** (*Sciatic*) ও **ফিমোরাল** (*Femoral*) নামে দুইটি ধমনীর দ্বারা বিভক্ত হয়। সায়াটিক ধমনী পশ্চাদ্-পদের উপরিভাগে রক্ত সরবরাহ করে।

(ii) **প্যালমোকিউটেনিয়াস মহাধমনী** (**Pulmocutaneous Arches**): ইহা প্রধান ধমনীর সর্বশেষ বা তৃতীয় মহাধমনী। ইহা নিলয় হইতে দূষিত বা অশুদ্ধ রক্ত বহন করে। এই ধমনীটি ফুসফুসে রক্ত সরবরাহ করে। ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্বে এই ধমনী হইতে অগ্রপদের দিকে একটি সূক্ষ্ম শাখা-ধমনী বাহির হইয়া ব্যাঙের চামড়ায় রক্ত সরবরাহ করে। এই শাখা ধমনীটিকে **চার্ম-ধমনী** (*Cutaneous Artery*) বলা হয়। যে ধমনীটি ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করে, তাহাকে **ফুসফুসীয় ধমনী** (*Pulmonary Artery*) বলা হয়। ফুসফুসীয় ধমনী ফুসফুসে প্রবেশ করিবার পর অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখা-ধমনীতে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি শাখা-ধমনী পর্যায়ক্রমে আরও বিভক্ত হইয়া ফুসফুসের সর্বাঙ্গে জালকাকারে ছড়াইয়া পড়ে। শ্বসন-প্রক্রিয়ার সময় জালকের ভিতরকার রক্ত অক্সিজেন শোষণ করে এবং কার্বন-ডায়কসাইড নির্গত করে। এইভাবে দূষিত রক্ত ফুসফুসে শুদ্ধ হয়।

শিরা প্রণালী

(Venous System)

কতকগুলি রক্তবাহী নালীর সাহায্যে শরীরের বিবিধ তন্ত্র হইতে কার্বন-ডায়কসাইড ঘটিত রক্ত পুনরায় ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্রে ফিরিয়া আসে।
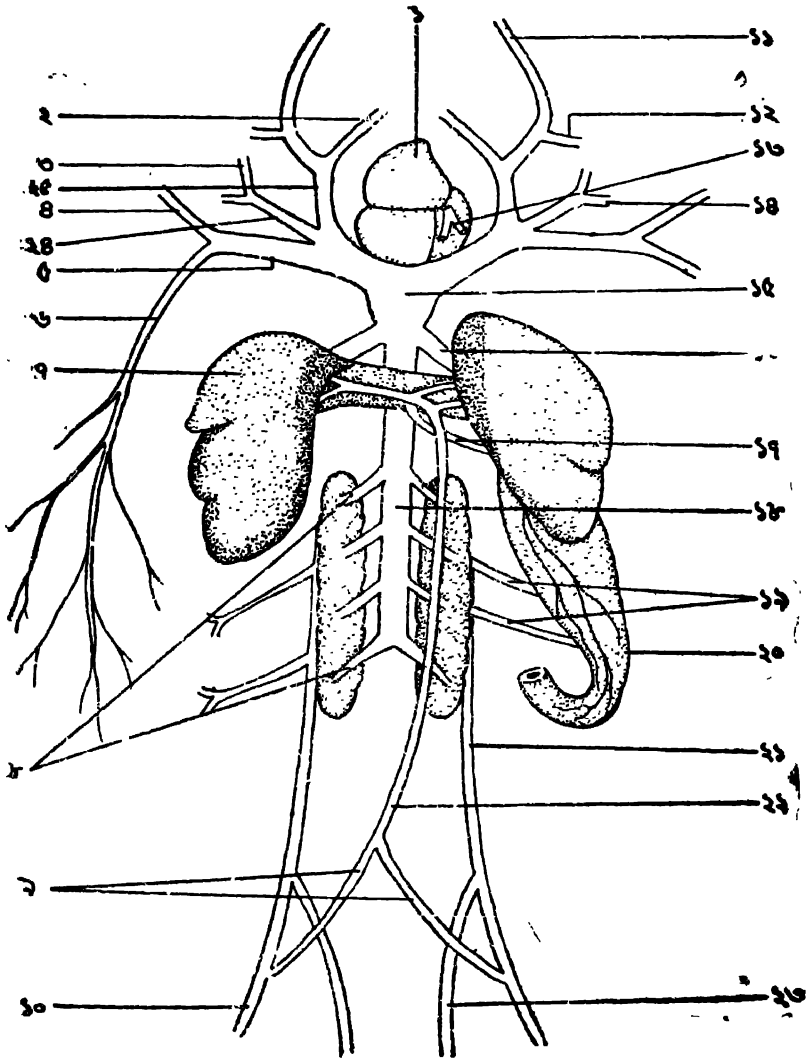
৬৭নং চিত্র—ব্যাঙের দেহের ভিতরকার শিরা-বিন্যাস দেখান হইতেছে।

১, নিলয়; ২, জিহ্বা-শিরা; ৩, অন্তঃ-জুগুলার; ৪, ব্রাঙ্কিয়েল শিরা; ৫, সম্মুখস্থ মহাশিরা; ৬, পেশী ও চার্ম-শিরা; ৭, যকৃৎ; ৮, বৃক্ক শিরা; ৯, শ্রোণী শিরা; ১০, ফিমোরাল শিরা; ১১, ম্যানডিবল বা চোয়ালের শিরা; ১২, মুখমণ্ডলের শিরা; ১৩, ফুসফুসীয় শিরা; ১৪, সাবাস্কাপিউলার শিরা; ১৫, সাইনাস ভেনোসাস; ১৬, যকৃৎ শিরা; ১৭, হিপাটিক পোর্টাল প্রণালীর প্রধান শিরা; ১৮, পশ্চাদ্-ভাগের মহাশিরা; ১৯, ডরসো-লাম্বার; ২০, পাকস্থলী; ২১, বৃক্কীয় পোর্টাল শিরা; ২২, উদরের সম্মুখের শিরা (Anterior abdominal vein) ২৩, স্যায়াটিক শিরা।

এই রক্তবাহী নালীকে শিরা (Vein) বলা হয় এবং ইহাদের বিন্যাসকে **শিরা-প্রণালী** (*Venous system*) বলে। ধমনী যেমন কোন যন্ত্রে প্রবেশ করিবার পর **জালকে** (*Capillary*) পরিণত হইয়া শেষ হইয়া যায়, সেইরূপ এই ধমনীর জালকের সমন্বয়ে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরার সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলি পুনরায় একত্রিত হইয়া একটি সাধারণ শিরায় পরিণত হয় এবং তখনই উহা যন্ত্রটির (Organ) ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসে। সুতরাং শিরা বাহির হইবার সময় যন্ত্রের দূষিত দ্রব্যগুলিকে রক্তের সহিত বহন করিয়া আনে। সমস্ত শিরা প্রণালীকে সাধারণতঃ তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়; যথা—(i) **পালমোনারী** (*Pulmonary*) (ii) **সিস্টেমিক** (*Systemic*) ও (iii) **পোর্টাল অঞ্চল** (*Portal group*)।

(i) পালমোনারী মহাশিরা (Pulmonary Veins) ঃ

হৃদ্‌যন্ত্রের ডান ও বাম দিকে একটি করিয়া ফুসফুস বিদ্যমান। ডান ফুসফুস হইতে **ডান পালমোনারী** বা **ফুসফুসীয় শিরা** (*Right pulmonary vein*) রক্ত বহন করিয়া আনে। সেইরূপ বাম ফুসফুস হইতে **বাম পালমোনারী** বা **ফুসফুসীয় শিরা** (*Left pulmonary vein*) রক্ত বহন করিয়া আনে। ডান ফুসফুসীয় ও বাম ফুসফুসীয় শিরা একত্রিত হইয়া একটি সংযুক্ত বা সাধারণ ফুসফুসীয় শিরায় পরিণত হয়। এই **সাধারণ ফুসফুসীয় শিরা** (*Common pulmonary vein*) সোজা হৃদ্‌যন্ত্রের বাম অলিন্দের পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করে এবং তথায় রক্ত জমা করে।

(ii) সিস্টেমিক মহাশিরা (*Systemic veins*) **:** তিন প্রধান শিরা-সমন্বয়ে যে শিরাবিন্যাস, তাহাকে সিস্টেমিক মহাশিরা অঞ্চল বলা হয়। সাইনাস ভেনোসাসের তিন কোণে উপরোক্ত তিনটি শিরা ব্যাঙের দেহের সর্বাঙ্গের দূষিত (ফুসফুস বাদে) রক্ত বহন করিয়া আনিয়া প্রবেশ করে। দেহের অগ্রভাগের প্রতিপার্শ্ব হইতে একটি করিয়া মহাশিরা উক্ত পার্শ্বের সাইনাস ভেনোসাসের কোণে প্রবেশ করে। এই মহাশিরা দুইটিকে **সম্মুখস্থ মহাশিরা** (*Pre-caval vein*) বলা হয়। সেইরূপ দেহের পশ্চাদ্ভাগের দূষিত রক্ত আরও একটি মহাশিরার দ্বারা সংগৃহীত হইয়া সাইনাস ভেনোসাসের পশ্চাদ্ভাগের শীর্ষকোণে প্রবেশ করে। ইহাকে **পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরা** (*Post caval vein*) বলা হয়। নিম্নে প্রত্যেকটি সম্মুখস্থ

মহাশিরা এবং পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরার বিবিধ শাখা-শিরার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল :

সম্মুখস্থ মহাশিরা (*Precaval Vein*): সম্মুখস্থ মহাশিরাটি নিম্নলিখিত শাখা-শিরার সমন্বয়ে গঠিত ; যথা—

(ক) **বহিঃ-জুগুলার** (*External Jugular*): ইহা আবার আরও দুইটি সূক্ষ্ম শাখা-শিরার সমন্বয়ে গঠিত। ব্যাঙের জিহ্বা হইতে দূষিত রক্ত বহন করিয়া একটি সূক্ষ্মশিরা হৃদযন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়। এই সূক্ষ্ম শিরাটিকে **জিহ্বাদেশীয় শিরা** (*Lingual vein*) বলা হয়। সেইরূপ ব্যাঙের মুখমণ্ডল হইতে আরও একটি শিরা ওই অঞ্চলের রক্ত সংগ্রহ করিয়া আনে। এই শিরাটিকে **মুখমণ্ডলীয় শিরা** (*Facial vein*) বলা হয়। একটি তৃতীয় শাখা-শিরা ব্যাঙের ম্যানডিবল হইতে দূষিত রক্ত সংগ্রহ করিয়া আনে। ইহাকে **ম্যানডিবল অঞ্চলীয় শিরা** (*Mandibular vein*) বলা হয়। রক্ত সংগ্রহ করিয়া অগ্রগতির পথে মুখমণ্ডলীয় শিরাটি ম্যানডিবল অঞ্চলীয় শিরাটির সহিত যুক্ত হয় এবং তখন এই একত্রিত শিরাকে **মুখমণ্ডল ও ম্যানডিবল অঞ্চলীয় শিরা** (*Facio-mandibular vein*) বলা হয়। এখন জিহ্বাদেশীয় শিরাটি অগ্রগতির পথে মুখমণ্ডল ও ম্যানডিবল অঞ্চলীয় শিরার সহিত যুক্ত হইয়া যায়। উপরোক্ত দুইটি শাখা-শিরার, একত্রিত-শাখাটিকে **বহিঃ-জুগুলার শাখা শিরা** (*External jugular vein*) বলা হয় এবং ইহাই সম্মুখস্থ মহাশিরা বা প্রথম শিরা।

(খ) **অনামী** বা **ইনোমিনেট** (*Innominate*): এই শাখা-শিরাটি দেহের স্কন্ধস্থ অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশ হইতে এবং করোটির ভিতরকার অঞ্চল হইতে দূষিত রক্ত সংগ্রহ করিয়া আনে। ইহা স্কন্ধস্থ অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশ হইতে দূষিত রক্ত **সাবস্কাপুলার শিরার** (*Subscapular vein*) দ্বারা সংগ্রহ করে। করোটির ভিতরকার দূষিত রক্ত **অন্তঃ-জুগুলার** (*Internal Jugular*) দ্বারা সংগৃহীত হয়। সাবস্কাপুলার এবং অন্তঃ-জুগুলার শিরা দুইটি একত্রিত হইয়া দেহের প্রতি পার্শ্বের অনামী বা ইনোমিনেট শাখা-শিরার উৎপত্তি করে। **ইনোমিনেট** (*Innominate*) সম্মুখস্থ মহাশিরার দ্বিতীয় শিরা।

(গ) **সাবক্লেভিয়ান** (*Subclavian*): এই শাখাশিরাটি দেহের

অগ্রপদ, চামড়া ও পেশী হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়া আনে। ইহাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি শিরা সমন্বয়ে গঠিত। অগ্রপদের দূষিত রক্ত **অগ্রপদ শিরার** (*Brachial Vein*) দ্বারা সংগৃহীত হয় এবং দেহের পেশী ও চামড়া হইতে দূষিত রক্ত **পেশী-চার্ম শিরার** (*Musculo cutaneous*) দ্বারা সংগৃহীত হয়। উপরোক্ত দুইটি শিরার সমন্বয়ে সম্মুখস্থ মহাশিরার সাবক্লেভিয়ান শাখা-শিরাটি উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। ইহাই সম্মুখস্থ মহাশিরার তৃতীয় বা শেষ শিরা। ব্যাঙের চামড়া অতিরিক্ত শ্বসন-যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়ায় পেশী-চার্ম-শিরার রক্ত অপেক্ষাকৃত কম দূষিত।

পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরা (*Post Caval Vein*): এই মহাশিরাটি প্রধানতঃ দুইটি শাখা-শিরার সমন্বয়ে গঠিত। ব্যাঙের বৃক্কযন্ত্র দুইটি পাশা-পাশি বিদ্যমান। প্রতিটি বৃক্কযন্ত্র হইতে পর পর চারিটি **বৃক্কশিরা** (*Renal veins*) বাহির হয়। শিরাগুলি বৃক্কযন্ত্রের ভিতর দিক হইতে বাহির হয় এবং ডানদিকের বৃক্কযন্ত্রের চারিটি (সময় সময় পাঁচটিও দেখা যায়) শিরা, বামদিকের বৃক্কযন্ত্রের চারিটি শাখার সহিত মিলিত হইয়া, দুইটি বৃক্কযন্ত্রের মধ্যস্থলে একটি স্থূল শিরার উৎপত্তি করে। ইহাকেই পশ্চাদ্দেশীয় **মহাশিরা** (*Post caval vein*) বলা হয়। ব্যাঙের জনন-অঙ্গ হইতে একটি সূক্ষ্ম **জনন-শিরা** (*Genital vein*) বাহির হইয়া যে-কোন একটি বৃক্কশিরার সহিত মিলিত হয়। সুতরাং পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরাটি বৃক্ক ও জনন-অঙ্গের দূষিত রক্ত সংগ্রহ করিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবার পথে ইহা যকৃৎ-অস্থির ভিতর প্রবেশ করে এবং দুইদিকের যকৃৎঅস্থির দুইজোড়া **যকৃৎ শিরা** (*Hepatic vein*) সহিত মিলিত হয়। পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরাটি ইহার পর সোজা উপরের দিকে অগ্রসর হয় এবং সাইনাস ভেনোসাসের পশ্চাদ্ভাগের শীর্ষে প্রবেশ করিয়া উহার মাধ্যমে দূষিত রক্ত জমা করে।

(iii) **পোর্টাল মহাশিরা (Portal Veins):** কতকগুলি শিরা কোন কোন তন্ত্র বা অঙ্গ বা কোন অঞ্চল হইতে জালক নির্মাণ করিয়া সৃষ্ট হয়। এইরূপ শিরায় সংগৃহীত রক্ত, শিরার দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্রে সোজাভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে জমা হয় না, বরং এইরূপ শিরাগুলি অন্য একটি অঙ্গে পুনরায় জালক বিস্তার করিয়া প্রবেশ করে। যে সকল শিরা জালকের দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং পুনরায় হৃদ্‌যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গে

জালক বিস্তার করিয়া দূষিত রক্ত জমা করে, সেইরূপ শিরাকে **পোর্টাল মহাশিরা** (*Portal veins*) বলা হয়। পোর্টাল মহাশিরাগুলি দুইটি পৃথক্ শিরা-প্রণালী সৃষ্টি করে, যথা—**যকৃৎ পোর্টাল-প্রণালী** (*Hepatic Portal System*) এবং **বৃক্ক পোর্টাল-প্রণালী** (*Renal portal system*):

(*i*) **যকৃৎ পোর্টাল-প্রণালী (Hepatic Portal system):**

এই প্রণালীতে দুইটি প্রধান শিরা থাকে। প্রথম শিরাটি **যকৃৎ-পৌষ্টিক শিরা** (*Hepatic Portal vein*) বলা হয়। এই শিরাটি পৌষ্টিক নালীর পাকস্থলী, অন্ত্র, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরার দ্বারা রক্ত সংগ্রহ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলি পাতলা পর্দার দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই সকল শিরা একত্রিত হইয়া **যকৃৎ পৌষ্টিক শিরা** (*Hepatic Portal caval*) সৃষ্টি করে। এই একত্রিত শিরাটি যকৃৎ অঙ্গের দিকে অগ্রসর হইবার পথের একটি বেশ স্থূল **অগ্রস্থ উদরদেশীয় শিরার** (*Anterior Abdominal Vein*) সহিত মিলিত হয়। ইহার পর যকৃৎ-পৌষ্টিক শিরা দুইটি যকৃৎ অঙ্গের ভিতর জালক সৃষ্টি করিয়া প্রবেশ করে এবং উহার ভিতরকার রক্ত যকৃৎ অঙ্গের সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া দেয়। দুই পাশের যকৃৎ হইতে পুনরায় জালক সমন্বয়ে প্রতি যকৃৎ হইতে একটি যকৃৎ-শিরার সৃষ্টি হয়। প্রতি যকৃৎ অঙ্গের **যকৃৎ-শিরাটি** (*Hepatic vein*) যকৃৎ অঙ্গের রক্ত সংগ্রহ করিয়া আনে। এবং **পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরায়** (*Post-caval vein*) যুক্ত। আগেই বলা হইয়াছে যে, পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরা হৃদ্‌যন্ত্রের সাইনাস ভেনোসাসের পশ্চাৎ-কোণে প্রবেশ করে।

ব্যাঙের পশ্চাৎ-পদের দূষিত রক্ত দুইটি শিরার দ্বারা সংগৃহীত হয়। পদের উপরিভাগ হইতে **সায়াটিক শিরা** (*Sciatic vein*) জালকাকারে রক্ত সংগ্রহ করে এবং পদের নিম্নভাগ হইতে সেইরূপে **ফিমোরাল শিরা** (*Femoral vein*) জালকাকারে দূষিত রক্ত সংগ্রহ করে। এই ফিমোরাল শিরাটি ব্যাঙের দেহগহ্বরের নিকট অগ্রসর হইয়া সায়াটিক শিরার সহিত মিলিত হয়। কিন্তু ফিমোরাল শিরা উপরোক্তভাবে মিলিত হইবার পূর্বে ভিতরের দিকে শ্রোণী অঞ্চলে একটি **শ্রোণী শিরার** (*Pelvic vein*) উৎপত্তি করে। দুইটি ফিমোরাল শিরা হইতে প্রতিদিকে এইভাবে দুইটি মুখোমুখি শ্রোণী শিরা উৎপন্ন হয় এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরের

সহিত কোণাকুণিভাবে অঙ্কীয় মধ্যরেখাস্থলে যুক্ত হয়। দুইটি শ্রোণী শিরার যুক্ত শিরাকেই অগ্রস্থ উদরদেশীয় শিরা (*Anterior Abdominal vein*) বলা হয়। অগ্রস্থ উদরদেশীয় শিরাটি বেশ স্থূল এবং ইহা অঙ্কীয় মধ্যরেখার
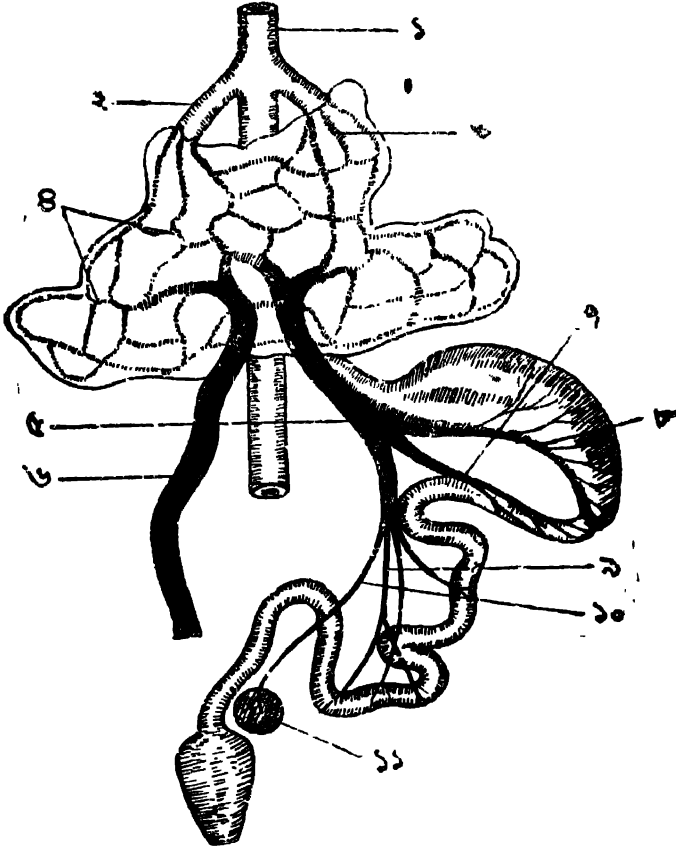
৬৮নং চিত্র

ব্যাঙের যকৃৎ-পোর্টাল প্রণালী বড় করিয়া দেখান হইতেছে।

১, পশ্চাদ্ভাগের মহাশিরা ; ২, যকৃৎ-শিরা ; ৩, জালক-শিরা ; ৪, পোর্টাল-প্রণালী ; ৫, যকৃৎ-পোর্টাল শিরা ; ৬, সম্মুখস্থ উদরীয় শিরা ; ৭, ডিওডিনাল ; ৮, গ্যাস্ট্রিক ; ৯, অন্ত্রীয় ; ১০, প্লীহা-শিরা ; ১১, প্লীহা।

ঠিক তলা দিয়া যকৃৎ অঙ্গের দিকে অগ্রসর হয়। এই অগ্রগতির পথে ইহা অসংখ্য সূক্ষ্ম শিরার দ্বারা ব্যাঙের অঙ্কায় পেশীস্তর হইতে দূষিত রক্ত সংগ্রহ করে। যকৃৎ অঙ্গের নিকট পৌঁছাইলে ইহা বক্রভাবে মধ্যযকৃৎ অঞ্চলে যকৃৎ-পৌষ্টিক শিরার (*Hepatic portal vein*) সহিত মিলিত
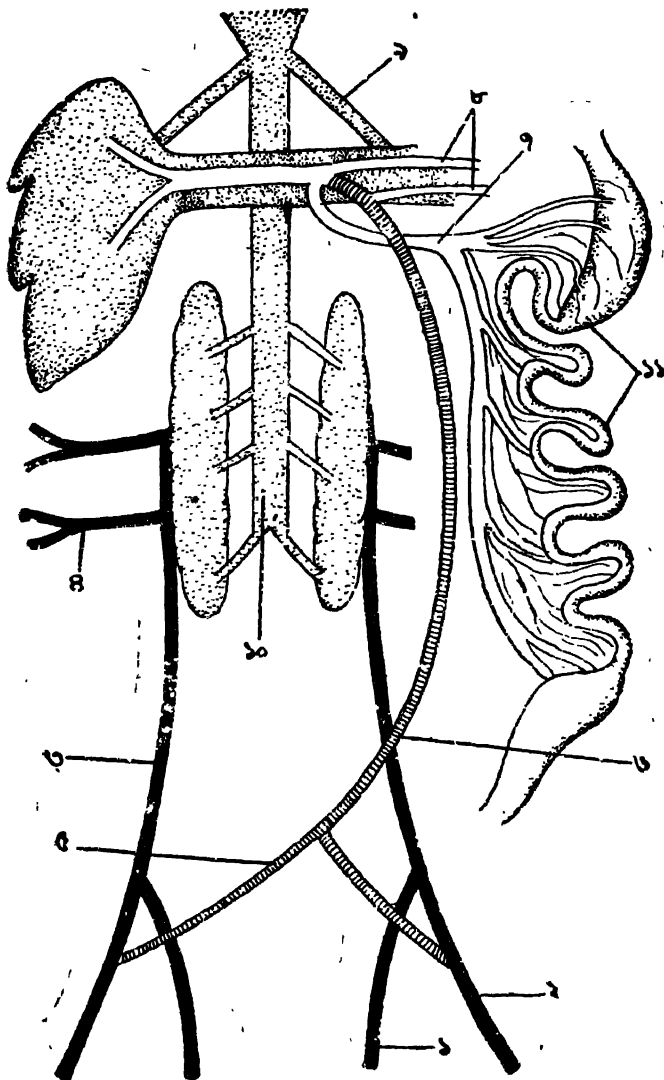
৬৯(ক)নং চিত্র—ব্যাঙের শিরা-বিন্যাসের যকৃৎ পোর্টাল প্রণালী, বৃক্কীয়-পোর্টাল প্রণালী এবং সম্মুখস্থ উদর-শিরার মধ্যে সম্পর্ক দেখান হইতেছে।

১, সায়াটিক শিরা; ২, ফিমোর্যাল শিরা; ৩, রেনাল পোর্টাল শিরা; ৪, ডরসো লাম্বার; ৫, শ্রোণী শিরা; ৬, সম্মুখস্থ উদর-শিরা; ৭, যকৃৎ-পোর্টাল শিরা-প্রণালী; ৮, যকৃৎযন্ত্রের ভিতরকার শাখা-শিরার জালকের অগ্রভাগ; ৯, যকৃৎ শিরা; ১০, পশ্চাতের মহাশিরা; ১১, অন্ত্র।

বৃক্কীয় বা রেনাল-পোর্টাল প্রণালীটিকে কালো রঙে ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্মুখস্থ উদর-শিরার সহিত শ্রোণী-শিরা দুইটিকে দাগানো হইয়াছে এবং যকৃৎ-পোর্টাল প্রণালীটিকে সাদা-নালীরূপে দেখান হইয়াছে।

হয়। অতএব যকৃৎ-পোর্টাল প্রণালীর দ্বারা পৌষ্টিকনালীর রক্ত এবং শ্রোণী অঞ্চলের রক্তের সহিত ব্যাঙের অঙ্কীয়দেশে পেশীস্তরের রক্তও সংগৃহীত হইয়া যকৃৎ-অঙ্গে জমা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সংযুক্ত শিরাটি যকৃৎ অঙ্গে **জালকাকারে** (*Capillary*) রক্ত জমা করে। ইহার পূর্বে সংযুক্ত শিরা হইতে প্রথমে প্রতি যকৃৎ-অঙ্গে তিনটি করিয়া শিরা প্রবেশ করে এবং প্রতি যকৃৎ-অঙ্গে এই তিনটি শিরাই পর্যায়ক্রমে বিভক্তির দ্বারা জালকের সৃষ্টি করে। এই জালকের অপর দিক হইতে জালক-সমন্বয়ে প্রতি যকৃৎ হইতে একটি **যকৃৎ-শিরার** (*Hepatic vein*) উৎপত্তি হয় এবং তাহা পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরায় মিলিত হয়। পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরা ব্যাঙের পশ্চাদ্ভাগের সমস্ত দূষিত রক্তকে সাইনাস ভেনোসাসের ভিতর জমা করে। অতএব পোর্টাল প্রণালীর দ্বারা রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রে নিশ্চয়ই পৌঁছায়, কিন্তু সোজাসুজি না পৌঁছাইয়া আগে যকৃৎ অঙ্গের ভিতর দিয়া রক্ত জমা করে। যকৃৎ আবার সেই রক্ত, যকৃৎ-শিরার দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্রে পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরার দ্বারা জমা করে। তথা হইতে রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবেশ করে।

বৃক্কীয় পোর্টাল প্রণালী (Renal Portal System) ঃ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙের প্রতি পশ্চাদ্‌পদের দূষিত রক্ত সায়াটিক ও ফিরোমাল শিরার দ্বারা সংগৃহীত হয়। এই দুইটি শিরা শ্রোণী অঞ্চলের দুই পাশের খাঁজস্থলে মিলিত হইয়া একটি স্থূল শিরার সৃষ্টি করে। এই শিরাটিকে **বৃক্কীয় পোর্টাল শিরা** (*Renal Portal vein*) বলা হয়। দুই পাশের বৃক্কীয় পোর্টাল শিরা, বৃক্কের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রতি বৃক্কের পশ্চাদ্ভাগে প্রবেশ করে। বৃক্কে প্রবেশ করিয়া পর্যায়ক্রমে শিরা বিভক্ত হয় এবং শেষে জালকের সৃষ্টি করে। জালকের দ্বারা পদের সমস্ত দূষিত রক্ত এইভাবে বৃক্কের ভিতর জমা হয়। বৃক্কীয়-পোর্টাল শিরা বৃক্কে প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রায় তিনটি উপর হইতে নীচে সজ্জিত **পৃষ্ঠীয়-লাম্বার** (*Dorso-lumber vein*) শিরার সহিত যুক্ত হয়। এই শিরাগুলি ব্যাঙের পৃষ্ঠদেশের দেহ-প্রাচীরের পেশী হইতে এবং মেরুদণ্ডের **লাম্বার** (*Lumber*) কশেরুকাগুলি হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়া আনে। বৃক্কীয় পোর্টাল শিরার দ্বারা দূষিত রক্ত বৃক্কের প্রতিটি কোষে ছড়াইয়া পড়ে এবং পরে একই রক্ত বৃক্কের জালক হইতে প্রতি বৃক্ক পর পর চারিটি বা পাঁচটি বৃক্ক-শিরা

(*Renal vein*) সৃষ্টি করে। সুতরাং দুই দিকের বৃক্ক হইতে চারিটি বা পাঁচটি বৃক্কশিরা, প্রতি বৃক্ক হইতে মুখোমুখি আসিয়া একটি স্থূল শিরার সৃষ্টি করে। এই শিরাটি **পশ্চাদ্দেশীয় মহাশিরা** (*Post Caval vein*) নামে
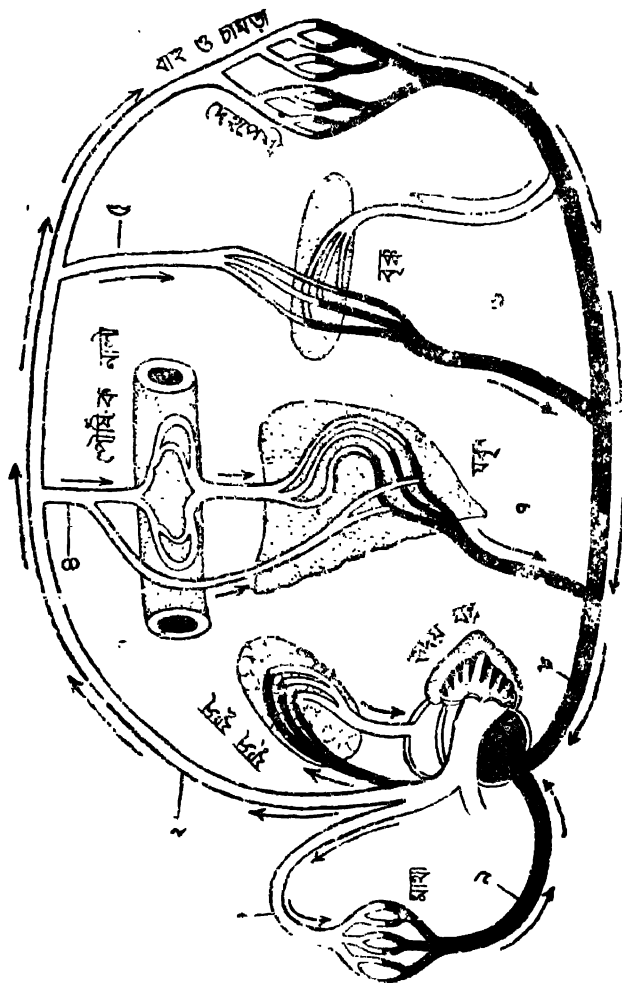
৬৯ (খ) নং চিত্র—ব্যাঙের রক্ত-সংবহন চক্র। (ছক সহযোগে ব্যাখ্যা)
১, ক্যারোটিড ধমনী ; ২, সিস্টেমিক ধমনী ; ৩, পালমোকিউটেনিয়াস ধমনী ; ৪, সিলিয়াকো মেসেনট্রিক ধমনী ; ৫, বৃক্ক ধমনী ; ৬, বৃক্কীয় পোর্টাল শিরাতন্ত্র ; ৭, হিপাটিক পোর্টাল শিরাতন্ত্র ; ৮, পশ্চাদ্ভাগের মহাশিরা।

পরিচিত। এই মহাশিরা দূষিত রক্ত বহন করিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের সাইনাস ভেনোসাসে জমা করে। ব্যাঙের **দ্বি-সংবহন পদ্ধতির** (*double circulation*) একটি সচিত্র ছক দেওয়া হইল।

শ্বসন-তন্ত্র

(Respiratory System)

যে-কোন নির্জীব বা সজীব পদার্থে গতিশক্তি সৃষ্টি করিতে হইলে, অক্সিজেনের প্রয়োজন অপরিহার্য। রেল-ইঞ্জিন কয়লা হইতে শক্তি অর্জন করে এবং সেই শক্তি ব্যবহারে উহার গতিশক্তি যুক্ত হয়। এখন কয়লা কিভাবে শক্তি যোগায়? বাতাসের অক্সিজেন কয়লাগুলিকে দহন করে। এই দহনের ফলে কয়লার ভিতরকার স্থিতিশক্তি গতিশক্তিরূপে বাহির হইয়া আসে। গতিশক্তিই ইঞ্জিনের জলকে বাষ্পে পরিণত করে এবং বাষ্প ইঞ্জিনটিকে চালনা করে। সুতরাং যে-কোন বিপাকীয় কার্যের জন্য কয়লার মত শক্তি চাই। জীবের খাদ্যসারই উহার কয়লা। খাদ্যসারই জীবকে চালনা করে। জীবের চলন, খাদ্যগ্রহণ, বৃদ্ধি—সর্বক্রিয়ায় শক্তির প্রয়োজন এবং সেই শক্তি যোগায় জীবের খাদ্য। যেমন কয়লা হইতে গতিশক্তি বাহির করিতে হইলে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, তেমনি জীবের খাদ্য হইতে গতিশক্তি বাহির করিতে হইলে অক্সিজেনেরও প্রয়োজন হয়। শ্বাসকার্যের অর্থ আমরা জানি। জীবের শরীরের ভিতর হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাস নিষ্কাশন এবং তাহার পরিবর্তে অক্সিজেন প্রবেশ-প্রক্রিয়াকে শ্বাস-ক্রিয়া বলা হয়। যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাস-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাদের একত্রিত করিয়াই **শ্বসনতন্ত্রের** (*Respiratory system*) সৃষ্টি। দেহের প্রতিটি কোষ উহার প্রোটোপ্লাজমস্থিত খাদ্যবস্তুকে অক্সিজেনের দ্বারা ধীরে ধীরে দহন করে। ইহার ফলে খাদ্যবস্তু হইতে গতিশক্তি নিঃসৃত হয় এবং তৎসহ কার্বন-ডায়কসাইড গ্যাস এবং জলও নির্গত হয়। মনে কর, এক অণু গ্লুকোজ দহন করিতে হইলে ছয় অণু অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। দহনের পর উপরোক্ত রাসায়নিক সংকেতের দ্বারা ছয় অণু কার্বন-ডায়কসাইড গ্যাস এবং ছয় অণু বাষ্প নির্গত হয়। ইহাদের সাথে গতিশক্তিও নিঃসৃত হয়। এক গ্রাম গ্লুকোজ দহনে চার ক্যালরী গতিশক্তি (*Kinetic energy*) নির্গত হয়। এই চার ক্যালরী গতিশক্তির দ্বারা জীবের যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হয়। এইরূপ শত শত খাদ্য-অণু দহনের ফলে জীবের প্রতিটি কোষ হইতে শক্তি নিঃসৃত হয় এবং নির্গত কার্বন ডায়ক্সাইড ও জল-বাষ্প রক্তের রক্তরসের সঙ্গে ফুসফুসে জমা হয়। এই অঙ্গের ভিতরেই রক্তরসের ভিতর হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইড, গ্যাসীয় অবস্থায় বাহির হইয়া যায় এবং রক্তের ভিতর

অক্সিজেন প্রবেশ করে। তাহা হইলে রক্তের মধ্য হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাস বাহির করিয়া লওয়া এবং তৎপরিবর্তে অক্সিজেন প্রবেশ করাইয়া লওয়াকে কি শ্বসনকার্য বলা হয়? প্রকৃতপক্ষে ইহাকে শ্বসনকার্য বলে না। পরন্তু ইহাকে **বাহ্যিক শ্বসনকার্য** (*External respiration*) বলা হয়। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট শ্বাসযন্ত্রে বাহ্যিক শ্বসনকার্য পরিচালিত হয়। বাহ্যিক শ্বসনকার্যের দ্বারা কেবলমাত্র রক্তের ভিতর হইতে কার্বন-ডায়কসাইড বাহির করিয়া তৎপরিবর্তে অক্সিজেন ভর্তি করা হয়। কিন্তু ইহাতে খাদ্যরস হইতে শক্তি নির্গমনের কোন উপায় নাই। সুতরাং জীব-কলার ভিতর রক্তের সাহায্যে অক্সিজেন প্রবেশ করাইয়া উহার ভিতরকার খাদ্যবস্তু দহন করা এবং দহনের ফলে নিঃসৃত কার্বন-ডায়ক্সাইডকে পুনরায় রক্তের সাহায্যে বাহির করিয়া লওয়াকেই প্রকৃত শ্বসনকার্য বলা হয়। ইহাকে **অন্তঃশ্বসন কার্য** বা **কলা শ্বসনকার্য** (*Internal respiration or Tissue respiration*) বলে। অতএব কোন খাদ্য হইতে অক্সিজেনের দ্বারা গতি-শক্তি নিষ্কাশন এবং কোষে কার্বন-ডায়ক্সাইড যুক্ত করাই প্রকৃত শ্বসনকার্য বা **শ্বাসকার্য** (*Respiration*)।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, লোহিত রক্তকণার নিউক্লিয়সের হোমোগ্লোবিনই অক্সিজেন বহন করে। অক্সিজেন অণুর প্রতিও লৌহকণার প্রীতি খুব বেশী এবং হোমোগ্লোবিন লৌহঘটিত হওয়ায় উহা অক্সিজেন শোষণ করিয়া **অক্সিহোমোগ্লোবিনে** (*Oxyhoemoglobin*) পরিণত হয়। কিন্তু অক্সিহোমোগ্লোবিন অত্যন্ত **অস্থিতিস্থাপক** (*Unstable*) রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। রক্ত, ফুসফুসের অক্সিজেন অণুগুলিকে অক্সিহোমোগ্লোবিন অবস্থায় দেহের প্রতি কোষে ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জালকের মাধ্যমে বহন করিয়া লইয়া যায়। অক্সিহোমোগ্লোবিন, কোষের সংস্পর্শে আসিলে অক্সিজেন নিঃসৃত করে, তখন উহা প্রথমে লসিকারসে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং লসিকারস হইতে কোষগুলি অক্সিজেন গ্রহণ করে। কোষে অক্সিজেন প্রবেশ করিয়া উহার অন্তরস্থ খাদ্যবস্তু দহন করে এবং কার্বন-ডায়ক্সাইড নির্গত করে অর্থাৎ কলা-শ্বসনকার্য সমাপ্ত হয়। ইহাতে কার্বন-ডায়ক্সাইডের সহিত গতি-শক্তিও নিঃসৃত হয়। গতি-শক্তি, কোষগুলিকে উহাদের **বিপাকীয় কার্যের** (*Metabolic activities*) শক্তি দেয় এবং কার্বন-ডায়ক্সাইড ব্যাপন-ক্রিয়ার দ্বারা রক্তরসে মিশ্রিত হয়। শিরাগুলি

দেহ হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইড-মিশ্রিত রক্ত বহন করিয়া পুনরায় ফুসফুসে বা অন্য কোন শ্বসন-অঙ্গে জমা করে এবং তথায় বাহ্যিক শ্বসনকার্যের দ্বারা রক্তে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন-ডায়ক্সাইড দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। কার্বন-ডাক্সাইড রক্তরসে **বাইকার্বনেট** (*Bicarbonate*)-রূপে থাকে এবং শ্বসন-অঙ্গ হইতে ইহা পুনরায় কার্বন-ডায়কসাইডে পরিণত হইয়া বাহির হইয়া যায়। শিক্ষক যেমন পুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞানবৃদ্ধি করেন এবং পুনরায় পুস্তকের মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেন, সেইরূপ রক্তের মাধ্যমে দেহের কোষ ও কলাগুলি অক্সিজেন শোষণ করে এবং পুনরায় রক্তের মাধ্যমে দেহের কোষ ও কলাদি হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইড বাহির করিয়া লইয়া যায়। অতএব রক্ত অক্সিজেন ও কার্বন-ডায়ক্সাইড উভয়েরই বাহক।

শ্বসনকার্যের প্রকারভেদ (Types of Respiration) :

ব্যাঙ উভচর প্রাণী হওয়ায় বিবিধ উপায়ে ইহার শ্বসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ইহাদের গায়ের চামড়া সর্বদা জলসিক্ত থাকে এবং স্বভাবতঃই ইহারা মুখবিবর খুলিয়া চলাফেরা করে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিনপ্রকারের শ্বাসযন্ত্রের দ্বারা ব্যাঙ শ্বসনকার্য পরিচালন করে,—(১) **ফুসফুস** (*Lungs*), (২) **জলসিক্ত গায়ের চামড়া** (*moist skin*) এবং **(৩) মুখবিবরের পাতলা আস্তর** (*Mucous membrane of the buccal cavity*)।

(১) ফুসফুসীয় শ্বসনকার্য (Pulmonary respiration) :

ফুসফুসীয় শ্বসনকার্য নিম্নলিখিত যন্ত্রের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় ; যথা (i) বহিঃ-নাসারন্ধ্র, (ii) নাসানালী, (iii) অন্তঃ-নাসারন্ধ্র, (iv) মুখ-বিবর, (v) গ্লটিস, (vi) লেরিঙ্গো ট্রেকিয়াল প্রকোষ্ঠ, (vii) ব্রঙ্কাই, (viii) ফুসফুস।

ব্যাঙের ফুসফুস দুইটি এবং তাহা হৃদ্‌যন্ত্রের প্রতি পার্শ্বে বিদ্যমান ; ফুসফুসের গাত্র পাতলা এবং মৌমাছি চাকের মত খোপযুক্ত। ইহা ফাঁপা, ভরাট নহে এবং ইহার রঙ লালচে গোলাপ ফুলের মত। প্রতিটি ফুসফুসের অগ্রভাগ নলাকার। দুইটি নালী বা **ব্রঙ্কাই** (*Bronchi*) অগ্রভাগের **লেরিঙ্গো-ট্রেকিয়াল প্রকোষ্ঠ** (*Laryngo trancheal chamber*) বা **শব্দযন্ত্রের** (*Voice box*) সহিত মিলিত হয়। লেরিঙ্গো-ট্রেকিয়াল প্রকোষ্ঠের অগ্রভাগে **গ্লটিস** (*Glottis*) ছিদ্রের দ্বারা মুখ-বিবরটি (Buccal cvaity) যুক্ত। মুখবিবরের অগ্রভাগের উপর-চোয়ালের শীর্ষস্থানে **অন্তঃ-নাসারন্ধ্র** (*Internal nares*) বিদ্যমান। ইহা

বাহিরের সহিত **বহিঃ-নাসারন্ধ্র** (*External nostril*) দ্বারা যুক্ত। ফুসফুসের বাহিরের পাত্র মৌমাছির চাকের মত খোপযুক্ত। এইরূপ খোপ (Chamber)-গুলিকে **বাতাস-থলি** (*Air sacs*) বা **এলভিওলাই**
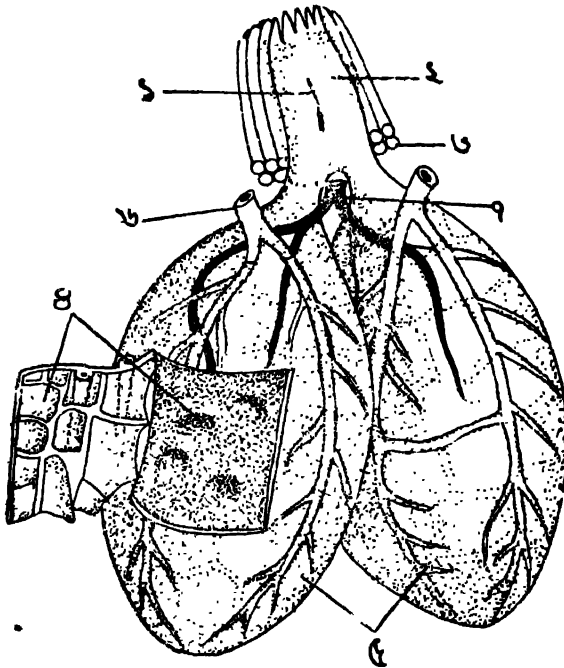
৭০নং চিত্র

ব্যাঙের ফুসফুসের পার্শ্ব-অক্ষীয়দেশ দেখান হইতেছে।

১, গ্লটিস ; ২, স্বর ও শ্বাসপ্রকোষ্ঠ ; ৩, অ্যারোটিনয়েড তরুণাস্থি খণ্ড ;
৪, এলভিওলাই ; ৫, ফুসফুস ; ৬, ফুসফুসীয় ধমনী ; ৭, ফুসফুসীয় শিরা।
প্রতিটি ফুসফুসের সরু গলাটিকে ব্রঙ্কাস (Bronchus) বলে।

(*Alveoli*) বলা হয়। প্রতিটি বাতাস-থলিতে একটি করিয়া অতি সূক্ষ্ম **ফুসফুসীয় ধমনী** (*Pulmonary artery*)-শাখা প্রবেশ করে এবং ইহা জালকে বিস্তারিত হইয়া উক্ত বাতাস-থলিতে ছড়াইয়া পড়ে। বাতাস-থলির এপিথিলিয়ম কোষগুলিতে রক্ত সরবরাহ হয় এবং ধমনী-জালক হইতে শিরা-জালকের সৃষ্টি হয়। শিরা-জালক কোষ হইতে রক্তের দূষিত পদার্থ মুক্ত করিয়া হৃদ্‌যন্ত্রে পুনরায় রক্ত সরবরাহ করে। ফুসফুসের এপিথিলিয়ম সিক্ত হওয়ায় উহার দ্বারাই ব্যাপন প্রক্রিয়ার সাহায্যে

রক্তে অক্সিজেন-কার্বন-ডাইঅক্সাইডের বিনিময় হয়। রক্তে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন ডায়কসাইড রক্তের রক্তরস হইতে বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়।

শ্বাসপ্রণালী (**Machanism of Respiration**) : ফুসফুসে শ্বসনকার্যের প্রণালী **নিশ্বাস গ্রহণ** (*Inspiration*) এবং **প্রশ্বাস ত্যাগ** (*Expiration*)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথমে ব্যাঙ মুখ বন্ধ করে এবং ইহাতে
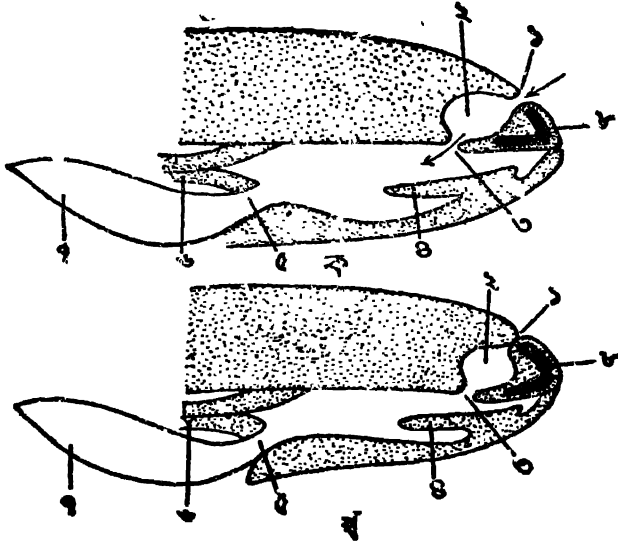
৭১নং চিত্র

ফুসফুসীয় শ্বাসক্রিয়ার প্রণালী দেখান হইতেছে।

ক, মুখবিবরের বাহির হইতে বাতাসের প্রবেশ দেখান হইতেছে ; খ, ফুসফুসে মুখবিবর হইতে বাতাসের প্রবেশ দেখান হইতেছে।

১, বহিঃ-নাসারন্ধ্র ; ২, অন্তঃ-নাসাগহ্বর (olfactory sac) ; ৩, অন্তঃ-নাসারন্ধ্র ; ৪, জিহ্বা ; ৫, গ্লটিস ; ৬, গ্যালেট বা গ্রাসনালী মুখ ; ৭, ফুসফুস।

নীচের চোয়াল নামিয়া যায়, ফলে মুখবিবরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এই সময় বহিঃ ও অন্তঃ-নাসারন্ধ্র মুক্ত হওয়ায় বাহিরের বাতাস পথ দিয়া মুখবিবরের আয়তন বৃদ্ধি হেতু প্রবেশ করে। শ্বাসকার্যের এই পদ্ধতিটিকে **বাতাস প্রবেশ** (*Aspiration*) বলে। এই সময় গ্লটিস-ছিদ্র বন্ধ থাকায় বাতাস বেশ কিছুক্ষণ মুখবিবরের মধ্যে থাকে।

ইহার পর ফুসফুস দুইটির পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়। ইহার ফলে কার্বন-ডায়কসাইড মিশ্রিত বাতাস ফুসফুসের ভিতর হইতে বাহির হইয়া মুখ-বিবরের ভিতর প্রবেশ করে। কিন্তু বাতাস-প্রবেশ পদ্ধতি অনুসারে মুখবিবরের বাহির হইতে বাতাস আগে হইতেই ভর্তি থাকে এবং ফুসফুসের উপরোক্ত কার্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাসপূর্ণ বাতাস পুনরায় প্রবেশ করিয়া মুখবিবরের চারিপাশে প্রবলবেগে চাপ দেয়। ফুসফুস হইতে মুখবিবরের বাতাসের গতিকেই **প্রশ্বাসগ্রহণ** (*Expiration*) বলা হয়। এই পদ্ধতির ফলে মুখবিবরের কিছুটা বাতাস অন্ততঃ বহিঃ-নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহাতে মুখবিবরের কিছু বাতাস বাহিরে চলিয়া গেলেও অধিকাংশ বাতাস থাকিয়া যায়।

ঠিক ইহার পরেই ব্যাঙের মুখবিবরের তলটি পেশী সঙ্কোচনের দ্বারা পুনরায় উপরে উঠিয়া স্বাভাবিক হইয়া যায়। ইহার ফলে বহিঃ-নাসারন্ধ্রের ছিদ্র ও মুখের ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায় এবং মুখবিবরের আয়তন ক্ষুদ্রতর হয়। ইহাতে মুখবিবরের বাতাসের উপর চাপ পড়ে। কেবলমাত্র গ্লটিস ছিদ্রযুক্ত থাকায় বাতাস সবেগে ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করে। শ্বসন-কার্যের এই পদ্ধতিকে **নিশ্বাসগ্রহণ** (*Inspiration*) বলা হয়। সুতরাং ফুসফুসের ভিতর বহিরাগত বাতাস এবং ফুসফুস হইতে ফিরিয়া আসা বাতাস একত্রিত হইয়া বা মিশ্রিত হইয়া প্রবেশ করে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাঙ মুখছিদ্র বন্ধ করিয়া থাকে এবং ইহার মুখ-বিবরের তল উঠা-নামা করিতে দেখা যায়। ইহার দ্বারাই বোঝা যায় যে, ব্যাঙ শ্বসনকার্য পরিচালনা করিতেছে। মুখবিবরের তল উঠা নামা করার জন্যই শ্বসনকার্য কার্যকরী হয়। মুখবিবরের তলে **হাওয়েড** (*Hyoid Cartilage*) তরুণাস্থি থাকে এবং উহার সংযুক্ত পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের জন্যই মুখবিবরের তল উঠা-নামা করে। অতিরিক্ত অক্সিজেন প্রয়োজনের সময় ব্যাঙ কেবলমাত্র ফুসফুসের দ্বারা শ্বসনকার্য পরিচালনা করে। সাধারণতঃ ইহারা মুখ-বিবরের ভিতরকার এপিথিলিয়ম কোষের দ্বারা এবং সিক্ত চামড়ার দ্বারাই শ্বসন-পদ্ধতির সাহায্যে দেহের অক্সিজেনের চাহিদা মেটায়।

২। মুখবিবরের পাতলা আস্তরের সাহায্যে শ্বসনকার্য (Respiration by the living membraue of the buccal cavity) :

ব্যাঙের মুখবিবরের পাতলা আস্তর বা এপিথিলিয়ম পর্দায় শিরার

জালকে পূর্ণ থাকে এবং এইজন্যই মুখবিবরের অন্তস্তরটি দেখিতে লাল হয়। ফুসফুসের দ্বারা শ্বাসকার্যের সময় মুখবিবরের ভিতর বাহিরের বাতাস বেশ কিছুক্ষণ থাকে। ইহার ফলে এপিথিলিয়ম পর্দার রক্ত হইতে ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা কার্বন-ডায়ক্সাইড বাহির হইয়া আসে এবং অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে। ব্যাঙের অধিকাংশ রক্ত এইভাবে অক্সিজেন শোষণ করে।

৩। **সিক্ত চামড়ার সাহায্যে শ্বসনকার্য (Respiration by the Moist skin) :**

ব্যাঙ উহার প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসারে সর্বদাই জলের ধারে বাস করে। বাতাস এইরূপ সিক্ত চামড়ার সংস্পর্শে আসিলে কিছুটা ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা চামড়ার ভিতর দিয়া প্রবেশ করে। ফুসফুসীয় চার্ম-ধমনীর শাখা ব্যাঙের চামড়ার অতি সূক্ষ্ম জালকে পরিণত হইয়া ছড়াইয়া থাকে। ইহার ভিতরকার রক্ত বাতাস হইতে অক্সিজেন শোষণ করিতে পারে এবং রক্তরসের কার্বন-ডায়ক্সাইড বাহির করিয়া দেয়। ব্যাঙের **শীতঘুমের** (*Hibernation*) সময় উহারা কেবলমাত্র চামড়ার দ্বারা শ্বসনকার্য পরিচালনা করে। উপরোক্ত-তিন প্রকার শ্বসন-প্রণালীর মধ্যে চামড়ার দ্বারা শ্বসনকার্য সর্বদাই কার্যকরী হয়। ব্যাঙাচি ব্যাঙের লার্ভা দশা। এই দশায় ব্যাঙাচির মাথার দুইধার হইতে **ফুলকা** (*Gill*) বাহির হয়। ফুলকাগুলি রক্তজালকে পূর্ণ থাকে। ব্যাঙাচি সাধারণতঃ জলেই জীবনযাপন করায় ফুলকাগুলি জলের সংস্পর্শে আসে। ইহার ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ফুলকার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ফুলকার রক্তরস হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইড বাহির হইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। বলা বাহুল্য, ইহাও ব্যাপন-প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয়।

স্নায়ুতন্ত্র
(Nervous System)

জীবের নানাবিধ তন্ত্রের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রের প্রাধান্য সর্বাধিক। এই তন্ত্রের সাহায্যেই প্রাণী উহার পরিবেশ অনুযায়ী নিজ জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। এই তন্ত্র প্রাণীর প্রতিটি অঙ্গের কার্যকারিতার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখে। শুধু ইহাই নহে, অন্যান্য তন্ত্রগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত

সহযোগিতা বজায় রাখিয়া যাহাতে এককভাবে প্রাণীর জীবনের সকল বিপাকীয় কার্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহাও স্নায়ুতন্ত্রের বহুকার্যের মধ্যে একটি প্রধান কার্য। এই তন্ত্রটি দেহের সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া থাকায় সহজে ইহার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য তন্ত্রটি তিনভাগে ভাগ করিয়া বর্ণনা করা হয়; যথা—(১) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (*Central nervous system*): এই তন্ত্রের **মস্তিষ্ক** (*Brain*) ও **সুষুম্নাকাণ্ড** (*Spinal cord*) অন্তর্গত। (২) **পার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্র** (*Peripheral nervous system*): **মস্তিষ্ক হইতে করোটি স্নায়ু** (*Cranial Nerve*) এবং সুষুম্নাকাণ্ড হইতে বিবিধ স্নায়ু সমন্বয়ে এই তন্ত্রটি গঠিত। (৩) **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র** (*Autonomic nervous system*): এই তন্ত্রটি অনেকগুলি স্নায়ুগ্রন্থিযুক্ত সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু দ্বারা গঠিত। সুষুম্নাকাণ্ডের প্রতি পার্শ্বে লম্বালম্বিভাবে একটি করিয়া সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু থাকে।

১। **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (**Central nervous system**): ব্যাঙের পৃষ্ঠমধ্যরেখার উপর লম্বালম্বিভাবে এই তন্ত্রটি বিদ্যমান। ইহার স্থূল, ফাঁপা অগ্রাংশটি করোটির ভিতর থাকে। ইহাকে **মস্তিষ্ক** বা **মগজ** (*Brain*) বলা হয়। মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগ সরু হইয়া সুষুম্নাকাণ্ডে পরিণত হয়। **সুষুম্নাকাণ্ডটি** (*Spinal cord*) কশেরুকার ভিতর দিয়া দেহের পৃষ্ঠদেশে লম্বালম্বিভাবে থাকে। মস্তিষ্কের মত সুষুম্নাকাণ্ডটিও ফাঁপা। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতরকার ফাঁপা অংশে একপ্রকার রস থাকে। ইহাকে **মস্তিষ্ক সুষুম্নারস** (*Cerebro Spinal fluid*) বলা হয়। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের ফাঁপা অংশকে পরিবেষ্টিত করিয়া যে-সব কঠিন অংশগুলি থাকে, তাহা **স্নায়ুকোষ** (*Neuron*) দ্বারা গঠিত। আগেই বলা হইয়াছে, স্নায়ু-কোষের বিবিধ শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। কোষগুলি মাকড়সার জালের মত। স্নায়ুকোষের যে শাখাটি সোজা বাহির হয় ও প্রশাখাহীন হয়, তাহাকে **অ্যাক্সন** (*Axon*) বলা হয়। অন্যান্য প্রশাখাবিশিষ্ট শাখাগুলিকে **ডেনড্রন** (*Dendron*) বলে। সাধারণতঃ স্নায়ুকোষের শাখার চারিপাশে **নিউরিলিমা** (*Neurilemma*) আবরণী থাকায় উহাকে স্নায়ুকোষের **স্নায়ুতন্তু** (*Nerve fibre*) বলে। মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের কঠিন অংশগুলি স্নায়ুকোষ দ্বারা গঠিত এবং উহাদের হইতে নির্গত স্নায়ুগুলি কতকগুলি স্নায়ুতন্ত্র সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ মস্তিষ্কের ভিতরের অংশগুলি

শ্বেতবর্ণের স্নায়ুতন্তুর দ্বারা গঠিত হয়। সেইজন্য এই অঞ্চলকে মস্তিষ্কের **শ্বেত-পদার্থ অঞ্চল** (*White matter*) বলা হয়। মস্তিষ্কের বাহিরের
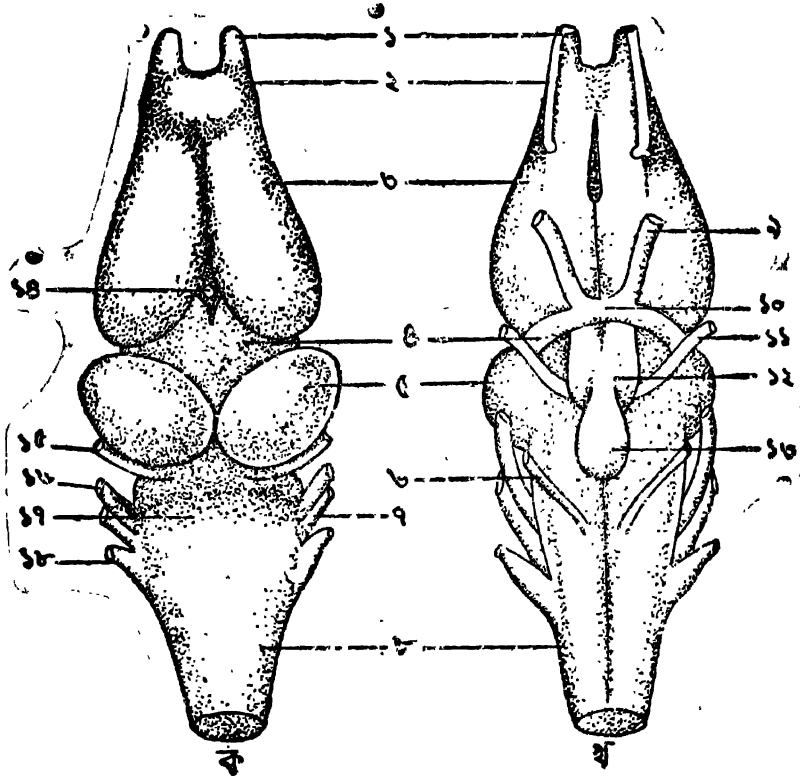
৭২নং চিত্র

ব্যাঙের মস্তিষ্কের বহিরাকৃতি দেখান হইতেছে ; ক, পৃষ্ঠদেশ ; খ, অঙ্কীয় দেশ।

১, ঘ্রাণস্নায়ু ; ২, ঘ্রাণকেন্দ্র ; ৩, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ; ৪, থ্যালামেন সেফালন অঞ্চল ; ৫, দর্শনকেন্দ্র ; ৬, করোটির ষষ্ঠ স্নায়ু (Abducens) ; ৭, করোটির অষ্টম স্নায়ু (Auditory) ; ৮, সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla Obl. ngata) ; ৯, করোটির দ্বিতীয় স্নায়ু (Optic) ; ১০, অপটিক কায়েজমা (Optic Chiasma) ; ১১, করোটির তৃতীয় স্নায়ু (Oculomotor) ; ১২, হাইপো-ফাইসিস ; ১৩, পিটুইটারি গ্রন্থি ; ১৪, পিনিয়াল বডি ; ১৫, করোটির চতুর্থ স্নায়ু (Pathetic) ; ১৬, করোটির পঞ্চম ও সপ্তম স্নায়ু (Trigemenal and Facial) ; ১৭, সেরিবেলম (Cerebellum) ; ১৮, করোটির নবম ও দশম স্নায়ু (Glosso-pharyngeal and vagus)

অঞ্চলটি ধূসর বর্ণের হয়। কারণ এই অঞ্চলটি স্নায়ুকোষ দ্বারা গঠিত। স্নায়ুকোষগুলির নিউক্লিয়াস ধূসর বর্ণের হওয়ায় মস্তিষ্কের বহিরাঞ্চলটি ধূসর বর্ণ ধারণ করে এবং ইহাকে মস্তিষ্কের **ধূসর পদার্থ** (*Grey matter*)

অঞ্চল বলে। কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুব্যবস্থা এরূপ নহে। উহার ভিতরের অঞ্চল স্নায়ুকোষবিশিষ্ট ধূসর পদার্থের দ্বারা গঠিত এবং বাহির অংশটি স্নায়ুতন্তু বা শ্বেত পদার্থের দ্বারা গঠিত। সুতরাং স্নায়ুকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা দেখা যায়। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড পর পর দুইটি আবরণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রথম বা বাহিরের আবরণীটি স্থূল এবং ইহাকে **ডুরামেটার** (*Duramater*) বলা হয়। দ্বিতীয় বা ভিতরের পাতলা আবরণীটিকে **পায়ামেটার** (*Piamater*) বলে।

(*i*) **মস্তিষ্ক (Brain) :** করোটির ভিতর মস্তিষ্ক বিদ্যমান। ইহাকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া বর্ণনা করা হয় ; যথা—**অগ্রমস্তিষ্ক** (*Fore brain*), **মধ্যমস্তিষ্ক** (*Mid brain*) এবং **পশ্চাদ্-মস্তিষ্ক** (*Hind brain*)। আবার অগ্রমস্তিষ্ক ও পশ্চাদ্-মস্তিষ্ককে বিবিধ অঞ্চল অনুযায়ী পুনরায় ভাগ করা হয়। মোটের উপর সমগ্র মস্তিষ্কটিকে উহার অগ্রভাগ হইতে পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা—

ক। **অগ্র-মস্তিষ্ক (Fore-brain)**	অগ্রমস্তিষ্কের উপরভাগ বা **টেলেনসেফালন**। (Telencephalon ; Tel = *end*, cephalon = *brain.*)
	অগ্রমস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগ বা **ডায়েনসেফালন** (Diencephalon ; Di = *between.*)
খ। **মধ্য-মস্তিষ্ক (Mid-brain)**	**মেসেনসেফালন** (Mesencephalon ; Mes = *middle.*)
গ। **পশ্চাদ-মস্তিষ্ক (Hind-brain)**	পশ্চাদ্মস্তিষ্কের অগ্রভাগ বা **মেটেনসেফালন**। (Metencephalon ; met = *after.*)
	পশ্চাদ্-মস্তিষ্কের পশ্চাদ্-অঞ্চল বা **মাইলেনসেফালন**। (Myelencephalon ; (Myelon = *spinal cord.*)

ক। **অগ্রমস্তিষ্ক** (**Fore-brain**) : ব্যাঙের অগ্রমস্তিষ্ক অঞ্চলটি টেলেনসেফালন ও ডায়েনসেফালন অঞ্চলে বিভেদিত। টেলেনসেফালনের অগ্রভাগে একজোড়া ছোট ছোট **ঘ্রাণকেন্দ্র অঞ্চল** (*Olfactory lobe*) বিদ্যমান। এই অঞ্চলের দ্বারা ব্যাঙ ঘ্রাণশক্তি অর্জন করে। টেলেনসেফালনের বাকি অংশটি দুইটি বড় গোলাকার অঞ্চলে বিভেদিত। এই দুইটি অঞ্চলকে **গুরুগোলার্ধ** (*Cerebral hemisphere*) বলা হয়। ইহা ঘ্রাণকেন্দ্রের ঠিক নিম্নে বিদ্যমান। গুরুগোলার্ধের তলদেশ স্থূল হইয়া একটি বৃহৎ স্নায়ুগ্রন্থির সূচনা করে। ইহাকে **করপাস স্ট্রিয়াটম** (*Corpus striatum*) বলা হয়। গুরুগোলার্ধের উপরিভাগ ও পার্শ্বদেশ পাতলা হয় এবং এই অঞ্চলকে **পেলিয়ম** (*Pallium*) বলা হয়। গুরুগোলার্ধ অঞ্চলটি বুদ্ধি, মননশক্তি, স্মরণশক্তি ও ভাবপ্রবণতার জন্য দায়ী। ব্যাঙের এই অঞ্চলটি উন্নত ধরনের না হওয়ায়, উপরোক্ত গুণগুলি তেমন পরিলক্ষিত হয় না। অগ্রমস্তিষ্কের পশ্চাদ্দেশ বা ডায়েনসেফালন অঞ্চলটি চাপা এবং গুরুগোলার্ধের পশ্চাদ্ভাগের মধ্যে বিদ্যমান। মস্তিষ্কের পৃষ্ঠঅঞ্চলে এই স্থানে একটি সরু লম্বাকার অঞ্চল দেখা যায়। ইহাকে **এপিফাইসিস** (*Epiphysis*) বলা হয়। ইহার অগ্রভাগে একটি সূক্ষ্ম, গোলাকার বস্তু দেখা যায়। ইহাকে **পিনিয়াল বডি** (*Pineal body*) বলা হয়। এপিফাইসিসের ও পিনিয়াল বডির সঠিক কার্যকারিতা জানা যায় না। এপিফাইসিসের সম্মুখে একটি **সংবহন পর্দা** (*Vascular membrane*) দেখা যায়। ইহাকে **অগ্রভাগের কোরয়েড সংযোগ** (*Anterior choroid plexus*) বলা হয়। ডায়েনসেফালনের অঙ্কীয় দেশের উপর দিয়া একটি **দৃষ্টি-স্নায়ু** (*Optic nerve*) পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। ডানদিকের দৃষ্টি-স্নায়ু বামদিকে এবং বামদিকের দৃষ্টি-স্নায়ু ডানদিকে অগ্রসর হওয়ায় "X"-এর মত আকার ধারণ করিয়া উহারা ডায়েনসেফালনের অঙ্কীয় দেশের উপর বিদ্যমান। ইহাকে **দৃষ্টিচ্ছেদ** (*Optic Chiasma*) বলা হয়। দৃষ্টি-ছেদের নিম্নে চাপা আয়তাকার অঞ্চলটি **হাইপোফাইসিস বা ইনফানডিবলুম** (*Hypophysis or infundibulum*) বলা হয়। ইহার পশ্চাদ্ভাগের সহিত একটি গোলাকার **গ্রন্থি** আটকাইয়া থাকে। এই গ্রন্থিটিকে **পিটুইটারি বডি** (*Pituitary body*) বলা হয়। পিটুইটারী বডি প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের কোন অঞ্চল নহে এবং স্নায়ুকোষের সাথেও

ইহার কোন সংযোগ নাই। ইহা **গলবিল** (*Pharynx*) হইতে ব্যাঙের দেহ-বৃদ্ধি সময় ইহা সৃষ্ট হইয়া মস্তিষ্কের উপরোক্ত অঞ্চলে আটকাইয়া থাকে। ইহা একটি **উদ্বোধক গ্রন্থি** (*Endo-cranial gland*) এবং ইহার নিঃসৃত রসের দ্বারা ব্যাঙের দেহবৃদ্ধি বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া ছাড়াও জননকোষ-পুষ্টি সাধিত হয়। ডায়েনসেফালনের দুই পাশ বেশ পুরু হওয়ায় এই অঞ্চল দুইটিকে **থ্যালামাস** (*Thalamas*) বলা হয়।

খ। মধ্য-মস্তিষ্ক (*Mid-brain or Mesencephalon*): এই অঞ্চলটি অগ্র ও পশ্চাৎ অঞ্চল অপেক্ষা বৃহত্তর। স্থূল মধ্য-মস্তিষ্ক অঞ্চলের দুই ধারে একটা করিয়া গোলাকার অংশ দেখা যায়। মস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশে পাশাপাশি এই দুইটি অংশ থাকে। ইহাদের ভিতরটাও ফাঁপা। ইহাদের **দৃষ্টি-কেন্দ্র অঞ্চল** বা **করপোরা বাইজিমিনা** (*Optic lobes or Corpora Bigemina*) বলা হয়। দৃষ্টিকেন্দ্র অঞ্চলের অঙ্কীয় দেশে দুইটি স্নায়ুপেশী লম্বালম্বিভাবে মস্তিষ্কের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগকে যুক্ত করে। এই একটি স্নায়ু পেশী-খণ্ডকে **ক্রুরা-সেরিব্রি** (*Crura cerebri*) বলা হয়। দৃষ্টিকেন্দ্র-অঞ্চল জীবের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির জন্য দায়ী।

গ। পশ্চাদ্-মস্তিষ্ক (**Hind-brain**)**:** পশ্চাদ্-মস্তিষ্ক মেটেনসেফালন ও মাইলেন-সেফালন অঞ্চলে বিভেদিত। দৃষ্টিকেন্দ্র অঞ্চলের ঠিক নিম্নে মস্তিষ্কের পৃষ্ঠদিকে আড়াআড়িভাবে একটি পাতলা অংশ দেখা যায়। এই অংশটিকে **সেরিবেলম** (*Cerbellum*) বলা হয়। সেরিবলম মেটেন-সেফালন অঞ্চলে বিদ্যমান এবং চলন-প্রক্রিয়ার সময় বিবিধ অঙ্গের সংযোজন করাই এই অংশের কার্য। পশ্চাদ্ মস্তিষ্কের মাইলেনসেফালন অঞ্চলকে সুষুম্নাশীর্ষ বা **মেডুলা অবলংগাটা** (*Medulla oblongata*) বলা হয়। এই অঞ্চলের তল ও দুইধার বেশ পুরু। ইহার উপরে একটি সংবহন পর্দা থাকে। ইহাকে **পশ্চাদ্ভাগের করোয়েড সংযোগ** (*Posterior Choroid Plexus*) বলা হয়। ব্যাঙের যাবতীয় বিপাকীয় কার্য, যথা—শ্বসনকার্য, হৃদযন্ত্রের সংবহনকার্য ইত্যাদি এই অঞ্চলেরই দ্বারা পরিচালিত হয়। মেডুলা অবলংগাটা ধীরে ধীরে সরু হইয়া **সুষুম্নাকাণ্ডে** (*Spinal Cord*) পরিণত হয়। সুষুম্নাকাণ্ড করোটির নিম্নস্থ ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া আসে এবং কশেরুকার ভিতর দিয়া ব্যাঙের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার উপর লম্বালম্বি ভাবে থাকে।

মস্তিষ্কের বিবিধ গহ্বর (*Cavities of the Brain*) : মস্তিষ্কের বিবিধ অঞ্চলের ভিতর ফাঁপা গহ্বরগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত। আবার মস্তিষ্কের গহ্বরগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের গহ্বরের সহিত যুক্ত। মস্তিষ্কের গহ্বরগুলিকে **প্রকোষ্ঠ** (*Ventricle*) বলা হয়। দুইটি গুরুগোলার্ধের ভিতর বা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের ভিতর একটি করিয়া লম্বালম্বিভাবে প্রকোষ্ঠ থাকে। এই দুইটি প্রকোষ্ঠকে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ বলা হয়। ইহাদের **পার্শ্ব-প্রকোষ্ঠও** (*Lateral ventricle*) বলা হয়। মস্তিষ্কের ডায়েনসেফালন অঞ্চলের প্রকোষ্ঠটিকে **তৃতীয় প্রকোষ্ঠ** (*Third Ventricle*) বলা হয়। তৃতীয় প্রকোষ্ঠটি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের সহিত একটি ছিদ্রের দ্বারা সংযুক্ত। এই ছিদ্রটিকে **মনরো ছিদ্র** (*Foramen of Monro*) বলা হয়। সুষুম্নাশীর্ষকের ভিতর-গহ্বর বা প্রকোষ্ঠটি বৃহৎ, কিন্তু অগভীর। এই প্রকোষ্ঠটিকে **চতুর্থ প্রকোষ্ঠ** (*Fourth Ventricle*) বলা হয়। চতুর্থ প্রকোষ্ঠটি তৃতীয় প্রকোষ্ঠের সঙ্গে একটি সরু নলাকার গহ্বরের দ্বারা সংযুক্ত। এই নলাকার গহ্বরটিকে **ইটার** বা **একুইডাক্ট অফ সিলিভিয়াস** (*Iter or Aqueduct of Sylvius*) বলা হয়। দৃষ্টিকেন্দ্র অঞ্চলের প্রকোষ্ঠ দুইটিও দুইপাশ হইতে ইটারের সহিত যুক্ত থাকে। চতুর্থ প্রকোষ্ঠটি সুষুম্নাকাণ্ডের গহ্বরের সহিত মিলিত হইয়া উহার শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া থাকে।
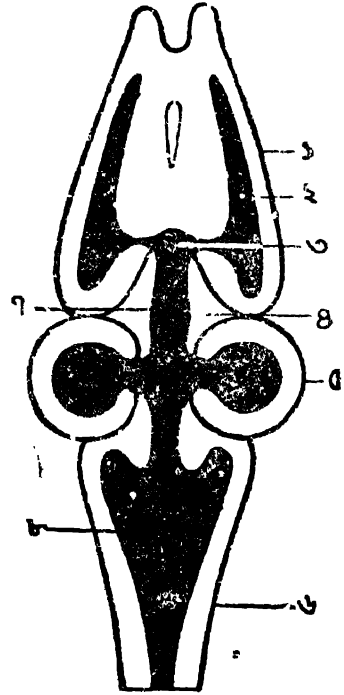
৭৩নং চিত্র

মস্তিষ্কের বিবিধ গহ্বর দেখান হইতেছে। ১, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার; ২, পার্শ্ব-গহ্বর; ৩, মনরোর ছিদ্র; ৪, থালামেন সেফালেন; ৫, অপটিক বা দৃষ্টিকেন্দ্র; ৬, মেডুলা অবলংগাটা বা সুষুম্নাশীর্ষক; ৭, তৃতীয় গহ্বর; ৮, চতুর্থ গহ্বর।

সুষুম্নাকাণ্ড (**Spinal cord**): মস্তিষ্কের **শীর্ষক** (*Medulla oblongata*) অঞ্চলের পশ্চাদ্ভাগ হইতে সুষুম্নাকাণ্ডের সৃষ্টি। ইহা **করোটির** (*Skull*) **মহাবিবর** (*Foramen Magnum*) ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া লম্বালম্বিভাবে প্রতিটি **কশেরুকার** (*Vertebrae*) নিউরাল নালীর মধ্য দিয়া **ইউরোস্টাইল** (*Urostyle*) বা শেষ কশেরুকার ভিতর সমাপ্ত
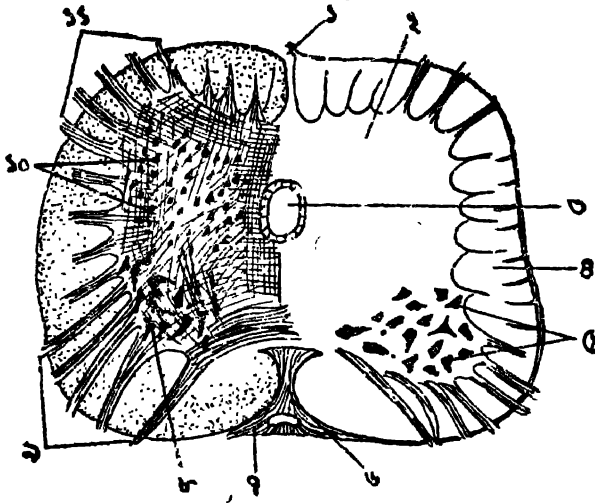
৭৪নং চিত্র

সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে।

১, পৃষ্ঠ-নালা (Dorsal fissure); ২, ধূসর পদার্থের পৃষ্ঠভাগ (dorsal horn of the grey matter); ৩, নিউরোসিল; ৪, শ্বেত পদার্থ অঞ্চল (white matter); পৃষ্ঠভাগের স্নায়ুকোষ (nerve cells of dorsal horn); ৬, অঙ্কীয় নালা (ventral fissure); ৭, পায়ামেটার; ৮, ধূসর পদার্থের অঙ্কীয় ভাগ (ventral horn of the grey matter); ৯, সুষুম্নাকাণ্ডের অঙ্কীয় মূল হইতে অন্তর সৃষ্টি; ১০, স্নায়ুকোষ; ১১, সুষুম্নাকাণ্ডের পৃষ্ঠদেশের মূল হইতে তন্তুর সৃষ্টি।

হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের ইউরোস্টাইলের অন্তরস্থ শেষ অংশটিকে **ফিলাম টারমিনাল** (*Filum terminal*) বলা হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার এবং অঙ্কীয়-মধ্যরেখার উপর দিয়া লম্বালম্বিভাবে একটি করিয়া **চাপা নালা** (*Groove*) থাকিতে দেখা যায়। পৃষ্ঠমধ্যরেখার চাপা নালাটিকে **পৃষ্ঠ-নালা** (*Dorsal fissure*) এবং অঙ্কীয় মধ্যরেখার চাপা নালাটিকে **অঙ্কীয় নালা** (*Ventral fissure*) বলা হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রস্থ গহ্বরটিকে **কেন্দ্র গহ্বর** বা **নিউরোসিল** (*Ventral canal or Neurocel*) বলা হয়।

ইহাই মস্তিষ্কের চতুর্থ প্রকোষ্ঠের সহিত যুক্ত থাকে। মস্তিষ্কের মত সুষুম্নাকাণ্ডের দুইটি আবরণী পর্দা থাকে। বহিঃপর্দাটিকে **ডুরামেটার** (*Duramater*) এবং অন্তঃ-পর্দাটিকে **পায়ামেটার** (*Piamater*) বলা হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের নিউরোসিল গহ্বরের চারিপাশে স্নায়ুকোষবিশিষ্ট **ধূসর পদার্থ** (*Grey matter*) বিদ্যমান। স্নায়ুকোষগুলি নিউরোসিলের চারিপাশে ডানা খোলা প্রজাপতির মত বিন্যস্ত থাকে। **শ্বেত পদার্থ** (*White matter*) ধূসর পদার্থটিকে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে। শ্বেত-পদার্থটি স্নায়ুতন্তুর দ্বারা গঠিত।

২। পার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্র (The Peripheral Nervous System) :

মস্তিষ্কের করোটির **জোড়া স্নায়ুগুলির** (*Cranial nerves*) এবং **সুষুম্নাকাণ্ডের জোড়াস্নায়ুগুলির** (*Spinal nerves*) বিন্যাসকে ব্যাঙের পার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্র বলা হয়। স্নায়ুকোষ বা নার্ভকোষগুলি মাকড়সার মত। ইহার বহু শাখার মধ্যে প্রশাখাহীন লম্বা শাখাটিকে অ্যাকসন বলা হয়। অ্যাকসন শাখা স্নায়ুকোষের সাইটোপ্লাজম হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। অ্যাকসনের চারিপাশে বেষ্টন করিয়া থাকে স্নায়ু আবরণী বা নিউরিলিমা। নিউরিলিমা পরিবেষ্টিত অনেকগুলি অ্যাকসন একত্রিত হইয়া একটি নার্ভ বা স্নায়ুর সৃষ্টি করে। প্রতিটি নিউরিলিমা-বেষ্টিত অ্যাকসনকে স্নায়ুতন্তু বা নার্ভতন্তু বলে। সুতরাং লম্বা লম্বা এক এক গোছা স্নায়ুতন্তুর অপর নাম **স্নায়ু** বা **নার্ভ** (*Nerve*)। স্নায়ুকোষের নিউক্লিয়সগুলি ধূসর রঙের হয় এবং ইহারা একটি স্তর নির্মাণ করে। এই স্তরকেই মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের **ধূসর পদার্থ** (*Grey matter*) অঞ্চল বলা হয়। ইহাদের সাইটোপ্লাজম হইতে নির্গত স্নায়ুতন্তুগুলি দেখিতে শ্বেত রঙের হয় এবং ইহাদের স্তরটি ধূসর পদার্থ নির্মিত স্তরটিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। ইহাদের স্নায়ুতন্তু স্তর বা শ্বেত পদার্থ অঞ্চল বলা হয়। মাঝে মাঝে অনেকগুলি স্নায়ুকোষ একসঙ্গে জড়ো হইয়া একটি স্থূল **স্নায়ুগ্রন্থির** (*Nerve ganglion*) সৃষ্টি হয়। স্নায়ুগুলির সংযোগস্থলে এই স্নায়ুগ্রন্থি প্রায়ই দেখা যায়। স্নায়ুতন্তু (Nerve fibre) ইহার কার্যকারিতা অনুসারে প্রধানতঃ দুই প্রকারের হয়। প্রথম প্রকার স্নায়ুতন্তু দেহের বিবিধ ইন্দ্রিয়, যথা—চক্ষু, কর্ণ, চামড়া ইত্যাদি হইতে উদ্দীপনার সংবাদ বহন করিয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিবিধ কোষে পৌঁছাইয়া দেয়।

এইরূপ স্নায়ুতন্তুকে **উদ্দীপক** বা **সংবেদ স্নায়ু** (*Sensory Nerve*) বলা হয় ; ইহাকে **অন্তর্মুখী** (*Afferent*) স্নায়ুও বলে। কারণ ইহারা স্নায়ুতন্ত্রের বাহির হইতে ভিতরে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার স্নায়ুতন্তু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্তু হইতে অনুজ্ঞা (Impulses) বহন করিয়া আনে এবং বিবিধ গ্রন্থি ও ঐচ্ছিক পেশীগুলিকে কার্যকরী করে। এইপ্রকার স্নায়ুতন্তুগুলিকে **চেষ্টীয়** বা **বহির্মুখী** (*Motor or Efferent*) স্নায়ু বলা হয়। সংবেদ স্নায়ু ও চেষ্টীয় স্নায়ু যথাক্রমে **সংবেদ-তন্তু** (*Sensory Fibre*) এবং চেষ্টীয় তন্তুর (*Motor Fibre*) দ্বারা গঠিত। আবার কতকগুলি স্নায়ু সংবেদন-তন্তু ও চেষ্টীয়-তন্তু একত্রিত হইয়া গঠিত হয়। ইহাদের **মিশ্র স্নায়ু** (*Mixed Nerve*) বলা হয়। মিশ্রস্নায়ু সংবাদ ও অনুজ্ঞা দুইই বহন করিয়া আনে অর্থাৎ বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী স্নায়ুকার্য একাই করিতে সক্ষম।

করোটির স্নায়ু (**Cranial Nerves**) : মস্তিষ্কের বিবিধ অঞ্চল হইতে দশ জোড়া স্নায়ু করোটির বিবিধ ছিদ্রপথে বাহির হইয়া ব্যাঙের নানা অঙ্গে প্রবেশ করে। ইহাদের **করোটির স্নায়ু** (*Cranial Nerve*) বলা হয়। এই স্নায়ুগুলির মধ্যে কতকগুলি সংবেদ-স্নায়ু, আবার কতকগুলি চেষ্টীয়-স্নায়ুরূপে কার্য করে। কতকগুলি আবার মিশ্র স্নায়ুরূপেও কার্য করিয়া থাকে। মস্তিষ্কের বিবিধ অঞ্চল হইতে স্নায়ুগুলি নির্গত হওয়ায় উক্ত অঞ্চলের নামানুসারে স্নায়ুগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। নিম্নে প্রতিটি স্নায়ুর উৎপত্তি অঞ্চল, বিস্তার, বিবিধ অঙ্গে প্রবেশ ও কার্যকারিতার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল :

(I) ঘ্রাণ-স্নায়ু বা অলফ্যাক্টারী নার্ভ (*Olfactory Nerve*) : ঘ্রাণ-স্নায়ুই করোটি-স্নায়ুর প্রথম স্নায়ু। ইহা মস্তিষ্কের ঘ্রাণকেন্দ্র অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া নাসিকার ভিতর প্রবেশ করে। প্রতিটি ঘ্রাণ-স্নায়ু সেই দিকের নাসিকার মিউকস পর্দায় সংবেদ কোষে ছড়াইয়া পড়ে। এই স্নায়ু জোড়া কার্যতঃ সংবেদ-স্নায়ু এবং ইহারা ঘ্রাণকার্যে ব্যবহৃত হয়।

(II) অক্ষি-স্নায়ু বা অপটিক নার্ভ (*Optic Nerve*) : ইহারা মস্তিষ্কের ডায়েনসেফালন অঞ্চলের দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে বাহির হইয়াছে। ডায়েনসেফালনের অঙ্কীয়দেশে পিটিউটারী গ্রন্থির ঠিক সম্মুখে ডানদিকের অক্ষি-স্নায়ুটি বামদিকে বাহির হইয়া যায় এবং বামদিকের অক্ষিস্নায়ুটি ডানদিকের স্নায়ুটিকে অতিক্রম করিয়া ডানদিকে বাহির হইয়া যায়। ইহাতে উক্ত দুইটি

স্নায়ু পিটিউটারী গ্রন্থির সম্মুখে ইংরাজী অক্ষরের "X"-এর মত আকার ধারণ করে। ইহাকে দৃষ্টি-ছেদ বা **অপটিক ক্যায়েজমা** (*Optic Chiasma*) বলা হয়। ডানদিকের অক্ষিস্নায়ুটি বাম দিকের চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহার **অক্ষিপটে** (*Retina*) ছড়াইয়া পড়ে। সেইরূপ বামদিকের অক্ষিস্নায়ুটি
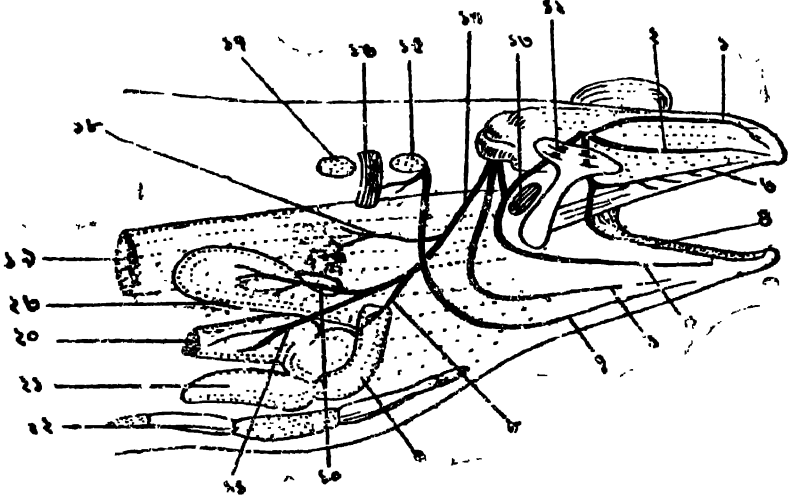
৭৫নং চিত্র

ব্যাঙের মস্তিষ্ক হইতে নির্গত করোটির স্নায়ুগুলির গতিপথ দেখান হইয়েছে।

১, অপথ্যালমিক স্নায়ু (v) : ২, প্যালাটাইন (vii) ; ৩, ম্যাক্সিলারি (v) ; ৪, ম্যানডিবুলার (v) ; ৫, হ্যায়োম্যানডিবুলার (vii) ; ৬, গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল (ix) ; ৭, প্রথম সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু ; ৮, লারিঞ্জিয়াল (x) ; ৯, হৃদ্‌যন্ত্রের ট্রাঙ্কাস অ্যার্টারিওসাস : ১০, পাল্‌মোনারি বা ফুসফুসীয় (x) ; ১১, কার্ডিয়েক (x) ; ১২, স্কোয়ামোজাল হাড় ; ১৩, ইউস্টেচিয়ান নালী ; ১৪, ভেনাস (x) ; ১৫, প্রথম সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুগ্রন্থি ; ১৬, প্রথম কশেরুকার ট্রান্‌স্‌ভার্স প্রসেস ; ১৭, সুষুম্নাকাণ্ডের দ্বিতীয় স্নায়ুগ্রন্থি ; ১৮, গ্যাস্ট্রীয় স্নায়ু (x) ; ১৯, পাকস্থলী ; ২০, সাইনাস ভেনোসাস ; ২১, হৃদ্‌যন্ত্র ; ২২, হৃদ্‌-অস্থি (Sternum) ; ২৩, ফুসফুস।

ডানদিকের চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহার অক্ষিপটে প্রবেশ করে। অক্ষিস্নায়ু দৃষ্টি-প্রদায়ী স্নায়ু এবং স্বভাবে ইহা সংবেদ।

(III) চক্ষুপেশী স্নায়ু বা অকুলোমোটর নার্ভ (Oculomotor Nerve) : মস্তিষ্কের মেসেনসেফালন অঞ্চলের অঙ্কীয় দেশ হইতে এই দুইটি স্নায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে। স্নায়ু দুইটি প্রতিদিকের চক্ষু-খোলকে প্রবেশ করিয়া সেই দিকের চক্ষুর চারিটি ঐচ্ছিক পেশীতে (Superior Rectus, Inferior

Rectus, Internal Rectus, Inferior Oblique) বিভাজন দ্বারা ছড়াইয়া পড়ে। চক্ষু উঠা-নামা করিতে ইহারা সাহায্য করে এবং স্বভাবে ইহারা চেষ্টীয় জাতীয়।

(IV) **সূক্ষ্ম চক্ষুপেশী স্নায়ু বা ট্রকলিয়ার নার্ভ** (**Trochlear or Pathetic Nerve**)ঃ ইহা করোটি স্নায়ুর চতুর্থ জোড়. এবং ইহা মস্তিষ্কের মেসেনসেফালন অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহারা অতীব সূক্ষ্ম স্নায়ু এবং করোটি হইতে বাহির হইয়া ইহারা চক্ষুখোলকে প্রবেশ করিয়াছে। চক্ষুখোলকের পঞ্চম **ঐচ্ছিক পেশীতে** (*Superior oblique*) ইহারা ছড়াইয়া পড়ে। চক্ষুর বিবিধ সঞ্চালনে ইহারা সাহায্য করে এবং স্বভাবে ইহারাও চেষ্টীয়-জাতীয়।

(V) **ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু** (**Trigeminal Nerve**)ঃ এই স্নায়ু দুইটি মস্তিষ্কের সুষুম্নাশীর্ষকের দুই পাশ হইতে নির্গত হইয়াছে। প্রতিটি স্নায়ু নির্গত হইবার পরেই স্থূল হইয়া গোলাকারে পরিণত হয়। ইহাকে গ্যাসেরিয়ান গ্রন্থি বা **প্রো-অর্টিক গ্রন্থি** (*Gasserian or Pro-ortic Ganglion*) বলা হয়। ইহার পর প্রতিটি স্নায়ু সরু হইয়া করোটি ছিদ্রপথে **কর্ণ-খোলকের** (*Auditory capsule*) সম্মুখ দিক দিয়া বাহির হইয়া আসে। করোটি হইতে বাহির হইবার পরেই প্রতিটি ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম শাখা-স্নায়ুটিকে **অপ্‌থ্যালমিক** (*Ophthalmic Nerve*) স্নায়ু বলা হয়। ইহা ক্ষুদ্রতম শাখা। অপ্‌থ্যালমিক স্নায়ুটি সোজা চক্ষু, খোলকের দিকে অগ্রসর হইয়া চোখের উপরকার চামড়া, মাথার শীর্ষাগ্রের চামড়া ও নাসিকার ভিতরকার মিউকাস বা শ্লেষ্মাপর্দায় ছড়াইয়া পড়ে। অপ্‌থ্যালমিক স্নায়ু স্বভাবে সংবেদী। ট্রাইজেমিনালের দ্বিতীয় শাখাটিকে **ম্যাক্সিলারি স্নায়ু** (*Maxillary Nerve*) বলা হয়। ইহা প্রতি পার্শ্বের উপরকার চোয়ালের ধার দিয়া অগ্রসর হয় এবং উপরোষ্ঠ, নিম্ন চক্ষু পর্দা ও উপরোষ্ঠের ভিতরকার মিউকাস পর্দায় ছড়াইয়া পড়ে। ম্যাক্সিলারি স্নায়ুও স্বভাবে সংবেদ। ট্রাইজেমিনালের তৃতীয় শাখাটিকে **ম্যাণ্ডিবিউলার স্নায়ু** (*Mandibular Nerve*) বলা হয়; স্নায়ুটি প্রথমে নীচের দিকে বেগে অগ্রসর হইয়া চোয়ালের কোণ অতিক্রম করে এবং পরে অধরোষ্ঠের বাহিরের দিক দিয়া অগ্রসর হয়। ম্যাণ্ডিবিউলার স্নায়ু ঐই সময় অধরোষ্ঠের চামড়ায় সংবেদ-তন্তুর দ্বারা ছড়াইয়া পড়ে এবং মুখবিবরের তলদেশের পেশীগুলিতে চেষ্টীয়-

তন্তু প্রবেশ করায়। সুতরাং ম্যাণ্ডিবিউলার স্নায়ু-শাখাটি স্বভাবে মিশ্র-জাতীয় হওয়ায় সমগ্র ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুটিকে মিশ্র স্নায়ুতে পরিণত করে।

(VI) অ্যাবডিউসেন্স (Abducens Nerve) : এই স্নায়ু দুইটি খুবই সরু এবং ইহারা সুষুম্নাশীর্ষক অঞ্চলের অঙ্কীয় দিক হইতে বাহির হইয়াছে। প্রতিটি স্নায়ু চক্ষুখোলকের দিকে অগ্রসর হইয়া চোখের ষষ্ঠ পেশীতে (External Rectus) ছড়াইয়া পড়ে। স্নায়ু দুইটি চক্ষু সঞ্চালনে সাহায্য করে। ইহারা স্বভাবে চেষ্টীয়।

(VII) মুখমণ্ডলের স্নায়ু বা ফেসিয়াল নার্ভ (Facial Nerve) : মস্তিষ্কের সুষুম্নাশীর্ষকের দুইধার হইতে মুখমণ্ডলের স্নায়ু দুইটি বাহির হইয়াছে। ইহা পঞ্চম স্নায়ু বা ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর উৎপত্তিস্থলের ঠিক পিছন হইতে বাহির হইয়াছে। প্রতিটি স্নায়ু গ্যাসেরিয়ান গ্রন্থির পিছন দিক দিয়া অগ্রসর হইয়া করোটির ছিদ্রপথে বাহির হয়। বাহির হইবার পরই প্রতিটি স্নায়ু দুইটি শাখা-স্নায়ুতে বিভক্ত হয়।

প্রথম শাখাটিকে **প্যালাটাইন** (*Palatine*) স্নায়ু বলা হয়। এই শাখাটি সোজা মুখবিবরের উপর দিকের মিউকাস পর্দায় অগ্রসর হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। ছড়াইয়া পড়িবার সময় এই শাখাটি ট্রাইজেমিনালের ম্যাক্সিলারি শাখার সহিত সূক্ষ্ম প্রশাখার দ্বারা যুক্ত হয়। মুখমণ্ডলের স্নায়ুর দ্বিতীয় শাখাটিকে **হ্যায়োম্যানডিবুলার** (*Hyomandibular*) স্নায়ু বলা হয়। এই শাখাটি মুখবিবরের তলদেশের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয় এবং **হ্যাওয়েড** (*Hyoid*) তরুণাস্থির পেশীগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার অন্যান্য প্রশাখা-কর্ণপটহ, ম্যানডিবুলার সংযোগে এবং মুখবিবরের তলদেশে মিউকাস পর্দায় প্রবেশ করে। মুখমণ্ডল-স্নায়ু বা ফেসিয়াল-স্নায়ু স্বভাবে মিশ্রজাতীয়।

(VIII) শ্রবণ স্নায়ু বা অডিটরী নার্ভ (Auditory Nerve) : মস্তিষ্কের সুষুম্নাশীর্ষকের দুই পাশ হইতে শ্রবণ-স্নায়ু দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাকে ফেসিয়াল-স্নায়ুর ঠিক নিম্নদেশ হইতে বাহির হইতে দেখা যায়। প্রতিটি শ্রবণ-স্নায়ু করোটি হইতে বাহির হইয়া কর্ণের অন্তঃকর্ণ অঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। স্নায়ুটি শ্রবণকার্য সম্পন্ন করে। শ্রবণ-স্নায়ু স্বভাবে সংবেদী জাতীয়।

(IX) গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল স্নায়ু (Glossopharyngeal Nerve) : সুষুম্নাশীর্ষক অঞ্চলের শ্রবণ-স্নায়ুর উৎপত্তিস্থান হইতে গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল স্নায়ু বাহির হয়। উৎপত্তির পর ইহা মস্তিষ্কের দশম স্নায়ু **ভেগাস** (*Vagus*) গ্রন্থির ভিতর প্রবেশ করে এবং ভেগাস গ্রন্থি হইতে বাহির হইয়া ফেসিয়াল-স্নায়ুর হ্যায়োম্যাণ্ডিবিউলার শাখার সহিত বহু প্রশাখার দ্বারা মিলিত হয়। প্রধান গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল শাখাটি পৌষ্টিক-নালীর গলবিলে কিছু প্রশাখার দ্বারা স্নায়ু প্রবেশ করায় এবং পুনরায় বক্রভাবে অগ্রভাগের দিকে অগ্রসর হইয়া মুখবিবরের তলদেশে পৌছায়। জিহ্বা ও তলদেশের পেশীগুলিতে গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল-স্নায়ু চেষ্টীয় তন্তু প্রবেশ করায়। সুতরাং গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল স্নায়ুও মিশ্রজাতীয়।

(X) ভেগাস বা নিউমোগ্যাস্ট্রিক স্নায়ু (Vagus of Pneumo-gastric Nerve) : ইহা করোটির শেষ বা দশম স্নায়ু। ইহা আকারে বেশ স্থুল এবং দৈর্ঘ্যে বৃহত্তম। মস্তিষ্কের সুষুম্নাশীর্ষকের অনেকগুলি মূলের (roots) দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়। প্রতিটি মূল বাহির হইবার পর মূলগুলি একত্রিত হইয়া একটি বেশ বড় স্নায়ুগ্রন্থির সৃষ্টি করে। ইহাকেই **ভেগাস গ্রন্থি** (*Vagus Ganglion*) বলা হয়। প্রতিটি ভেগাস স্নায়ু উপরোক্ত ভেগাস গ্রন্থি সৃষ্টির পর করোটির **বহিঃ-অক্সিপিটাল** (*ex-occipital*) অঞ্চল হইতে একটি ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া আসে। প্রথমে প্রতিটি ভেগাস স্নায়ু একটি সূক্ষ্ম-শাখাস্নায়ু উৎপন্ন করিয়া গলবিলের (Pharyngeal) গাত্রে প্রবেশ করায়। ইহার পর ভেগাস স্নায়ুটি পিছনের দিকে বাঁকিয়া গিয়া চারিটি শাখাস্নায়ুতে বিভক্ত হয়। প্রথম শাখাস্নায়ুটিকে **ল্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু** (*Laryngeal Nerve*) বলে। ইহা ব্যাঙের স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় শাখাটিকে **কার্ডিয়াক** (*Cardiac*) স্নায়ু বলা হয়। ইহা ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবেশ করে। তৃতীয় শাখাটিকে **পালমোনারী** (*Pulmonary*) শাখাটিকে **গ্যাস্ট্রিক** বা **পাকস্থলী** (*Gastric*) স্নায়ু বলে। ইহা পৌষ্টিক-নালীর পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে। ভেগাস স্নায়ু প্রাণীর প্রধান প্রধান জৈবনিক কার্যসকল, যথা হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণ, শ্বসন-কার্যের সময় বিবিধ সঞ্চালন ও পৌষ্টিক-নালী সঙ্কোচন ও প্রসারণ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

নিম্নলিখিত ছকে করোটির বিবিধ স্নায়ুর উৎপত্তি, বিভিন্ন শাখার গন্তব্য অঞ্চল ও উহাদের স্বভাব ইত্যাদি দেওয়া হইল:

স্নায়ুর সংখ্যা	নাম	মস্তিষ্কের যে অঞ্চল হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে	বিভিন্ন শাখার নাম ও উহাদের গন্তব্য অঙ্গ	স্বভাব	কার্য
১।	ঘ্রাণস্নায়ু (Olfactory nerve)	মস্তিষ্কের টেলেনসেফালন অঞ্চলের ঘ্রাণকেন্দ্র হইতে	শাখাহীন-নাসিকার ভিতরকার মিউকাস পর্দা (Mucus membrane of nose)	সংবেদ	ঘ্রাণশক্তি
২।	অক্ষিস্নায়ু (Optic nerve)	মস্তিষ্কের ডায়েনসেফালন অঞ্চলের দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে	শাখাহীন-চক্ষুর অক্ষিপট (Retina)	সংবেদ	দৃষ্টিশক্তি
৩।	অকিউলোমোটর (Oculomotor nerve)	মস্তিষ্কের মেসেনসেফালন অঞ্চলের অঙ্কীয়দেশ হইতে	চক্ষুগোলকের চারিটি পেশী-সমূহ (Extrinsic muscles) —শাখাহীন	চেষ্টীয়	চক্ষুগোলককে উঠা-নামা করানো
৪।	ট্রকলিয়ার (Trochlear nerve)	মস্তিষ্কের মেসেনসেফালন অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশ হইতে	চক্ষুগোলকের পঞ্চম পেশী (Fifth extrinsic muscles) —শাখাহীন	চেষ্টীয়	চক্ষুগোলককে উঠা-নামা করানো

স্নায়ুর সংখ্যা	নাম	মস্তিষ্কের যে অঞ্চল হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে	বিভিন্ন শাখার নাম ও ইহাদের গন্তব্য অঙ্গ	স্বভাব	কার্য
৫।	ট্রাইজেমিনাল (Trigeminal nerve)	সুষুম্নাশীর্ষকের পার্শ্ব হইতে	শাখা—(i) অপথ্যালমিক (Opthalmic nerve)—মাথার অগ্রভাগের চামড়া, চোখের উপরকার চামড়া ও নাসিকার মিউকাস পর্দা।	সংবেদ	মাথার অগ্রভাগের চামড়ার সংবেদনশীলতা
			(ii) ম্যাক্সিলারি (Maxillary nerve)—উপর চোয়াল।	সংবেদ	উপরের চোয়ালের সংবেদনশীলতা
			(iii) ম্যাণ্ডিবুলার (Mandibular nerve) মুখের নীচের চোয়াল ও মুখবিবরের তলদেশের পেশীসমূহ	সংবেদ ও চেষ্টীয়	নীচের চোয়াল ও মুখবিবরের তলদেশের সংবেদনশীলতা
৬।	অ্যাবডিউসেন্স (Abducens nerve)	সুষুম্নাশীর্ষকের দুই অঙ্কীয়দেশ হইতে	শাখাহীন চক্ষুখোলকের ষষ্ঠ পেশী	চেষ্টীয়	চক্ষুগোলককে সঞ্চালিত করা
৭।	মুখমণ্ডলীয় স্নায়ু (Facial nerve)	সুষুম্নাশীর্ষকের পার্শ্বদেশস্থিত এবং ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর ঠিক নিম্নস্থল হইতে	শাখা—(i) প্যালাটাইন (Palatine nerve) —মুখবিবরের উপরিদেশ (Roof of the buccal cavity)	সংবেদ	মুখবিবরের উপরিদেশের সংবেদনশীলতা
			(ii) হ্যায়াম্যাণ্ডিবুলার (Hyamandibular narve) —হাওয়েড তরুণাস্থি ও মুখবিবরের তলদেশের পেশীসমূহ।	মিশ্র	হাওয়েড তরুণাস্থি ও মুখবিবরের তলদেশের পেশীগুলির সংবেদনশীলতা

সংখ্যা	নাম	মস্তিস্কের যে অঞ্চল হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে	বিভিন্ন শাখার নাম ও উহাদের গন্তব্য অঙ্গ	স্বভাব	কাজ
	শ্রবণ স্নায়ুর (Auditory nerve)	ফেসিয়াল স্নায়ুর উৎপত্তি স্থলের ঠিক পিছনে সুষুম্নাশীর্ষকের পার্শ্ব হইতে	কর্ণের অন্তঃকর্ণের ভিতর (Membranous labyrinth) —শাখাহীন	সংবেদ	শ্রবণকায
৯।	[illegible] রঞ্জিয়াল (Glossopharyn-geal [illegible]e)	শ্রবণ স্নায়ুর উৎপত্তি-স্থলের ঠিক পিছনে সুষুম্নাশীর্ষকের পার্শ্ব হইতে	শাখা—(i) একটি সূক্ষ্ম শাখা ফেসিয়াল স্নায়ুর হ্যায়োম্যাণ্ডিবুলার শাখার সহিত যুক্ত (ii) প্রধান শাখাটি জিহ্বা ও গলবিলে যায়।	সংবেদ মিশ্র	গলবিল ও জিহ্বার সংবেদনশীলতা
১০।	ভেগাস স্নায়ু (Vagus nerve	[illegible]কের শেষ পার্শ্ব হইতে বহু মূলের দ্বারা ইহার উৎপত্তি	শাখা (i) লেরিঞ্জিয়াল (Laryngal nerve) —স্বরযন্ত্র ও গলবিলে (ii) ফুসফুসীয় (Pulmonary)—ফুসফুস দুইটিতে (iii) কর্ডিয়াক (Cardiac)—হৃদযন্ত্র (iv) গ্যাষ্ট্রিক (Gastric)—গ্যাষ্ট্রিক নালীর পাকস্থলীতে	মিশ্র	স্বর পরিচালনা ও হৃদযন্ত্রের স্পন্দন, ফুসফুসের সঞ্চালন, পৌষ্টিকনালীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ

সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু (Spinal Nerve) :

সুষুম্নাকাণ্ড হইতেও দশজোড়া স্নায়ু বাহির হয়। প্রতিটি স্নায়ু সুষুম্না-কাণ্ডস্থিত দুইটি পৃথক গোড়া হইতে বাহির হয় এবং পরে একত্রিত হইয়া একটি স্নায়ুতে পরিণত হয়। প্রতিটি স্নায়ুর প্রথম গোড়াটি সুষুম্নাকাণ্ডের

৭০নং চিত্র
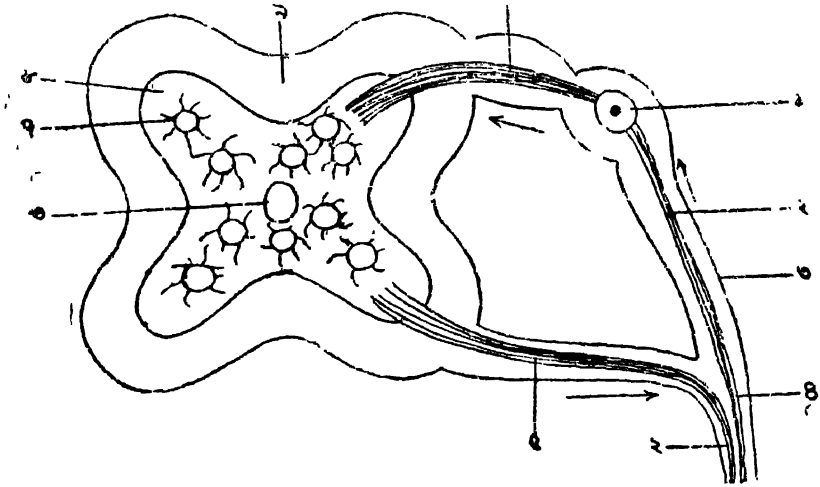
রেখাচিত্রের দ্বারা সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের সহিত উহা হইতে নির্গত স্নায়ু দেখান হইয়াছে।
১, পৃষ্ঠগ্রন্থি ; ২, স্নায়ুতন্তু ; ৩, সংবেদী স্নায়ু-তন্তু ; ৪, সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুর উৎপত্তি ;
৫, চেষ্টীয় স্নায়ুতন্তু ; ৬, নিউরোসিল ; ৭, ধূসর পদার্থের পৃষ্ঠভাগ (Dorsal Horn) ;
৮, ধূসর পদার্থ ; ৯, শ্বেত-পদার্থ অঞ্চল।

পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির হওয়ায় ইহাকে **পৃষ্ঠদেশীয় সংবেদ গোড়া** (*Dorsal Sensory Rest*) বলা হয়। সেইরূপ দ্বিতীয় গোড়াটি সুষুম্নাকাণ্ডের অঙ্কীয় দেশ হইতে বাহির হওয়ায় ইহাকে **অঙ্কীয়দেশের চেষ্টীয় গোড়া** (*Ventral Motor Root*) বলা হয়। পৃষ্ঠদেশীয় সংবেদ গোড়াটিতে কেবলমাত্র একটি সংবেদগ্রন্থি উৎপত্তিলাভ করে। সুতরাং প্রতিটি সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু স্বভাবে মিশ্রজাতীয়।

প্রতি সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু দুইটি কশেরুকার মধ্যবর্তী ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হয়। এই ছিদ্রপথের চারিপাশে চুনের গুঁড়া জমা হইয়া থাকে বলিয়া উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না। ছিদ্রপথ হইতে বাহির হইবার পর প্রতিটি স্নায়ু তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রথম শাখাটিকে **পৃষ্ঠদেশীয় স্নায়ু** (*Dorsal*

Nerve) বলা হয়। ইহা উক্ত অঞ্চলের চামড়া ও পৃষ্ঠদেশের পেশীগুলির ভিতর প্রবেশ করে। দ্বিতীয় শাখাটিকে **অঙ্কীয়দেশের স্নায়ু** (*Ventral Nerve*) বলা হয়। ইহাই স্থূল ও প্রধান স্নায়ু। এই স্নায়ুটি অঙ্কীয়দেশের চামড়া ও দেহের অঙ্কীয়-পেশীগুলির ভিতর প্রবেশ করে। তৃতীয় স্নায়ুটি অতি সূক্ষ্ম। ইহাকে **রেমাস কমিউনিকান্স** (*Ramus Communicans*) বলা হয়। ইহা নিকটবর্তী **সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুগ্রন্থি** (*Sympathetic Nerve Ganglion*) সহিত মিলিত হয়। প্রতিটি সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু স্বভাবে মিশ্র জাতীয়। ইহারা পৃষ্ঠদেশীয় স্নায়ুর দ্বারা বিবিধ অঙ্গের অনুভূতি লইয়া সুষুম্না কাণ্ডে যায় এবং অঙ্কীয়দেশের স্নায়ু দ্বারা সুষুম্নাকাণ্ড হইতে অনুজ্ঞা বা নির্দেশ লইয়া পেশীতে পৌছায়, ফলে পেশীগুলি সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়। পেশীসংযুক্ত অঙ্গগুলি সেইরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণশীল হয়।

সুষুম্নাকাণ্ডের প্রথম স্নায়ুজোড়াটি প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকার মধ্যবর্তী ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হয়। ইহার অঙ্কীয় শাখাটিকে **হাইপোগ্লসোল** (*Hypoglossal*) স্নায়ু বলে। ইহা জিহ্বার পেশীসমূহের ভিতর প্রবেশ করে। দ্বিতীয় জোড়া স্নায়ুটি ও তৃতীয় কশেরুকার মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রতিটি প্রতিপার্শ্ব হইতে ছিদ্রপথে বাহির হয়। ইহা বেশ লম্বা ও স্থূল। তৃতীয় জোড়া স্নায়ুটি সেইরূপ তৃতীয় ও চতুর্থ কশেরুকার মধ্যবর্তী অঞ্চল হইতে বাহির হয়। প্রথম সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুটি দ্বিতীয় সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুটির সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাস্নায়ুর দ্বারা জাল সৃষ্টি করিয়া যুক্ত হয়। এইরূপ স্নায়ু-জালককে **ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস** (*Brachial plexus*) বলা হয়। এই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস হইতে কয়েকটি স্নায়ু বাহির হইয়া প্রতি পার্শ্বের বাহুর চামড়া ও পেশীতে প্রবেশ করে। চতুর্থ সুষুম্নাকাণ্ডে স্নায়ুটি পঞ্চম ও ষষ্ঠ কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থান হইতে বাহির হয়। সেইরূপ ষষ্ঠ স্নায়ুটি ষষ্ঠ ও সপ্তম কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থান হইতে বাহির হয়। উপরোক্ত চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্নায়ুজোড়াগুলি উৎপত্তির পর পিছনের দিকে ধাবিত হয় এবং দেহের চামড়া ও পেশীসমূহে প্রবেশ করে। সপ্তম, অষ্টম, নবম জোড়া সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুগুলি যথাক্রমে সপ্তম, অষ্টম কশেরুকা হইতে, অষ্টম ও নবম কশেরুকা হইতে এবং নবম ও দশম কশেরুকা হইতে ছিদ্রপথে উৎপত্তি-লাভ করে। ইহারা প্রত্যেকে ব্যাঙের পশ্চাৎ-পদের দিকে অগ্রসর হয় এবং কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর এই স্নায়ুগুলি পরস্পরের সহিত জটিলভাবে যুক্ত

হয়। এই যুক্ত স্থলটিকে **সায়াটিক প্লেক্সাস** (*Sciatic Plexus*)
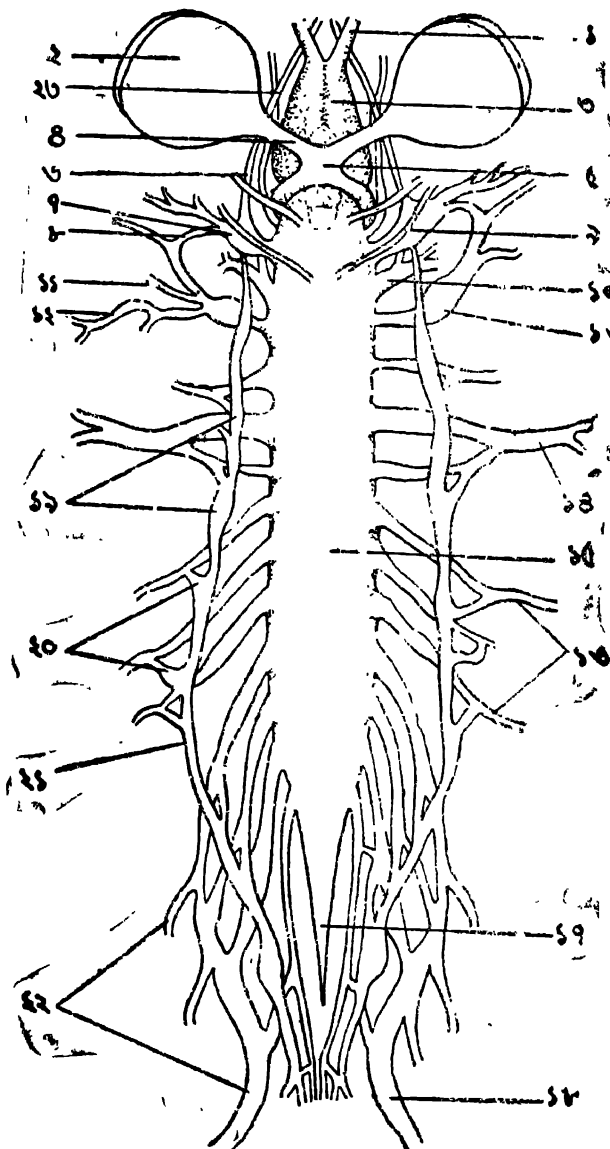
১, ঘ্রাণ-স্নায়ু; ২, চক্ষু; ৩, মস্তিষ্ক; ৪, দৃষ্টি-স্নায়ু; ৫, অপটিক কায়েজমা; ৬, ট্রকলিয়ার করোটি স্নায়ু; ৭, গ্যাসারিয়ন স্নায়ু গ্রন্থি; ৮, ফেসিয়েল স্নায়ু; ৯, আবডিউসেন্স করোটি স্নায়ু। ১০, শ্রবণ-স্নায়ু, ১১, গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু, ১২, ভেগাস স্নায়ু; ১৩, ভেগাস স্নায়ু; ১৪, ব্রাকিয়েল; ১৫, সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু (IV-VI) ১৭, ফিলাম টারমিনেলি; ১৮, স্যায়াটিক স্নায়ু ১৯, সিমপ্যাথেটিক গ্রন্থি; ২০, সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুর সহিত সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর সংযুক্তি; ২১, সিমপ্যাথেটিক প্রধান স্নায়ু; ২২, সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু (VII-X)।

৭৭নং চিত্র

ব্যাঙের স্নায়ুতন্ত্র দেখান হইতেছে।

বলা হয়। সায়াটিক প্লেক্সাস হইতে এক বিরাট স্নায়ু বাহির হয়। ইহাদের

মধ্যে সর্ববৃহৎ **সায়াটিক স্নায়ুটি** (*Sciatic Nerve*) পশ্চাদ্-পদের ভিতর প্রবেশ করে। দশম জোড়া সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু ইউরোস্টাইলের ছিদ্রপথ হইতে বাহির হয় এবং ইহা অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা। কুনো ব্যাঙের একধারে একটিমাত্র দশম সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু দেখা যায় এবং ইহাও সায়াটিক প্লেক্সাসের সহিত যুক্ত হয়।

৩। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System) ঃ

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে (**Autonomic ঃ auto = self : nemo =** distributing) দুইটি অতীব সরু সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুরজ্জু (Sympathetic Trunk) বিদ্যমান। এই দুইটি স্নায়ুরজ্জু সুষুম্নাকাণ্ডের দুইপাশে একটি করিয়া লম্বালম্বিভাবে থাকে। **বৃক্কযন্ত্রের** (*Kidney*) আরও পিছনে, পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীর (Dorsal Aorta) দ্বি-বিভাজনের স্থল হইতে প্রতিটি সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুরজ্জুতে পরিণত হয়। প্রতিটি স্নায়ুরজ্জু সুষুম্নাকাণ্ডের পাশ দিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে এবং ধমনীপ্রণালীর **সিস্টেমিক মহাধমনীর** (*Systemic Arch*) পাশাপাশি আরো সম্মুখদিকে আগাইয়া যায়। ইহার একটি শাখা সাবক্লেভিয়ান ধমনীকে বেষ্টন করিয়া ব্যাঙের করোটির দিকে ঘুরিয়া যায়। করোটির ভিতর প্রবেশ করিবার পর উহার একটি শাখা **ভেগাস স্নায়ুগ্রন্থিতে** (*Vagus Ganglion*) ছড়াইয়া পড়ে। সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুরজ্জুর প্রধান শাখাটি পরে আরো সামান্য অগ্রসর হইয়া **গ্যাসারিয়ান স্নায়ুগ্রন্থির** (*Gassarian Ganglion*) ভিতর সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া শেষ হইয়া যায়। প্রতিটি সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুরজ্জুতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দশটি ফোলা **স্নায়ুগ্রন্থি** (*Sympathetic Ganglia*) আছে। প্রতিটি গ্রন্থিতে সুষুম্নাকাণ্ডের প্রতিটি স্নায়ু, উহাদের শাখার দ্বারা যুক্ত থাকে। প্রতিটি সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুর এই সূক্ষ্ম শাখা-স্নায়ুটিকে **রেমাস কমিউনিকানস্** (*Ramus Communicans*) বলা হয়।

সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুরজ্জু হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা-স্নায়ু বাহির হইয়া বিবিধ যন্ত্রের **অনৈচ্ছিক পেশীসমূহের** (*Involuntary Muscles*) ভিতর প্রবেশ করে। হৃদ্‌যন্ত্রের পেশীবহুল গাত্রে, রক্ত-সংবহন নালীর পেশীতে ও পৌষ্টিক নালীর পেশীতেও ইহার একাধিক শাখা প্রবেশ করে। যন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্বে শাখাগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত জালকাকারে মিলিত হয়।

এইরূপ জালকাকার স্নায়ুসমূহকে **স্নায়ুজাল** (*Nerve plexuses*) বলা হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের **স্নায়ুজালকে কার্ডিয়েক** (*Cardiac Plexus*) বলে। সেইরূপ **ইণ্টার অরিকিউলার প্রাচীরের** (*Inter Auricular Septum*) উপর **বিডার্স স্নায়ুজাল** (*Biders' Ganglion*) এবং **সাইনাস ভেনোসাসের** (*Sinus Venosus*) উপরেও **রিমাক স্নায়ুজাল** (*Remak Ganglion*) বিদ্যমান। উপরোক্ত স্নায়ুজালগুলি স্নায়ুগ্রন্থির ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া উহাদের জাল না বলিয়া গ্রন্থি বলা হয়।

দেহের ভিতর হইতে উত্তেজনাবশতঃ অনৈচ্ছিক পেশীসমূহের সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং উহার নিয়ন্ত্রণই স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্য। হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন, পৌষ্টিক-নালীর উঠা-নামা ও অন্যান্য রসগ্রন্থির নিঃসরণ কার্যও সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহাকে একটি স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র বলিলেও প্রকৃত-পক্ষে ইহা স্বাধীন নয়। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহারা **পার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্রের** (*Peripheral Nervous System*) স্নায়ুর সহিত যুক্ত। ইহারা কেবল কার্যকারিতায় স্বাধীন অর্থাৎ **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের** (*Central Nervous System*) সাহায্য না লইয়া ইহারা কার্য করিতে পারে।

রেচন-জনন তন্ত্র
(Urinogenital System)

ব্যাঙের **রেচন-জননতন্ত্র** (**Urinogenital System**)—**রেচনতন্ত্র** (*Excretory System*) ও **জননতন্ত্র** (*Reproductive System*)—এই দুইটি তন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত। কারণ পুং-ব্যাঙের শুক্রকীটগুলি রেচন-নালীর ভিতর দিয়া রেচন দ্রব্যের সহিত বাহিত হয় এবং বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কার্যকারিতা ও যন্ত্রের অন্তর্গঠন অনুযায়ী রেচনতন্ত্র ও জননতন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক। নিম্নে রেচনতন্ত্র ও জননতন্ত্র দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইল :

ক। রেচনতন্ত্র (Excretory System) :

প্রাণিদেহে **জৈবনিক বিপাকীয় কার্যের** (**Physiological Metabolic Activities**) জন্য নূতন নূতন রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এইরূপ পদার্থগুলি প্রাণিদেহ গঠনের কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। আবার

ইহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যাহা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর এবং দেহের ভিতর থাকিলে প্রাণীর জীবনধারণের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। এইরূপ রাসায়নিক পদার্থ বা দ্রব্যগুলিকেই **রেচন দ্রব্য** (*Waste Products*) বলা হয়। পৌষ্টিক-নালীর **মল** (*Faeces*) কিন্তু রেচন দ্রব্য
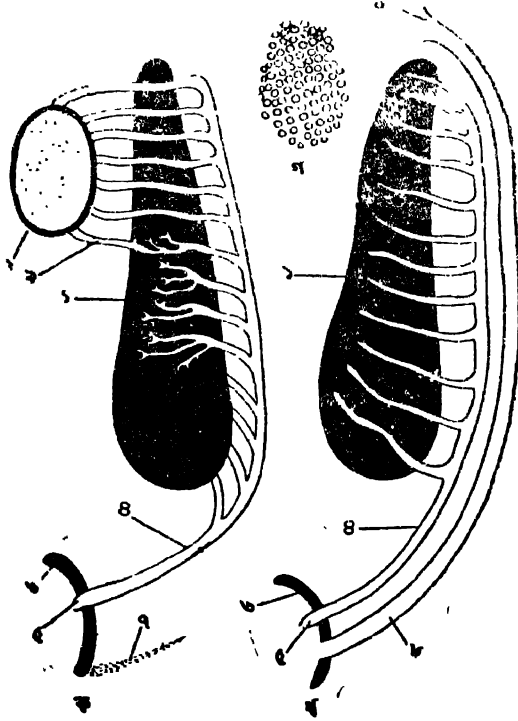
৭৮নং চিত্র
ব্যাঙের রেচন-জননতন্ত্রের রেখাচিত্র দ্বারা রেচন-প্রণালী ও জনন-প্রণালীর সম্পর্ক দেখান হইতেছে।

ক, পুং-রেচন-জননতন্ত্র ; খ, স্ত্রী-রেচন-জননতন্ত্র ; ১, বৃক্ক ; ২, শুক্রাশয় ; ৩, ডিম্বাশয় নালীর ফানেলের মত মুখ ; ৪, গবিনী ; ৫, গবিনী-ছিদ্র ; ৬, অবসারণী ; ৭, ক্ষয়প্রাপ্ত মূলারিয়ান নালী (ডিম্বনালী) ; ৮, মূলারিয়ান নালী বা ডিম্বনালী (Oviduct) ; ৯, শুক্রনালী বা ভাসা ডিফাবেন্স।

নহে। কারণ কলা বা কোষের জৈবিক-বিপাকীয় কার্যের ফলে ইহা নির্গত হয় না। **ইউরিয়া** (*Urea*), **ইউরিক অ্যাসিড** (*Uric Acid*), কার্বন ডায়ক্সাইড ও মিশ্রিত অনেকপ্রকার ধাতব পদার্থগুলিকে সাধারণতঃ ব্যাঙের রেচনদ্রব্য বলা হয়। এইগুলি কলা বা কোষের জৈবনিক বিপাকীয়

কার্যের ফলে নির্গত হয় এবং ইহা যে-কোন প্রাণীর পক্ষে বিষবৎ। বিবিধ শিরায় রক্তের সহিত উপরোক্ত রেচনদ্রব্যগুলি মিশিয়া যায় এবং শিরাগুলি যন্ত্র হইতে রক্ত ফিরাইয়া আনিবার সময় রেচনদ্রব্য বহন করিয়া আনে। শিরাগুলি এইরূপ রেচনদ্রব্য মিশ্রিত রক্ত **রেচনযন্ত্রের** (*Excretory Organ*) ভিতর জালকের সাহায্যে ছড়াইয়া দেয়। রেচনযন্ত্রের কোষগুলি রেচনদ্রব্যগুলিকে রক্তরস হইতে শোষণ করিয়া লয় এবং রেচনতন্ত্রের দ্বারা দেহের ভিতর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাণী রেচনপদার্থগুলি রক্তরস হইতে বাহির করিয়া দেহের বাহিরে নিক্ষেপ করে, তাহাকে **রেচনপ্রক্রিয়া** (*Excretion*) বলা হয়।

রেচনযন্ত্র (Excretory Organ): বিবিধ প্রকার রেচন-পদার্থের মধ্যে কার্বন-ডায়ক্সাইড ও অতিরিক্ত জল শ্বাসকার্যের ফলে সৃষ্ট হয়। কার্বন-ডায়কসাইড গ্যাস ফুসফুসের দ্বারা দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং অতিরিক্ত জল চামড়ার ভিতর দিয়া সর্বদা বাহির হইতে দেখা যায়। নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড প্রধান। যকৃৎ-যন্ত্রের **অ্যামাইনো অ্যাসিড** (*Amino Acid*) অণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া ইউরিয়াতে (*Urea*) পরিণত হয়। ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, দ্রবণীয় ধাতব-পদার্থ ও অতিরিক্ত জল একত্রিত হইয়া যে রাসায়নিক পদার্থটির সৃষ্টি করে, তাহাকেই আমরা প্রস্রাব বা ইউরিন (Urine) বলিয়া থাকি। নিম্নলিখিত রেচনতন্ত্রের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া প্রস্রাব দেহের ভিতর হইতে বাহিরে বাহির হইয়া যায়, যথা—(*i*) **বৃক্ক** (*Kidney*); (*ii*) **গবিনী** (*Ureter*); (*iii*) **মূত্রাশয়** (*Urinary Bladder*); (*iv*) **অবসারণী** (*Cloaca*) ও (*v*) **পায়ুছিদ্র** (*Vent*)।

(*i*) **বৃক্ক (Kidney):** বাঙের বৃক্কজোড়াটি দেহ-গহ্বরের পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ডের দুইপাশে বিদ্যমান। প্রতিটি বৃক্ক লম্বাকারে প্রসারিত এবং ইহার রঙ গাঢ় লালচে-বাদামী। ইহার মেরুদণ্ডের দুইপাশ স্বচ্ছ পাতলা পেরিটোনিয়ম পর্দার দ্বারা আবৃত থাকে এবং ইহাদের দ্বারাই অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বৃক্কের বাহিরের সীমা (Outer Margin) উত্তল এবং সীমার মাঝে মাঝে খাঁজ দেখা যায়। প্রতিটি বৃক্কের বাহিরের সীমা হইতে একটি স্থূল নালী বাহির হয়। এই নালীকে **গবিনী** বা **উলফিয়ান নালী** (*Ureter or Wolffian Duct*) বলা হয়। এই পাতলা নালী দুইটি

পরস্পর পরস্পরের সহিত সমান্তরালভাবে পিছনের দিকে নামিতে থাকে এবং শ্রোণীর নিকট পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া একটি নালীতে পরিণত হয়। সংযুক্ত গবিনী নালীটি ব্যাঙের পৃষ্ঠদেশের অবসারণীর মধ্যে **গবিনী ছিদ্রের** (*Urinary opening*) দ্বারা যুক্ত হয়। অবসারণীর (Cloaca) অঙ্কীয়দেশ হইতে একটি দ্বি-বিভক্ত পাতলা গাত্রবিশিষ্ট থলি বাহির হয়। এই থলিটিকে **মূত্রাশয়** (*Urinary bladder*) বলা হয়। মূত্রাশয় থলিটির অগ্রাংশে পেশী কপাটিকা (*Sphincter muscle*) থাকে। অবসারণী গহ্বরটি পায়ুর ভিতর দিয়া দেহের বাহিরে মুক্ত হয়।

বৃক্কের অন্তর্গঠন (**Structure of the Kidney**): অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাকানো **বৃক্ক নালীর** (*Uriniferous Tubules*) সমন্বয়ে প্রতিটি বৃক্ক গঠিত। সুতরাং প্রতিটি বৃক্কনালীর আকার ও কার্যই সমগ্র বৃক্কের কার্য। বৃক্কের ভিতরকার বৃক্কনালীগুলি নানাভাবে থাকে। কোনটি আড়াআড়িভাবে, আবার কোনটি লম্বালম্বিভাবে বিদ্যমান। কিন্তু সর্বদাই উহা জড়ানো থাকে। সুতরাং বৃক্কের প্রস্থচ্ছেদে ইহাদের বিভিন্ন অংশের বিবিধ অবস্থার আকার প্রতীয়মান হয়। প্রতিটি বৃক্কনালীর অগ্রাংশ সুরাপানের পেয়ালার (Wine Cup) মত। এই পেয়ালার মুখটি দুই কোষবিশিষ্ট-স্তরের দ্বারা গঠিত। পেয়ালাটিকে **বোম্যানস্ ক্যাপসিউল** (*Bowman's Capsule*) বলা হয়। বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের ভিতরে একটি করিয়া **অন্তর্মুখী রক্তনালী** (*Afferrent blood vessel*) বা বৃক্ক-ধমনী প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করিয়া জালকের দ্বারা পেয়ালার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। বৃক্ক ধমনীর জালকটিকে (Capillaries) গোলাকার রক্তনালী পিণ্ডের মত দেখায়। বৃক্ক ধমনীর জালকটিকে **গ্লোমারিউলাস** (*Glomerulus* ; *Glomus* = a ball) বলে। এই গ্লোমারিউলাস হইতে জালকাকারে ধীরে ধীরে প্রশাখা সমন্বয়ে একটি **বহির্মুখী রক্তনালী** (*Efferrent Blood Vessel*) বাহির হইয়া আসে এবং ইহা **বৃক্ক-শিরার** (*Renal Vein*) সহিত যুক্ত হয়। সবৃক্কযন্ত্রের সমগ্র বৃক্কনালীর সমগ্র পেয়ালাটিকে (Bowman's capsule + Glomerulus) **ম্যালপিজিয়ান অঞ্চল** (*Malpighian region*) নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি ম্যালপিজিয়ান অঞ্চলের পশ্চাদ্ভাগ একটি সরু জড়ানো নালীর দ্বারা যুক্ত। নালীটি নানাভাবে জড়াইয়া শেষে **সংগৃহীত নালীর** (*Collecting Tubes*) সহিত যুক্ত হয়। সুতরাং অসংখ্য বৃক্কনালী এইভাবে সংগৃহীত নালীর

সহিত যুক্ত হইতে দেখা যায়। প্রতিটি বৃক্কের ভিতরকার সংগৃহীত নালীটি বৃক্ক হইতে বাহির হইয়া আসে এবং উহাকেই গবিনী বা উলফিয়ান নালী বলা হয়। বৃক্কনালীর জড়ানো অংশের চারিপাশেও বৃক্কশিরার জালক বিদ্যমান। বৃক্কের পৃষ্ঠদেশ হইতে **গবিনী** (*Ureter*) বাহির হয় এবং উহার অক্ষীয়দেশের
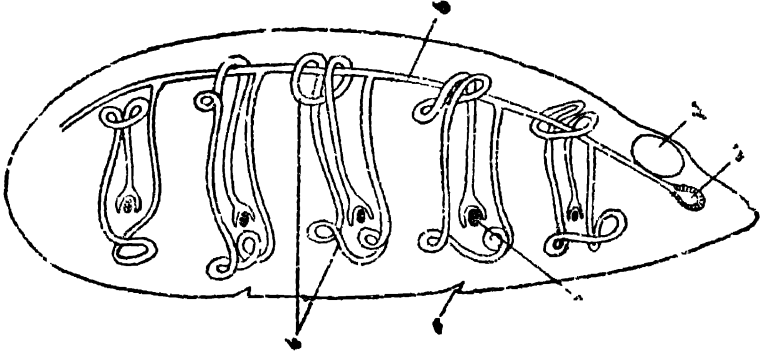
৭৯নং চিত্র

বৃক্কের ভিতরকার বৃক্কনালীর বিন্যাস রেখাচিত্রের দ্বারা দেখান হইতেছে।

১, গবিনী ; ২, রেন্যাল পোর্টাল শিরা ; ৩, সংগৃহীত নালী ; ৪, ম্যালপিজিয়ান অঙ্কুল ; ৫, নেফ্রোস্টোম ; ৬, পাকানো বৃক্কনালী (Uriniferous Tubule)।

সীমায় অনেকগুলি খাঁজ দেখা যায়। এই খাঁজগুলিকে নেফ্রোস্টোম বলা হয়। **নেফ্রোস্টোম** (*Nephrostome* ; *Nephros* = kidney ; *Stoma* = opening) প্রকৃতপক্ষে বৃক্কছিদ্র। ছিদ্রগুলি অতি ক্ষুদ্র এবং দেখিতে ফানেলের মুখের মত; ছিদ্রের ভিতরকার গাত্রে প্রচুর শিলিয়া (*Cilia*) বিদ্যমান।

বৃক্কে নিষ্ক্রমণ কার্য (Mechanism of Renal Excretion)ঃ ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ও অতিরিক্ত জল একত্রিত হইয়া প্রস্রাবের সৃষ্টি করে। বৃক্কনালীর ভিতর প্রস্রাবের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রস্রাব সৃষ্টি করা এবং উহা দেহ হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা রেচনতন্ত্রের কার্য এবং বৃক্ক কেবলমাত্র প্রস্রাবের সৃষ্টি করে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, গ্লোমারিউলাস বৃক্ক ধমনীর জালক। **বৃক্ক-ধমনী** (*Renal Artery*) ও **রেন্যাল পোর্টাল শিরা** (*Renal portal vein*) উপরোক্ত গ্লোমারিউলাস বা জালক বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের ভিতর সৃষ্টি করে। এই সময় জালকের ভিতরকার রক্তরস হইতে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ও অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের

মধ্যে জমা হয়। ক্যাপসিউলের গাত্র দুইস্তর-বিশিষ্ট কোষদ্বারা নির্মিত এবং
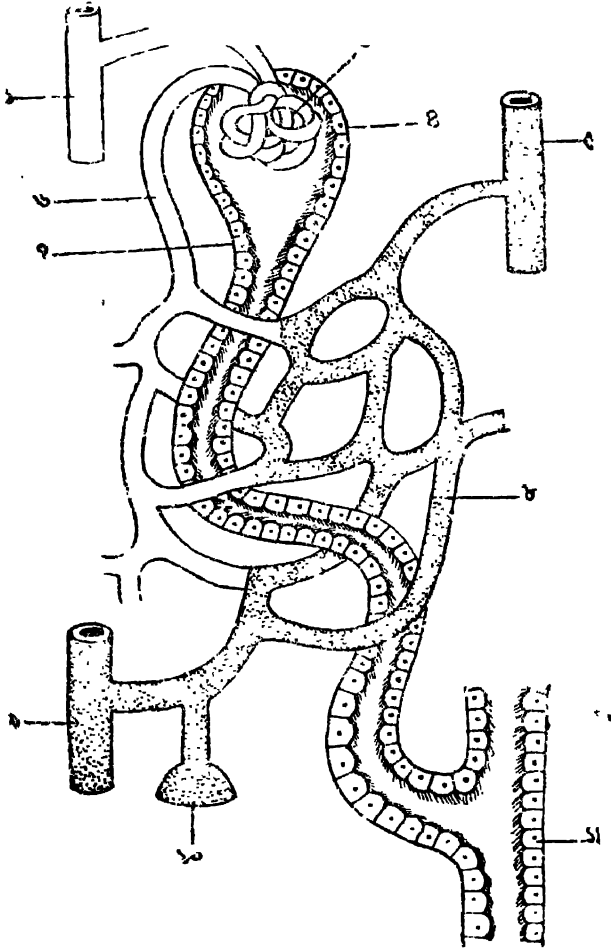
৮০নং চিত্র

বৃক্কনালীর ম্যালপিজিয়ান অঞ্চলে রেচন পদ্ধতি দেখান হইতেছে।

১. বৃক্কনালী ; ২, অ্যাফারেণ্ট ধমনী ; ৩, গ্লোমারিউলাস ; ৪, বোম্যানস্ ক্যাপসিউল ; ৫, বৃক্ক-শিরা ; ৬, ইফারেণ্ট ধমনী ; ৭, বৃক্ক-নালী ; ৮, রক্ত-জালক ; ৯, বৃক্ক-শিরা ; ১০, নেফ্রোস্টোম , ১১, গবিনী।

এই কাপসিউল হইতেই বৃক্কনালীর সৃষ্টি। এই কোষগুলি ধীরে ধীরে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি ব্যাপন-প্রক্রিয়ার দ্বারা শোধন করিয়া লয়

এবং বৃক্কনালীর ভিতর জমা করে। এই সময়ই ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি সমন্বয়ে প্রস্রাবের সৃষ্টি হয়। ধমনী-জালকের ভিতরকার রক্তের অক্সিজেন ও খাদ্যরস বৃক্কনালীর কোষগুলি ব্যবহার করে। বৃক্কনালী হইতে প্রস্রাব যথাক্রমে সংগৃহীত নালা এবং পরে গবিনীর ভিতর দিয়া মূত্রাশয়ে জমা হয়। মূত্রাশয় প্রস্রাবে পূর্ণ হইলে সঙ্কুচিত হয়, ফলে পায়ুছিদ্র দিয়া প্রস্রাব বাহির হইয়া যায়।
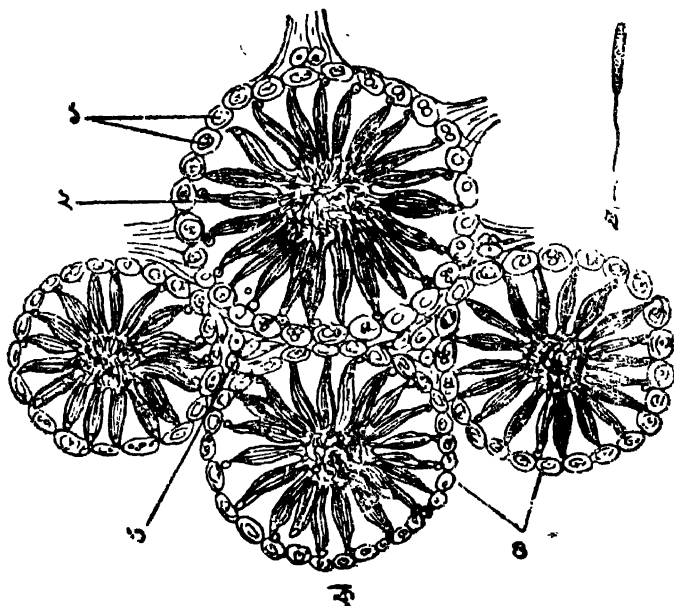
৮১নং চিত্র

শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছেদের কিছু অংশ বড় করিয়া দেখান হইতেছে।

ক, শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ ; খ, একটিমাত্র শুক্রকীট ; ১, জারমিনাল ত্বক্ বা বীজত্বক্ (Germinal Epithelium) ; ২, গুচ্ছিত শুক্রকীট ; ৩, ইণ্টারষ্টিশিয়েল কোষসমূহ ; ৪, শুক্র-সৃষ্ট নালী (Seminiferous Tubules) ।

ফুসফুস এবং দেহের চামড়া শ্বাস ও রেচন দুই কার্যই করিয়া থাকে। ফুসফুস কেবলমাত্র রক্তরস হইতে কার্বন-ডায়কৃসাইড নির্গত করে কিন্তু দেহ-চর্ম কার্বন-ডায়কৃসাইড ব্যতীত অতিরিক্ত জল ও দ্রবণীয় ধাতবপদার্থও দেহের ভিতর হইতে রক্তের মাধ্যমে দেহের বাহিরে নিঃসৃত করে ; এইরূপ নিঃসৃত পদার্থকে **নিঃসরণ** (*Secret* না বলিয়া **নিষ্ক্রমণ** (*Excretion*) বলা হয়।

কারণ নিঃসৃত রাসায়নিক-পদার্থ দেহগঠনের সহায়ক এবং নিষ্ক্রমণ-নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ দেহের পক্ষে বিষবৎ। দেহ-চার্ম-এর ভিতর কতকগুলি রস-গ্রন্থি ও রক্তজালক দূষিত পদার্থ ও জলকে পৃথক করিতে পারে। গ্রন্থিগুলি চার্মের বহির্ত্বকে ছিদ্রের দ্বারা মুক্ত হয়। সুতরাং জলীয় দূষিত পদার্থগুলি চামড়ার উপরে জমা হয় এবং চামড়া সর্বদা সিক্ত থাকে। ইহার ফলে বাহিরের অক্সিজেন সহজেই দ্রবীভূত হইতে পারে এবং ইহা শ্বসন-কার্যের সহায়তা করে।

জননতন্ত্র (Reproductive System): ব্যাঙ একলিঙ্গ প্রাণী। জনন-ঋতুতে স্ত্রী-ব্যাঙ ও পুং-ব্যাঙে প্রভেদ দেখা যায়। স্ত্রী-ব্যাঙের পেটের ভিতর অতিরিক্ত ডিম থাকায় উহা ফুলিয়া থাকে, কিন্তু পুং-ব্যাঙের পেট বেশ সরু দেখা যায়। ইহা ব্যতীত পুং-হাতের পাতায় একটি কালো রঙের গোলাকার উঁচু মাংসপিণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং জনন-ঋতুতে পুং-ব্যাঙগুলি স্বরযন্ত্রের দ্বারা ডাকিতে পারে। ব্যাঙের **জননতন্ত্র** (*Gonads*; *gono* = that which generates) হইতে জনন-কোষের (Germ cells) সৃষ্টি হয়। জনন-যন্ত্রের নালীর ভিতর দিয়া জনন-কোষগুলি বাহিত হইয়া দেহের বাহিরে উপনীত হয়। পুং ও স্ত্রী-জননকোষগুলি দেহের বাহিরে উপনীত হইবার পর পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয় এবং নূতন ব্যাঙের সৃষ্টি করে। সুতরাং বংশবৃদ্ধি করাই জননতন্ত্রের কার্য।

পুং-জননতন্ত্র (Male Rproductive Organs): পুং-ব্যাঙের জনন-যন্ত্র দুইটিকে **শুক্রাশয়** (*Testes. Singular* = testis) বলা হয়। শুক্রাশয়গুলি আকারে লম্বা এবং হাল্কা বাদামী-রঙের বর্ণ ধারণ করে। প্রতিটি শুক্রাশয় প্রতি দিকের বৃক্কের অঙ্কীয়দেশে একটি পাতলা পর্দার দ্বারা যুক্ত থাকে। এই পাতলা পর্দা পেরিটোনিয়ম-পর্দাটিকে **মেসরকিয়ম** (*Mesorchium*) বলা হয়। কোন পুং-ব্যাঙে লম্বাকার শুক্রাশয়টিকে খণ্ড খণ্ড দেখায়। পর পর তিনটি বা বিবিধ খণ্ডে শুক্রাশয় সৃষ্টির পর উহারা একত্রিত হইলে উপরোক্তভাবে খণ্ডিত দেখায়। শুক্রাশয়গুলি অসংখ্য **শুক্রসৃষ্টি নালী** (*Seminiferous Tubules*) দ্বারা গঠিত। এই শুক্রসৃষ্টি নালীর ভিতরকার গাত্র হইতে শুক্রকীট জন্মায়। শুক্রকীটগুলি দেখিতে অভিনব এবং প্রকৃতপক্ষে ইহারা এক একটি কোষবিশেষ। শুক্রকীটগুলি দেখিতে লম্বাকার। উহার গোলাকার মাথাটি কোষের নিউক্লিয়সের দ্বারা গঠিত। গোলাকার মাথার পরবর্তী অঞ্চল বা কণ্ঠ-অঞ্চলটি কোষের সেন্ট্রোসেমের দ্বারা গঠিত।

কণ্ঠের পরবর্তী অঞ্চলটি পাতলা সিলিয়ার মত। এই অঞ্চলটি কোষের সাইটোপ্লাজমের দ্বারা গঠিত হয়। শুক্র-সৃষ্টির নালীগুলি **বৃক্কের সংগৃহীত নালীর** (*Collecting Tube*) সহিত অনেকগুলি সূক্ষ্মনালী দ্বারা যুক্ত থাকে।
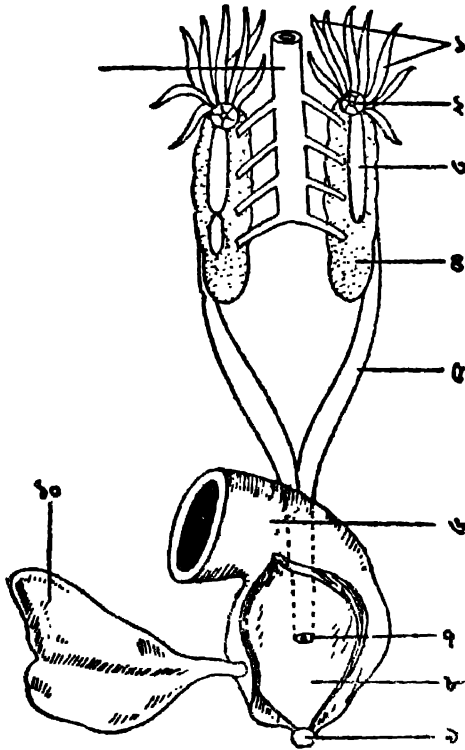
৮২নং চিত্র

ব্যাঙের পুং-রেচন জননতন্ত্র দেখান হইতেছে।

১, স্নেহ-পদার্থের ফিতা ; ২, বিডার্স গন্থ : ৩, শুক্রাশয় ; ৪, বৃক্ক ; ৫, গবিনী বা উলফিয়ান নালী ; ৬, মলাশয়ের শেষ অংশ ; ৭, রেচন-ছিদ্র বা গবিনী ছিদ্র ; ৮, অবসারণী ; ৯, অবসারণী ছিদ্র।

এই সূক্ষ্ম-নালীগুলিকে **ভাসা-এফারেন্সিয়া** (*Vasa efferentia*) বলা হয়। ভাসা-এফারেন্সিয়া নালীগুলি মেসরকিয়ম পর্দা ভেদ করিয়া বৃক্কের ভিতর প্রবেশ করে। বৃক্কের সংগৃহীত নালী গাবনীরূপে বাহির হইয়া অবসারণীতে মুক্ত হয়। শুক্রকীটগুলি ভাসা এফারেন্সিয়া নালীর ভিতর দিয়া বৃক্কের সংগৃহীত নালীতে পৌছায় এবং তথা হইতে গবিনীর দ্বারা আবরণীতে উপনীত হয়। শুক্রকীটগুলি উহার সিলিয়ার মত লেজের দ্বারা চলিতে পারায় উহারা নালীপথে সহজেই চলিয়া আসে।

গবিনী দুইটি সংযুক্ত হইয়া একটি সংযুক্ত গবিনীতে পরিণত হয়। এবং ইহা **রেচনছিদ্রের** (*Renal Opening*) দ্বারা দেহের বাহিরে মুক্ত হয়। সুতরাং রেচন-পদার্থের সহিত গবিনী নালী শুক্রকীটগুলিকেও দেহের বাহিরে নিক্ষেপ করে। গবিনী এইভাবে শুক্রকীট বহন ও রেচন-পদার্থ বহন—এই দুই কাজ করায় উহাকে **উলফিয়ান নালী** বা **জনন-রেচন নালী** (*Wolfian duct*

or Urino-genital duct) বা হয়। সোনা ব্যাঙের (*Frog*) উলফিয়ান নালী দুইটি সংযুক্ত হয় না। ইহারা পৃথকভাবে ছিদ্রের দ্বারা অবসারণীতে মুক্ত হয়। প্রতিটি বৃক্কের অঙ্কীয়দেশের অগ্রাংশে একটি গোলাকার বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে **বিডারস্ যন্ত্র** (*Bider's organ*) বলা হয়। ইহা স্ত্রী বা পুরুষ উভয় ব্যাঙেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিডারস্ যন্ত্রের অন্তর্গঠন ডিম্বাশয়ের (*Ovary*) মতন। কিন্তু ইহার কোষগুলি অপরিণত হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রে রূপান্তরিত হইতে পারে না। শুক্রকীটগুলি জনন-ঋতুতে কেবলমাত্র সঙ্গমের সময়ই বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। স্ত্রী বা পুরুষ জনন-তন্ত্রের শীর্ষাগ্রে অনেকগুলি লম্বা লম্বা ফিতার মত হলদে রঙের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিকে স্নেহপদার্থ বস্তু (Fat bodies) বলা হয়। ব্যাঙ জনন ঋতুতে এইভাবে স্নেহপদার্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই স্নেহপদার্থের সাহায্যে শুক্রাশয়ে বা ডিম্বাশয়ে শুক্রকীট বা ডিম্বকের সৃষ্টি হয়। আবার ব্যাঙের **শীত-ঘুমের সময়** (*Hibernation period*) এই স্নেহপদার্থ-গুলি উহাদের খাদ্য যোগায়।

স্ত্রী-জননযন্ত্র (Female Reproductive Organs):

স্ত্রী-ব্যাঙের স্ত্রী-জননযন্ত্র দুইটিকে **ডিম্বাশয়** (*Ovary*) বলা হয়। প্রতিটি ডিম্বাশয় আকারহীন থলির মত। এই বৃহৎ ডিম্বাশয় নানাভাবে ভাঁজ করা থাকে এবং প্রতি পাশের ডিম্বাশয় সেই পাশের বৃক্কের অঙ্কীয়দেশের সহিত **মেসোভারিয়াম** (*Mesovarium*) পর্দার দ্বারা যুক্ত থাকে। পূর্ণাঙ্গ ডিম্বাশয়ে অসংখ্য ডিম্বকোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম্বকোষের কেন্দ্রস্থ কালো অঞ্চলটি কোষের প্রোটোপ্লাজমের দ্বারা নির্মিত। এই অঞ্চলটিকে **অ্যানিমেল পোল** (*Animal Pole*) বলা হয়। অ্যানিমেল পোলের চারিপার্শ্বের সাদা অঞ্চলটিকে ভেজিটেটিভ পোল (Vegetative pole) বলে। প্রতিটি ডিম্বকোষ একটি পাতলা পর্দার দ্বারা আবৃত থাকে। ডিম্বকোষের এই সূক্ষ্ম পর্দাটিকে **ভিটেলাইন পর্দা** (*Viteline membrane*) বলা হয়।

প্রতিটি ডিম্বাশয়ের জন্য ব্যাঙের দেহগহ্বরের দুইপাশে একটি করিয়া **ডিম্বাশয় নালী** (*Oviduct*) বিদ্যমান। ডিম্বাশয়ের সহিত ডিম্বাশয় নালীর কোনও সম্বন্ধ নাই। ডিম্বাশয় নালী দুইটি লম্বা, পাকানো এবং সাদা রঙের। প্রতিটি ডিম্বাশয় নালীর অগ্রভাগ, সেইদিকের ফুসফুসের ঠিক তলায় থাকে।

ডিম্বাশয় নালীর অগ্রাংশটি ফানেলের মুখের মত এবং ইহাকে **অসটিয়াম** (*Ostium*) বলা হয়। অগ্রাংশ হইতে ডিম্বাশয় নালীটি যতই নীচের দিকে নামিতে থাকে, ততই সরু হয় এবং পাকাইয়া যায়। ব্যাঙের শ্রোণী-অঞ্চলের (Pelvic Region) নিকট প্রতিটি ডিম্বাশয় নালী ফুলিয়া উঠে এবং ডিম্বাশয় নালীর এই ফোলা অঞ্চলটিকে **ইউটেরাস** (*Uterus*) বলা হয়। দুইটি
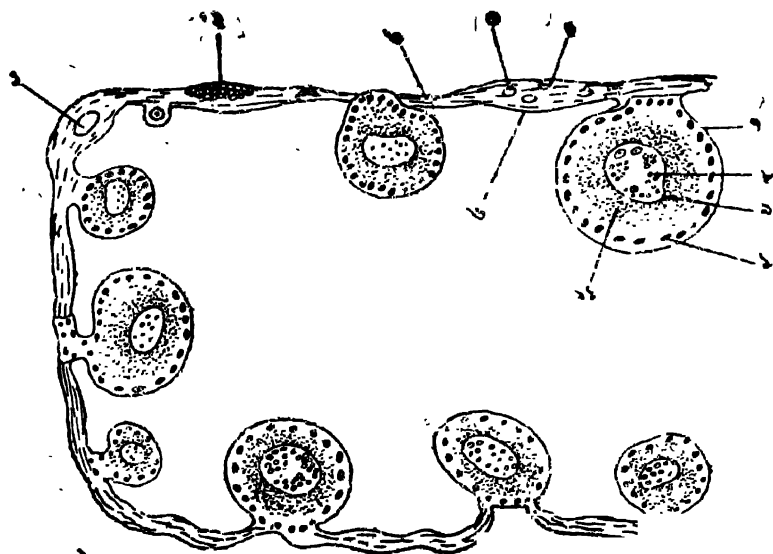
৮৩নং চিত্র

ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদের কিছু অংশ দেখান হইতেছে।

১, রক্তবাহী নালী; ২, বীজত্বক; ৩, ত্বক্ বা এপিথিলিয়মের বাহিরের স্তর; ৪, রক্তবাহী নালী; ৫, সংযোগী পেশী; ৬, ত্বক্ বা এপিথিলিয়মের ভিতরের স্তর; ৭, ওভারিয়ান ফলিকলের বাহিরের স্তর; ৮, নিউক্লিওলাই; ৯, নিউক্লিয়স; ১০, ইয়ক বা স্নেহ-পদার্থ; ১১, ফলিকলের এপিথিলিয়ম।

ইউটেরাস একত্রিত হইয়া একটি সংযুক্ত ইউটেরাসে রূপান্তরিত হয় এবং ইহা অবসারণীর পৃষ্ঠদিকে **স্ত্রী-জনন-ছিদ্রে** (*Female Genital Opening*) মুক্ত হয়। সোনা ব্যাঙের (Frog) দুইটি ইউটেরাস সংযুক্ত না হইয়া পৃথকভাবে পৃথক ছিদ্রের দ্বারা অবসারণীতে মুক্ত হয়। জনন-ঋতুতে ডিম্বাশয় হইতে পূর্ণাঙ্গ ডিম্বকোষগুলি খসিয়া ব্যাঙের দেহ-গহ্বরের ভিতরে পড়ে। দেহ-গহ্বরের

ভতরকার দেহরসে ভাসিতে ভাসিতে উহা ফুসফুসের তলায় উপনীত হয় এবং

৮৪নং চিত্র

ব্যাঙের স্ত্রী-জননতন্ত্র দেখান হইতেছে।
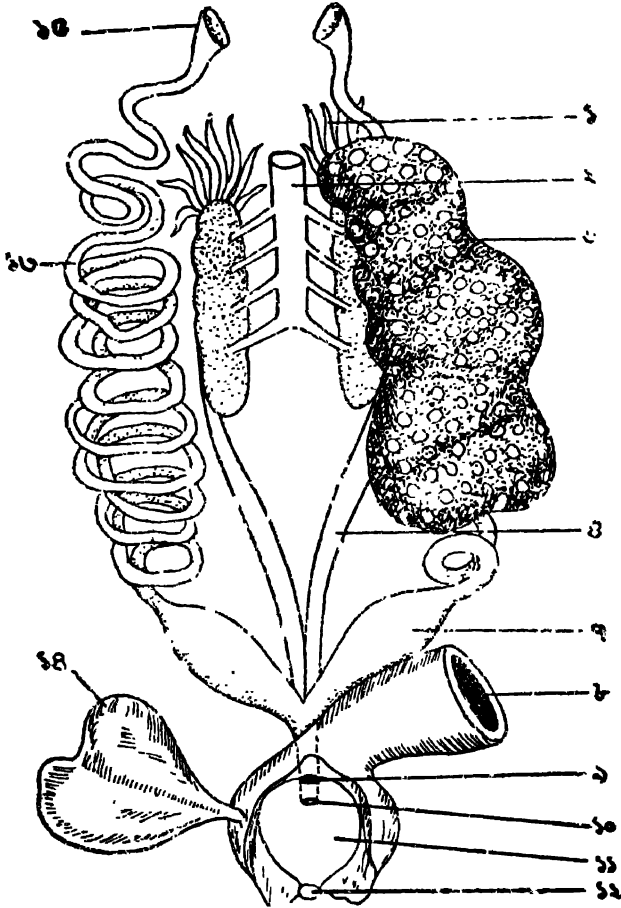
১, স্নেহ-পদার্থের ফিতা; ২, পশ্চাদ্ভাগের মহাশিরা; ৩, ডিম্বাশয়; ৪, গবিনী, ৭, ইউটেরাস; ৮, মলাশয়ের শেষ অঞ্চল; ৯, ডিম্বাশয় নালীর একত্রিত ছিদ্র; ১০, গবিনী-ছিদ্র; ১১, অবসারণী; ১২, অবসারণী ছিদ্র; ১৩, ডিম্বাশয় নালী; ১৪, মুখথলি; ১৫, ডিম্বাশয় নালীর ফানেলের মত মুখ।

ডিম্বাশয় নালীর অসটিয়ামের ভিতর প্রবেশ করে। ডিম্বকোষগুলি ডিম্বাশয় নালীর অসটিয়ামের ভিতর প্রবেশ করিবার পর উহা নালীর ভিতর দিয়া ধীরে

ধীরে নামিতে থাকে। এই সময় ডিম্বকোষের চারিপাশে জেলির মত পদার্থ জমা হয়। অবশেষে ডিম্বকোষগুলি ব্যাঙের ইউটেরাসে পৌছায় এবং তথায় অবস্থান করে। জনন-সঙ্গমের সময় ডিম্বকোষগুলি মূল ইউটেরাস হইতে স্ত্রী-জননছিদ্রের ভিতর দিয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।

চক্ষু
(Eye)

ব্যাঙ চোখের দ্বারা দেখিতে পায়। ইহার মাথার দুইপাশে একটি করিয়া গোলাকার চোখ থাকে। প্রতিটি চোখের তিনটি করিয়া আবরণী বা পাতা (*Eye-lid*) থাকে। যথা—উপরের স্থূল আবরণী, নিচের ক্ষয়প্রাপ্ত আবরণী
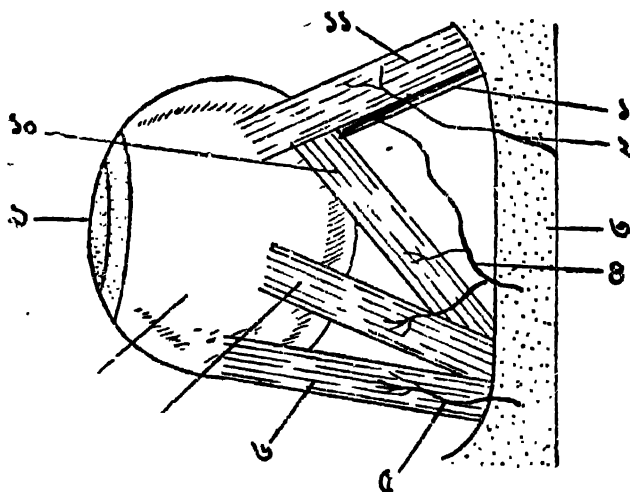
৮৫নং চিত্র

চোখের পেশী এবং স্নায়ুগুলি দেখান হইতেছে।

১, ইনফিরিয়র অবলিক পেশী ; ২, করোটির ট্রকলিয়র স্নায়ু ; ৩, চক্ষু-খোলক ; ৪, অকুলোমোটর স্নায়ু ; ৫, অ্যাবডিউসেন্স স্নায়ু ; ৬, এক্সটারনাল রেকটাস্ পেশী ; ৭, সুপিরিয়র রেকটাস পেশী ; ৮, চক্ষুগোলক ; ৯, লেন্স ; ১০, ইন্টারনাল রেকটাস বেশী ; ১১, সুপিরিয়র অবলিক পেশী।

ও চোখের উপরকার স্বচ্ছ পাতলা পর্দা (*Nictitating Membrane*) করোটির দুইটি চক্ষুগোলকের (*Eye socket*) মধ্যে একটি করিয়া চোখ

থাকে। এই খোলক হইতে চক্ষুগোলককে (*Eye-ball*) আটটি মাংসপেশী যুক্ত থাকে। এইরূপ পেশীর দ্বারা চক্ষুগোলকটি খোলকের মধ্যে ইচ্ছামত ঘুরিতে পারে। নিম্নে, বিবিধ পেশীর নাম ও উহাদের কার্যকারিতা উল্লেখ করা হইল :

চক্ষুপেশীর নাম	উহার কার্যকারিতা
(i) সুপিরিয়র রেক্টস্ (Superior Rectus)	চোখ দুইটিকে উপরের দিকে তুলিতে পারে। (upward movement)।
(ii) ইনফিরিয়র রেক্টস্ (Inferior Rectus)	চোখ দুইটিকে নীচের দিকে নামাইতে পারে। (downward movement)।
(iii) অ্যানটিরিয়ার রেক্টস্ (Anterior Rectus)	চোখ দুইটিকে সামনের দিকে আগাইয়া দেয়। (forward movement)।
(iv) পোস্‌টিরিয়র রেক্টস্ (Posterior Rectus)	চোখ দুইটিকে পিছনের দিকে ফিরাইয়া দেয়। (backward movement)।
(v) সুপিরিয়র অব্‌লিক (Superior Oblique)	চোখ দুইটিকে ডানদিকে ঘুরাইতে পারে। (right roatation along optic-cornea axis)।
(vi) ইনফিরিয়র অব্‌লিক (Inferior Oblique)	চোখ দুইটিকে বাম দিকে ঘুরাইতে পারে। (left rotation along optic-cornea axis)।
(vii) এলিভেটর বাল্‌বি (Elevator Bulbi)	চোখ দুইটিকে মাথার উপর তুলিতে পারে। (raising the eye on the surface of the head)।
(viii) রিট্রাকটর বাল্‌বি (Retractor Bulbi)	চোখ দুইটিকে চক্ষুখোলকের ভিতর প্রবেশ করাইতে পারে। (bulging the eye into the buccal cavity)।

উপরোক্ত চক্ষুপেশীগুলির কার্যকরী সহায়তায় ব্যাঙ প্রায় সর্বদিকে চক্ষু ঘুরাইয়া দেখিতে পারে। প্রতিটি চক্ষু প্রকৃতপক্ষে একটি ফাঁপা গোলক বিশেষ। গোলকের সম্মুখভাগে একটি দ্বি-উত্তর লেন্স (*Lens*) নিবিষ্ট থাকে এবং উহার পশ্চাদ্ভাগের ভিতরের স্তরটি একটি **আলোক-সংবেদী** (*Light Sensitive*) পর্দা ঢাকিয়া থাকে। চোখের ভিতর ফটো-তোলা ক্যামেরার মত একটি নির্দিষ্ট ছিদ্র ব্যতীত অন্য কোন স্থানের ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না। প্রতিটি চক্ষুগোলককে পরিবেষ্টন করিয়া তিনটি আবরণী থাকে, যথা—চক্ষুগোলকের বহিরাবরণটিকে **শ্বেতমণ্ডল** বা **স্ক্লেরোটিক স্তর** (*Sclerotic Layer*) বলা হয়। ইহা অস্বচ্ছ, শক্ত ও সংযোগী কলার সমন্বয়ে গঠিত। স্ক্লেরোটিক্ স্তরটি আবার দুই অঞ্চলে বিভেদিত। ইহার যে অঞ্চলটি চক্ষুগোলকের ভিতরে থাকে, তাহাকে **স্ক্লেরা** (*Sclera*) অঞ্চল বলা হয়। ইহা অস্বচ্ছ এবং স্ক্লেরোটিক স্তরের পশ্চাদ্ভাগ অঞ্চল। স্তরটির বাহির অঞ্চলটিকে বা চক্ষুগোলকের বাহির অঞ্চলের স্তরের অংশটিকে অচ্ছোদপটল বা **করনিয়া** (*Cornea*) বলা হয়। চোখের বাহিরে সাদা গোলাকার অঞ্চলটিই অচ্ছোদপটল বা করনিয়া এবং ইহা স্বচ্ছ হওয়ায় উহার ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি প্রবেশ করে। উপর ও নীচের চোখের পাতার তলায় একটি করিয়া পাতলা পর্দা থাকে। এই পর্দাটি অচ্ছোদপটলের উপর কিছু অংশে প্রসারিত হয় এবং ইহার পর্দা দুইটি চোখের পাতার সহিত অচ্ছোদপটলকে যুক্ত করে। এই বিশিষ্ট পর্দাটিকে নেত্রবর্ত্মকলা বা **কন্জাংটিভা** (*Conjunctiva*) বলে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্ক্লেরা সংযোগী-কলার সমন্বয়ে গঠিত এবং ইহার ভিতর তরুণাস্থি-কলাও বিদ্যমান থাকায় ইহা চক্ষুগোলককে বহিরাগত আঘাত হইতে রক্ষা করে। নেত্রবর্ত্মকলা চক্ষুকে সিক্ত করে; ii) চক্ষুগোলকের দ্বিতীয় আবরণ বা মধ্যাবরণটিকে কৃষ্ণমণ্ডল বা **করয়েড স্তর** (*Choroid Layer*) বলা হয়। ইহা স্ক্লেরোটিক পর্দার নিম্নে বা ভিতরে বিদ্যমান। এই পর্দাটি খুবই সূক্ষ্ম এবং কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ দ্বারা রঞ্জিত। কৃষ্ণবর্ণের পদার্থগুলিকে **রঞ্জক** (*Pigment*) বলা হয়। এই পর্দার ভিতরে প্রচুর সংখ্যায় রক্তবাহীনালী বা স্নায়ুর সূক্ষ্ম-শাখা প্রবেশ করে এবং পর্দাটিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। করয়েড স্তরটি স্ক্লেরোটিক স্তরের স্ক্লেরা ও করনিয়ার সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রসারিত হইবার পর নিম্নমুখী হইয়া লেন্সের উপর গোলাকারে ছড়াইয়া পড়ে। এই গোলাকার কৃষ্ণবর্ণের সঙ্কোচন পর্দাটিকে

কণীনিকা বা আইরিস (*Iris*) বলা হয়। ইহার কেন্দ্রস্থলে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, উহাকে **তারারন্ধ্র বা পিউপিল** (*Pupil*) বলে। কণীনিকা বা আইরিস্ পর্দাটি **বৃত্তাকার ও অরীয়** (*Circular and Radial*) পেশীর দ্বারা গঠিত এবং ইহাদের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে তারারন্ধ্র বা পিউপিল-ছিদ্রটি
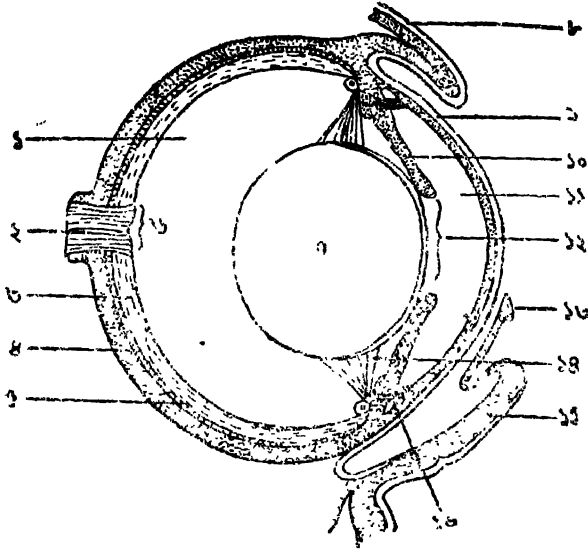
৮৬নং চিত্র

ব্যাঙের চোখের লম্বচ্ছেদ দেখান হইতেছে।

১, ভিটারাস হিউমার; ২, চক্ষুস্নায়ু; ৩, অক্ষিপট; ৪, স্ক্লেরা; ৫, করয়েড; ৬, ব্লাইণ্ড স্পট; ৭, লেন্স; ৮, উপরের পাতা; ৯, কনজাংটিভা; ১০, আইরিস বা কণীনিকা; ১১, অ্যাকুয়াস-হিউমার; ১২, পিউপিল বা তারারন্ধ্র; ১৩, নিকটিটেটিং পর্দা; ১৪, সাসপেনসারি লিগামেন্ট বা সন্ধিবন্ধনী; ১৫, নীচেকার পাতা; ১৬, প্রোট্রাক্টর পেশী।

ব্যাসে ছোট বা বড় হয়। ইহার দ্বারা তারারন্ধ্রের ভিতর কতখানি আলোক-রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে, তাহা প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং প্রখর রৌদ্রে তারারন্ধ্রটি ছোট হয় এবং হালকা রৌদ্রে বড় হয়। তারারন্ধ্রই একমাত্র ছিদ্র যাহার ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মি চক্ষু-লেন্সে প্রবেশ করিতে পারে।

(iii) চোখের অন্তরাবরণ বা তৃতীয় আবরণটিকে **অক্ষিপট** (*Retina*) বলা হয়। ইহা স্নায়ুপূর্ণ আবরণ। ইহা চক্ষুগোলকের কৃষ্ণমণ্ডলের নিম্নে সূক্ষ্ম

পাতলা কোমল আবরণরূপে বিদ্যমান। **অক্ষিস্নায়ু** (*Optic Nerve*) চক্ষু-গোলকের পশ্চাদ্দিকে ছিদ্রের দ্বারা প্রবেশ করিয়া ইহার পাতলা আবরণ-রূপে ছড়াইয়া পড়ে এবং সমগ্র অক্ষিপটটিকে আলোক-সংবেদ করিয়া দেয়। ইহা এমন অনুভবপ্রবণ যে, ব্যাঙ যাহা কিছু দেখিতে পায় তাহা এই আবরণে প্রতিফলিত হয়। চক্ষুপটে দুইপ্রকারের কোষ দেখা যায়। প্রথমটিকে **রডকোষ** (*Rod Cell*) বলা হয়। কোষগুলি পাতলা নলের মত। ইহারা লম্বভাবে (perpendicularly arranged) সাজানো থাকে। রডকোষের নিউক্লিয়সটি নলাকার কোষের নিম্নে থাকে। ইহার সহিত অক্ষিস্নায়ুর ডেনড্রাইট যুক্ত হয়। রডকোষগুলি মৃদু আলোক এবং বর্ণসংবেদ করে। **কোন-কোষগুলি** (*Cone Cell*) ক্ষুদ্র ও গোলাকার। ইহারাও স্নায়ুশিরার ডেনড্রাইটের সহিত যুক্ত হয়। অক্ষিপটে বিবিধ-অঞ্চল বিদ্যমান। রডকোষ ও কোন-কোষের বিস্তার অক্ষিপটের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। কোন-কোষগুলি উজ্জ্বল আলো ও বর্ণসংবেদী।

কণীনিকা বা আইরিসের ঠিক পিছনে একটি দ্বি-উত্তল বা গোলাকার আঠাল পদার্থপূর্ণস্বচ্ছ **লেন্স** বিদ্যমান। লেন্সের ঠিক কেন্দ্রস্থলের উপর তারারন্ধ্র বা পিউপিল থাকে। কতকগুলি পেশীতন্তুর সাহায্যে লেন্সটি এইরূপ অবস্থায় আবদ্ধ থাকে। এই পেশীতন্তুগুলিকে **আবদ্ধ-তন্তু** (*Suspensory Legament*) বলা হয়। অচ্ছোদপটল বা করনিয়া ও লেন্সের মধ্যে একটি অঞ্চল বিদ্যমান; ইহাকে **অগ্রকক্ষ** (*Anterior Chamber*) বলে। এই কক্ষ নির্মল জলবৎ একপ্রকার তরল-রসে পূর্ণ থাকে। উহাকে **জলীয় পদার্থ** (*Aqueous Humor*) বলা হয়। লেন্স আলোকরশ্মিকে প্রতিসৃত করে এবং উহাকে ঠিক অক্ষিপটে প্রতিফলিত করে। অগ্রকক্ষের জলীয় পদার্থটি চক্ষুর বিবিধ কোষে খাদ্য সরবাহ করে এবং কোষ হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয়।

লেন্সের পশ্চাতে চক্ষুগোলকের কেন্দ্রস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গহ্বর থাকে, তাহাকে **পশ্চাদ্-কক্ষ** (*Posterior-chamber*) বলা হয়। পশ্চাদ্-কক্ষে একপ্রকার আঠাল, জেলীর মত পদার্থ থাকে। এই পদার্থকে **সান্দ্র পদার্থ** (*Victreous Humor*) বলে। ব্যাঙ কোন প্রকারেই চোখের লেন্সের আকার পরিবর্তন করিতে পারে না। চোখের প্রতিটি কোণের তলা ও উপর হইতে একটি করিয়া সূক্ষ্ম পেশী **আবদ্ধ-তন্তুর** (*Suspensory Ligament*) সহিত যুক্ত থাকে। ইহাদের **প্রোট্র্যাক্টর লেন্টিস্** (*Protractor Lentis*)

বলে। প্রোট্র্যাক্টর লেন্টিস পেশী সঙ্কুচিত হইলে লেন্সের উপরকার আবদ্ধ-
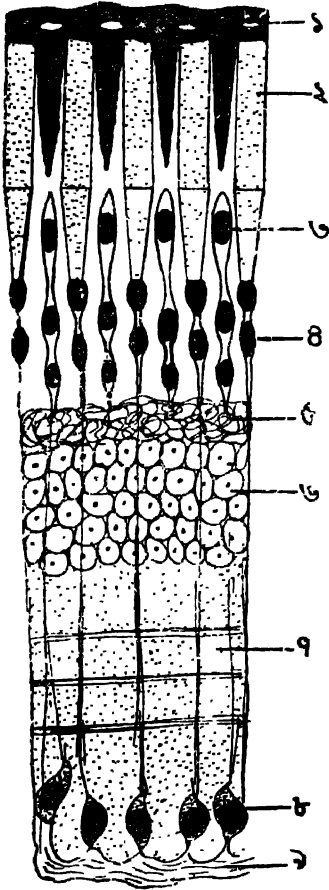
৮৭নং চিত্র

চোখের অক্ষিপটের উপর-তলা ভাবে ব্যবচ্ছেদ কাটিয়া উহার ভিতরের কোষ-বিন্যাস দেখান হইতেছে।

তন্তুটিকে তুলিয়া ধরে, ফলে লেন্সটি অচ্ছোদপটল বা করনিয়ার দিকে আগাইয়া যায়। সেইরূপে প্রোট্র্যাক্টর লেন্টিস প্রসারিত হইলে লেন্সটি অচ্ছোদপটল হইতে দূরে সরিয়া যায়।

মস্তিষ্কের অক্ষিস্নায়ু (*Optic Nerve*) চক্ষুগোলকের পশ্চাদ্ভাগের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করে এবং দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অক্ষিপটের উপর ছড়াইয়া পড়ে।

এই বিভাগ-স্থলে অক্ষিপটের ভিতর রড ও কোন-কোষ না থাকায় ইহা কোন বস্তুর চিত্র প্রতিফলিত করিতে পারে না। এই বিভাগ-স্থলটিকে **অন্ধকেন্দ্র** বা **ব্লাইণ্ড স্পট্** (*Blind Spot*) বলা হয়। ব্লাইণ্ড কেন্দ্রের দুই পার্শ্ববর্তী অক্ষিপট অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় বড় কোন-কোষ থাকায় এই অঞ্চলে চিত্র প্রতিফলিত হয়। এই অঞ্চলটিকে **সংবেদ-কেন্দ্র** (*Sensitive*) অঞ্চল বলে।

দৃষ্টি (Vision): চক্ষুগোলকের অচ্ছোদপটলের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি তারারন্ধ্রের পথে লেন্সে **প্রতিসৃত** (*refracted*) হয় এবং আলোক রশ্মিগুলি প্রতিসৃত হইবার পর অক্ষিপটের সূক্ষ্ম অংশের উপর **অভিসৃত** (*Canverged*) হয়। ইহার ফলে দৃশ্যবস্তুর একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি উল্টানোভাবে অক্ষিপটের উপর পতিত হয়। ফটো তুলিবার ক্যামেরায় যেমন লেন্সকে **ফোকাস** (*Focus*) করিয়া একটি নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতিচ্ছবি সংবেদী ফিল্মের উপর ফেলা হয়, সেইরূপ ব্যাঙের চক্ষুগোলকে ও উহার অক্ষিপটের উপর বস্তুর প্রতিচ্ছবি উল্টাইয়া পড়ে। চক্ষুগোলকের লেন্সের **উপযোজন ক্রিয়া** (*Accomodation*) উহার সংযুক্ত প্রোট্র্যাক্টর লেন্টিস্ পেশীর সাহায্যে সম্পাদিত হয়। প্রয়োজনমত পেশীগুলির সাহায্যে লেন্সটি আগাইয়া বা পিছাইয়া যায়। অক্ষিপটের উল্টানো ছবির অনুভূতি উহার রড ও কোন-কোষের সাহায্যে এবং অক্ষিস্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কের **অক্ষিকেন্দ্রে** (*Optic Lobe*) পৌঁছায়। এইভাবে ছবির অনুভূতিটি মস্তিষ্কের পথে যাইবার সময় উল্টানো প্রতিচ্ছবিটি আশ্চর্যরূপে সোজা হইয়া যায়।

ব্যাঙের মাথার দুই পার্শ্বে একটি করিয়া চোখ থাকায় উহারা দুই চোখ দিয়া দুইটি বিভিন্ন বস্তু দেখিতে পারে। এইরূপ দৃষ্টিকে **এক-দৃষ্টি** বা **মনোকিউলার ভিসন** (*Monocular Vision*) বলা হয়। কিন্তু অনেক প্রাণী একই বস্তুকে দুই চক্ষু দিয়া দেখিতে পারে। এইরূপ দৃষ্টিকে **দূরবীনদৃষ্টি** বা **বায়নোকিউলার ভিসন** (*Binocular Vision*) বলা হয়। চিল, বাজপাখী, পেঁচা প্রভৃতি পাখীরা দূরবীন-দৃষ্টির সাহায্যে বস্তু দেখিতে পায়। শুধু ইহাই নহে, বস্তুর দূরত্বও মাপ করিতে পারে। মানুষের দৃষ্টিও দূরবীন-দৃষ্টি গোত্রীয়। ব্যাঙের এক দৃষ্টি হওয়ায় বস্তুর অনেকাংশ দেখিতে পারে কিন্তু বস্তুর দূরত্ব বা গভীরতা মাপ করিতে পারে না। দূরবীন-দৃষ্টিতে বস্তুর কিছু অংশ পাখী বা মানুষ দেখিতে পারে এবং বস্তুটিকে দুই চোখ দিয়া দেখে

বলিয়া উহার দূরত্ব গভীরতা পরিমাপ করিতে পারে। ব্যাঙের মাথার দুই পাশে বেশ দূরত্ব বজায় রাখিয়া চোখ দুইটি থাকায় উহাদের দৃষ্টি এক দৃষ্টি জাতীয় হয়। সেইরূপ মানুষের চোখ দুইটি মাথার সামনে থাকায় উহাদের দূরবীন-দৃষ্টি-জাতীয় হয়।

কর্ণ
(Ear)

ব্যাঙের কর্ণ শব্দানুভূতির ইন্দ্রিয় এবং ইহা দেহের **ভারসাম্য** (*Balancing*) রক্ষা কার্যও করে। মানুষের বাহ্যকর্ণ থাকে। সাধারণতঃ বাহ্-
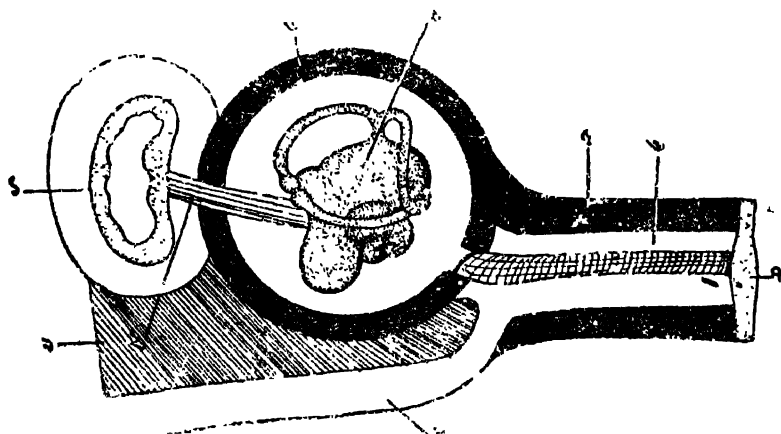
৮৮ নং চিত্র

১, মস্তিষ্ক; ২, শ্রবণ-স্নায়ু; ৩, কর্ণ-কোটর অস্থি; ৪, অন্তঃকর্ণ বা মেমব্রেনাল ল্যাবাইরিন্থ; ৫, মধ্যকর্ণের কোটর-অস্থি; ৬, কলুমিলা; ৭, কর্ণপটহ; ৮, ইউস্টেচিয়ান নালী; ৯, প্যারাস্ফিনয়েড অস্থি।

কর্ণকে আমরা কান বলিয়া থাকি। কিন্তু ইহা কর্ণের বাহিরের অংশমাত্র এবং ইহা শব্দস্রোতকে কানের ভিতর প্রবেশ করাইতে সাহায্য করে। ব্যাঙের কর্ণে এইরূপ কোন বাহ্যকর্ণ বা বহিঃকর্ণ নাই। মানুষের বহিঃকর্ণের

ভিতর একটি **কর্ণকুহর** (*Auditory Meatus or Canal*) বা কর্ণনালী থাকে। ইহার ভিতর দিয়া শব্দস্রোত অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। ব্যাঙের কর্ণে এইরূপ কর্ণকুহর নাই। ব্যাঙের মাথার দুই পার্শ্বের চোখের ঠিক পিছনে একটি করিয়া কর্ণ বিদ্যমান। প্রতিটি কর্ণে তিনটি অঞ্চল আছে। যথা—(i) **কর্ণপটহ** (*Tympanum*); (ii) **মধ্যকর্ণ** (*Middle Ear*) ও (iii) **অন্তঃকর্ণ** (*Internal Ear*)।

(*i*) তোমরা হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, ব্যাঙের প্রতিটি চোখের পিছনে একটি গোলাকার পাতলা পর্দা প্রসারিতভাবে থাকে। ইহাকেই কর্ণপটহ বলা হয়। এই পাতলা পর্দাটি মধ্যকর্ণকে আবৃত করিয়া রাখে। (*ii*) ব্যাঙের মধ্য-কর্ণটি একটি নালীবিশেষ। নালীটির আকার ফানেলের মত। এই নালী হইতে একটি শাখানালী বাহির হইয়া ব্যাঙের মুখবিবরে মিলিত হইয়াছে। শাখানালী-টিকে **ইউস্টেচিয়ান নালী** (*Eustachian Tube*) বলা হয়। ইহা কর্ণের রক্ষাকবচের মত কাজ করে। আগেই বলা হইয়াছে যে, কর্ণপটহ পর্দাটি মসৃণ ও পাতলা। উহা দেহের বাহিরে থাকায় সর্বদাই উহার উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ পড়ে। আবার এই বাহিরের বা বায়ুমণ্ডলের চাপের গতি ও শক্তি ক্ষয় করিয়া দেয় অন্য একটি চাপ। দ্বিতীয় চাপটি মুখবিবরের ভিতর দিয়া ইউস্টেচিয়ান নালীপথে কর্ণপটহের ভিতরের দিকের পড়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় চাপের গতি বিপরীত এবং শক্তি সমান হওয়ায় কর্ণপটহটি অতীব পাতলা হইলেও ফাটিয়া যায় না এবং টান-টান ভাবে থাকে। সুতরাং ইউস্টেচিয়ান নালা কর্ণপটহের ভিতরে ও বাহিরের দিকে বায়ুমণ্ডলের চাপের **ভারসাম্য** (*Balance*) বজায় রাখে। কর্ণপটহের ভিতরের কেন্দ্রস্থল হইতে একটি ছোট লম্বাকার তরুণাস্থিবিশিষ্ট দণ্ড লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে এবং অন্তঃকর্ণের বাহিরের পাতলা পর্দার সহিত যুক্ত থাকে। এই তরুণাস্থি-বিশিষ্ট দণ্ডটিকে **কলুমিলা অরিশ** (*Columella Auris*) বলা হয়। ইহা অন্তঃ-কর্ণের বাহিরের ছিদ্রটিকে আবৃত করিয়া রাখে। অন্তঃকর্ণের এই ছিদ্রটিকে **ফেনিস্ট্রা ওভালিস** (*Fenestra Ovalis*) বলা হয়। (*iii*) ব্যাঙের অন্তঃকর্ণটির করোটির **কর্ণপ্রকোষ্ঠের** (*Auditory Capsule*) মধ্যে বিদ্যমান। এই কর্ণপ্রকোষ্ঠটি বহিঃদ্বার বা ফেনিস্ট্রা ওভালিসের সহিত কলুমিলা অরিস যুক্ত থাকে। এই কর্ণপ্রকোষ্ঠটি **পেরিলিম্ফ** (*Perilymph*) নামক একপ্রকার তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। এই পেরিলিম্ফের মধ্যে ব্যাঙের অন্তঃকর্ণের যন্ত্রটি

ভাসমান অবস্থায় বিদ্যমান। এই যন্ত্রটিকে **মেমব্রেনাস ল্যাবাইরিন্থ** (*Membranous Labyrinth*) বলা হয়। মেমব্রেনাস ল্যাবাইরিন্থ বস্তুটিও ফাঁপা। ইহার ভিতরেও আর এক প্রকার জলীয় তরল পদার্থ থাকে। মেমব্রেনাস ল্যাবাইরিন্থের ভিতরকার জলীয় তরল পদার্থটিকে **এণ্ডোলিম্ফ** (*Endolymph* বলা হয়। মেমব্রেনাস ল্যাবাইরিন্থ আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা—অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ। দুইটি ভাগ পরপর বিদ্যমান। অগ্রভাগটিকে **ইউট্রিকিউলাস** (*Utriculus*) এবং পশ্চাদ্ভাগটিকে **স্যাকিউলাস** (*Saculus*) বলা হয়। উপরোক্ত দুইটি অঞ্চল পরস্পর পরস্পরের সহিত একটি সরু নালী দ্বারা যুক্ত। ইউট্রিকিউলাসের দ্বারা ব্যাঙ দেহের ভারসাম্য রক্ষা কার্য করিতে পারে এবং স্যাকিউলাসের দ্বারা ব্যাঙ শ্রবণশক্তিকে কার্যকরী করে। ইউট্রিকিউল হইতে তিনটি সরু স্বচ্ছ নালী বিভিন্ন স্থান হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ইউট্রিকিউলাসে প্রবেশ করিয়াছে। এই নালাগুলিকে **অর্ধবৃত্তাকার নালী** (*Semicircular canal*) বলা
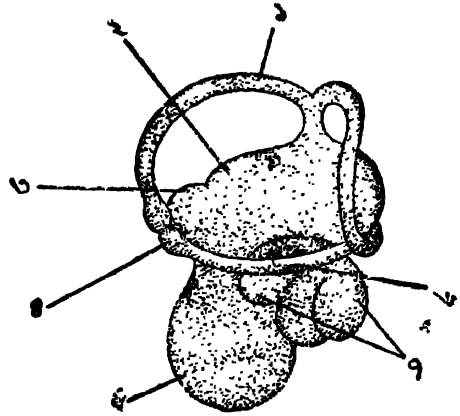
৮৯নং চিত্র

অন্তঃকর্ণের বিবিধ অংশগুলি দেখানো হইতেছে।
১, সম্মুখস্থ সেমিসার্কুলার বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি নালী ;
২, ইউট্রিকউলাস ; ৩, ইউট্রিকিউলাসের শেষ অংশ ;
৪, অ্যামপিউলা ; ৫, সাকিউলাস ; ৬, অনুভূমিকভাবে—সেমিসার্কুলার নালী ; ৭, প্যাপিলা বেসিলেরিস ও লেজিনা।

হয়। প্রতিটি নালী ইউট্রিকিউলাসের ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় স্ফীত হইয়া যায়। প্রতিটি নালীর এই স্ফীত অঞ্চলটিকে **আম্পিউলা** (*Ampulla*) বলা হয়। এই আম্পিউলার ভিতরে সিলিয়াযুক্ত শ্রবণ-সংবেদী কোষ থাকে। প্রথম অর্ধবৃত্তাকার নালীটি **অনুভূমিকভাবে** (*Horizontally*) বিদ্যমান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নালীটি **উল্লম্ব** (*Vertically*) ভাবে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত সমকোণ সৃষ্টি করে। দেখা গিয়াছে যে, ব্যাঙের যে-কোন একটি অর্ধবৃত্তাকার নালী নষ্ট হইয়া গেলে বা উহাকে কাটিয়া ফেলিলে ব্যাঙ কেবল

ঘুরপাক খায় এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে না। মেম্‌ব্রেনাস ল্যাবাইরিন্থের পশ্চাদ্ভাগ বা স্যাকিউলাস অঞ্চল ইউট্রিকিউলাস অপেক্ষা অনেক ছোট। এই অঞ্চলের এক পার্শ্ব হইতে দুইটি গোলাকার ফোলা অংশ দেখা যায়। প্রথমটিকে **প্যাপিলা বেসিলেরি** (*Papilla basilaris*) এবং
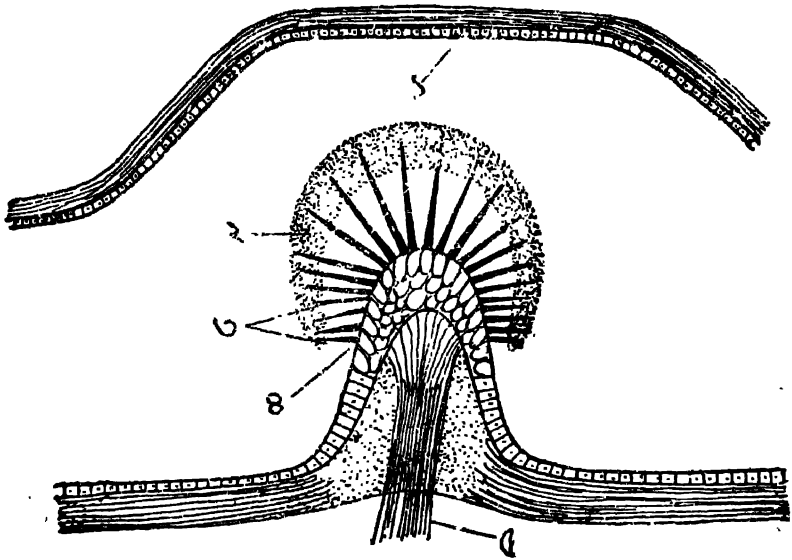
৯০নং চিত্র

ছেদের দ্বারা অ্যামপিউলার অভ্যন্তর দেখান হইতেছে।

১, অ্যামপিউলার গহ্বর ; ২, বালুকা কণা বা স্টাথোলিথ ; ৩, সংবেদনশীল শুঁয়া ; ৪, সংবেদনশীল এপিথিলিয়ম বা স্তর : ৫, শ্রবণ-শাখা-স্নায়ু।

দ্বিতীয়টিকে **লেজিনা** (*Legena*) বলে। প্যাপিলা বেসিলেরিস এই লেজিনার ভিতরেও সাধারণ কোষ ও সিলিয়াযুক্ত **শ্রবণ-সংবেদী কোষ** (*Ciliated sensory cells*) বিদ্যমান। এই সকল কোষের সিলিয়াগুলি শক্ত কূর্চের (*Bristle*) মত। মেমব্রেনাস ল্যাবাইরিন্থের ভিতরকার গাত্রেও উপরোক্ত প্রকার কোষপূর্ণ অঞ্চল থাকে। প্রতিটি স্তূপে শ্রবণ-স্নায়ুর শাখা প্রবেশ করে। স্যাকিউলাস্ ও ইউট্রিকিউলাস অঞ্চলও শ্রবণ-সংবেদী।

শ্রবণ (Hearing) ঃ প্রথমে বাহির হইতে শব্দস্রোত ব্যাঙের কর্ণপটহের উপর ধাক্কা দেয় এবং ইহার দ্বারা যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাহা কলুমিলা দণ্ডটিকেও কম্পিত করে। ফলে পেরিলিম্ফ ও পরে এণ্ডোলিম্ফে স্রোতের সৃষ্টি হয়। ইহাতে ইউট্রিকিউলাস, স্যাকিউলাসের সংবেদ কোষগুলি উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং উহাদের সহিত যুক্ত শ্রবণ-স্নায়ুর শাখার মাধ্যমে উত্তেজনার সংবাদ মস্তিষ্কের শ্রবণ-কেন্দ্রে পাঠায়। মস্তিষ্কে অনুভূতি শব্দে রূপান্তরিত হয়। স্যাকিউলাসের লেজিনা ও প্যাপিলা বেসিলেরিস অঞ্চলে শব্দের স্ফুরণ হয়, তখন ব্যাঙ শুনিতে পায়।

ভারসাম্যতা (Balancing) ঃ ইউট্রিকিউলাসের অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলি ব্যাঙের শরীরের অবস্থিতি অনুযায়ী দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। নালীগুলির মধ্যে এণ্ডোলিম্ফ তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে এবং ইহাদের ভিতরকার গাত্রে অসংখ্য কুর্চবিশিষ্ট সংবেদী-কোষও থাকে। ইহা ব্যতীত নালীর ভিতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুন-জাতীয় কঠিন পদার্থও থাকে। ইহাদের **ওটোলিথ্** (*Otolith*) বলে। তিনটি অর্ধাবৃত্তাকৃতি নালী তিনটি বিভিন্ন সমতলে অবস্থান করার ব্যাঙের দেহের সামান্য সঞ্চলনেও এণ্ডোলিম্ফের সহিত সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থগুলি নড়িয়া উঠে। ফলে সঞ্চলনের দিকে বেশী পরিমাণে কঠিন পদার্থগুলি জমা হয় এবং কোষের কুর্চের সংস্পর্শে আসে। কোষগুলি এইরূপ অনুভূতি পাইয়া উহার স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। ইহার ফলে ব্যাঙ দেহের ভার কোন্ দিকে বেশী তাহা বুঝিতে পারে এবং প্রয়োজনমত নড়াচড়া করিয়া দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী বিভিন্ন সমতলে থাকায় এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত সমকোণ সৃষ্টি করিয়া অবস্থান করায় ইহারা মাধ্যাকর্ষণের গতি অনুযায়ী দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।

অস্থি-ব্যবস্থা
(Skeletal System)

চিংড়ি বা আরশোলায় আমরা দেখিয়াছি যে, উহাদের দেহকে বেষ্টন করিয়া একটি আবরণী থাকে। এই আবরণীটি বেশ কঠিন এবং ইহা প্রাণীগুলিকে একটি সুস্পষ্ট আকার দেয়। এইরূপ আবরণীকে **কিউটিকল**

(*Cuticle*) বলা হয়। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ইহাই অস্থিরূপে কাজ করে এবং বিবিধ পেশীগুলি ইহার সহিত যুক্ত হয়। এইরূপ পেশীবিন্যাসের ফলে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের ভিতরকার তন্তুগুলি উপযুক্তভাবে সাজানো থাকে এবং নিজ নিজ কার্যগুলি সম্পাদন করিতেও পারে। কিউটিকলটি
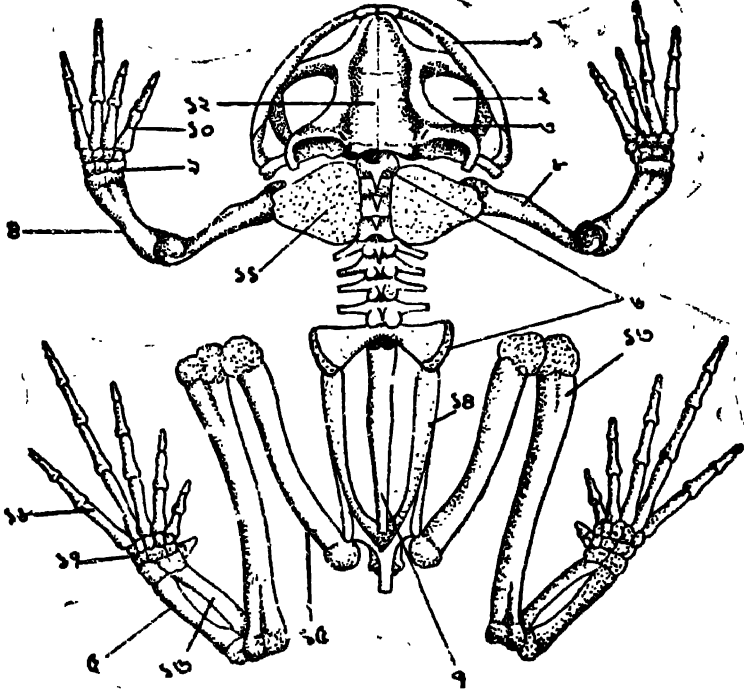
৯১নং চিত্র

ব্যাঙের দেহকঙ্কাল দেখান হইতেছে।

১, ম্যাকসিলা ; ২, চক্ষুগহ্বর ; ৩, এক্সোঅক্সিপিটেল অস্থি ; ৪, রেডিও-আলনা ; ৫, ক্যালকেনিয়ম ; ৬, কশেরুকা (I-IX) ; ৭, ইউরোস্টাইল ; ৮, হিউমারাস ; ৯, কারপল ; ১০, মেটাকারপল ; ১১, সুপ্রাস্ক্যাপুলা ; ১২, ফ্রণ্টো-প্যারাইটেল ; ১৩, টিবিও-ফিবুলা বা জঙ্ঘাস্থি-অনুজঙ্ঘাস্থি ; ১৪, শ্রোণীচক্রের ইলিয়ম অস্থি ; ১৫, উর্বাস্থি বা ফিমার ; ১৬, এ্যাস্ট্রাগ্যালাস ; ১৭, টারসাল ; ১৮, মেটাটারসাল।

দেহ-আবরণী হওয়ায় ইহাকে বহিঃ-অস্থি (*Exoskeleton*) বলা হয়। কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের ভিতরে অস্থি থাকায় এবং এই অস্থিগুলি দেহের কাঠামো নির্মাণ করায় ইহাদের অন্তঃ-অস্থি (*Endoskeleton*) বলা হয়। মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা গড়িবার সময় প্রথমে বাঁশ ও খড় দিয়া;

প্রতিমার কাঠামো নির্মাণ করে। ইহার পর এই কাঠামোর উপর মাটি দিয়া প্রতিমার রূপ ফুটাইয়া তোলে। সেইরূপ মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের ভিতরকার অস্থি-ব্যবস্থাই উহার কাঠামো এবং কাঠামোর উপর পেশী ও ত্বকের আবরণে প্রাণিদেহের আকার গঠন করে। দেহের অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রগুলিকে বিবিধ অস্থিগুলি উহাদের আবৃত করিয়া রক্ষণ করে। দ্রুত-গতিতে চলন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় পেশীগুলি অস্থির সহিত আটকাইয়া থাকে এবং ইহাদের দ্বারা পেশীগুলি সংকোচন ও প্রসারণের সাহায্যে চলন ইত্যাদি ক্রিয়াগুলিকে কার্যকরী করিতে পারে। অস্থিগুলি পরস্পরের সহিত কোমল **তরুণাস্থির** (*Cartilage*) দ্বারা যুক্ত হয়, ফলে একটি সম্পূর্ণ অস্থি-কাঠামো নির্মাণ করে। তরুণাস্থিটি কাঁচা বাঁশের কঞ্চির মত। ইহাকে চাপ দিলে বাঁকিয়া যায়—আবার চাপ হইতে মুক্ত হইলে পূর্ব অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থাতে ক্যালসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি কঠিন ধাতব পদার্থ জমা থাকায়, চাপে পড়লে ভাঙিয়া যায়। অস্থির ভিতরকার ফাঁপা স্থানে চর্বি ও মজ্জা থাকে। সেই মজ্জায় রক্তকণিকার জন্ম হয়।

ব্যাঙের অস্থি-ব্যবস্থাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) **অক্ষিক কঙ্কাল** (*Axial Skeleton*) এবং (২) **উপাঙ্গিক কঙ্কাল** (*Apendicular Skeleton*)।

১। **অক্ষিক কঙ্কাল (Axial Skeleton):** করোটি ও মেরুদণ্ড সমন্বয়ে ব্যাঙের অক্ষিক কঙ্কাল গঠিত। করোটির সহিত মেরুদণ্ড সংযুক্ত হইয়া লম্বাকারে ব্যাঙের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখায় বিদ্যমান। করোটি অনেকগুলি ক্ষুদ্র অস্থি সমন্বয়ে গঠিত। নিম্নে করোটির অঙ্কীয় পৃষ্ঠদেশের বিবিধ অস্থিগুলির বিবরণ দেওয়া হইল: (*i*) **করোটি** (*Skull*): করোটিকে মাথার কাঠামো বা মাথার খুলি বলিলে হয়তো কথাটি আরও সহজ হইবে। আবার করোটির বিবিধ অঞ্চল আছে, যথা—(ক) **করোটিকা** (*Cranium*)—এই অঞ্চলটিকে মস্তিষ্কের আধার বলা হয়। কারণ ইহার ভিতরেই মস্তিষ্ক থাকে। (খ) **নাসিকানালী** (*Nasal or Olfactory Capsule*)—এই অঞ্চলটি করোটিকা অঞ্চলের সম্মুখে বিদ্যমান এবং ইহার ভিতরে ব্যাঙের নাসিকা থাকে। (গ) **চক্ষুকোটর** (*Orbit*)—প্রতিটি চক্ষুকোটর করোটিকার প্রতি পার্শে বিদ্যমান এবং ইহার দুই পার্শ্বে চক্ষুর স্থান। (ঘ) **অটিক বা অডিটোরি ক্যাপসুল** (*Otic or Auditory*

Capsule)—ইহার ভিতরে শ্রবণেন্দ্রিয় যন্ত্রটি থাকে। (ঙ) **উপরের চোয়াল** (*Upper Jaw*)—ব্যাঙের উপরের চোয়ালটি করোটির অঙ্কীয়দেশের সীমা-রেখার সহিত অসম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়। (চ) **নীচেকার চোয়াল** (*Lower Jaw*)—করোটির এই অঙ্গুলটি উপরের চোয়ালের দুই পার্শ্বের প্রান্তের সহিত আটকাইয়া থাকে এবং ফলে উঠা-নামা করিতে পারে। (ছ) **হাওয়েড যন্ত্র** (*Hyoid Apparatus*)—ইহা মুখ-বিবরের তলদেশের মাঝে পেশীর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে।
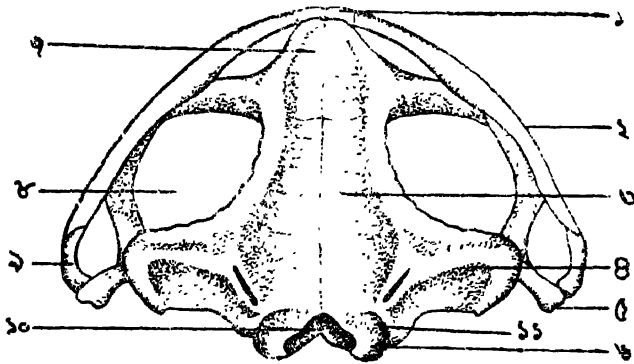
৯২নং চিত্র
করোটির পৃষ্ঠদেশ দেখান হইতেছে।

১, প্রিম্যাক্সিলা ; ২, ম্যাক্সিলা ; ৩, ফ্রন্টোপ্যারাইটাল ; ৪, প্রো-অটিক অস্থি ; ৫, স্কোয়ামোসাল ; ৬, অক্সিপিটাল মুণ্ডি বা কণ্ডাইল ; ৭, নাসিকা অস্থি ; ৮, চক্ষুকোটর ; ৯, কোয়াড্রাটো-যুগাল ; ১০, মহাবিবর ; ১১, এক্স-অক্সিপিটাল।

(ক) **করোটিকা (Cranium)ঃ** ইহা করোটির মধ্যস্থ নলাকার গহ্বরবিশেষ এবং ইহা লম্বালম্বিভাবে বিদ্যমান। ইহার ভিতর ব্যাঙের মস্তিষ্ক থাকে। করোটিকার পিছন দিকে একটি বড় ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্নানালী বাহির হইয়া আসে এবং মেরুদণ্ডের কশেরুকার স্নায়ুনালীর ভিতর প্রবেশ করে। করোটিকার এই পশ্চাদ্ ছিদ্রটিকে **মহাবিবর** (*Foramen Magnum* ; *Foramen* = bore) বলা হয়। মহাবিবরের প্রতি পার্শ্ব একখণ্ড তরুণাস্থির দ্বারা নির্মিত। এই তরুণাস্থি দুইটিকে **এক্স-অক্সিপিটাল** (*Ex-occipital*) বলা হয়। প্রতিটি এক্স-অক্সিপিটাল তরুণাস্থি মহাবিবরের দুই পার্শ্বে উত্তল

আকারে উঁচু স্থানের সৃষ্টি করে। এক্স-অক্সিপিটালের এর উঁচু-মত অংশ দুইটিকে **এক্স-অক্সিপিটাল কণ্ডাইল** (*Ex-occipital Condyle*) বলা হয়। বাক্সের মত করোটিকার ছাদটি দুই সমান্তরাল ও সর্বতোভাবে সমান অস্থির সংযোগে নির্মিত। এই অস্থিগুলিকে **ফ্রন্টোপ্যারাইটাল** (*Frontoparietals*) বলা হয়। অস্থিগুলি লম্বালম্বিভাবে যুক্ত (*Fused*) হয় এবং ইহাদের **যুক্ত রেখাটি** (*Sature line*) সুস্পষ্ট। ফ্রন্টো-প্যারাইটাল অস্থি দুইটি বেশ পাতলা এবং ইহারা করোটির সামনের দিকে **নাসিকা নালীর** (*Nasal capsule*) সহিত এবং পিছনের দিকে **এক্স-অক্সিপিটাল** (*Ex-occipital*) তরুণাস্থির সহিত জোড়া থাকে। করোটিকার মেঝ বা **তল** (*floor*) ছোরার মত একটিমাত্র অস্থির দ্বারা গঠিত। এই অস্থিটিকে **প্যারাস্ফিনয়েড** (*Parasphenoid*) বলা হয়। প্যারাস্ফিনয়েডের ছোরার ফলের মত অগ্রভাগটি করোটির সামনের দিকে আগাইয়া যায়। করোটিকার অগ্রাংশের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া আংটির মত গোলাকার তরুণাস্থি দেখা যায়। ইহা ফ্রন্টোপ্যারাইটাল অস্থির দ্বারা আবৃত থাকে। এই আংটির মত তরুণাস্থি দুইটিকে **স্ফেনেথময়েড** (*Sphencthmoid*) বলে। মহাবিবর ছিদ্র ব্যতীত করোটিকায় অনেকগুলি **স্নায়ুছিদ্র** (*Opening for nerves*) থাকে। মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি উপরোক্ত ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসে।

(ক) **নাসিকানালী** (*Nasal capsule*): করোটিকার অগ্রভাগে উহার পৃষ্ঠদেশে ফ্রন্টোপ্যারাইটাল হাড় দুইটির ঠিক উপরে স্ফেনেথময়েড হাড়টি থাকে। এই স্ফেনেথময়েড হাড়ের শীর্ষাগ্রের উপর একজোড়া পাতলা **মেমব্রেন হাড়** (*Membrane Bone*) থাকে। ইহারাই নাসিকানালী গঠন করে। নাসিকানালীর প্রতিটি হাড়কে **নাসিকা অস্থি** (*Nasal Bone*) বলা হয়। ইহা আকারে ত্রিভুজাকৃতি। নাসিকানালীর নিম্নদেশ বা তল আবার আরও দুইটি হাড়ের দ্বারা গঠিত হয়। এই দুইটি হাড়কে ভোমার (*Vomer*) বলা হয়। (গ) **চক্ষুকোটর** (*Orbit*): করোটিকার দুই পার্শ্বে একটি করিয়া বেশ বড় গোলাকার চক্ষুগহ্বর বিদ্যমান। ইহাদেরই চক্ষুকোটর বলা হয় এবং চক্ষু দুইটি এই দুইটি গহ্বরের মধ্যেই অবস্থান করে। তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত **চক্ষুখোলক** (*Cartilaginous Optic Capsule*) করোটিকার চক্ষুকোটরের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে না। ব্যাঙের

করোটিতে চক্ষু-খোলক দেখা যায়। (ঘ) অটিক বা **অডিটোরি ক্যাপস্থল** (*Otic or Auditory Capsule*): করোটিকার পশ্চাদ্ভাগের দুইপার্শ্বে একটি করিয়া অডিটোরি ক্যাপস্থল বিদ্যমান। ইহারা এক্স-অক্সিপিটাল হাড়ের সম্মুখভাগে অবস্থান করে। প্রতিটি অডিটোরি ক্যাপস্থল একটি নরম বাক্সবিশেষ। ইহার উপরিভাগ বা ছাদটি একটিমাত্র তরুণাস্থি-নির্মিত হাড দিয়া গঠিত। এই হাডটিকে **প্রো-অটিক** (*Pro otic*) বলা হয়। বাক্সের

৯৩নং চিত্র
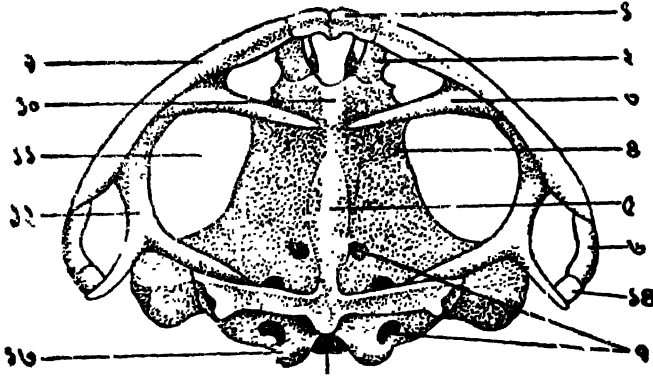
করোটির অঙ্কীয়দেশের বিবিধ অস্থির সন্নিবেশ দেখান হইতেছে ।

১, প্রিম্যাক্সিলা ; ২, ভোমরা ; ৩, প্যালাটাইন ; ৪, ফ্রন্টোপ্যারাইটাল ; ৫, প্যারাস্ফিনয়েড ; ৬, কোয়াড্রাটো যুগাল ; ৭, করোটির স্নায়ুপথ ; ৮, মহাবিবর ; ৯, ম্যাক্সিলা ; ১০, স্ফিনেথময়েড ; ১১, চক্ষুকোটর ; ১২, টেরিগয়েড ; ১৩, অক্সিপিটাল মুণ্ডি ; ১৬, কোয়াড্রেট।

দুইপার্শ্ব ও তলদেশ প্যারাস্ফিনয়েড হাড়ের প্রতি পাশের লম্বা অংশের দ্বারা গঠিত হয়। প্রো-অটিক হাড়ের বাহিরের দিকে একটি করিয়া **হাতুড়ির** মত (*Hammer-shaped*) মেমব্রেন হাড় বিদ্যমান। ইহা অডিটোরি ক্যাপস্থলকে উপর চোয়ালের পশ্চাদ্ভাগের সহিত আটকাইয়া রাখে। এই হাতুড়ির মত হাড়টিকে **স্কোয়ামোসাল** (*Squamosal*) বলা হয়। (ঙ) **উপরের চোয়াল** (*Upper jaw*): করোটির বহিঃসীমাকে দুইটি হাড় বেষ্টন করিয়া থাকে। এই দুইটি হাড়কেই উপরের চোয়াল বলা হয়। প্রতিটি হাড় করোটির শীর্ষাগ্রে যুক্ত হয় এবং প্রতিটি হাড় চারিটি তরুণাস্থি-নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেমব্রেন হাড়ের সমষ্টি। মেমব্রেন হাড়গুলি একের পর এক যুক্ত হয়। প্রথম মেমব্রেন হাড়টিকে

প্রিম্যাক্সিলা (*Premaxilla*) বলা হয়। প্রিম্যাক্সিলা হাড় দুইটি নাসিকা-অস্থির ঠিক উপরে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত। সংযুক্ত প্রিম্যাক্সিলাটি আবার নাসিকা নালীর সহিত আটকাইয়া থাকে। উপরের চোয়াল-হাড়ের দ্বিতীয় মেমব্রেন হাড়টি লম্বা ও সরু। ইহা একদিকে প্রিম্যাক্সিলার সহিত আটকাইয়া থাকে এবং পশ্চাদ্দিকে **কোয়াড্রাটো-যুগালের** (*Quadrato-jugal*) সহিত মিলিত হয়। কোয়াড্রাটো-যুগাল হাড়টি দ্বিতীয় মেমব্রেন হাড়ের চেয়ে অনেক ছোট। দ্বিতীয় মেমব্রেন হাড়টিকে **ম্যাক্সিলা** (*Maxilla*) বলা হয় এবং ইহা দন্তহীন। কিন্তু সোনা ব্যাঙের ম্যাক্সিলায় দাঁত থাকে। কোয়াড্রাটো-যুগালই তৃতীয় মেমব্রেন হাড়। চতুর্থ মেমব্রেন হাড়টি ক্ষুদ্র ও গোলাকার। ইহাকে **কোয়াড্রেট** (*Quadrate*) বলে। ইহা একদিকে কোয়াড্রেট-যুগালকে যুক্ত করে এবং অপরদিকে নীচের চোয়ালটিকে আটকাইয়া রাখে। করোটিকার সহিত ম্যাক্সিলা, কোয়াড্রাটো-যুগাল ও কোয়াড্রেট হাড়ের সহিত আরও তিনটি হাড় আড়াআড়িভাবে যুক্ত থাকে। এই হাড়গুলি উপরের চোয়ালকে করোটিকার সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে। উপরোক্ত তিনটি হাড়ের মধ্যে প্রথম হাড়টি সরু রডের মত এবং ইহাকে **পালাটাইন** (*Palatine*) বলা হয়। ইহা ম্যাক্সিলার উপরিভাগের সহিত করোটিকার স্ফিনেথময়েড হাড়ের সহিত যুক্ত। পালাটাইন চক্ষুকোটরের উপরে আড়াআড়িভাবে বিদ্যমান। দ্বিতীয় হাড়টিকে **টেরিগয়েড** (*Pterygoid*) বলা হয়। ইহা ইংরাজী অক্ষরের '*r*'-এর মতন। '*r*'-এর দণ্ডটি পালাটাইন ও ম্যাক্সিলার সংযোগ-স্থলে আটকাইয়া থাকে ও উহার একটি বাহু প্যারাস্ফিনয়েডের সহিত এবং অপর বাহু গোলাকার কোয়াড্রেট হাড়ের সহিত যুক্ত হয়। পালাটাইন ও টেরিগয়েড হাড় দুইটি করোটির অঙ্কীয়দিকে বিদ্যমান। তৃতীয় হাড়টিকে আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাকে **স্কোয়ামোসাল** (*Sguamosal*) বলে। ইহা করোটিকার অটিক ক্যাপসুলটিসহ কোয়াড্রেট হাড়ের সহিত যুক্ত হয়। এই হাড়টি করোটির পৃষ্ঠদিকে বিদ্যমান। টেরিগয়েড, স্কোয়ামোসাল এবং কোয়াড্রেট—এই তিনটি হাড়ের সংযুক্তির দ্বারা যে গহ্বর সৃষ্টি হয়, ইহাই নীচের চোয়ালটিকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে। (চ) **নীচের চোয়াল** (*Lower jaw*): নীচের চোয়ালের দুইটি সমান অংশ উহার শীর্ষাগ্রে

সন্ধিবন্ধনীর (*Ligament*) দ্বারা যুক্ত থাকে। নীচের চোয়ালের প্রতিটি অংশ **মেকেলের তরুণাস্থি** (*Meckel's cartilage*) নামক তরুণাস্থি হইতে গঠিত হয়। প্রতিটি অংশে মোট তিনটি হাড় থাকে। অগ্রভাগের প্রথম হাড়টিকে **মেণ্টো-মেকেলিয়ান** (*Mento Meckelion*) বলা হয়। ইহা অতীব ক্ষুদ্র তরুণাস্থি। প্রতিটি অংশের মেণ্টোমেকেলিয়ান পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়। মেণ্টোমেকেলিয়ানের পরের হাড়টিকে **অ্যাঙ্গিউলা-স্প্লেনিয়াল** (*Angulo-splenial*) বলা হয়। উহা উপরের চোয়ালের কোয়াড্রেট হাড়ের সহিত যুক্ত হয়। ইহা লম্বা রডের মত এবং ইহার বাহির সীমাকে একটি পাতলা মেমব্রেন হাড আবৃত করিয়া রাখে। এই পাতলা মেমব্রেন হাডটি নীচের চোয়ালের তৃতীয় হাড়। ইহা অ্যাঙ্গিউলো-স্প্লেনিয়াল হাডের পশ্চাদ্ভাগ আবৃত করিয়া রাখে না। উপরের চোয়ালের মত
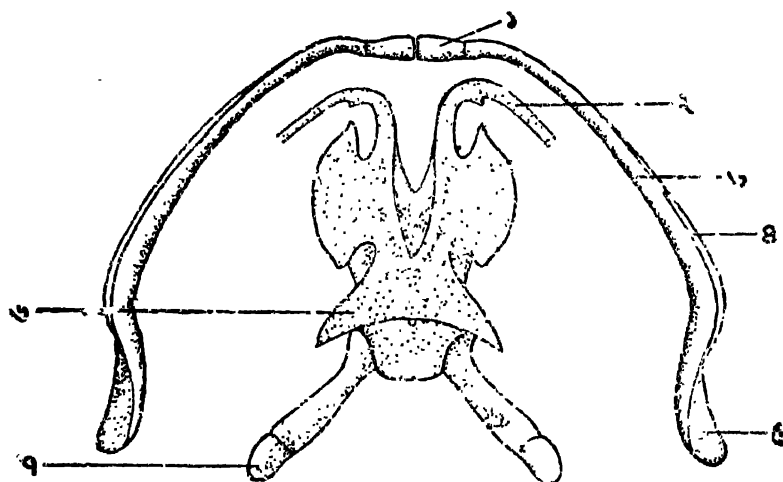
৯৪নং চিত্র

ব্যাঙের নীচেকার চোয়ালের মাঝে হ্যাওয়েড যন্ত্র দেখান হইতেছে।

১, মেকেলিয়ান ; ২, সম্মুখস্থ করনু ; ৩, এ্যাঙ্গিউলো স্প্লেনিয়াল , ৪, ডেণ্টারি ;
৫, মেকেলের তরুণাস্থি ; ৬, হ্যাওয়েড যন্ত্র ; ৭, পশ্চাদ্ভাগের করনু।

নীচের চোয়ালও দাঁতহীন। সোনা ব্যাঙের উপরের চোয়ালের মত নীচের চোয়ালেও দাঁত থাকে। (ছ) **হ্যাওয়েডযন্ত্র** (*Hyoid Apparatus*): মুখবিবরের মাঝে প্লেটের মত যন্ত্রটিকে হ্যাওয়েড যন্ত্র বলা হয়। ইহা

তরুণাস্থির দ্বারা গঠিত। ইহা জিহ্বাকে প্রসারিত করিয়া মাংসপেশীর দ্বারা আটকাইয়া রাখে। ইহার সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগের দুইদিক হইতে একটি করিয়া সরু লম্বাকার অংশ বাহির হয়। সম্মুখভাগের সরু অংশ দুইটিকে **সম্মুখভাগের করনু** (*Anterior cornu*) এবং পশ্চাদ্ভাগের সরু অংশ দুইটিকে **পশ্চাদ্ভাগের করনু** (*Posterior cornu*) বলা হয়। সম্মুখভাগের করনু দুইটি প্রতিপার্শ্বের অটিক ক্যাপস্থলের সহিত যুক্ত হয় এবং পশ্চাদ্ভাগের করনু দুইটি ব্যাঙের
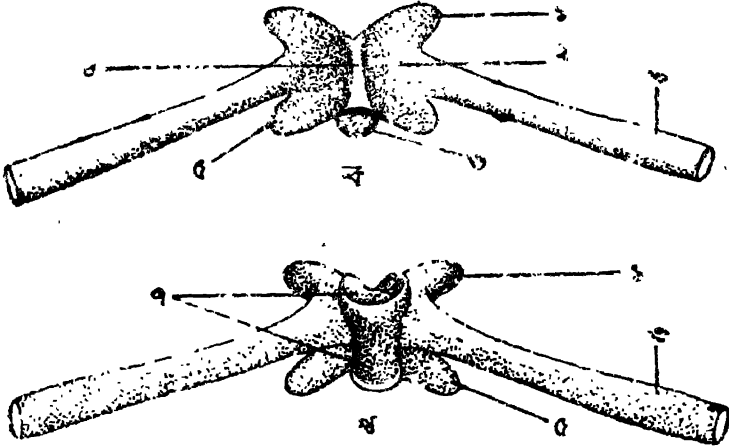
৯৫নং চিত্র

মেরুদণ্ডের একটি আদর্শ কশেরুকার বিবিধ অংশ দেখান হইতেছে। —

ক, অঙ্কীয়দেশ, খ, পৃষ্ঠদেশ।

১, প্রি-জাইগাপোফাইসেস ; ২, নিউরাল খিলান ; ৩, ট্রান্সভার্স প্রসেস ; ৪, নিউরাল কাটা ও স্পাইন ; ৫, পোস্ট-জাইগাপোফাইসেস, ৬, সেণ্ট্রাম।

স্বরযন্ত্রকে বেষ্টন করিয়া থাকে। সম্মুখভাগের করনু দুইটি পশ্চাদ্ভাগের করনু দুইটির চেয়ে অনেক লম্বা। হাওয়েড যন্ত্রের মধ্যভাগটিকে **হ্যাওয়েডের দেহ** (*body of Hyoid*) বলা হয়।

(ii) **মেরুদণ্ড** (**Vertebral Column**): ব্যাঙের মেরুদণ্ড উহার করোটির নিম্ন হইতে ধড়ের শেষ পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখায় অবস্থান করে। এই মেরুদণ্ড মোট আটটি খণ্ড হাড়ে বিভক্ত। এই হাড়গুলিকে কশেরুকা (Vertebra) বলা হয়। প্রতিটি কশেরুকা একের

পর এক করিয়া সাজানো থাকে এবং ইহার ফলে প্রতিটি কশেরুকার মধ্যস্থ ছিদ্র পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া মেরুদণ্ডের ভিতর একটি লম্বা নলের সৃষ্টি করে। ব্যাঙের প্রথম কশেরুকাকে **অ্যাটলাস** (*Atlas*) এবং দশম কশেরুকাকে **ইউরোস্টাইল** (*Urostyle* ; *oura* = tail ; *style* = rod) বলা হয়। ব্যাঙের নবম কশেরুকাটির বৈচিত্র্য থাকায় উহাকে নির্দিষ্টভাবে নবম **কশেরুকা** (*Ninth Vertebra*) বলা হয়; বাকি দ্বিতীয় হইতে অষ্টম কশেরুকাগুলিকে এই রকমের আকৃতির জন্য উহাদের **আদর্শ কশেরুকা** (*Typical Vertebra*) বলা হয়।
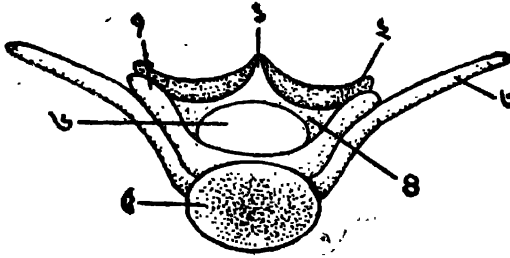
৯৬নং চিত্র

একটি আদর্শ কশেরুকাকে সম্মুখদেশ হইতে দেখান হইতেছে।

১, নিউরাল স্পাইন ; ২, প্রিজাইগাপোফাইসেস ; ৩, ট্রান্সভার্স প্রসেস ; ৪, নিউরাল খিলান ; ৫, অবতল সেণ্ট্রাম ; ৬, নিউরাল নালী।

একটি আদর্শ কশেরুকার মধ্যে অনেকগুলি ছোট হাড়ের অংশ আছে। কশেরুকা অক্ষীয়দেশের মাঝখানে একটি ফাঁপাহীন নলাকার হাড় লম্বালম্বিভাবে থাকে। এই হাড়টিকে **সেণ্ট্রাম** (*Centrum*) বলা হয়। ইহার অগ্রমুখে গহ্বর থাকে বা উহার অগ্রমুখটি **অবতল** (*Concave*) হওয়াতে এইরূপ **সেণ্ট্রাম প্রোসিলাস** (*Procoelous* ; *Pro* = front ; *coel* = hollow) বলা হয়। এইরূপ সেণ্ট্রামবিশিষ্ট কশেরুকা উভচর পর্বের বৈশিষ্ট্য। সেণ্ট্রামের ঠিক উপরে দুইটি হাড় খিলানের মত জুড়িয়া একটি বড় গোলাকার গহ্বরের সৃষ্টি করে। উপরোক্ত হাড় দুইটিকে **নিউরাল**

খিলান (*Neural Arch*) এবং উহাদের দ্বারা বেষ্টিত গহ্বরটি **নিউরাল নালী** (*Neural Canal*) বলে। এই নিউরাল নালীর ভিতর দিয়াই মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্নানালী ব্যাঙের ধড় অংশের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। দুইটি নিউরাল খিলান পরস্পর উঁচু হইয়া সরু কাঁটার আকারে মিলিত হইয়াছে। কাঁটাটি কশেরুকার শীর্ষাগ্রে থাকে এবং ইহাকে **নিউরাল কাঁটা** (*Neural Spine*) বলা হয়। প্রতিটি নিউরাল খিলানের পার্শ্ব হইতে একটি করিয়া লম্বাকার কাঁটা হাড় দুইটি হইতে বাহির হয়। ইহারা কশেরুকার অবস্থানের সহিত আড়াআড়ি-ভাবে অবস্থান করায় ইহাদের **ট্রান্সভার্স প্রসেস** (*Transverse process*) বলা হয়। প্রতিটি নিউরাল খিলানের অগ্রপার্শ্ব হইতে ট্রান্সভার্স প্রসেসের মত আরও দুইটি ক্ষুদ্র চামচের মুখের ন্যায় স্থূল খাঁজ বাহির হয়। ইহাদের **প্রি-জাইগাপোফাইসেস** (*Prezygapophyses*) বলা হয়। ইহারা ট্রান্সভার্স প্রসেসের চেয়ে অনেক ছোট। প্রি-জাইগাপোফাইসেসের মত প্রতিটি নিউরাল খিলানের পশ্চাদ্-পার্শ্ব হইতে আরও দুইটি খাঁজ বাহির হয়। ইহাদের **পোস্ট-জাইগা-পোফাইসেস** (*Postzygapophyses*) বলা হয়। প্রতি কশেরুকার সামনে ও পেছনে এইরূপ জাইগোপোফাইসেস থাকায় একটি কশেরুকার সামনের দিকের প্রি-জাইগাপোফাইসের অগ্রবর্তী কশেরুকার পিছন দিকের পোস্ট-জাইগাপোফাইসেসের সহিত আটকাইয়া যায় এবং ইহার ফলে একটি কশেরুকার সহিত অপর কশেরুকার সামনের দিকের কশেরুকার সুদৃঢ় সংযুক্তি সাধিত হয়। প্রতিটি কশেরুকার সেন্ট্রামটি প্রোসিলাস হওয়ায় পিছনের কশেরুকার সামনের দিকের কশেরুকার সহিত সংযুক্তি সম্ভব হয়। কশেরুকাগুলি স্বাভাবিকভাবে একে অপরের সহিত সন্ধিবন্ধনীর দ্বারা সংযুক্ত থাকায়, ব্যাঙ প্রয়োজন অনুসারে নিজের মেরুদণ্ডকেই বাঁকাইতে পারে।
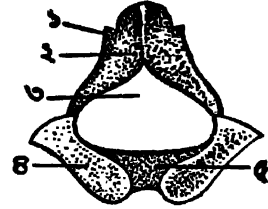
৯৭নং চিত্র
মেরুদণ্ডের প্রথম কশেরুকার সম্মুখভাগটিকে নীচের দিক করিয়া দেখান হইতেছে।
১, পোস্ট-জাইগাপোফাইসেস, ২, নিউরাল খিলান; ৩, নিউরাল নালী; ৪, করোটির অক্সিপিটাল মুণ্ডির জন্য গহ্বর; ৫, প্রসারিত সেন্ট্রাম।

প্রথম কশেরুকা বা অ্যাটলাস (First Vertebra or Atlas): মেরুদণ্ডের প্রথম কশেরুকাটি করোটিকে যুক্ত করে। ইহার আদর্শ কশেরুকার মত ট্রান্সভার্স প্রসেস বা প্রি-জাইগাপোফাইসেস নাই। প্রি-জাইগাপোফাইসেসের সহিত দুইটি গোলাকার অবতল (*concave*) খাঁজ থাকে। এই খাঁজগুলিতে করোটির অক্সিপিটাল কণ্ডাইল প্রবেশ করে এবং করোটির সহিত মেরুদণ্ডের
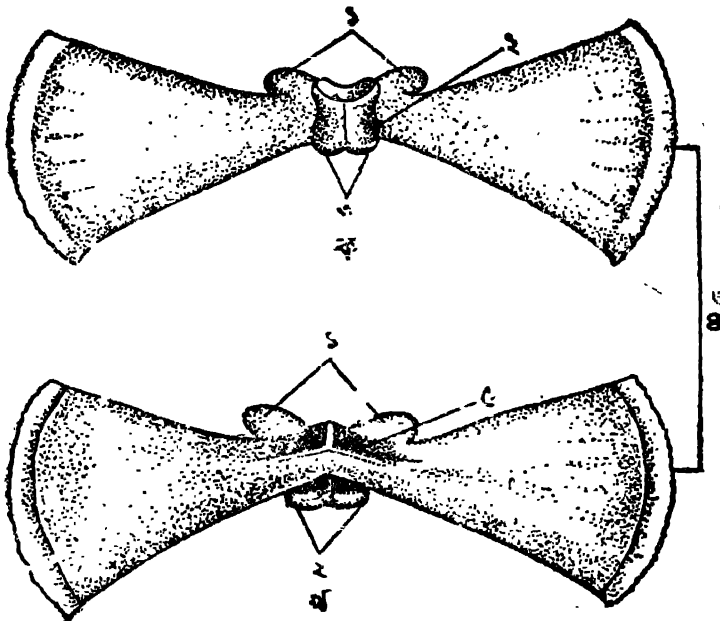
৯৮নং চিত্র

মেরুদণ্ডের নবম কশেরুকার অঙ্কীয়দেশ। (ক) পৃষ্ঠদেশ এবং (খ) পশ্চাদ্দেশ দেখান হইতেছে। ১, প্রিজাইগাপোফাইসেস; ২, সেণ্ট্রাম; ৩, সেণ্ট্রামের দুইটি মুণ্ডি; ৪, পাখার মত তরুণাস্থিবেষ্টিত ট্রান্সভার্স প্রসেস; ৫, নিউরাল খিলান।

সংযুক্তি ঘটায়। অ্যাটলাসের সেণ্ট্রাম অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও প্রসারিত হইয়া যায় এবং ইহার নিউরাল খিলানে পশ্চাদ্ভাগ হইতে অতি ক্ষুদ্র দুইটি পোস্ট-জাইগাপোফাইসেস খাঁজ থাকে। দ্বিতীয় কশেরুকার প্রি-জাইগাপো-ফাইসেস আসিয়া উপরোক্ত পোস্ট-জাইগাপোফাইসেসের সহিত মিলিত হয়। অ্যাটলাস আকারে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং ইহার সহিত সংযুক্ত

নিউরাল নালীটি বৃহত্তম। ব্যাঙের দ্বিতীয় কশেরুকা হইতে অষ্টম কশেরুকাকে আদর্শ কশেরুকার বিবিধ অংশরূপে পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। নবম কশেরুকাটি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহাকে **সাক্রাল কশেরুকাকাণ্ড** (*sacral vertebra*) বলা হয়। ইহা আকারে বৃহত্তম এবং ইহার বিবিধ অংশগুলি আদর্শ কশেরুকার মতন। সাক্রাল কশেরুকায় **ট্রান্সভার্স প্রসেস** (*Transverse process*) দুইটি শক্ত, স্থূল ও প্রসারিত। ইহার প্রতিটি ট্রান্সভার্স প্রসেস ব্যাঙের **শ্রোণীচক্রের** (*pelvic girdle*) ইলিয়ম অংশের সহিত সংযুক্ত হয়। সাক্রাল কশেরুকার সেণ্ট্রাম প্রোসিলাস হইলেও উপর-পশ্চাদ্‌-অংশ একটি বৃহৎ উত্তল অংশে শেষ না হইয়া, দুইটি পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তল অংশে বা **মুণ্ডিতে** (*knob*) শেষ হয়। নবম কশেরুকার পরবর্তী কশেরুকার অগ্রাংশে দুইটি পাশাপাশি অবতল অংশ থাকে এবং নবম কশেরুকার অবতল অংশের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্তি ঘটায়। সাক্রাল কশেরুকার প্রি-জাইগাপোফাইসেস দুইটি ক্ষুদ্র চামচের অগ্রভাগের মত। ইহার পশ্চাতে পোস্ট-জাইগাপোফাইসেস নাই।
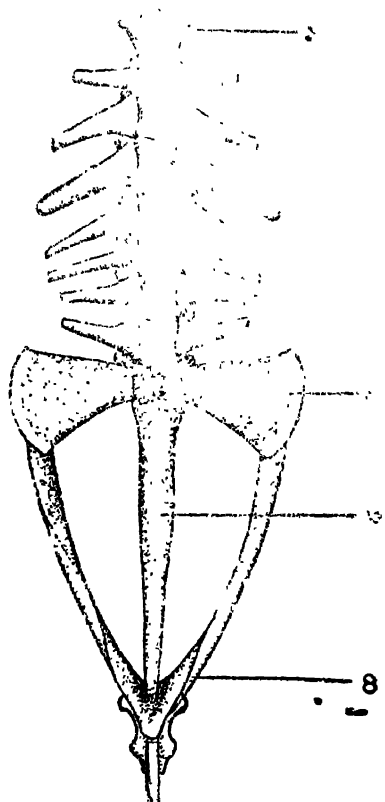
৯৯নং চিত্র
সমগ্র মেরুদণ্ডের কশেরুকা-বিন্যাস দেখান হইয়াছে।
১, প্রথম কশেরুকা বা অ্যাটলাস ; ২, নবম কশেরুকা ; ৩, ইউরোস্টাইল , ৪, শ্রোণীচক্রের ইলিয়ম।

নবম বা সাক্রাল কশেরুকার পরবর্তী কশেরুকাগুলি একত্রিত হইয়া একটি সংযুক্ত কশেরুকার সৃষ্টি করে। ইহাকে **ইউরোস্টাইল** (*Urostyle*) বলা হয়। ইহা আকারে একটি লম্বা সরু নলের ন্যায়। ইহার পিছনের অংশটি

সরু হইতে হইতে শেষ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা সাক্রাল কশেরুকার সহিত যুক্ত হয় এবং ব্যাঙের ধড়ের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে এক উঁচু খাঁজ থাকে। ইহাকে **নিউরাল ক্রেস্ট** (*Neural*
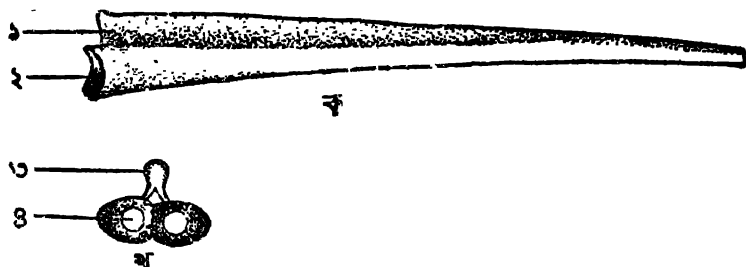
১০০নং চিত্র

মেরুদণ্ডের ইউরোস্টাইল দেখান হইতেছে। ক, পার্শ্বদেশ; খ, সম্মুখদেশ।
১-২, নিউরাল ক্রেস্ট বা খাঁজ; ৩, অবতল সেণ্ট্রাম; ৪, নবম কশেরুকার সেণ্ট্রামের মুণ্ডির জন্য দুইটি গহ্বর। গহ্বর দুইটির উপরে নিউরাল নালী।

Crest) বলা হয়। ইউরোস্টাইলের অগ্রভাগে দুইটি অবতল গর্ত বা গহ্বর থাকে; এই গহ্বরেই সাক্রাল কশেরুকার মুণ্ডি দুইটি মিলিত হয়। অবতল গর্ত দুইটি নিউরাল ক্রেস্টের মাঝে খুব সূক্ষ্ম নালী দেখা যায়। ইহাই **নিউরাল নালী** (*Neural Canal*)।

(২) উপাঙ্গিক কঙ্কাল (Appendicular Skeleton): অক্ষিক কঙ্কালের মত ইহাও দুই অঞ্চলে বিভেদিত; যথা—**(i) চক্র অঞ্চল** (*Girdle Regions*) ও **(ii) বাহু অঞ্চল** (*Limb Regions*)।

(i) চক্র অঞ্চল (Girdle Regions): ব্যাঙের উপাঙ্গিক কঙ্কালে দুইটি চক্র দেখা যায়: প্রথম চক্রটি ব্যাঙের প্রতিটি অগ্রপদকে যুক্ত করে। ইহাকে **বক্ষ-অস্থি-চক্র** (*Pectoral Girdle*) বলা হয় এবং দ্বিতীয়টি ব্যাঙের প্রতিটি পশ্চাৎ-পদকে যুক্ত করে। ইহাকে **শ্রোণী-চক্র** (*Pelvic Girdle*) বলা হয়।

ব্যাঙের বক্ষ-অস্থি-চক্রটি ধড়ের অগ্রভাগকে প্রায় বেষ্টন করিয়া রাখে। ধড়ের অগ্রভাগের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা অঞ্চল ব্যতীত ইহা অধিকাংশ অঞ্চল বেষ্টন করে। বক্ষ-অস্থি-চক্রটি আবার দুইটি প্রতিসাম্য অঞ্চলে বিভেদিত। প্রতিটি অঞ্চল বক্ষের সঙ্কীয় মধ্যরেখায় যুক্ত হয় এবং বক্ষের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা অঞ্চল

পৃথক থাকে। প্রতিটি সদৃশ অর্ধাংশ কিছু অস্থি ও কিছু তরুণাস্থিবিশিষ্ট এবং প্রসারিত। এই অংশটিকে **পুরঃঅংসফলক** (*Supra scapula*) বলা হয়। **পুরঃঅংসফলক** অংশের সহিত একটি শক্ত, পুরু ও লম্বাকার হাড় যুক্ত থাকে। ইহা প্রতিটি সদৃশ অর্ধাংশের পৃষ্ঠদেশের পশ্চাদ্ভাগ। এই হাড়টিকে **অংসফলক** বা **স্কাপুলা** (*Scapula*) বলা হয়। অংসফলক হাড়টির পশ্চাদ্ভাগ নিম্নমুখী হইয়া দেহের অঙ্কদেশে অবস্থিত বক্ষ-অস্থি-চক্রের আরও দুইটি রডের মত হাড়ের সহিত যুক্ত হয়। সম্মুখভাগের হাড়টি সরু ও তরুণাস্থিবিশিষ্ট অর্ধনলাকার এবং ইহাকে
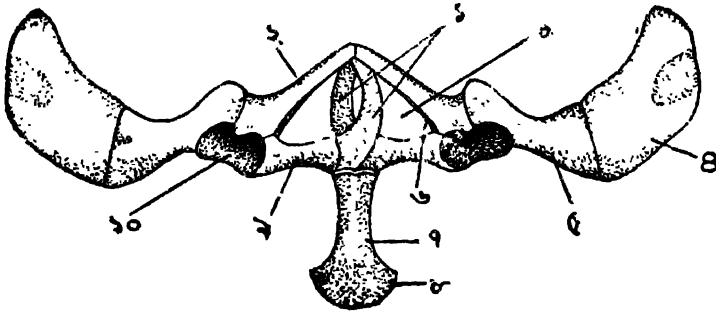
১০১নং চিত্র

ব্যাঙের বক্ষ-অস্থি-চক্রের বিবিধ অংশ দেখান হইতেছে।

১, এপিকোরাকয়েড; ২, ক্লাভিক্‌স বা কণ্ঠা; ৩, কোরাকয়েড ফ্রণ্টালি; ৪, সুপ্রা-স্ক্যাপুলা; ৫, স্ক্যাপুলা; ৬, প্রি-কোরাকয়েড; ৭, উরঃ-ফলক বা ষ্টারনাম; ৮, জিফি-ষ্টারনাম; ৯, কোরাকয়েড; ১০, গ্লিনয়েড গহ্বর।

কণ্ঠা বা **ক্লাভিকল** (*Clavicle*) বলা হয়। হাড়টি অর্ধনলাকার হওয়ায় উহার ভিতরে একটি সরু হাড় থাকে। ইহাকে **প্রি-কোরাকয়েড তরুণাস্থি** (*Per-coracoid cartilage*) বলা হয়। বাহির হইতে ইহার অস্তিত্ব বুঝা যায় না। অংস-ফলকের পিছনদিকের হাড়টি শক্ত ও গোলাকার রডের মত। ইহাকে **কোরাকয়েড** (*Coracoid*) বলা হয়। অংসফলক, কণ্ঠা ও কোরাকয়েড হাড়গুলির মিলন-স্থলে একটি বড় অবতল গহ্বর থাকে। গহ্বরটি উপরোক্ত তিনটি হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। ইহাকে **গ্লিনয়েড গহ্বর** (*Glenoid Cavity*) বলা হয়। এই গ্লিনয়েড গহ্বরে অগ্রবাহুর অস্থির মাথাটি মিলিত হয়। কণ্ঠা

ও কোরাকয়েড ভিতরের দিকে দুইটি বাঁকা তরুণাস্থিটি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত দুই পার্শ্বে যুক্ত। ডানদিকের বাঁকা তরুণাস্থিটি বামদিকের তরুণাস্থিটিকে সামান্য ঢাকিয়া রাখে। বাঁকা তরুণাস্থি দুইটিকে **এপিকোরাকয়েড** (*Epicoracoid*) বলা হয়। কণ্ঠা, কোরাকয়েড এবং এপিকোরাকয়েড অস্থিগুলির মধ্যে একটি বড় ফাঁক থাকে। এই ফাঁকগুলিকে **কোরাকয়েড ফ্রণ্টানিলি** (*Coracoid Frontanelle*) বলা হয়। গ্লিনয়েড গহ্বরের ভিতর অগ্রপদের প্রথম হাড়ের গোলাকার মাথাটি মিলিত হয় এবং ইহার দ্বারা সমগ্র অগ্রপদটিকে দেহের সহিত যুক্ত করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বক্ষ-অস্থি-চক্রের প্রতিটি সদৃশ অর্ধাংশ এপিকোরাকয়েডের দ্বারা বক্ষের অঙ্কীয় মধ্যরেখা-স্থলে যুক্ত হয়। দুইটি এপিকোরাকডের পশ্চাদ্ভাগের সংযুক্তিস্থানে নিম্নমুখী-ভাবে একটি মেমব্রেন হাড় যুক্ত থাকে। উহাকে **উরঃফলক** (*Sternum*) বলা হয়। উরঃফলককে আবার নিম্নমুখীভাবে একটি প্রসারিত প্লেট যুক্ত করে। এই তরুণাস্থিবিশিষ্ট প্লেটটিকে **জিফিস্টারনাম** (*Xiphisternum*) বলা হয়। বক্ষ-অস্থি-চক্রের সহিত মেরুদণ্ডের কোনও হাড়ের যোগ নাই। ইহা মাংসপেশীর দ্বার এমনভাবে আবদ্ধ থাকে যাহাতে ইহা মেরুদণ্ডের সহিত হাড়ের দ্বারা যুক্ত না হইয়াও উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করে এবং বিবিধ কার্য সম্পাদন করিতে পারে। চক্রের মাংসপেশীগুলি কাটিয়া ফেলিলে উহা তৎক্ষণাৎ দেহ হইতে খসিয়া পড়িবে। অগ্রপদ দুইটিকে দেহের সহিত আটকাইয়া রাখা এবং উহার সঞ্চালনই বক্ষ-অস্থি-চক্রের প্রধান কার্য। ইহা ব্যতীত চক্রটি বাঙের হৃদ্‌যন্ত্র ফুসফুস ইত্যাদি যন্ত্রগুলিকে বহিরাঘাত হইতে রক্ষা করে এবং ইহার মাংসপেশীর সাহায্যেই সাহায্যেই শ্বাসনকার্য সম্পন্ন হয়।

শ্রোণীচক্র

(Pelvic Girdle)

ধড়ের পশ্চাদ্-প্রান্তে, ইংরাজী অক্ষর "V"-এর মত একটি অস্থি থাকে। ইহাকেই শ্রোণীচক্র বলা হয়। "V" অক্ষরের বাহু দুইটি ধড়ের অগ্রভাগের দিকে থাকে এবং প্রতিটি বাহু সেইদিকের নবম কশেরুকার ট্রান্সভার্স

প্রসেসের সহিত যুক্ত হয়। "V" অক্ষরের কোণটি ধড়ের পশ্চাদ্‌মুখী এবং ইহাই শ্রোণীচক্রের পশ্চাদ্ভাগ। প্রকৃতপক্ষে "V" অক্ষরের কোণটি **চাকার মত** (*Disc like*) আকার ধারণ করে। এই চাকার প্রতি পার্শ্বে একটি চাপা গর্ত থাকে। ইহাকে **অ্যাসিটাবুলম** (*Acetabulum*) গহ্বর বলা
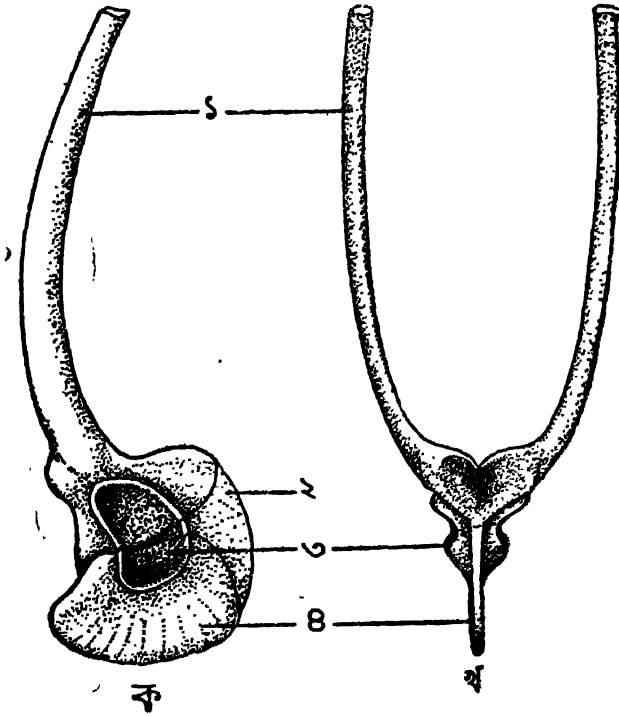
১০২নং চিত্র
ব্যাঙের শ্রোণী-চক্রের বিবিধ অংশ দেখান হইতেছে।
ক, পার্শ্বদেশ, খ, পৃষ্ঠদেশ।
১, ইলিয়ম; ২, পিউবিস; ৩, অ্যাসিটাবুলম গহ্বর; ৪, ইশ্চিয়ম।

হয়। এই অ্যাসিটাবুলম গহ্বরে পশ্চাদ্‌-পদের উরুর অস্থির মাথাটি যুক্ত হয়। এইভাবে শ্রোণীচক্রের দ্বারা ব্যাঙের পশ্চাদ্‌-পদ দুইটি দেহের সহিত আটকাইয়া থাকে। শ্রোণীচক্র দুইটি সদৃশভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগে তিনটি করিয়া হাড় থাকে; যথা—**ইলিয়ম** (*Ilium*), **ইশ্চিয়ম** (*Ischium*) এবং **পিউবিস** (*Pubis*)। এই তিনটি হাড় কোণাকুণি মিলিত হওয়ায় অ্যাসিটা-

বুলম গহ্বরটি সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অ্যাসিটাবুলম গহ্বর উপরোক্ত তিনটি হাড়ের দ্বারাই গঠিত; চাকার অগ্র পৃষ্ঠ-ভাগ শ্রোণীচক্রের প্রতিটি সদৃশ ভাগের প্রতিটি ইলিয়মের সংযুক্তির ফলে গঠিত। সেইরূপ শ্রোণীচক্রের প্রতিটি সদৃশ ভাগের প্রতিটি ইশ্চিয়মের সংযুক্তির ফলে চাকার পশ্চাদ্ভাগটি গঠিত। প্রতিটি পিউবিস তরুণাস্থি পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া শ্রোণীচক্রের চাকার অঙ্কীয় ভাগটি গঠিত করে। প্রতিটি ইলিয়মের লম্বাকার অগ্রভাগটি পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত না হইয়া পৃথক হইয়া যায় এবং ইহারাই ইংরাজী "V" অক্ষরের মত আকার ধারণ করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রতিটি ইলিয়মের অগ্রাংশটি নবম কশেরুকার ট্রান্সভার্স প্রসেসের সহিত যুক্ত হয়। ইলিয়ম দুইটির মাঝে মেরুদণ্ডের **ইউরোস্টাইল** (*Urostyle*) কশেরুকাটি দেখা যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, **বক্ষ-অস্থিচক্র** (*Pectoral Girdle*) কেবলমাত্র মাংসপেশী দ্বারা দেহে অবস্থান করে এবং মেরুদণ্ডের সহিত ইহার কোন সংযোগ নাই। কিন্তু শ্রোণীচক্র প্রত্যক্ষভাবে (নবম কশেরুকার দ্বারা) মেরুদণ্ডের সহিত যুক্ত। বক্ষ-অস্থিচক্র উহার প্রতিটি গ্লিনয়েড গহ্বরের দ্বারা প্রতি পার্শ্বের অগ্রপদের বাহুর হাড়টি যুক্ত করে। সেইরূপ শ্রোণীচক্রের প্রতি পার্শ্বের অ্যাসিটাবুলম গহ্বর সেই দিকের পশ্চাদ্-পদের উরুর হাড়টিকে সংযুক্ত করে।

—**অগ্রপদ** (*Forelimb*) সমগ্র অগ্রপদের ভিতর পর পর সংযুক্ত অস্থিমালা বিদ্যমান। অগ্রপদের পুরোবাহের মধ্যেকার হাড়টিকে **প্রগণ্ডাস্থি** বা **হিউমারাস** (*Humerus*) বলা হয়। এই হাড়টি লম্বা এবং উহার উভয় প্রান্তই স্থূল। ইহার অগ্রাংশটিকে (*Proximal*) **মাথা** (*Head*) বলা হয়। হিউমারাসের মাথাটি গোলাকার এবং এই মাথাটিই বক্ষ-অস্থি-চক্রের গ্লিনয়েড গহ্বরে মিলিত হয়। হিউমারাসের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত সরু ও গোলাকার রডের মত। মাথাটির ঠিক পিছনে রডের একপার্শ্বে একটি ত্রিকোণাকৃতি উচ্চ অঞ্চল দেখা যায়। ইহাকে হিউমারাসের **ডেল্‌টয়েড রীজ** (*Deltoid Ridge*) বলা হয়। ইহার উপর হিউমারাসের পেশীগুলি স্থাপিত হয়। প্রগণ্ডাস্থি বা হিউমারাসের **শেষপ্রান্তে** (*Distant End*) একটি সরু বাঁকা অংশের মধ্যে, একটি গোলাকার অস্থিপিণ্ড থাকে। এই সমগ্র অঞ্চলকে **ট্রকলিয়া** (*Trochlea*) বলা হয়। এই গোলাকার বলের মত অস্থিপিণ্ডটি পরবর্তী অস্থির অগ্রাংশের গহ্বরের সহিত মিলিত হয়।

অগ্রপদের বাহুর মধ্যকার হাড়টিকে **রেডিও-আল্‌না** (*Radio-Ulna*) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে **রেডিয়স** (*Radius*) ও **অ্যাল্‌না** (*Ulna*) নামের দুইটি হাড় সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হইয়া উপরোক্ত হাড়টিকে গঠিত করে। রেডিও-অ্যাল্‌নার অগ্রাংশে এক-দিকে একটি কানা-উঁচু গহ্বর দেখা যায়। এই গহ্বরটিকে **সিগ্‌ময়েড নচ্‌** (*Sigmoid Notch*) বলা হয়। গহ্বরের উঁচু কানাটিকে **অলিক্রেনন প্রসেস** (*Olecranon Process*) বলা হয়। প্রগণ্ডাস্থি বা হিউমারাসের ট্রক্‌লিয়া প্রান্ত রেডিও-অ্যালনার সিগ্‌ময়েড নচের ভিতর মিলিত হয়। এইরূপ মিলন দ্বারাই কনুই-সন্ধির সৃষ্টি হয়। রেডিও-অ্যাল্‌নার পশ্চাদ্‌-প্রান্তটি বেশ চওড়া। ইহার মাঝে একটি লম্বাকৃতি চাপা দাগ থাকে। এই দাগের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, রেডিও-অ্যাল্‌নার হাড়টি রেডিয়স ও অ্যাল্‌না, দুইটি পৃথক্ হাড়ের যুক্তির ফলে গঠিত। রেডিও-অ্যাল্‌নার পশ্চাদ্‌-প্রান্ত কতকগুলি (ছয়টি) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার হাড়ের সহিত যুক্ত হয়। ইহাদের **কব্জির হাড় বা কারপল্** (*Carpal*) বলা হয়। হাড়গুলি উপর-নীচ দুই সারিতে বিদ্যমান; প্রতি সারিতে তিনটি হাড় থাকে। ব্যাঙের হাতের তালু পর পর চারিটি সরু লম্বাকার অস্থিদণ্ডের দ্বারা গঠিত। এই

১০৩নং চিত্র
ব্যাঙের অগ্রপদের বিভিন্ন হাড়গুলি দেখান হইতেছে।

অস্থিদণ্ডকে **মেটাকারপল্** (*Metacarpal*) বলা হয়। ব্যাঙের হাতে চারিটি অঙ্গুলি থাকে এবং প্রতিটি অঙ্গুলি আবার কতকগুলি হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি অঙ্গুলির অস্থি-খণ্ডগুলিকে অঙ্গুলি-নলক বা **ফ্যালেন্‌জেস্** (*Phalenges. Sing.* Phalanax) বলা হয়। আমাদের মত ব্যাঙের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলিতে দুইটি করিয়া অঙ্গুলি-নলক থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া অঙ্গুলি-নলক বিদ্যমান।

পশ্চাদ্-পদ (**Hind-limp**) **:** সমগ্র পশ্চাদ্-পদের ভিতর পর পর সংযুক্ত অস্থিমালা বিদ্যমান। পশ্চাদ্-পদের **জঙ্ঘার** (*Thigh*) হাড়টিকে **ঊর্বাস্থি** (*Femur*) বলা হয়। এই হাড়টি বেশ লম্বা এবং উহার উভয়প্রান্তই স্থূল ও গোলাকার। ঊর্বাস্থির মধ্যভাগ বেশ বাঁকা এবং ইহার অগ্রাংশের গোলাকার অঞ্চলটিকে ঊর্বাস্থির **মাথা** (*Head*) বলা হয়। মাথাটি অ্যাসিটাবুলমের ভিতর মিলিত হয় এবং ইহার ফলে শ্রোণীচক্রের সহিত সমগ্র পশ্চাদ্-পদটি যুক্ত হয়। শ্রোণীচক্রের অ্যাসিটাবুলম গহ্বরের সহিত ঊর্বাস্থির সংযুক্তির দ্বারা ব্যাঙের **নিতম্ব-সন্ধির** (*Hip-joint*) সৃষ্টি হয়। ঊর্বাস্থির পরবর্তী হাড়টিকে **জঙ্ঘাস্থি-অনুজঙ্ঘাস্থি** (*Tibia Fibula*) বলা হয়। **জঙ্ঘাস্থি** (*Tibia*) এবং **অনু-জঙ্ঘাস্থি** (*Fibula*) নামক দুইটি সদৃশ হাড়ের সমন্বয়ে ইহা গঠিত। টিবিয়া-ফিবিউলা হাড়টি পশ্চাদ্-পদের **জানুতলের** (*Shank*) ভিতর বিদ্যমান। ইহার প্রান্ত দুইটি চওড়া, অগ্রপ্রান্তটি ঊর্বাস্থির শেষ প্রান্তের সহিত যুক্ত হইয়া **জানুসন্ধি** (*Knee*) সৃষ্টি করে এবং ইহার পশ্চাদ্-প্রান্তটি পরবর্তী হাড়ের সহিত যুক্ত হইয়া **গোড়ালি-সন্ধির** (*Ankle-joint*) উৎপত্তি করে। টিবিয়া-ফিবিউলার পরবর্তী হাড়গুলিকে গোড়ালির-অস্থি বা **টারসাল** (*Tarsal*) হাড় বলা হয়। প্রতি সারিতে দুইটি করিয়া দুই সারি উপর-নীচ ভাবে থাকে। প্রথম সারির হাড় দু'টি লম্বা। ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রান্তে যুক্ত এবং হাড় দুইটির মাঝে যথেষ্ট ফাঁক দেখা যায়। **ক্যালকার** (*Calcar*) অঙ্গুলির দিকের হাড়টিকে **ক্যালকেনিয়ম** (*Calcaneum*) এবং উহার বিপরীত দিকের হাড়টিকে **অ্যাস্ট্রাগেলাস** (*Astragalus*) বলা হয়। দ্বিতীয় সারির হাড় দুইটি আকারহীন ও ছোট। ব্যাঙের পদতলে পাঁচটি সরু সরু কাঠির মত হাড পর পর সাজানো থাকে। পদতলের হাড়গুলিকে **মেটাটারসাল** (*Metatarsal*) হাড় বলা হয়। প্রতিটি পদে পাঁচটি অঙ্গুলি আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলিতে দুইটি করিয়া **অঙ্গুলি-নলক ফ্যালেন্‌জেস**

Phalenges) থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলিতে যথাক্রমে তিনটি ও চারিটি করিয়া **অঙ্গুলি-নলক** (*Phalenges*) বিদ্যমান। পঞ্চম অঙ্গুলিতে পুনরায়
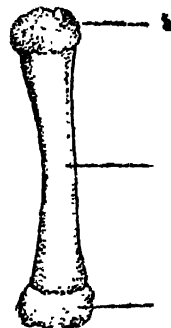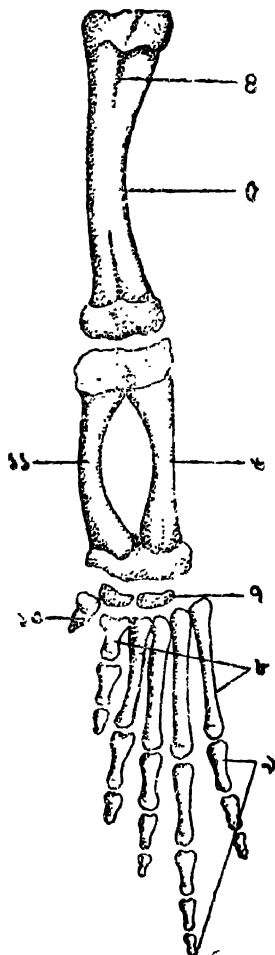
১০৪নং চিত্র

ব্যাঙের পশ্চাদ্‌-পদের বিবিধ অস্থির সন্নিবেশ দেখান হইতেছে।

১, ফিমার অস্থির মস্তক; ২, ফিমার; ৩, মুণ্ডি; ৪, নিমিয়াল দাগ; ৫, টিবিয়া-ফিবিউলা বা জঙ্ঘাস্থি-অনুজঙ্ঘাস্থি; ৬, এ্যাস্ট্রাগেলাস; ৭, টারসাল; ৮, মেটাটারসাল; ৯, ফ্যালেন্‌জেস বা অঙ্গুলি-নলক; ১০, ক্যালকার; ১১, ক্যালকেনিয়ম।

তিনটি করিয়া অঙ্গুলি-নলক থাকে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে উহার ভিতরের দিকে একটি উঁচু অংশ থাকে। উহার ভিতরকার হাড়কে ক্যালকার বা **প্রি-হ্যালাক্স** (*Calcar or Prehallux*) বলা হয়। ক্যালকার দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়ের দ্বারা গঠিত। অগ্রপদ ও পশ্চাদ্‌-পদ উভয়েরই হাড়গুলি একই প্রণালীতে সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ সদৃশ অগ্রপদ ও পশ্চাদ্‌-পদের পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি থাকায়

এই পদ্ধতিকে **পেণ্টাডাকটাইল** (*Pentadactile*) পদ্ধতি বা ভিত্তি বলে। সাধারণতঃ পশ্চাদ্-পদের হাড়গুলি অগ্র-পদের হাড়ের চেয়ে অনেক বড় হয়।

ব্যাঙের জন্ম-বৃত্তান্ত

(Life-history of Toad)

বর্ষাকালেই ব্যাঙ প্রজনন-কার্য সম্পন্ন করে। পুং-ব্যাঙগুলি এই সময়ে পুকুর বা ডোবার ধারে আসিয়া জমা হয় এবং ক্রমাগত ইহাদের স্বর-থলির (Vocal sac) সাহায্যে আওয়াজ করে। এই আওয়াজে স্ত্রী-ব্যাঙগুলি আকৃষ্ট হইয়া জলাশয়ের ধারে জমা হয়। স্ত্রী-ব্যাঙ ডাকিতে পারে না; কারণ ইহাদের কণ্ঠে স্বর-থলি থাকে না। স্ত্রী ও পুং-ব্যাঙ একত্রিত হইলে যৌন-সঙ্গমের সৃষ্টি হয়। পুং-ব্যাঙগুলি স্ত্রী-ব্যাঙগুলিকে পিছন দিক হইতে আলিঙ্গন করে এবং উহাদের অঙ্গুলির কালো প্যাডের দ্বারা স্ত্রী-ব্যাঙগুলির বক্ষদেশ চাপিয়া ধরে। এই অবস্থায় দুই বা তিনদিন কাটিয়া যায় এবং পরে স্ত্রী ব্যাঙগুলি আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায় জলের ধারে ডিম ছাড়ে। প্রতিটি ডিমের চারিধারে একটি করিয়া পাতলা জেলীর পর্দা বা আবরণী থাকে। ডিমগুলি বেশীক্ষণ জলে সিক্ত হইলে জেলী-আবরণটি ফুলিয়া উঠে এবং এই অবস্থায় ডিমগুলিকে শুক্রকীট নিষিক্ত করিতে পারে না। সুতরাং স্ত্রী-ব্যাঙ পর পর ডিমগুলিকে জলে ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পুং-ব্যাঙ, নিঃসৃত-ডিমের উপর শুক্রকীট ঢালিয়া দেয়। ডিমের জেলিগুলি পরস্পরের সহিত আটকাইয়া লম্বা ফিতার সৃষ্টি করে; ইহাকে **স্পন** (*Spawn*) বলা হয়। প্রতিটি ডিমের কেন্দ্র-স্থল কালো এবং ইহা পাতলা জেলী পর্দায় পরিবেষ্টিত। প্রতিটি শুক্রকীটের ত্রিকোণাকৃতি মাথা, ধর এবং লম্বা লেজ থাকে। একটিমাত্র শুক্রকীট একটি ডিমকে নিষিক্ত করিতে পারে। সাধারণতঃ শুক্রকীটগুলি জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়; ডিমের সংস্পর্শে আসিলে শুক্রকীটগুলি উহার ভিতর প্রবেশ করে এবং শুক্রকীটের মাথার সহিত ডিমের মিলনের ফলে সংযুক্ত জনন-

কোষের সৃষ্টি হয়। ডিমের ভিতর শুক্রকীটের মাথাটি প্রবেশ করিবার পর উহার লেজটি খসিয়া পড়ে। শুক্রকীট ও ডিমকে ব্যাঙের **পুং-জননকোষ** (*Male Gamete*) এবং **স্ত্রী-জননকোষ** (*Female Gamete*) বলা হয়। শুক্রকীটের মাথাটি ডিমের ভিতরে প্রবেশ করিবার পর উহা গোলাকারে পরিণত হয়। তখন ইহাকে **পুং-নিউক্লিয়স** (*Male Pronucleus*) বলা হয়। সেইরূপ ডিমের মধ্যকার নিউক্লিয়সকে **স্ত্রী-নিউক্লিয়স** (*Female Pronucleus*) বলা হয়। উপরোক্ত দুইটি নিউক্লিয়স মিলিত হইয়া একটি সংযুক্ত নিউক্লিয়সে পরিণত হয়। এই সংযুক্ত নিউক্লিয়সকে **অস্পার্ম বা জাইগোট** (*Osperm or Zygote*) বলা হয়। ইহাদের বৃদ্ধি ও রূপান্তরের ফলেই ভাবী ব্যাঙের আবির্ভাব হয়। জাইগোট সৃষ্টির পদ্ধতিকে **নিষিক্তকরণ** (*Fertilization*) বলা হয়। যে-কোন ডিমে একটিমাত্র শুক্রকীটের প্রবেশের পর অন্য কোন শুক্রকীট আর প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ ডিমের ভিতর শুক্রকীট প্রবেশের পর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে ; ফলে ডিমের আবরণ শক্ত হইয়া যায়।

জাইগোটের কোষটি বহুবিধ বিভাজনের ফলে বহুকোষে পরিণত হয় এবং শেষে একটি **ভ্রূণে** (*Embryo*) রূপান্তরিত হয়। জাইগোট সৃষ্টির প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। প্রথমে ভ্রূণটিকে ডিমের মধ্যে নড়াচড়া করিতে দেখা যায়। সুতরাং নিষিক্ত ডিমের মধ্যে বর্জনশীল প্রাণীকেই ভ্রূণ বলা হয়। ডিমের পর্দা ফাটাইয়া ভ্রূণটি জলে বাহির হইয়া আসে। ভ্রূণটির এই অবস্থাকে আমরা **লার্ভা** (*Larva*) বলি। লার্ভার প্রথম অবস্থার আকারের সহিত পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের কোন মিল নাই, বরঞ্চ মাছের সহিত উহার কিছুটা মিল আছে। লার্ভার দেহের তিনটি অঞ্চল পরিষ্কার দেখা যায়। উহার মাথাটি গোলাকার, ধড়টি লম্বা এবং লেজটি ছোট ও চ্যাপ্টা। লার্ভার অঙ্কদেশে একটি বড় ও লেজের সংযোগস্থলে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখা যায়। ইহাই **পায়ুছিদ্র** (*Vent*)। ইহাদের **মুখছিদ্র** (*Mouth*) নাই এবং কোন পদও থাকে না। মাথার একপাশে একটি **গোলাকার সাকার** (*Sucker*) থাকে ও ইহার দ্বারা লার্ভা জলমগ্ন গাছের পাতার সহিত আটকাইয়া থাকে। লার্ভার মুখছিদ্র না থাকায় এই সময় উহারা কিছুই খায় না। মাথার দুইধারে চোখ থাকে। চোখের পিছন দিকে মাথার প্রতি পাশে, সারিবদ্ধভাবে তিনটি করিয়া বহিঃ-ফুলকা থাকে। প্রতিটি ফুলকা আবার দুইভাগে বিভক্ত দেখা যায়। প্রতিটি
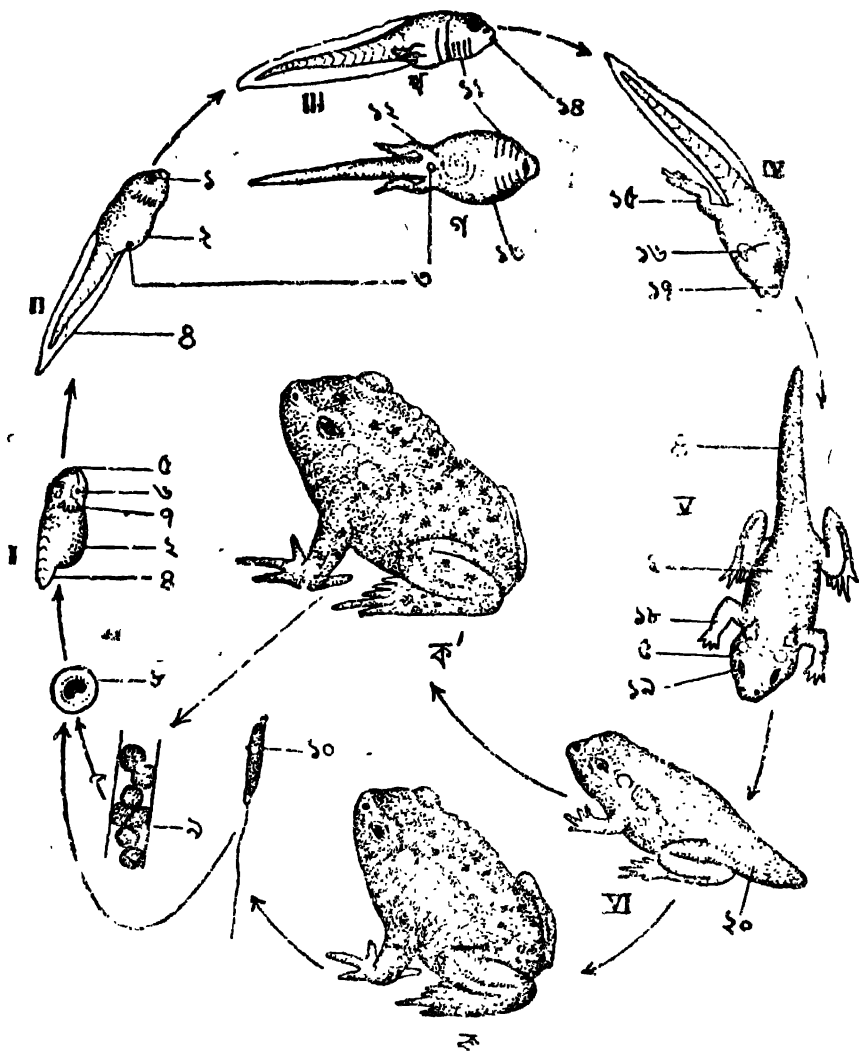
১০৫ নং চিত্র

ব্যাঙের জীবন-চক্র দেখান হইতেছে। ক, স্ত্রী-ব্যাঙ ; ক', পুং-ব্যাঙ।

I—V ব্যাঙের বিবিধ দশা : ১, চক্ষু ; ২, ধড় ; ৩, আবরণী ছিদ্র ; ৪, লেজ ; ৫, মুখ-ছিদ্র : ৬, সাকার ; ৭, বহিঃ-ফুলকা ; ৮, নিষিক্ত ডিম ; ৯, অনিষিক্ত ডিম ; ১০, শুক্রকীট ; খ—গ, ব্যাঙাচির পার্শ্ব ও অঙ্কীয় দেশ দেখান হইতেছে : ১১, অন্তঃ-ফুলকা ; ১২, পাকানো অন্ত্র : ১৩, স্পাইরা[illegible]ত্র ; ১৪, মুখছিদ্র ; ১৫, পশ্চাদ্‌পদ ; ১৬, অপারকুলামের তল হইতে অগ্রপদের সৃষ্টি ; ১৭, বহিঃনাসারন্ধ্র ; ১৮, অগ্রপদ ; ১৯, চক্ষু ; ২০, অবলুপ্তির পথে লেজ।

ফুলকার ভিতর প্রচুর পরিমাণে রক্তবাহী নালীর জালক থাকায় ইহারা শ্বাসযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। জলের ভিতরে বহিঃফুলকাগুলি জলমিশ্রিত অক্সিজেন শোষণ করে এবং দেহ হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইড বাহির করিতে পারে। লার্ভার বহিঃফুলকাগুলিই **প্রথম শ্বাসযন্ত্র** (*First set of respiratory organs*)।

ইহার পর লার্ভা দ্বিতীয় দশায় রূপান্তরিত হয়। এই দশায় লার্ভার মুখছিদ্রের (mouth) সৃষ্টি হয় এবং উহা উপর এবং নীচের শক্ত চোয়ালের দ্বারা আবদ্ধ থাকে। লেজটি ধীরে ধীরে লম্বা হয় এবং উহার পৃষ্ঠ ও অঙ্কদেশে পাতলা পর্দার সৃষ্টি হয়। এই সময় লার্ভাটির লেজ-অঞ্চল মাছের পাখনার মত দেখায়। লেজ-অঞ্চলের পেশীগুলি "V' অক্ষরের মত পর পর সজ্জিত থাকে। এই সময়ে লার্ভাটি এই পেশীগুলির সাহায্যে সাঁতার কাটিতে পারে। ইহারা অ্যাল্‌জী গোত্রীয় উদ্ভিদ্‌গুলিকে শক্ত চোয়ালের দ্বারা কাটিয়া ভক্ষণ করে। লার্ভা অবস্থায় ইহাদের ধড় ক্ষুদ্র হইলেও দেহের ভিতরকার পৌষ্টিক-নালীটি এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি হয় এবং অন্ত্রটি অতি লম্বা হওয়ায় ইহা ঘড়ির স্প্রিংয়ের মত পাকানো থাকে। লার্ভা দ্বিতীয় অবস্থায় বেশ চঞ্চল হয় এবং দ্রুতবেগে সাঁতার কাটিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। সুতরাং লার্ভা দ্বিতীয় অবস্থা হইতেই স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে। কিন্তু ইহাদের আকৃতিও স্বভাবের সহিত পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের কোনও মিল নাই। লার্ভার এই দ্বিতীয় দশাকে **ব্যাঙাচি** (*Tadpole*) বলা হয়; সুতরাং ব্যাঙাচি ব্যাঙেরই লার্ভা। স্বাধীন অপরিণত এবং ভিন্ন আকৃতির শিশুপ্রাণীকে উহার পূর্ণাঙ্গ প্রাণী হইতে পৃথক করিবার জন্য লার্ভা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সব ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের আকৃতি এবং মাছের মত শিশু-প্রাণীরও ব্যাঙাচির মত আকৃতি। ব্যাঙাচি এইভাবে কিছুদিন সাঁতার কাটিবার পর **উহাদের গলবিলের** (*Pharynx*) দুইপাশে ছিদ্রের সৃষ্টি হয় এবং ব্যাঙাচির বহিঃফুলকাগুলি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া মিলাইয়া যায়। গলবিলের ছিদ্রের ভিতরে ফুলকার আবির্ভাব হয় এবং সেইজন্য গলবিলের ছিদ্রগুলিকে **ফুলকা ছিদ্র** (*Gill Slits*) বলে। ফুলকাগুলি ফুলকাছিদ্রের ভিতরে থাকায় উহাদের **অন্তঃফুলকা** (*Internal Gills*) বলা হয়। ইহার পর ব্যাঙাচির মাথায় দুই পাশ হইতে পাতলা চামড়ার পর্দা বাহির হইয়া ফুলকাগুলিকে ঢাকিয়া ফেলে এবং এই চামড়ার পর্দাটিকে ফুলকা **আবরণী বা অপারকুলাম** (*Gill*

Cover or Operculum) বলা হয়। প্রতি পার্শ্বের ফুলকা আবরণী বৃদ্ধিলাভ করিয়া ধড়ের সহিত মিলিত হয়। ডান পার্শ্বের ফুলকা আবরণী ব্যাঙের ধড়ের সহিত সংযুক্ত হয় কিন্তু বাম পার্শ্বে একটিমাত্র ছিদ্রের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই ছিদ্রটিকে **স্পাইরাকল** (*Spiracle*) বলা হয়। ব্যাঙাচি মুখছিদ্র দিয়া জল প্রবেশ করায়। জল মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া গলবিলের ফুলকাছিদ্রে প্রবেশ করে এবং তথাকার অন্তঃফুলকাগুলিকে ধৌত করিয়া স্পাইরাকল ছিদ্রপথে পুনরায় বাহির হইয়া যায়। এইভাবে বাহিরের অক্সিজেন-মিশ্রিত জল মুখছিদ্র দিয়া প্রবেশ করে এবং অন্তঃফুলকাগুলিকে ধৌত করিবার পর স্পাইরাকল ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসে। এইভাবে অন্তঃফুলকার দ্বারা শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয় এবং অন্তঃফুলকাই ব্যাঙাচির দ্বিতীয় প্রকার শ্বাসযন্ত্র। ব্যাঙাচির অন্তঃফুলকাগুলি কার্যকরী হইবার পর ইহার আকৃতি, চলন ও স্বভাব মাছের মত হয় এবং হঠাৎ দেখিলে মাছের বাচ্চা বলিয়া ভ্রম হয়।

কিছুদিন এইভাবে অন্তঃফুলকার সাহায্যে জীবন অতিবাহিত করিবার পর গলবিলের অঙ্কদেশ-অঞ্চল হইতে প্রতি পার্শ্বে একটি করিয়া ফুসফুসের সৃষ্টি হয়। ফুসফুস ব্যাঙাচির তৃতীয় দশার শ্বাস-যন্ত্র। পদগুলি ইহার পর বাহির হয়। প্রথমে পশ্চাদ্-পদ দুইটি লেজের মূল হইতে উহার দুইপাশ দিয়া ক্ষুদ্র গোলাকার কুঁড়ি আকারে সৃষ্টি হয়। পরে কুঁড়ি হইতেই পশ্চাদ্-পদ্-জোড়ার আবির্ভাব ঘটে। ফুলকা-আবরণীর নিম্ন হইতে ইহার পর অগ্রপদের সৃষ্টি হয়। অগ্রপদ-জোড়া ফুলকা আবরণী ফাটাইয়া বাহির হইয়া আসে। অগ্রপদ ও পশ্চাদ্-পদের সৃষ্টির পর ব্যাঙাচি ধীরে লাফাইতে আরম্ভ করে এবং জলে থাকাকালীন অন্তঃফুলকার দ্বারাই শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। এইসময় মাঝে মাঝে ইহারা জলের বাহিরে ও ডাঙ্গায় আসে, তখন ইহারা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। ব্যাঙাচির ফুসফুস দুইটি সম্পূর্ণভাবে গঠিত হইবার পর অন্তঃফুলকাগুলি সঙ্কুচিত হইয়া দেহের ভিতর মিলাইয়া যায়। ইহার পর ব্যাঙাচি লাফাইতে লাফাইতে ডাঙ্গায় আসিয়া একস্থানে বিশ্রাম করে। এখন আকারে ব্যাঙাচিগুলি প্রায় পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের মত দেখিতে হয়। অবশ্য তখনও ব্যাঙাচির লম্বা ও স্থূল লেজ থাকে। অগ্রপদ্-পদ-জোড়া সম্পূর্ণভাবে গঠিত হইবার পর ব্যাঙাচি কিছুদিন উপবাসে থাকে। এই সময় উহাদের লেজ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ লেজটি ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া খাদ্যরসরূপে পরিণত হয় এবং এই খাদ্যরসই ব্যাঙাচির উপবাসের সময় খাদ্য যোগায়। এইভাবে ব্যাঙাচির লেজটি

মিলাইয়া যায় এবং ব্যাঙাচি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়। পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে এইসময় জলের ধার হইতে লাফাইতে লাফাইতে ডাঙ্গায় অবতার্ণ হয়। ইহার পর ব্যাঙের শক্ত চোয়াল দুইটি হাড়ের চোয়ালে পরিবর্তিত হয় এবং ব্যাঙ পতঙ্গ ও কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে। ব্যাঙাচির অতিরিক্ত লম্বা পৌষ্টিকনালী সঙ্কুচিত হইয়া এখন অনেকটা ছোট হয়। ব্যাঙের ভ্রূণ অবস্থা হইতে ব্যাঙাচির শেষদশা পর্যন্ত অতিবাহিত করিতে সময় লাগে প্রায় বারো সপ্তাহ। সুতরাং ব্যাঙের বৃদ্ধিকাল মোট বারো সপ্তাহ। ভ্রূণ হইতে ধীরে ধীরে আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন সহকারে বাঙের বিবিধ দশাকে একত্রিত করিয়া উহাকে রূপান্তর নামে অভিহিত করা হয়। **রূপান্তর** (*Metamorphosis*) কথাটি উপরোক্ত সমগ্র প্রকার পরিবর্তনকে বুঝায়। লার্ভার এই পরিবর্তন বা রূপান্তরের লক্ষ্য ব্যাঙে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা। এই রূপান্তরের সময় কৃত্রিম উপায়ে কমাইতে পারা যায়। ব্যাঙের লার্ভাকে থাইরয়েড্ গ্রন্থিরস ভক্ষণ করাইলে উহা খুব শীঘ্র পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়।

অনুশীলনী

১। ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্রের বিবিধ অঙ্গগুলির সচিত্র বিবরণ দাও। (Describe the digestive system of Toad. Leave a neat and labelled sketch)—1963.

২। ব্যাঙের পরিপাক-প্রক্রিয়া কিভাবে হয় তাহা সবিস্তারে লিখ। (Explain the process of digestion of Toad in detail.)

৩। লসিকাতন্ত্রের সহিত রক্ত-সংবহন-তন্ত্রের সম্পর্ক কি? ধমনী হইতে শিরার উৎপত্তি কিভাবে হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দাও। (How lymphatic system is connected with the circulatory system? Explain how veins originate from arteries.)

৪। রক্ত কাহাকে বলে? রক্ত-কণিকার প্রকারভেদ ও উহাদের কার্যকারিতা বর্ণনা কর। (What is blood? Describe different types of blood corpuscles and state the function of each.)

৫। ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্রের বহিরাকৃতি ও অন্তর্গঠন চিত্র-সহযোগে বর্ণনা কর। হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর রক্ত কিভাবে প্রবাহিত হয়, তাহার গতি-পথের নির্দেশ দিয়া যন্ত্রটির কার্যকারিতার বিবরণী দাও। (Describe the external and internal structure of the heart of a Toad with labelled sketches. Explain the path of the circulation of blood within the heart. State its function.)

৬। ব্যাঙের দেহের ধমনী-প্রণালীর বিষয় চিত্র-সহযোগে বর্ণনা কর। (Describe the arterial system of Toad. Leave a neat and labelled sketch.)

৭। ব্যাঙের দেহের শিরা-প্রণালীর বিষয় চিত্র-সহযোগে বর্ণনা কর। (Describe the veinous system of Toad. Leave a neat and labelled sketch.)

৮। যকৃৎ-পোর্টাল প্রণালী ও বৃক্ক-পোর্টাল প্রণালী কাহাকে বলা হয়? উহাদের সহিত অগ্রস্থ উদরদেশীয় শিরার কি সম্বন্ধে তাহা চিত্র সহযোগ বর্ণনা কর। (Define hepatic portal system and renal portal system. Explain their relation with anterior abdominal vein. Leave a neat and labelled sketch.)

৯। অন্তঃশ্বাসপ্রণালী কাহাকে বলে? ব্যাঙের বিবিধ শ্বাসযন্ত্রগুলির বর্ণনা দাও। (Define internal respiration. Describe different types of respiratory organs of Toad.)

১০। ব্যাঙের ফুসফুসীয় শ্বাসক্রিয়া কিভাবে হয় তাহা চিত্র-সহযোগে বুঝাইয়া লিখ। (Describe the process of pulmonary respiration of Toad. Leave neat and labelled sketches.)

১১। ব্যাঙের মস্তিষ্কের গঠন, বিশেষত্ব ও কার্যকারিতা চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe the structure, peculiarities and the function of the brain of Toad. Leave neat and labelled sketches.)

১২। ব্যাঙের পঞ্চম, সপ্তম, দশম করোটি স্নায়ুর উৎপত্তি, গতি ও গন্তব্যস্থল সবিস্তারে এবং চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Describe the origin, course and the distribution of fifth, seventh and tenth cranial nerves of Toad.)

১৩। সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুগুলির উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থলের বিবরণ দাও। (Describe the various types of spinal nerves with reference to its origin and distribution.)

১৪। ব্যাঙের পুং-জননতন্ত্র বর্ণনা কর। ব্যাঙের রেচনতন্ত্রের সহিত পুং-জননতন্ত্রের কি সম্বন্ধ তাহা সঠিকভাবে বর্ণনা কর। (Describe the male reproductive system of Toad. Explain the relation between the general system with the male reproductive system of Toad.)

১৫। রক্ত হইতে কিরূপে প্রস্রাব নিষ্কাশিত হয় তাহা চিত্রসহ বর্ণনা কর। (Explain with sketches how urine is separated from the blood.)

১৬। ব্যাঙের চক্ষু, ইহার গঠন কার্য ও বিশেষত্ব বর্ণনা কর। (Describe the structure, peculiarities and the function of the eye of a Toad.)

১৭। ব্যাঙের কর্ণের গঠন ও উহার কার্যকারিতা বর্ণনা কর। (Explain the internal structure and the function of the ear of a Toad.)

১৮। রূপান্তর কাহাকে বলে? ব্যাঙের জীবন-বৃত্তান্ত চিত্রসহযোগে বর্ণনা কর। (What is metamorphosis? Describe the life-history of a Toad. Leave neat sketches.)

১৯। ব্যাঙের মেরুদণ্ডের বিবিধ কশেরুকাগুলির সচিত্র বর্ণনা দাও। (Describe various types of vertebra of the vertebral column of the Toad. Leave neat sketches.)

২০। ব্যাঙের বক্ষ-অস্থিচক্রের চিত্র অঙ্কন করিয়া উহার প্রতিটি অংশ চিহ্নিত কর। (Draw a net sketch of the pectoral girdle of Toad and label every part of it.)

২১। ব্যাঙের অগ্র-পদের অস্থির সহিত পশ্চাদ্-পদের অস্থিগুলির তুলনা কর। (Compare the bones of fore-limb with that of hind-limb of a Toad.)

২২। নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষেপে লিখ:

(i) জালক (ii) অগ্ন্যাশয় (iii) প্লীহা (iv) ম্যালপিজিয়ান বডি (v) ধমনী (vi) শিরা (vii) লসিকা (viii) অলিক্রানন প্রসেস (ix) বিডার্স যন্ত্র (x) কলুমিলা (xi) অক্ষিপট (xii) ব্যাঙাচি (xiii) পিটিউটারি গ্রন্থি।

[Write short notes on :—(i) Capillaries (ii) Pancreas (iii) Spleen (iv) Malpighian body (v) Artery (vi) Vein (vii) Lymph (viii) Olecranon Process (ix) Bidder's Organ (x) Columella (xi) Retina (xii) Tadpole (xiii) Pituitary Gland.]

HIGHER SECONDARY AND MULTIPURPOSE COURSE

Questions (*Final Examination*)

BIOLOGY—Paper I

(Theoretical)

Special credit will be given for answers which are brief and to the point.

Three marks assigned for neat figures and general impression.

Group A

Answer question 1 and *any two* from questions 2 to 5.

1. Draw diagrams to illustrate the structures of the following and mention their chemical composition :

(*a*) Starch grains ; (*b*) Protein grains ; (*c*) Cystolith ; (*d*) Raphide.

2. Describe an experiment to show that plants transpire. What are the external factors which regulate transpiration ?

3. Draw the internal structures in a transverse section of a stem of moncotyledonous plant. Mention only two characteristic features which are diffierent from the features noticed in the internal structure of a dicotoyledonous stem.

4. Describe the modified underground stems with figures and examples. What special functions do they perform ?

5. Give brief description and figures where necessary to illustrate any four of the following :

(*a*) Epiphyte. (*b*) Shrub, (*c*) Root-hair, (*d*) 'Budding', (*e*) Meristem, (*f*) Collenchyma, (*g*) Alternate phyllotaxy, (*h*) Phylloclade.

Group B

Answer question 6 and *any two* from questions 7 to 10.

6. Describe briefly how plants perform photosynthesis. In what way it is different from respiration ?

7. Draw and describe the parts of a typical flower. Mention the function of each part.

8. Describe the four chief means by which fruits and seeds are dispersed. Cite one example of each. What are the uses of seed dispersal.

9, What do you understand by the endospermic and non-endospermic seed ? Describe the structure and germination of non-endospermic dicotyledonous seed.

10. Give description, figures and suitable examples of any four of the following :

(*a*) Spike, (*b*) Monoecious plant, (*c*) Diadelphous stamen, (*d*) Vivipary, (*e*) Self-pollination, (*f*) Symbiosis, (*g*) Stem, (*h*) Geotropism.

BIOLOGY—Paper II

(Theoretical)

1960

Special credit will be given for answers which are brief and to the point. Marks will be deducted for untidiness and bad handwriting. The questions carry equal value. Answer any five questions. Illustrate your answer with diagrams wherever possible.

1. Give an account of the principal structures found in a typical animal cell. Briefly mention their functions.

2. Describe the alimentary system of the earthworm, noting the functions of its different regions. Sum up the agricultural importance of earth-worms.

Or,

Give an account of the anatomy of the reproductive organs of the earthworms.

3. Name the phyla and classes to which the animals mentioned belong, and state reasons for placing them in their respective groups. Give one more example for each of the classes that you state :

(1) the prawn ; (2) the guineapig ; (3) the koi fish ; (4) the cockroach.

4. A hungry frog catches an insect. Explain the mechanism involved with special reference to the functioning of the nervous system.

5. Give an outline of the life-history of a mosquito.

Or,

Give an account of the respiratory organs of the prawn. Describe the mechanism of circulation of water in the gill chamber.

6. Write out you your field experience of collecting and preserving various insects avaliable in your locality.

7. Describe the different types of cell found in the ectoderm of Hydra mentioning their functions.

8. Give an account of the gross anatomy of the digestive system of the frog or the toad. Enumerate the different digestive ferments present in the gastric, pancreatic and intestinal juices. State the substances on which they act and the final products of their action.

BIOLOGY (Science Group)

Paper I

(Theoretical)

1961

Special credit will be given for answers which are brief and to the point. Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.

Group A

[*Answer* **question 1** *and any* **two** *from* **questions 3 to 5**].

1. Give a brief description with figure and examble of any *three* of the following :—

(*a*) Parasite, (*b*) Phylloclade, (*c*) Female flower, (*d*) Monadelphous stamens and (*e*) Legume.

2. You are supplied with an underground part of a fresh plant body. With the help of external features only, state whether it is a root or a stem.

3. With figure and example describo the chief types of venation.

4. What is cross-pollination ? How is it different from self-pollination ? Mention some merits of cross-pollination.

5. Draw and label the parts of a castor oil seed. Mention the type of which it belongs.

Group B

[*Answer* **question 5** *and any* **two** *from* **questions 7 to 10.**]

6. Write notes on any *three* of the following :—

(*a*) Cellulose ; (*b*) Cambium ; (*c*) Endodermis ; (*d*) Movements of protoplasm ; (*e*) Phloem.

7. What is meant by photosynthesis. Describe and experiment to prove that sun light is necessary for photosynthesis.

8. Give a brief account of the influence of gravity on movements of stem and root of a plant.

9. With labelled sketches show the broad outlines of mitosis.

10. Draw and label the internal structure of a dorsiventral leaf.

BIOLOGY (Science Group)

Paper II

(Theoretical)

1961

Special credit will be given for answer which are brief and to the point. Marks will be deducted for spelling mistakes and bad handwriting.

The questions carry equal value. Answer any **five** *questions.*

Illustrate your answers with diagrams whenever possible.

1. Describe briefly the methods of cell divison. What changes take place in the cell during mitosis ?

2. Give an account of the process of reproduction in *Monocysts* and mention briefly how it differs from that of the free-living *Amoeba.*

3. Give a brief account of the life history of the honey-bee. How does it feed at each stage ?

4. Describe the digestive system of the cockroach *or* the earthworm.

5. Describe the external features of a Rahu fish and mention the function of each structure that you mention.

6. Describe the external features of a bird.

Or,

Describe the methods of locomotion and the locomotry organs in the frog *or* to the toad.

7. Describe the process of respiration in the toad, *or* the frog. Name the respiratory organs.

8. Mention any *three* animals you have seen in a fresh water pond and state their position in the animal kingdom. Give an outline description of each

BIOLOGY (Science Group)

Paper—I

(Theoretical)

1962

Special credit will be given for answers which are brief and to the point. Masks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting. Answer question 1 and 6 from each group.

Group—A

1. With sketches and reasons mention the morphological nature of the edible parts of the following :

   (*a*) Carrot
   (*b*) Onion
   (*c*) Potato

2. Describe with a diagram the different parts of a typical leaf. How a simple leaf is distinguished from a compound leaf ?

3. Give an account of the different parts of typical flower you have examined. What are Monoecious and Dioecious plants ? Give one example for each of them.

4. What do you understand by germination of seed ? Mention the external conditions necessary for it and describe an experiment to prove your statement.

5. Describe with figure and example in each case of any *three* of the following :

   (*a*) Herb
   (*b*) Fibrous root
   (*c*) Rhizome
   (*d*) Hypanthodium
   (*e*) Staminate flower

Group—B

6. Give an account of the living contents of a plant cell. Mention briefly their functions.

7. Define tissue. Menti[illegible] the different forms of tissue you have studied and state their functions.

8. What is meant by transpiration ? Describe an experiment to show that plants transpire. What is its importance ?

9. What is photosynthesis ? Describe an experiment to prove that oxygen is liberated during photosynthesis.

10. Write notes on any *four* of the following :

(*a*) Stomota
(*b*) Lignin
(*c*) Raphide
(*d*) Phototropism
(*e*) Symbiosis
(*f*) Saprophyte

BIOLOGY (Science Group)

Second Paper

1962

Special credit will be given for answers which are brief and to the point. Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.

All questions carry equal value.
Answer any five questions.

1. What is a tissue ? Name the major types of animal tissues. State briefly the function of each type.

2. Describe the structures found in the body of a free-living *Amaeba*. Mention briefly their functions.

3. Name the layers found in the body-wall of *Hydra*. Describe the different types of cell found in the inner layer of its body-wall, and state their functions.

4. Give an account of the external features of the earthworm. State how earthworms are beneficial to man.

5. Enumerate the external features by which a male prawn is distinguished from a female. Give an account of the male reproductive organs of the prawn.

6. Narrate briefly the stages in the life history of a mosquito.

7. Give an account of external character of a shark.

8. Describe the structure of the heart in toad or frog and mention the course of circulation through the heart.

9. State the distinctive external features of the following animals and mention in each case, the phylum in which the animal is placed :

(*a*) Hydra, (*b*) Cockroach, (*c*) Rahu.

BIOLOGY (Science Group)

First Paper

(Theoretical)

1963

Special credit will be given for answer which are brief and to the point. Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.

Answer Questions 1 and 6 and two from each group.

Group A

(*Answer* Question 1 and *any two*)

1. Give a brief description, with example and figure, of any three of the following :

(*a*) Parasite. (*b*) Tap-root, (*c*) Runner, (*d*) Simple leaf, (*e*) Bract, (*f*) Raceme, (*g*) Pistillate flower, (*h*) Syngenesious stamen, (*i*) Berry.

2. With a labelled sketch describe the main parts of a typical flowering plant. State their fundamental functions.

3. Cite an example with the figure of—(*a*) *one* modified underground stem, (*b*) *one* modified sub-aerial stem, and (*c*) *one* metamorphosed stem. Mention the special function of each one of them.

4. Define self and cross-pollination. What are agents which help its pollination? Mention a few characteristics of insect pollinated flowers.

5. Draw and label the parts of a pea seed. Describe how it germinates. Mention the type which the seed belongs.

Group B

(*Answer* Question 6 and any two)

6. Write notes on any *three* of the following :

(*a*) Cellulose, (*b*) Starch grains, (*c*) Sclerenchyma, (*d*) Epidermis, (*e*) Phloem, (*f*) Circulation of protoplasm, (*g*) Root pressure.

7. Write what you know about the place of occurence, structure and function of the Nucleus.

8. Describe with example and figure any three of the following :

(*a*) Fission, (*b*) 'Budding', (*c*) Conjugation, (*d*) Fertilization.

9. Define Osmosis. Describe one experiment. Explain how the root-hair utilises this phenomenon.

10. Give a brief account of the influence of light on the movements of stem and root with an experiment.

BIOLOGY (Science Group)

First Paper

1964

(Theoretical)

Special credit will be given for answers which are brief and to the point.

Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting

Answer **Questions 1** and **6** and **two** from each group.

Group A

1. Why do plants climb a support ? Cite at least *three* examples with figures and describe how they climb.

2. Compare the external features of root and stem. Give suitable diagrams.

3. Define venation. Describe the main types of venation with figures and examples. What are the functions of veins ?

4. Name the type of fruit to which guava, mango, paddy and pea belong. Mention which part of each of the fruits we eat.

5. Write notes on any *three* of the following :—
(*a*) Saprophyte, (*b*) Stipule, (*c*) Thorn, (*d*) Capitulum, (*e*) Monoecious plant, (*f*) Didynamous stamen.

Group B

(*Answer* **Question 6** *and* **two** *others*)

6. Write what you know about the structure, place of occurance and function of chloroplasts. Name the parts in a plant body where they are absent. Name a plant in which they are absent.

7. Draw and label the internal structure of a dorsiventral leaf. What do you mean by the word dorsiventral ?

8. What do you mean by transpiration ? Describe an experimeant to show that plants transpire. What are the factors which regulate transpiration ?

9. Define respiration. Describe an experiment to prove that green parts of a plant respire at day time. State whether respiration goes on in all the cells in the plant.

10. Write notes on any *three* of the following :
(*a*) Vacuole
(*b*) Fertilization
(*c*) Endodermis
(*d*) Osmosis
(*e*) Movements of protoplasm inside a cell
(*f*) Geotropism.

1964

Second Paper

Special credit will be given for answers which are brief and to the point. Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting. Answer any five questions, not more than two, from any group. Illustrate your answers with diagrams wherever necessary.

Group A

1. Describe the structural and functional characteristics of a living organism.

2. Describe the process of reproduction in *Amoeba*.

3. Name the various structures associated with digestion in *Hydra* and describe the process of nutrition.

Group B

4. Describe the position, structure and functions of the following in earthworm (*Pheretima*) :

(*a*) Prostomium
(*b*) Gizzard
(*c*) Spermatheca

5. Mention the composition of blood in fresh water prawn (*Palaemon*) and describe the course of circulation of blood.

6. Define respiration. Describe the mechanism of respiration and the structures concerned in cockroach (*Periplaneta*).

Group C

7. Draw and label the various structures found in a longitudinal section of the heart of toad (*Bufo*) or frog (*Rana*) and mention how its heart differs from that of freshwater prawn (*Palaemon*).

8. Describe the shortest route of a red blood corpuscle from kidney to heart and back in toad (*Bufo*) or frog (*Rano*).

9. Define excretion. Describe the urinary organs in toad (*Bufo*) or frog (*Rana*)

BIOLOGY (Science Group)

Paper II

(Theoretical)

Special credit will be given for answer which are brief and to the point. Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting. Answer question 8 and four other questions.

Illustrate your answers with diagrams wherever possible.

1. Define alternation of generation. Explain with reference to the life-history of the *Monocystis.*

2. Describe the various modes or locomotion in *Hydra*, specially mentioning the structures concerned.

3. Draw and describe the transverse section passing through the intestinal region of the *Pheretima.*

4. Mention the various structures associated with the locomotion of prawn (*Palaemon*) and describe briefly one typical structure of each type.

5. Give a short account of the following structures :—

(*a*) Compound eye, (*b*) Trachea, (*c*) Salivary apparatus, (*d*) Gizzard, (*e*) Malpighian tubules.

6. What is honey ? Describe briefly the life-history of the honey-bee.

7. Describe the digestive organs in toad (*Bufo*) or frog (*Rana*) and mention how it catches the prey.

Or,

Give an outline description of the structure of the eye in toad (*Bufo*) or frog (*Rana*) and mention how it differs from the eye of prawn.

BIOLOGY

First Paper

1965

Group A

(Answer Question 1 and any two)

1. Define germination. Mention the three external conditions necessary for germination. Describe one experiment to support your statement for each condition. Is sunlight ordinarily necessary to start germination ? $2+3+(3\times3)+1=15$

2. Cite an example of rhizome. Draw and label the external parts of that rhizome in detail. State why it is an underground stem. $1+3+3+5=12$

3. How will you distinguish a simple leaf from that of a compound leaf ? With examples draw one simple leaf and two types of compound leaves. $6+(1+1)+(2+2)=12$

4. What is meant by dispersal of fruits and seeds? Name the agents which help in the dispersal. What are the benefits of dispersal of fruits and seeds? 2 + 4 + 6 = 12

5. Write short notes on any four of the following :

(a) Herb, (b) Tap-root, (c) Thorn, (d) Monoecious plant, (e) Raceme, (f) Syngenesious stamens.

Group B

(Answer Question No. 6 and any two)

6. Describe mitosis, with the help of diagrams. What is the importance of mitosis? 5 + 5 + 2 = 12

7. Name the three types of plastids. Mention the place of occurance and function of each type. 3 + 6 + 3 = 12

8. What are essential food elements? Describe an experiment to prove the necessity of an one of the elements. 5 + 7 = 12

9. Describe with separate simple experiment, the influence of Gravity and water on the movement of roots. 6 + 6 = 12

10. Write notes on any four :—(a) Cellulose, (b) Cystolith, (c) Cambium, (d) Osmosis, (e) Root pressure, (f) Collenchyma. 4 × 3 = 12

BIOLOGY (Second Part)

Group A

1. Describe the similarities and dissimilarities between a typical vertebrate and an invertebrate, 7 + 8

2. Define Parasitism. Describe the sturctures of a Parasitic protozoon you have studied. Mention its site of occurance and the scientific name of the host. 3 + 9 = 12 + 2

Group B

3. Mention the composition of Blood in Pheretima and describe the various structures associated with the circulation of blood.

4. Give a brief account of the various structures associated with locomotion of Palaemon.

5. Mention the scientific name of an insect harmful to man and narrate briefly its life-history.

Group C

6. Draw and label the external features of a shark and mention the function of each structure. 3+4+8=15

7. Enumerate the sexual dimorphism in Bufo or Rana and describe the reproductive system in male. 3+12

8. Draw and label (a) the Pelvic girdle, (b) the ninth vertebrain Bufo or Rana. 5+4+3+3

BIOLOGY

First Paper

1966

Group A

(Answer Questions 1 and any two)

1. What is meant by modification of a Plant organ ? With example and diagram explain that (a) a tap root (*b*) a rhizome and (c) a runner, are modified forms. 3+(1+1+2)×3=15

2. Mention at least six external characteristic features of a typical stem. State at least four different functions of a stem. Name two plants which do not bear any branch on stem.

3. What is venation ? With examples and figure describe four types of venation. What type of venation is generally found in the leaf of (a) dicotoledonous and (b) monocotyledonous plants.

4. With examples and figures describe the four main types of simple racemose inflorescence. (1+1+1)×4=12

5. Write notes on (any four) of the following :—

(a) Parasite, (b) Viviparous germination, (c) Epigynous flower, (d) Syngenesious stamen, (e) Self-pollination, (f) Legume. 3×4=12

Group B

(Answer Question 5 and any two)

6. On a sketch label the protoplasmic contents of a plant cell. Mention their functions briefly. In which part of a tree the protoplasmic contents are absent in cells ?

7. Draw and label the parts, as seen in a transverse section of a typical young root of a dicotyledonous root. 6 + 6 = 12

8. Define osmosis and describe an experiment to show osmosis. Explain how the phenomenon is utilised by root hairs.

9. What do you mean by photo and synthesis ? Describe an experiment to prove that sunlight is necessary for photo synthesis. Does it take place (a) in all cells and (b) at all times ?

10. Write notes on any four of the following :—

(a) Starch, (b) Budding, (c) Cambium, (d) Photometer, (e) Respiration, (f) Tropic movement.

BIOLOGY

Second Paper

Group A

1. Describe the structure of a typical animal cell and mention the function of each part. 5 + 10

2. Mention the various changes in the nucleus of a cell during mitosis. 15

3. Draw and label the various structures in the transverse section of Hydra passing through the region of testes and indicate the function of each of cell components. 5 + 10

Group B

4. Define the term hermaphrodite. Mention the scientific name of a hermaphrodite animal and describe its male reproductive system. 3 + 2 + 10

5. Describe the position, structure and function of the following in palaemon—(a) Hastate plate, (b) Green gland, (c) Ommatidium. 5 × 3 = 15

6. Mention the distinctive external features of the following animals and state the phylum and class in which they belong : (a) Cockroach, (b) Spider, (c) Snail.

Group C

7. Draw and label the digestive organs of Bufo or Rana and mention the action of (a) gastric Juice (b) pancreatic juice.

8. Describe the respiratory system and the mechanism of respiration in an adult Bufo or Rana.

BIOLOGY

First Paper

1957

Group A

(Answer Question 1 and **any two**)

1. Indicate the different parts of a root in a suitable figure and state their functions. In how many ways the root may be modified to take up special functions ? Illustrate them with sketches, giving an example, for each kind of modification. (2 + 2) + 4 + 4 + 3 = 15

2. Are leaves arranged on plants in regular order ? If so, why ? Draw three types of arrangement of leaves on plants. Describe an experiment to demonstrate the principal function of a green leaf. 1 + 1 + 6 + 4 = 12

3. Give two examples of plants, the one which is propagated sexually the other vegetatively. Distinguish an unisexual flower from a hermaphrodite one. Indicate the reproductive organs of these two types of flowers. Give an example each of dioecious and monoecious plants.

2 + 2 + 6 + 2 = 12

4. How are seeds formed in plants ? Draw the different parts of albuminous and exalbuminous seeds. What are the functions of these parts of the seed ? Give example of each kind.

5. Write short notes on any four :—(*a*) Drupe, (*b*) Spathe, (c) Adeciduous plant, (d) Hypanthodium, (e) A nut. 3 × 4 = 12

Group B

(Answer Question 6 and any two)

6. In which part of the plant body the cells continue to multiply ? Describe the process of mitosis by the help of

properly labelled sketches. Why is this type of division called equational ?

7. Draw and label the microscopical features of a typical Dicotyledonous stem as observed in a transverse section of the stem. Indicate the different kinds of tissues present and mention their functions. (4 + 4) + (1 × 4) = 12

8. Explain why photosynthesis is also called carbon assimilation. State both the internal and external factors which influence the process. Describe experiments to show the influence of two external factors on photosynthesis. How is this process carried out in leaves submerged under water ? 2 + 3 + (3 + 3) + 1 = 12

9. Describe an experiment by which you can demonstrate growth of an organ as well as its rate of Growth. Enlargement of a cell and growth of a cell—are these two processes the same ? Explain. 10 + 2 = 12

10. Write explanatory notes on any four of the following :—
(a) Nucleus, (b) Latex, (c) Cystolith, (d) Essential elements, (e) Root pressure, (f) Positive geotropism. 4 × 3 = 12

BIOLOGY

Second Paper

Group A

1957

1. Tabulate the similarities and dissimilarities between a typical Vertebrate and an Invertebrate animal. 6 + 10

2. Write down the scientific name of a parasitic protozoon and describe the nutrition and reproduction. 1 + 1 + 12

3. Describe how Hydra obtains its nutrition. 15

Group B

4. Define excretion. Describe the excretory organs and the mechanism of excretion of Palaemon. 2 + 10 + 3

5. Describe the mechanism of respiration and the various structures associated with it in periplaneta. 5 + 10

6. Mention the differences between a Moth and a Butterfly and describe the life-history of the silk-moth. 5 + 10

Group C

7. Describe the reproductive system of a male Bufo or Rana and add a note on metamorphosis.

8. Mention the scientific names and the distinctive external features of the following animals and indicate their position in the animal kingdom : (a) Koi, (b) Frog. (c) Guineapig.

5 + 5 + 5

1968

BIOLOGY

(Science and Agriculture Group)

Second Paper

(Theoretical)

Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.

পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখ, কিন্তু প্রতি বিভাগ হইতে **দুইটির** অধিক নহে।

"ক" বিভাগ

1. সজীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। জড় বস্তুর সহিত ঐগুলির পার্থক্য নির্দেশ কর। 8+7=15

2. 'তন্ত্র' শব্দটির সংজ্ঞা লিখ। প্রাণীর পৌষ্টিকতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রের ক্রিয়া-করণ উল্লেখ কর। 3+8+4=15

3. হাইড্রার (Hydra) নিম্নলিখিত অংশগুলির অবস্থান, গঠন ও কার্য-কারিতার বর্ণনা কর—(ক) নিমাটোসিস্ট (Nematocyst) ; (খ) ক্ষণপদী কোষ (Pseudopodial cell) ? 9+6=15

"খ" বিভাগ

4. স্ত্রী ও পুরুষ প্যালিমনের (Palaemon) বহির্গঠনের পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর এবং উহার পুং-জননতন্ত্রের বিশদ বর্ণনা দাও। 5 + 10 = 15

5. পেরিপ্লানেটার (Periplaneta) গমনাগমনের সহিত সংযুক্ত গঠনাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 15

"গ" বিভাগ

6. সিসটেমিক শিরা ও পোর্টাল শিরার পার্থক্য উল্লেখ কর। বুফো (Bufo) অথবা রাণার (Rana) হেপাটিক পোর্টালতন্ত্রের বিশদ বিবরণ ও উহার প্রয়োজনীয়তা লিখ। 3 + 10 + 2 = 15

7. পায়রার বহিরাকৃতির চিহ্নাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন কর ও উহার বিভিন্ন গঠনাদির কার্যকারিতা সম্বন্ধে লিখ। 7 + 8 = 15

1968

BIOLOGY

Second Paper

English Version

(Answer *five* questions but not more than *two* from any group.)

Group A

1. Describe the characteristics of a living organism. How do these differ from those of a non-living object ? 8 + 7 = 15

2. Define the term 'system'. Mention the function of the alimentary and the respiratory systems in animal. 3 + 8 + 4 = 15

3. Describe the position, structure and function of the following in *Hydra*—(a) Nematocysts ; (b) Pseudopodial cell. 9 + 6 = 15

Group B

4. Mention the external differences between a male and a female *Palaemon* and describe in detail the male repro ductive system. 5 + 10 = 15

5. Give a short description of the various structures associated with locomotion in *Periplaneta.* 15

Group C

6. Mention the differences between a systemic vein and a portal vein. Describe, in detail, the hepatic portal system in *Bufo* or *Rana* and mention its importance. 3 + 10 + 2 = 15

7. Draw and label the external features of a pigeon and mention the function of each structure. 7 + 8 = 15

BIOLOGY

(Science and Agriculture Group)

First Paper

English Version

Group A

Answer Question *one* and any *two.*

1. Draw a complete flower and label the different parts. State the functions of each part they perform. Describe two features by which flowers ensure cross-pollination. 4 + 4 + 4 + 3 = 15

2. What are the principal functions of a stem ? Describe with the help of properly labelled sketches the different kinds of modifications of the aerial stem. Mention in each case the advantage the plant secures by undergoing such a modification.
4 + 4 + 4 = 12

3. Draw a sketch of a typical dicotyledonous leaf. Indicate its different parts and state the functions of the different parts they perform. 3 + 3 + 6 = 12

4. Name *four* different kinds of fruits and describe each of them. Why dispersal of seeds is essential for plants ? Give one example of each ad[illegible]tions for dispersal of seeds.
(4 + 2) + 1 + 3 = 12

5. Write short notes on any *four* of the following :— $4 \times 3 = 12$

(*a*) Pollen tube, (*b*) spike, (*c*) Inferior ovary, (*d*) Tendril, (*e*) Tuber, (*f*) Root-hairs and (*g*) a Thorn.

Group B

Answer question *six* and any *two*.

6. Draw the microscopical features of a young root as seen from a transverse section. Label the different tissues and state their functions. $4 + 4 + 4 = 12$

7. Describe a typical living cell and its contents. What are the functions of the nucleus and plastids ? $5 + 5 + 2 = 12$

8. How and through what organs and tissues exchange of gases takes place between the internal parts of the plant and the external atmosphere ?

9. Explain how water and minerals enter the root from the soil. Mention the forces that are involved in lifting water from the root to the leaf. $8 + 4 = 12$

10. Write short notes on any *four* of the following :— $4 \times 3 = 12$

(*a*) Tropic as against nastic movements of organs (*b*) Palisade cells (*c*) Meristems, (*d*) Enzyme, (*e*) Starch grain and (*f*) Cambium.